সসাগরা

প্রফুল্ল রায়

উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির ■ কলকাতা

SASAGARA
by Prafulla Ray
Published by :
UJJAL SAHITYA MANDIR
C-3 College Street Market
Calcutta-700 007 (1st floor)

প্রথম (উজ্জ্বল) প্রকাশ
আশ্বিন, ১৩৬৫
নভেম্বর, ১৯৫৮

পরিবেশকঃ
উজ্জ্বল বুক স্টোরস্
৬এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রতিষ্ঠাতা
শরৎচন্দ্র পাল
কিরীটিকুমার পাল

প্রকাশিকা
সুপ্রিয়া পাল
উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির
সি-৩ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-৭০০ ০০৭ (দ্বিতলে)

মুদ্রণে
ইন্দ্রলেখা প্রেস
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ
অমিয় ভট্টাচার্য

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

শ্রদ্ধাস্পদেষু

এ কালের মানুষ বলে পশ্চিমঘাট। প্রাচীন গ্রন্থে এর নাম সহ্যাদ্রি।

যে নামেই ডাকা যাক, কোঙ্কন উপকূলের অনাদি অনন্ত এই পাহাড়ের মহিমা চিরদিনই এক। এখানে চড়াইয়ের পর উতরাই, উতরাইয়ের পিছু পিছু আবার চড়াই। চড়াই-উতরাইতে পৃথিবী এখানে তরঙ্গিত।

কবে কোন সুদূর অতীতে বিশাল এক সমুদ্র কোঙ্কনের এই প্রান্তরে অবিরাম দোল খেত বুঝি। কে এক জাদুকর মন্ত্র পড়ে তার সব ঢেউ, সব স্রোত চিরদিনের মত স্তব্ধ করে দিয়েছে।

পশ্চিমঘাটের সর্বাঙ্গ জুড়ে ধাতব রুক্ষতা মেশানো। রংও তার কালো। সামনে পেছনে—কোনো দিকে তাকিয়েই এখানকার মাটিতে প্রাণের উৎসব খুঁজে পাওয়া যাবে না। ইতস্ততঃ দু'-চারটে সেগুন, এক-আধটা চন্দন, হলুদ রঙের চাপড়া চাপড়া পাহাড়ী ঘাস আর কিছু কন্টিকারি—এর মধ্যেই জীবনের সমস্ত উদ্যম নিঃশেষ। উপমা দিয়ে বলা যায়, পশ্চিমঘাট যেন অটুটদেহ এক কৃষ্ণাঙ্গী আদিবাসিনী; কঠিন বন্ধ্যা শরীর এলিয়ে সে এখানে শুয়ে আছে।

খাড়া উপত্যকা বেয়ে একটা চড়াইয়ের মাথায় উঠে এল ডানিয়েল। জন ডানিয়েল ফ্রান্সিস। কত তার বয়স? খুব বেশি হলে বাইশ-তেইশ। দীর্ঘ ছ' ফুট চেহারা। মেরুদণ্ড আশ্চর্য ঋজু। চওড়া কব্জি, ঘাড়, কাঁধ—সব যেন অনমনীয় বলশালিতার প্রতীক। নিয়ম অনুযায়ী তাকে যুবক বলাই সঙ্গত।

কিন্তু আরো একটু বিশ্লেষণ করে দেখলে ডানিয়েলকে পুরোপুরি যুবক বলা যাবে কিনা সে সম্বন্ধে সংশয় আছে। অন্তত কিছুটা দ্বিধান্বিত হতেই হবে। সোনালী চুলগুলো অযত্নে এলোমেলো। মসৃণ শরীর ঘিরে কচি পাতার মত সরস লাবণ্য ছড়িয়ে আছে, সব চাইতে বিস্ময়কর তার চোখ। সাদা জমির মাঝখানে নীল মণি দুটো টলমল করছে। মনে হয়, দুটো নীল সরোবর। ডানিয়েলের চেহারার বর্ণনা এটুকুতেই শেষ নয়। পৃথিবীর সবখানি দুষ্টুমি যেন সে দুটিতে মাখা!

যৌবন এসেছে বটে, কিন্তু সে আসাটা কিছু কুণ্ঠিত। এখন ডানিয়েলের সবটুকু দখল সে নিয়ে উঠতে পারেনি। ডানিয়েলের দেহের, সম্ভবত মনেরও অনেকখানি এখনও কৈশোরের হাতে বলা যায়, তাকে ঘিরে কৈশোরেরই আধিপত্য।

যাই হোক চড়াইয়ের মাথায় উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছিল ডানিয়েল।

দিনটা এখন দুপুর এবং বিকেলের মাঝামাঝি জায়গায় থমকানো। সূর্য পশ্চিম আকাশের ঢালু বেয়ে অনেকটা নেমে গেছে। রোদের তাপ জুড়িয়ে যাচ্ছে দ্রুত, রংও বদলাতে আরম্ভ করেছে।

মাসটা অক্টোবর। ঋতুর হিসেবে অটাম্‌ন্ অর্থাৎ শরৎকাল। এদেশে— বহু দূরের এই ভারতবর্ষে এ মাসটার কী নাম, ডানিয়েল জানে না। না জানুক, সেজন্য তার বড় একটা ক্ষোভ নেই।

নামেই শরৎ। নইলে বাতাসে প্রগলভতা নেই, রোদে যেন সোনালী আলোর বান। আকাশময় কালো কালো ভারী মেঘের আনাগোনা লেগেই আছে। সে মেঘ লঘু লীলাচপল নয়, রীতিমত মন্থর এবং জলবাহী। মাঝে মাঝে বায়ুকোণের দিকটায় বিদ্যুৎ চমকে যাচ্ছে।

আজকের এই দিনটার মতিগতি, রীতিনীতি—সব কিছুই বর্ষার দুরন্ত ঢলের দিকে। এ দেশের আর কোথায় কী নিয়ম, ডানিয়েলের জানা নেই। তবে পশ্চিমঘাটের এই দিনটা শরৎকালের হয়েও বর্ষার খাসদখলে। বর্ষাকে প্রাণ ধরে সে বিদায় দিতে পারে নি।

কালো কালো মন্থর মেঘ, স্তিমিত বিষণ্ণ রোদ কিংবা চারপাশের চড়াই উতরাই —কোনদিকেই বিশেষ মনোযোগ ছিল না ডানিয়েলের। দুরমনস্কের মত সে ভাবছিল।

পরশু দিন এই সময়টায় সে ছিল জলগাঁও, কাল ছিল কোলাপুর, আর আজ পশ্চিমঘাটের এই চড়াই-উতরাইতে।

মনে পড়ছে, পরশু ভোরে বাবা-মা আর সে বোম্বাই থেকে দিল্লী মেলে জলগাঁও রওনা হয়েছিল। জলগাঁও থেকে একশ' মাইলের মধ্যে অজন্তা। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, অজন্তার গুহাগাত্রে প্রাচীন ভারতের যে অপূর্ব শিল্পকলা রয়েছে তা দেখতে যাওয়া। সঙ্গে ছিলেন মহারাষ্ট্র গভর্ণমেণ্টের একজন জয়েন্ট সেক্রেটারি আর ছদ্মবেশে জনকয়েক সিকিউরিটি পুলিশ।

দুপুরের কিছু পরে তারা জলগাঁও স্টেশনে পৌঁছেছিল। স্টেশনের ঠিক বাইরে চারখানা শীততাপ নিয়ন্ত্রিত সুদৃশ্য মোটর অপেক্ষা করছিল। মহারাষ্ট্র গভর্ণমেণ্টই তাদের জন্য গাড়িগুলোর ব্যবস্থা করেছিলেন।

বাবা-মা এবং সঙ্গীরা যখন মোটরগুলোর দিকে যেতে ব্যস্ত তখন সবার অলক্ষ্যে উলটো দিকের প্ল্যাটফর্মে চলে গিয়েছিল ডানিয়েল। উদ্দেশ্য—পালানো।

পালানোটা খুব সহজ হ'ত কিনা, সে সম্বন্ধে সংশয় আছে। কিন্তু সেই মুহূর্তে তার ইচ্ছার সঙ্গে তাল মিলিয়েই যেন একটা ট্রেন ওধারের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ছিল। সুযোগটা অবহেলা করেনি ডানিয়েল। চোখ কান বুঁজে সমুদ্রে ঝাঁপ দেবার মত করে সেটায় উঠে বসেছিল। আর ওঠামাত্র হুইসিল দিয়ে ট্রেনটা ছেড়ে দিয়েছে। ট্রেনটা কোথায় কতদূর যাবে সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র ধারণা ছিল না ডানিয়েলের। এ দেশের পথঘাট কিছুই জানা নেই। সে জন্য তার প্রাণে এতটুকু শঙ্কার ছায়াও পড়েনি। নিজের ইচ্ছাতেই অজানা সাগরে ঝাঁপ দিয়েছে ডানিয়েল। তখন যে স্রোত তাকে যেদিকে ভাসিয়ে নেবে সেদিকেই ভেসে যাবে, সামান্য বাধাটুকুও দেবে না।

একা একা এই অজানা দেশের ট্রেনে, উঠে তার ভয় করেনি। বরং বাইশ বছরের ছকে-বাঁধা জীবনে কোনদিন যা সম্ভব হয়নি, ইণ্ডিয়ার মাটিতে পা দিয়ে হাতের মুঠোয় অতর্কিতে তা পেয়ে গিয়েছিল ডানিয়েল। কী পেয়েছিল সে? একটু মুক্তি। ঠিকানাবিহীন

নিরুদ্দেশে পাড়ি জমাতে গিয়ে বিচিত্র খুশিতে আর উত্তেজনায় তার সমস্ত শরীর থরথর করছিল যেন।

টিকিট না কেটেই ট্রেনে উঠেছিল ডানিয়েল। সে সময় তখন কোথায়? চুপিসাড়ে পালিয়ে এসেছে, তখন প্রতি মুহূর্তেই তো ধরা পড়ার সম্ভাবনা।

দু'-তিনটে স্টেশন পার হতে না হতেই চেকারের আবির্ভাব। ডানিয়েল যে বিনা টিকিটের যাত্রী, সেটুকু বুঝতে তাঁর সময় লাগেনি। ডানিয়েলও তা গোপন করেনি। চেকার ভদ্রলোক বলেছিলেন, যে স্টেশন পর্যন্ত সে যাবে তার ভাড়া তো দিতেই হবে। উপরন্তু ফাইনও দিতে হবে।

ডানিয়েল তৎক্ষণাৎ রাজী। পকেট থেকে এক তাড়া নোট বার করে চেকারের হাতে দিতে দিতে বলেছিল, 'যা লাগে নিয়ে নিন।'

চেকার ভদ্রলোক বলেছিলেন, 'কোথায় যাবেন বলুন।'

এবার বিপন্ন বোধ করেছিল ডানিয়েল। এদেশের কোন কিছুই তার জানা নেই। দিশেহারার মত প্রশ্ন করেছিল, 'কোথায় যাওয়া যায় বলুন তো?'

চেকার স্তম্ভিত। গন্তব্য সম্বন্ধে হুঁশ নেই, এমন যাত্রী সম্ভবত আগে আর তিনি দেখেননি। বিস্ময়টা কিঞ্চিৎ থিতিয়ে এলে বলেছিলেন, 'কোথায় যাবেন তা আমি কেমন করে বলব?'

রীতিমত একটা সমস্যা। তার সমাধান যে কী, সেই মুহূর্তে জানা ছিল না ডানিয়েলের। অতএব চোখ কুঁচকে কিছুক্ষণ ভাবতে হয়েছিল। আর ভাবতে ভাবতে মুশকিলের আসানটা চকিতে তার হাতে এসে গিয়েছিল। ডানিয়েল জিজ্ঞেস করেছিল, 'এই ট্রেনটা কতদূর যাবে?'

'কোলাপুর পর্যন্ত।'

'আমাকে কোলাপুরের টিকিটই দিন।'

টিকিটের দাম আর ফাইন কেটে নিয়ে বাকি টাকা ডানিয়েলকে ফেরত দিয়েছিলেন চেকার ভদ্রলোক।

পুরো একটা দিন ট্রেনে কাটাবার পর কাল্ল দুপুরে কোলাপুর পৌঁছেছিল ডানিয়েল। সেখান থেকে বাস ধরে আজ ভোরে পশ্চিমঘাটের পাশে এসে নেমেছে। তারপর শুরু হয়েছে হাঁটা, সহ্যাদ্রির কঠিন পাথুরে দেহের ওপর দিয়ে অবিশ্রান্ত পথ চলা। হাঁটতে হাঁটতে অবশেষে ছিন্নবাধা পলাতক ছেলেটি এই চড়াইটার মাথায় এসে দাঁড়িয়েছে।

দাঁড়িয়েই আছে ডানিয়েল। একটা কথা ভেবে এই মুহূর্তে ভারি মজা লাগছে তার। দুষ্টুমির হাসিতে রক্তাভ ঠোঁটের প্রান্ত দুটি ক্রমশ বেঁকে যাচ্ছে।

ডানিয়েলের ভাবনাটা এই রকম। দু'দিন ধরে সে পলাতক। দুটো দিন অর্থাৎ পুরোপুরি আটচল্লিশটি ঘণ্টা। আটচল্লিশ ঘণ্টা তো বিরাট ব্যাপার। একসঙ্গে সাতঘণ্টার বেশি সে মা-বাবাকে ছেড়ে দূরে থাকে নি। মা-বাবাই থাকতে দেননি। গত জানুয়ারিতে বাইশে পা দিয়েছে ডানিয়েল। দীর্ঘ এতগুলি বছর বাবা-মা তাকে সতর্ক দৃষ্টি দিয়ে ঘিরে রেখেছেন। তাঁদের চোখের আড়ালে যাবার সুযোগ বা সাধ্য—এতকাল কোনোটাই হয় নি। চিরদিন যা অকল্পনীয় মনে হয়েছে, কয়েক হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে ইণ্ডিয়ার

মাটিতে এসে হঠাৎ সেটা পেয়ে গেছে ডানিয়েল। বাবা আর মাকে ফাঁকি দিয়ে পালাতে পেরেছে।

দুটো দিন কাছে নেই। এর মধ্যে মা-বাবা কী করছেন? নিশ্চয়ই দিগ্বিদিকে পুলিশ পাঠিয়ে ইণ্ডিয়ার মাটি তোলপাড় করে ফেলছেন। কিন্তু এই সীমাহীন দেশের বিপুল জনারণ্য থেকে তাকে খুঁজে বার করা এতই সহজ!

চড়াইয়ের মাথায় দাঁড়িয়ে মা-বাবার কথা ডানিয়েল যতই ভাবছে ততই প্রাণের অতল থেকে কৌতুকের রাশি রাশি বুদবুদ উঠে আসছে যেন।

কিন্তু খুব বেশিক্ষণ কৌতুকের জোয়ারে গা ভাসিয়ে থাকা গেল না। পালানোটার মধ্যে মজা আছে ঠিকই, আবার কঠিন বাস্তবের কয়েকটা দিকও রয়েছে।

কাল কোলাপুর এসে সে খবর নিয়েছিল, পশ্চিমঘাটের এদিকে আদিবাসী আর জেলেদের কিছু কিছু গ্রাম আছে। তখনই সে ঠিক করে ফেলেছিল, ওখানকার একটা গ্রামে গিয়ে উঠবে। সেটা সব দিক থেকেই তাব পক্ষে কাম্য। প্রথমত, শহরে থাকা খুব নিরাপদ নয়। বাবা-মা নিশ্চয়ই তার ফোটো দিয়ে ইণ্ডিয়ার সমস্ত খবরের কাগজ ছেয়ে দিয়েছেন। সে ফোটোর সঙ্গে মিলিয়ে যে-কেউ তাকে ধরে ফেলতে পারবে।

এদেশে আসার আগেই ডানিয়েল শুনেছে ইণ্ডিয়ার গ্রামগুলোর অবস্থা শোচনীয়। সেখানকার দারিদ্র্য আর অশিক্ষার জনশ্রুতিতে সারা পৃথিবী মুখর। আর যাই হোক, সে-সব জায়গায় যে খবরের কাগজ হানা দেবে না এ একরকম স্বতঃসিদ্ধ। ভূগোলের কোলাহল থেকে অনেক—অনেক দূরে তেমন একখানা নিরালা নির্ঝঞ্ঝাট গ্রামই ডানিয়েলের পছন্দ।

পছন্দ তো, কিন্তু সকাল থেকে পশ্চিমঘাটের পাথুরে মাটির ওপর দিয়ে মাইলের পর মাইল হাঁটার পরও একখানা গ্রাম আবিষ্কার কবা যায় নি। এখনও আরো কতদূর যেতে হবে, কে জানে।

পশ্চিমঘাটের কোন চড়াই-উতরাইতে গ্রামগুলো আত্মগোপন করে আছে, ডানিয়েলের জানা নেই। দিনের আলো থাকতে থাকতে যদি একটা আশ্রয় খুঁজে বার করা না যায়, সন্ধ্যা নামলে আর কি তা সম্ভব হবে? আদিবাসীদের দরিদ্র গ্রামগুলো তো আর বোম্বাই শহর নয় যে মার্কারি ল্যাম্প আর নীওন আলোর ফোযারা ছুটিয়ে ডানিয়েলকে হাতছানি দেবে।

গ্রাম যদি না-ই পাওয়া যায় সারাবাত কী করবে ডানিয়েল? উদ্‌ভ্রান্তের মত পশ্চিমঘাটের চড়াই-উতরাইতে টহল দিয়ে বেড়ানো নিশ্চয়ই খুব একটা সুখকর হবে না। আশ্রয় না পেলে পালিয়ে আসার সব মজাটুকুই যাবে উবে।

তা ছাড়া সকাল থেকে হেঁটে হেঁটে ক্লান্তিও বোধ করতে শুরু করেছে ডানিয়েল। পা দুটো ঘণ্টা কয়েক আগে থেকেই বিদ্রোহের আভাস দিয়েছে। খিদেও পেয়েছে মারাত্মক রকমের। এদিকে পশ্চিমের আকাশ বেয়ে সূর্যটা দ্রুত নেমে যাচ্ছে।

কাজেই চড়াইয়ের মাথায় আব দাঁড়িয়ে থাকা গেল না। জোরে জোরে পা-চালিয়ে নিচের উপত্যকায় নামতে লাগল ডানিয়েল।

চড়াই থেকে নেমে খুব বেশিদূর যেতে হল না। গোটা তিনেক উতরাই পার হতেই একখানা গ্রাম পাওয়া গেল।

গ্রাম আর কি। চাঙড়া চাঙড়া পাথরের দেওয়াল আর ভাঙাচোরা টিনের চাল দিয়ে ঘেরা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কতকগুলি বাড়ি। বাড়ি বললে তাদের যথেষ্ট মর্যাদা দেওয়া হয়। অতখানি গৌরব তাদের প্রাপ্য নয়।

দূর থেকেই বোঝা যাচ্ছিল, গ্রামটার পেছনে কোনো রকম পরিকল্পনা নেই, চেহারায় নেই শ্রী। যে যার প্রয়োজন আর সাধ্য অনুযায়ী যেখানে-সেখানে ঘর তুলে নিয়েছে।

যত দীনই হোক তবু তো একটা মানুষের মাথা গোঁজার জায়গা। ওখানে গিয়ে নিজের ক্লান্তি আর খিদের কথা বললে নিশ্চয়ই একটা আশ্রয় মিলবে। দীর্ঘকালের জন্য না হোক আজকের দিনটা থাকতে পেলেই সে খুশী। একটা রাত বিশ্রাম করতে পারলে সজীব উদ্যমে আবার না হয় নতুন আস্তানার খোঁজে বেরিয়ে পড়া যাবে।

এতক্ষণ স্খলিত পায়ে হাঁটছিল ডানিয়েল। গ্রামটা চোখে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চলার গতি অস্বাভাবিক দ্রুত হল। পাখির মত ডানা থাকলে সে বোধ হয় উড়েই যেত। গ্রামটা ঢালু উপত্যকায়, মোটামুটি সমতলই বলা যায় জায়গাটাকে। সামনের দিকে উঁচু উঁচু দুটো টিলা, তাদের মধ্যবর্তী ভেতরে যাবার পথটা যেন সিংহদ্বার।

ডানপাশের টিলাটার নিচে কালো কালো ক'টি ছেলে খেলা করছিল। লম্বা লম্বা পায়ে ডানিয়েল তাদের সামনে এসে দাঁড়াল।

ছেলেগুলোর বয়স দশ থেকে পনেরোর মধ্যে। পরনে সংক্ষিপ্ত একটি করে নেংটি না থাকলে তাদের উলঙ্গই বলা চলত। কালো কর্কশ স্বাস্থ্যহীন চেহারা। সর্বাঙ্গে অপুষ্টি আর খেতে না পাওয়ার সমস্ত লক্ষণই ফুটে রয়েছে। চোখের দৃষ্টিতে দীপ্তি নেই। প্রায় সবারই গলা বড় বড় মাদুলিতে অলঙ্কৃত। (এই মুহূর্তে অবশ্য মাদুলির নাম জানে না ডানিয়েল।)

ছেলে ক'টি যেন নাম-না-জানা এই গ্রামখানার অনন্ত দৈন্যের প্রতীক।

কয়েক হাজার মাইল দূরে বসে ইণ্ডিয়ার দারিদ্র্য সম্পর্কে অনেক কিংবদন্তী শুনেছে ডানিয়েল। সে সম্বন্ধে মনে মনে একটা কাল্পনিক ছবিও এঁকে নিয়েছে। কিন্তু এই অচেনা গ্রামের সামনে দাঁড়িয়ে ছেলে ক'টাকে দেখতে দেখতে তার সমস্ত কল্পনা সাঙ্ঘাতিক একটা মার খেল। এমন দারিদ্র্য সত্যিই তার পক্ষে অকল্পনীয়।

যাদের প্রায় অনশনে দিন কাটে, ভদ্র রকমের আচ্ছাদন যারা জুটিয়ে উঠতে পারে না, তাদের কাছে আশ্রয় চাইতে যাওয়া নিতান্তই বিড়ম্বনা। কিন্তু আজকের দিনটার জন্য ডানিয়েল নিরুপায়। মনে মনে সে স্থির করল, খাদ্য এবং আশ্রয় সে এমনি এমনি নেবে না। সেজন্য দাম ধরে দেবে। যা ন্যায্য তার চাইতে অনেক গুণ বেশিই দেবে।

এদিকে ছেলেগুলো পায়ে পায়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। একটু দূরে সরে গিয়ে সন্ত্রস্ত ভীত চোখে ডানিয়েলকে দেখছে। তাদের ভয়ের সঙ্গে বিস্ময়ও মেশানো। সেটা অকারণে নয়। কেননা পশ্চিমঘাটের এই নগণ্য উপত্যকায় ডানিয়েলের মত আগন্তুক সত্যিই অভাবনীয়।

চোখমুখ দেখে তাদের মনোভাব বুঝতে পারল ডানিয়েল। তারপর ইংরেজিতে বলল, 'ভয়ের কিছু নেই, আমি তোমাদের মতই মানুষ।'

ছেলেগুলো নিশ্চুপ।

ডানিয়েল আবার বলল, 'অনেক দূর থেকে আসছি। তোমাদের গ্রামে থাকতে চাই আজকের দিনটা। ভেরি হাংগ্রি এ্যাণ্ড টায়ার্ড।'

ছেলেগুলোর এবারও কোন ভাবান্তর দেখা গেল না। দু'চোখে অপার বিস্ময় এবং ভয় নিয়ে তেমনভাবেই তারা তাকিয়ে আছে।

ডানিয়েল বলতে লাগল, 'চল, তোমাদের গ্রামে যাওয়া যাক।'

ছেলেগুলো যথারীতি নিরুত্তর। তাকে গ্রামে নিয়ে যাবার কোনো লক্ষণই দেখাচ্ছে না।

এবার কেমন যেন সংশয় হল ডানিয়েলের, বোবার রাজ্যে এসে পড়েছে নাকি! পরক্ষণেই মনে পড়ল, দূর থেকে এই ছেলেগুলোকে চেঁচামেচি করতে দেখেছিল। তবে কি—তবে কি—

বিদ্যুৎ-চমকের মত আরেকটি সন্দেহ হঠাৎ ডানিয়েলের চেতনার মধ্য দিয়ে বয়ে গেল। তার ভাষা বোধ হয় ছেলেগুলো বুঝতে পারছে না।

দ্বিতীয় সন্দেহটা মনের কোণে ছায়া ফেলতেই ইণ্ডিয়া সম্পর্কে ডানিয়েলের কল্পনা আরেক বার ধাক্কা খেল। ইতিহাস পড়ে সে জেনেছে, দু'শ বছরের মত এদেশ তাদের পদানত ছিল। ইংরেজি ছিল এখানকার রাজভাষা। যত দিন ইণ্ডিয়া তাদের অধীনে ছিল ততদিন এই সুবিশাল ভূখণ্ড জুড়ে ইংরেজি নাকি প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করেছে আর তার তোপের মুখে এদেশে যত নেটিভ নিগার ভাষা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

ডানিয়েল শুনেছে, শুধু ইংরেজিটুকু জানা থাকলে তার দৌলতে সারা ভারতবর্ষ ঘুরে আসা যায়। কোথাও কোন অসুবিধে হয় না।

কিন্তু পশ্চিমঘাটের এই উপত্যকায় দাঁড়িয়ে সে যা শুনেছিল তার সঙ্গে কোনো মিলই খুঁজে পেল না ডানিয়েল। তার মনে হল, যা শোনা যায় তার সবটুকুই সত্যি নয়। দস্তুরমত চিন্তিতই হয়ে পড়ল ডানিয়েল। নিজের কথা যদি বোঝানো না যায় তা হলে খুবই বিপদের কথা। খাদ্য, আশ্রয়—এসবের আশা নেহাতই দুরাশা।

কী বলা আর কী করা উচিত যখন বুঝে উঠতে পারছে না, ঠিক সেই সময় একটা কথা মনে পড়ে গেল। ইণ্ডিয়ায় এসে মা-বাবার সঙ্গে দুটি শহর ঘুরেছে ডানিয়েল। প্রথমে রাজধানী নয়াদিল্লীতে গেছে, তারপর এসেছে বোম্বাই। এই দু'-জায়গায় মোট চার পাঁচটা হিন্দি এবং উর্দু শব্দ শিখেছে সে। সেই নবলব্ধ জ্ঞান এই মুহূর্তে শেষ পারানির কড়ির মত মনে হল। মনে হল ঐটুকুর জোরেই মুশকিল আসান হয়ে যাবে।

এবার ডানিয়েল করল কি, হাতজোড় করে মাথা ঈষৎ হেলিয়ে বিগলিত হাসি-হাসি মুখে বলল, 'নমস্তে—'

ছেলেগুলোর কোনো প্রতিক্রিয়া নেই। আগের মতই বিহ্বল আর সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে তারা তাকিয়ে আছে।

ডানিয়েল আবার বলল, 'সুক্রিয়া—'

ছেলেগুলো এই রকম চিত্রার্পিত!

প্রচণ্ড উৎসাহে ডানিয়েল বলতে লাগল, 'বহুত আচ্ছা, খুবসুরত। দিলরুবা।' তার জ্ঞানের ভাণ্ডার নিঃশেষ।

কিন্তু এত প্রচেষ্টা, সব নিষ্ফল। এত উদ্যম, সব বৃথা। ছেলেগুলো কিছুই বুঝতে পারছে না বোধহয়। অন্তত মুখচোখ দেখে তাই মনে হচ্ছে।

ইংরেজি না হয় না বুঝল কিন্তু এ দেশের ভাষাও তারা জানে না নাকি!

ডানিয়েল আবার বিপন্ন বোধ করল। পরমুহূর্তেই তার সহজাত বুদ্ধিটা বুঝিয়ে দিল, অন্য পন্থা ধরতে হবে। মানুষের আদিমতম সনাতন যে ভাষা অর্থাৎ ইশারা—তার আশ্রয় নিল সে। একটা হাত পেটে রেখে আরেক হাত মুখের কাছে এনে খাওয়ার ভঙ্গি করল। বোঝাতে চাইল, সে ক্ষুধার্ত।

এবার ছেলেগুলো কী বুঝল তারাই জানে। হঠাৎ উর্ধ্বশ্বাসে গ্রামের দিকে ছুট লাগাল।

আর স্তম্ভিত বিমূঢ় ডানিয়েল পেছন থেকে অসহায়ের মত দ্রুত বারকয়েক বলে উঠল, 'হ্যালো—হ্যালো—হ্যালো—ডোন্ট গো। প্লীজ ডোন্ট গো—'

ছেলেগুলো পেছন ফিরে তাকাল না পর্যন্ত। দুই টিলার মধ্যবর্তী সেই পথটা ধরে নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ডানিয়েল এবার কী করবে, বুঝে উঠতে পারছে না। একবার ভাবল, ছেলেগুলো যে পথে উধাও হয়েছে সেটা ধরে সে-ও গ্রামের দিকে যায়। পরক্ষণেই একটা কথা মনে পড়তে সিদ্ধান্তটা টলে গেল। সে স্থির করল, ভেতরে যাবে না।

বছর দুই আগে একটা ভ্রমণকাহিনী পড়েছিল ডানিয়েল। লেখক কঙ্গো বেসিনে, না রেড ইণ্ডিয়ানদের দেশে—কোথায় যেন অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় পাড়ি জমিয়েছিলেন। সে সব জায়গা ঘুরে যে বিচিত্র বিপুল অভিজ্ঞতা তাঁর হয়েছিল, ভ্রমণ কাহিনীটিতে তার সরস বিবরণ আছে।

বইটার এক জায়গায় চমকপ্রদ একটা ঘটনার উল্লেখ ছিল। চমকপ্রদ বলা বোধ হয় ঠিক নয়। বলা উচিত ভয়াবহ।

ভয়াবহই। লেখক একটা অচেনা আদিবাসী গ্রামে কাউকে না বলে কয়ে অর্থাৎ আগে থেকে অনুমতি না নিয়ে হঠাৎ ঢুকে পড়েছিলেন। তার ফল হয়েছিল মারাত্মক। গ্রামবাসীরা তাকে বর্শা ছুঁড়ে মেরেছিল। ভাগ্য ভাল বলতে হবে, বর্শাটা তাঁর গায়ে লাগেনি।

পশ্চিমঘাটের এই অজানা গ্রামটিতে তেমনই এক অভ্যর্থনা ডানিয়েলের জন্য যে অপেক্ষা করছে না, জোর করে কে তা বলতে পারে।

সকাল থেকে এই বিকেল পর্যন্ত সারা কোঙ্কন উপকূলে টহল দিয়ে যদিও বা একটা গ্রাম আবিষ্কাব করা গেল, সেটা বোধহয় কাজে লাগবে না। এখন নতুন করে যে আবার অন্য আস্তানার সন্ধানে বেরিয়ে পড়বে, তেমন উৎসাহ নিজের মধ্যে কোথাও খুঁজে পেল না ডানিয়েল। পেল না একাধিক কারণে। প্রথমত, শরীরে এমন শক্তি আর অবশিষ্ট নেই যাতে এক পা-ও আর সে চলতে পারে। দ্বিতীয়ত, একটা গ্রাম খুঁজে বার করতেই তার পুরো দিন লেগে গেছে। এখন যদি নতুন গ্রামের সন্ধানে বেরিয়েও পড়ে,

পুরো আরেকটি দিনের ধাক্কা। তা ছাড়া, সেখানে যাওয়া মাত্র সবাই যে তাকে মাথায় তুলে নেবে, এমন কোনো নিশ্চয়তাও নেই।

অতএব ক্লান্ত ক্ষুধার্ত অবসন্ন ডানিয়েল আচ্ছন্নের মত দাঁড়িয়ে রইল। মাথার ভেতরটা এই মুহূর্তে ঝিম ঝিম করছে। মনে হল, পালিয়ে আসার সমস্ত মজাটুকু চোখের সামনে ধোঁয়া হয়ে মিলিয়ে যেতে শুরু করেছে।

কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল, খেয়াল নেই। হঠাৎ দূর থেকে বহু কণ্ঠের সম্মিলিত চিৎকার ভেসে এল। নিমেষে সব আচ্ছন্নতা কেটে গেল ডানিয়েলের। সমস্ত স্নায়ু ধনুকের ছিলার মত টান টান করে উৎকর্ণ হয়ে উঠল।

দূরবর্তী চিৎকারটা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। ঐ কালো কালো ছেলেগুলো কি গ্রামের লোকদের ডেকে নিয়ে আসছে? যদি আসেই, কী উদ্দেশ্য ওদের? খুব সদুদ্দেশ্য বলে তো মনে হচ্ছে না। ডানিয়েলের কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম জমতে লাগল। বুকের ভেতর শ্বাসটা আসতে লাগল রুদ্ধ হয়ে।

ঝোঁকের বশে এতখানি হঠকারিতা করে বসা বোধহয় উচিত হয়নি। অ্যাডভেঞ্চার-ট্যাডভেঞ্চারগুলো বইয়ে পড়তে মজা। 'পদে পদে ছোট নিষেধে'র শেকলে বাবা-মা তাকে ভাল ছেলে করে রাখতে চেয়েছিল, তা-ই ছিল ভাল। সুবোধ বালকের মত তাঁদের অনুগত হয়ে চললে আর যাই হোক এমন বিপন্ন হতে হত না। এখন কী করবে ডানিয়েল? পালাবে?

পালানোটাই এ ক্ষেত্রে বিধিসম্মত পন্থা। কিন্তু সে কাজটি করতে গিয়ে বিপদটা টের পাওয়া গেল। মনে হল, কেউ যেন পেরেক ঠুকে পা দুটো মাটির সঙ্গে আটকে দিয়েছে।

সুতরাং পালানো তার হল না। দেখতে দেখতে দূরের কোলাহলটা কাছে এসে পড়ল।

ডানিয়েল দেখল, কালো কালো অনেকগুলো লোক সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। সেই ছেলেগুলোর মতই তাদের চেহারায় স্বাস্থ্যের দীপ্তি নেই, গায়ের চামড়ায় তেমনই সামান্য সংক্ষিপ্ত আচ্ছাদন। ডানিয়েলের দিকে তারা তাকিয়ে আছে। তাদের চোখে যত কৌতূহল তার চাইতে অনেক বেশি বিস্ময় আর উদ্বেগ, এবং ভয়ও।

ডানিয়েলও দেখছিল। প্রথমটা ভয়ে ভয়ে। পরে অবশ্য যত দেখছিল, ভয়টা অতি দ্রুত কেটে যাচ্ছিল। নাঃ, শঙ্কার বোধহয় কিছু নেই। ভ্রমণকাহিনীতে পড়া সেই আদিবাসীদের মত বর্শার ফলা নিয়ে এরা অভ্যর্থনা জানাতে আসে নি। এই লোকগুলো নিরস্ত্র এবং নিরীহও।

যাই হোক, সারি সারি মুখের ওপর দিয়ে ডানিয়েলের দৃষ্টি ঘুরতে ঘুরতে এক জায়গায় থমকে দাঁড়াল। যেখানে দাঁড়াল সেটি একটি রমণীর মুখ।

ইণ্ডিয়ায় আসার আগেই ডানিয়েল শুনেছে, এ দেশ কালো রূপের দেশ। এখানে এসে স্বচক্ষে দেখেছেও। এই জায়গাটায় তার শোনার সঙ্গে দেখার মিল ঘটেছে। কিন্তু সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ঐ মেয়েটি আশ্চর্য ব্যতিক্রম। সে গৌরাঙ্গী। ডানিয়েলের স্বদেশবাসিনীদের মত না হলেও বেশ ফর্সাই। এই কৃষ্ণাঙ্গের দেশে তার সর্বাঙ্গ জুড়ে গৌররূপের অহঙ্কার।

কত বয়স হবে? এই গরমের দেশে যৌবন নাকি অনেক আগেই এসে পড়ে। যত আগেই আসুক, মেয়েটির বয়স উনিশ-কুড়ির বেশি কোনোমতেই নয়। সে কি রূপসী? রূপের ব্যাখ্যা একেক দেশে একেক রকম। ইণ্ডিয়ায় কেমন, ডানিয়েল জানে না!

এখন সব কিছু খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করে দেখার সময় নয়। তবু মেয়েটিকে খারাপ লাগছে না। বরং সুশ্রীই মনে হচ্ছে। ঘন পালকে-ঘেরা দীর্ঘ চোখ, সরু ভুরু, তীক্ষ্ম নাক—সব মিলিয়ে সে বেশ আকর্ষণীয়াই।

তবে তার আকর্ষণের সবটুকুই বোধহয় রূপের দিক থেকে নয়। সেটা অন্য কোথাও। পলকহীন কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকতেই সেটার খোঁজ পাওয়া গেল। এতগুলো মানুষের মধ্যে এই মেয়েটিই যা কিছু ভয়লেশহীনা। স্থির নিষ্পলকে সে ডানিয়েলের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। খুব সম্ভব পশ্চিমঘাটের এই উপত্যকায় বিচিত্র আগন্তুকটিকে বিশ্লেষণ করে নিচ্ছে।

ডানিয়েলের মনে হল, শুধু ভয়হীনাই নয়, মেয়েটির সারা শরীর ঘিরে এমন অনমনীয় একটা ব্যক্তিত্ব আছে যা সমস্ত স্নায়ুকে মুহূর্তে সজাগ করে দেয়।

মেয়েটির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ডানিয়েলের কল্পনা আরেক বার ধাক্কা খেল। ইণ্ডিয়ার মেয়েদের সম্বন্ধে কী ধারণা ছিল তার? সে শুনেছে, এ দেশের শিক্ষাদীক্ষাহীন সমাজ শতাব্দীর মূঢ় অন্ধকারে ডুবে আছে। মেয়েদের চারপাশ ঘিরে এখানে অসংখ্য দেওয়াল, অগুনতি অচলায়তন। বিশ শতকের অর্ধেকেরও বেশি কেটে গেছে। এখনও চারিদিকের কারাগার ভেঙে বাইরের উন্মুক্ত প্রান্তরে এসে দাঁড়ানো তাদের পক্ষে নাকি সম্ভব হয়নি। রক্ষণশীলতার যে প্রথাগুলো পচে পচে দুর্গন্ধ ছুটেছে সেগুলোর অসহায় শিকার হয়ে আছে এদেশের মেয়েরা। বাইরের লোকের সামনে তারা নাকি বার হয় না। একরকম লতা আছে, ছুঁতে গেলেই যারা গুটিয়ে যায়—এদেশের মেয়েরা নাকি তাই।

কিন্তু এই মেয়েটি যেভাবে তার দিকে তাকিয়ে আছে তাতে মনে হয়, তার ভেতরে বাইরে কোথাও বুঝি সঙ্কোচের চিহ্নমাত্র নেই। আরো একটা ব্যাপার লক্ষ্য করল ডানিয়েল, মেয়েটা লোকগুলোর একেবারে সামনে দাঁড়িয়ে আছে। সে কি এদের নেত্রী?

অনেকক্ষণ চুপচাপ। দূর থেকে লোকগুলো প্রচণ্ড চেঁচামেচি করতে করতে আসছিল। কাছে এসে একেবারে নীরব হয়ে গেছে।

একসময় সেই মেয়েটি স্তব্ধতা ভাঙল। সারা গ্রামের মুখপাত্র হিসাবে সে বলল, 'আপনি কে? কী চান?'

ডানিয়েল হতবাক। কেননা, মেয়েটা ইংরেজিতে কথা বলছে। উচ্চারণ পুরোপুরি সঠিক না হলেও ভাষাটা নিঃসন্দেহে শুদ্ধ। বিস্ময় কিছু থিতিয়ে এলে ডানিয়েলের মনে হল, আকাশের চাঁদ হাতে পেয়েছে।

এদিকে ভিড়ের মধ্যে চার-পাঁচটা ছেলেকে দেখিয়ে মেয়েটি আবার বলল, 'ওদের নাকি আপনি কি সব বলেছেন। ওরা তো ইংরেজি জানে না, বুঝতে না পেরে আমাদের ডেকে এনেছে।'

ছেলেগুলোকে চিনতে পারল ডানিয়েল। তারপর এক নিশ্বাসে নিজের নাম বলল। সে যে ক্ষুধার্ত এবং অপরিসীম ক্লান্ত সে কথা বলল। এই মুহূর্তে তার যে কিছু খাদ্য আর বিশ্রামের প্রয়োজন তাও বলল। শুধু মা-বাবার পরিচয়টা জানালো না আর পালিয়ে আসা সম্বন্ধেও নীরব থাকল।

মেয়েটি কি একটু ভেবে প্রশ্ন করল, 'আপনি তো এদেশের লোক নন।'

'না।'

'তবে?'

'আমি ইংলিশম্যান। দিনকয়েক হল ইণ্ডিয়ায় বেড়াতে এসেছি।'

'তা এখানে এলেন কী করে?' মেয়েটির চোখে মুখে এবং কণ্ঠস্বরে এবার যা ফুটে উঠল তার একটাই নাম—বিস্ময়।

'সব বলব, কিন্তু তার আগে কিছু খেতে না পেলে—মানে আই এ্যাম ভেরি হাংগ্রি। আমাকে কিছু খেতে দিতে পারেন?'

এবার মেয়েটি উত্তর দিল না। তার সঙ্গীদের দিকে ফিরে দুর্বোধ্য ভাষায় কী যেন পরামর্শ করতে লাগল। ডানিয়েল লক্ষ্য করল, কথা বলতে বলতে লোকগুলো আড়ে আড়ে তার দিকে তাকাচ্ছে। একটু আগে তাদের চোখেমুখে সংশয় এবং ভয়ের ছায়া দেখা গিয়েছিল। ধীরে ধীরে সে ছায়াটা কেটে যাচ্ছে। সারি সারি মুখগুলি এখন আশ্চর্য সদয়। সেখানে অভ্যর্থনার মত কি যেন একটা ফুটতে শুরু করেছে। ডানিয়েল আশান্বিত হয়ে উঠল। মনে হচ্ছে, আশ্রয় পাওয়া যাবে—নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।

পরামর্শ সেরে মেয়েটি এদিকে তাকাতেই ডানিয়েল তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'বিদেশী বলে আমাকে ভয় পাবেন না।'

মেয়েটি নিরুত্তর—তাকিয়েই আছে।

ডানিয়েল আবার বলল, 'আমাকে আপনাদের বন্ধু বলে ধরতে পারেন। ইয়েস—ফ্রেণ্ড—'

মেয়েটি নিশ্চুপ।

ডানিয়েল বলতে লাগল, 'আজকের দিনটা শুধু আমাকে থাকতে দিন। কাল যদি আমার থাকা আপনারা পছন্দ না করেন, বলবেন। চলে যাব।'

এতক্ষণে কথা বলল মেয়েটি, 'আসুন আমার সঙ্গে।'

প্রথমটা যেন অবিশ্বাস্যই মনে হল ডানিয়েলের। একটু চুপ করে থেকে প্রবল উচ্ছ্বাসে বলল, 'যাব?'

মেয়েটি মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ।'

'কোথায়?'

'গ্রামে।' নিজের সঙ্গীদের দেখিয়ে মেয়েটি বলল, 'ওরা আপনাকে থাকতে দিতে রাজী হয়েছে।'

'চলুন—' দলটার সঙ্গে দুই টিলার মধ্যবর্তী সেই সিংহদরজা দিয়ে এগিয়ে চলল ডানিয়েল। মনে হল, পশ্চিমঘাটের অখ্যাত গ্রামে নয়, স্বপ্নের ঘোরে এক অচেনা বিস্ময়ের রাজ্যেই বুঝি চলেছে।
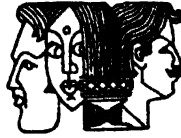
সর্বাঙ্গে সারাদিনের ক্লান্তি মাখা; তার ওপর খিদেটাও হয়ে উঠেছে প্রচণ্ড রকমের। পা দুটো ঠিকমত চলছিল না। মাথাটা আকাশের দিকে সোজা করে রাখতে চেষ্টা করছে ডানিয়েল কিন্তু ঘাড়ের কাছ থেকে শিথিল হয়ে সেটা ঝুলে পড়তে চাইছে। শুধু কি মাথাটাই, হাত-পা-কোমর—সব কিছুই টনটন করছে শরীরের সঙ্গে কোনো প্রত্যঙ্গই আর দৃঢ়ভাবে যুক্ত নেই বুঝি।

অবসন্ন এলোমেলো পায়ে টলতে টলতে হেঁটে চলেছে ডানিয়েল আর সীমাহীন অবসাদের মধ্যে মোটামুটি মজাই লাগছে তার।

সে শুনেছে ইংরেজ রাজত্বে নাকি সূর্যাস্ত হত না। শোনাই বা কেন, ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে সেই গৌরবময় উজ্জ্বল দিনগুলির কাহিনী পড়তে পড়তে ডানিয়েল নিজেই কতবার রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে। পূর্ব আর পশ্চিম গোলার্ধের এমন কোনো প্রান্ত আছে যা তাদের পদানত ছিল না? ভূমণ্ডলের দিকদিগন্তে তাদের দুঃসাহসী পূর্বপুরুষেরা বিজয়-পতাকা উড়িয়ে গিয়েছিল। হিজ ম্যাজিস্টির উদ্দেশে নিবেদিত সেই বিখ্যাত গানটির সুরে ত্রিভুবন একদা মুখরিত ছিল, 'গড সেভ দি কিং, লং লিভ দি কিং।'

ডানিয়েল জানে সে সুদিন আর ইংরেজদের নেই। সেই গৌরব আজ নিতান্তই ইতিহাস আর কিংবদন্তীর পাতায় আত্মগোপন করেছে। এশিয়া আর আফ্রিকার উপনিবেশগুলো থেকে হিজ ম্যাজেস্টির প্রতিনিধিরা চাটিবাটি গুটিয়ে চুপিসারে একে একে দেশে ফিরে যাচ্ছে। দুর্ধর্ষ পূর্বপুরুষের দল একদা যে জয়ধ্বজা দিকে দিকে তুলেছিল, পৃথিবী-ভ্রমণে বেরিয়ে আজ তা খুঁজতে যাওয়া নেহাতই বিড়ম্বনা। 'হিজ ম্যাজেস্টি'র উদ্দেশে গাওয়া সেই গানটির প্রতিধ্বনি আর কোথাও শুনতে পাওয়া যাবে কিনা সে সম্বন্ধে ডানিয়েলের নিদারুণ সন্দেহ আছে।

বিষুব রেখার দু'পারে ছোটখাটো নগণ্য কলোনিগুলোতে ইংরেজ রাজত্বের যে দু'-একটা দেউটি এখনও চোখে পড়ে সেগুলোও নিভু নিভু, স্তিমিত। ডানিয়েল জানে ওগুলোর আয়ু খুব বেশিদিন নয়। খুব বেশি হলে পনের বিশ বছরের মধ্যে পৃথিবীর দেশে দেশে ছড়ানো ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সঙ্কুচিত হতে হতে গ্রেট বৃটেনের কয়েকটি দ্বীপের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে যাবে।

কিন্তু বিচিত্র একদল মানুষের সঙ্গে পশ্চিমঘাটের অখ্যাত গ্রামখানার দিকে যেতে যেতে ঠাকুরদার কথা মনে পড়ছে ডানিয়েলের। ঠাকুরদার সঙ্গে সেই নানারঙের গৌরবের দিনগুলির কিছু ছটাও চোখে এসে লাগছে যেন। এই মনে পড়াটা অহেতুক নয়।

ঠাকুরদা অর্থাৎ লর্ড অব হ্যাম্পেস্টেড্‌শায়ার। পুরো নাম লর্ড এল্‌স্‌ওয়র্থ ডন ফ্রান্সিস অব হ্যাম্পেস্টেড্‌শায়ার।

ঠাকুরদাকে ডানিয়েল দেখে নি। তার জন্মের আগেই তিনি মারা গেছেন।

বাবার মুখে ডানিয়েল বহুবার শুনেছে হিজ ম্যাজেস্টি জর্জ দি সিক্সথের আমলে ঠাকুরদা এই ইণ্ডিয়ারই একটি প্রদেশে—যতদূর সম্ভব মাদ্রাজ কিংবা বোম্বাই অথবা মালাবারে গভর্ণর হয়ে এসেছিলেন। জাহাজ থেকে নেমে পাঁচ শ' গজী কাশ্মীরী কার্পেটের ওপর দিয়ে তিনি হেঁটে গিয়েছিলেন। তারপর শুরু হয়েছিল শোভাযাত্রা। এ দেশের সম্ভ্রান্ত নেটিভরা মাথায় জরির কাজ করা পাগড়ি বেঁধে আর রেশমি আচকান গায়ে দিয়ে মিছিল করে তাকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল।

সে মিছিলে না ছিল কী? সুসজ্জিত হাতী ছিল, হাতীর পিঠে চমৎকার করে সাজানো হাওদা ছিল, উট ছিল, মাহুত ছিল, ঘোড়া ছিল। বহুবর্ণময় জমকালো একটা উৎসবের ব্যাপার যেন। এ-সব কথা বাবা যত বার বলেছেন তত বারই তাঁর চোখ চকচকিয়ে উঠেছে।

ইণ্ডিয়া আজ স্বাধীন দেশ। ঠাকুরদার মত সম্বর্ধনা পাওয়া এখন অকল্পনীয়। কেননা, ঠাকুরদা এখানে এসেছিলেন দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হিসেবে, রাজার প্রতিনিধি হয়ে। তাঁর সম্বর্ধনার পেছনে ভয় ছিল, বাধ্যবাধকতা ছিল। তাঁর আপ্যায়নে সামান্য ক্রটি ঘটলে এদেশের নেটিভগুলোর ঘাড় থেকে কচাৎ করে মাথা নেমে যাবার সম্ভাবনা ছিল।

ডানিয়েল এদেশে শাসনের সনদ নিয়ে আসে নি, সে রাজ-প্রতিনিধিও নয়। ডানিয়েল এক পলাতক আগন্তুক মাত্র। তাকে হাতীর হাওদায় চড়িয়ে বরণ করে নিয়ে যাবার প্রশ্নই উঠে না। তবু কোঙ্কন উপকূলের এই অজানা উপত্যকায় কালো কালো অর্ধ উলঙ্গ মানুষগুলির মিছিলে ভেসে যেতে যেতে ডানিয়েলের মনে হল ঠাকুরদার মত একটা রাজকীয় অভ্যর্থনাই সে পাচ্ছে।

তাকে আর সেই ভয়লেশহীনা ফর্সা মেয়েটিকে মাঝখানে রেখে দলটা চলেছে। চলতে চলতে সঙ্গীদের দিকে একবার তাকাল ডানিয়েল। নিজেদের মধ্যে অনুচ্চ চাপা গলায় লোকগুলো কি যেন বলাবলি করছে আর আড়ে আড়ে ফিরে ফিরে ডানিয়েলের দিকে তাকাচ্ছে। ডানিয়েলকে ঘিরে একটানা গুঞ্জন যেন সঙ্গে সঙ্গে চলেছে।

লোকগুলোর ভাষা ডানিয়েলের জানা নেই। তবু আড়ে আড়ে তাকানো আর কৌতূহল এবং বিস্ময়ে-ভরা চোখ দেখে সে অনুমান করতে পারছে, তার সম্বন্ধেই ওদের মধ্যে গবেষণা চলছে। ওদের আলোচনায় সে অংশ নেবে, তার উপায় নেই। সেজন্য মনে মনে কিছুটা অসহায়ই বোধ করল ডানিয়েল।

দুই টিলার মধ্যবর্তী সেই সিংহদরজা দিয়ে বেশ খানিকটা এসে পড়েছে তারা। গ্রামটা এখান থেকে খুব দূরে নয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেখানে পৌঁছুনো যাবে। সঙ্গীদের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে একবার আকাশের দিকে তাকাল ডানিয়েল। একটু আগেও পশ্চিমঘাটের দূর দিগন্তে আকাশ যেখানে ধনুরেখায় নেমে গেছে ঠিক সেইখানে দিনান্তের সূর্য থমকে ছিল। এখন আর আতিপাতি করে খুঁজে তাকে পাওয়া যাচ্ছে না। সহ্যাদ্রির ওধারে সে অদৃশ্য হয়ে গেছে। সমস্ত উপত্যকা ঘিরে, যতদূর চোখ যায়, গাঢ় ছায়াচ্ছন্নতা নেমে আসতে শুরু করেছে।

আকাশ-ভরা সন্ধ্যার আয়োজন দেখতে দেখতে একটা ব্যাপারে হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠল ডানিয়েল। এতক্ষণ খেয়াল করে নি, তবু ঝাপসা ভাবে মনে হয়েছিল অনেক দূর থেকে বিরামহীন একটা শব্দ যেন ভেসে আসছে। গ্রামটা যত কাছাকাছি হচ্ছে, সেই শব্দটা আরো স্পষ্ট আরো প্রবল আরো তীব্র হয়ে কানে বাজছে। ঐ অশ্রান্ত শব্দটা কিসের?

ডানিয়েল উৎকর্ণ হল। খুব সম্ভব ঐ শব্দের কারণ এবং উৎসটা বুঝতে চেষ্টা করল। কিন্তু না কিছুই আন্দাজ করতে পারা যাচ্ছে না।

সুতরাং আপনা থেকেই এবার ডানিয়েলের চোখ দুটি সেই মেয়েটির দিকে ফিরে গেল। সেই মেয়েটি, যে তার ডান পাশ ঘেঁষে অনায়াস স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে অসঙ্কোচে হেঁটে চলেছে।

ডানিয়েল লক্ষ্য করছে, গ্রামে যাবার পথে যেতে একটি কথাও বলেনি মেয়েটি। তবে দুরমনস্কের মত কি এক অতল গভীর ভাবনার মধ্যে মগ্ন হয়ে যেন পথ চলছে। একটু আগে কালো কালো লোকগুলোর সঙ্গে মেয়েটি যখন প্রথম তার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল তখনই ডানিয়েলের মনে হয়েছে পশ্চিমঘাটের এই ভারতীয় মেয়েটিকে ঘিরে স্পর্শাতীত এমন কিছু আছে যা ঠিক ব্যাখ্যা করা যায় না।

সেটা একান্তই অনুভবের ব্যাপার। আর অনুভব করামাত্র তার সম্বন্ধে সমস্ত চেতনা মুহূর্তে সজাগ হয়ে ওঠে।

মেয়েটি যেন অনেক দূরের কোনো স্তব্ধ লেগুন যার চারপাশ ঘিরে প্রবাল বলয়ের দুর্ভেদ্য বেষ্টনী। মনে হল, খুব সহজে তার কাছে পৌঁছুনো যায় না।

একটু ইতস্তত করল ডানিয়েল। তারপর নিজের অসীম শ্রান্তির কথা একেবারে ভুলে গিয়ে দ্বিধান্বিত সুরে বলল, 'এক্সকিউজ মী—'

'ইয়েস—' মেয়েটি তার মগ্নতার মধ্য থেকে উঠে এল যেন, পরিপূর্ণ স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, 'আমাকে কিছু বলবেন?'

'হ্যাঁ—' ডানিয়েল মাথা নাড়ল।

'বলুন।'

সেই অবিশ্রান্ত দূরাগত শব্দটার দিকে মেয়েটির মনোযোগ আকর্ষণ করে ডানিয়েল বলল, 'আচ্ছা, ঐ আওয়াজটা কিসের?'

মেয়েটি যেন অবাক। একটু চুপ করে থেকে বলল, 'বুঝতে পারছেন না?'

তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল না ডানিয়েল। উৎকর্ণ হয়ে শব্দটা আরেক বার বুঝতে চেষ্টা করল। তারপর অপ্রতিভের মত ঘাড় দুলিয়ে দুলিয়ে খুব আস্তে বলল, 'না— মানে—'

মেয়েটি বলল, 'ওটা সমুদ্রের আওয়াজ—'

'সমুদ্রের আওয়াজ! তার মানে এখানে 'সী'ও আছে?' ডানিয়েলের চোখ মুখে কণ্ঠস্বরে এবার অসীম বিস্ময়।

'ও ইয়েস—' মাথা নেড়ে মেয়েটি জানাল, 'আরোবিয়ান সী—'

একটু চুপ। পরক্ষণেই ডানিয়েল বলে উঠল, 'আচ্ছা—'

'বলুন—'

'বৃটিশ আইল্যাণ্ডস্, মানে আমাদের দেশ থেকে ইণ্ডিয়ায় আসতে হলে সুয়েজ ক্যানেলের ভেতর দিয়ে আরবিয়ান সী হয়ে আসতে হয়—তাই না?'

মেয়েটি হাসল। বলল, 'আমি কোনোদিন আপনাদের দেশে যাই নি কিংবা সেখান থেকে ইণ্ডিয়াতে আসি নি। কাজেই নিজের অভিজ্ঞতা থেকে কিছু বলতে পারব না। তবে—'

'তবে কী?'

'আপনি যেভাবে বললেন, ভূগোলের বইতে সেইভাবেই আসার কথা লেখা আছে বটে।'

কিছুক্ষণ নীরবতা। তারপর মেয়েটিই আবার শুরু করল, 'ভূগোলের কথা বলে কি হবে, আপনি নিজেও তা জানেন। আপনি ইংলিশম্যান। ঐ পথ ধরেই তো আমাদের দেশে আপনাকে আসতে হয়েছে।'

'না—না—' হঠাৎই অস্থিরভাবে সোনালী চুল ঝাঁকিয়ে মাথা নাড়ল ডানিয়েল। বলল, 'নট অ্যাট অল, নট অ্যাট অল—'

'কী ব্যাপার?'

ডানিয়েল বলল, 'সমুদ্র পাড়ি দিয়ে আমি আসি নি।'

নিস্পৃহ মুখে মেয়েটি প্রশ্ন করল, 'তা হলে?'

'প্লেনে এসেছি। লণ্ডন থেকে বেরিয়ে প্রথমে গিয়েছিলাম ওয়েস্ট জার্মানি, সেখান থেকে ইটালি। ইটালি থেকে অস্ট্রেলিয়ায়। তারপর নরওয়ে, সুইডেন আর ইজিপ্ট হয়ে জাপান। জাপান থেকে এসেছি এখানে, মানে আপনাদের ইন্ডিয়ায়।'

মেয়েটি আবার হাসল। বলল, 'তবে তো অনেক দেশ ঘুরতে ঘুরতে আসছেন!'

'হ্যাঁ। আমেরিকা বাদ দিলে মোটামুটি সব ক'টা কন্টিনেণ্টেই চষতে চষতে আসছি বলতে পারেন।' ডানিয়েলও হাসল।

একটু কি ভেবে মেয়েটি বলল, 'একলাই এসেছেন, না সঙ্গে কেউ কেউ আছে?'

উৎসাহের ঝোঁকে ডানিয়েল বলতে যাচ্ছিল, একা একা পৃথিবীর এই দূর প্রান্তে পাড়ি জমানো তো অকল্পনীয় ব্যাপার, মা-বাবার সতর্ক পাহারা এড়িয়ে খাস লণ্ডন শহরের এ-পাড়া ও-পাড়ায় কোনোদিন সে পা বাড়াতে পেরেছে কিনা, সে সম্বন্ধে তার সীমাহীন সংশয় আছে। মা-বাবার সঙ্গেই এদেশে এসেছে সে এবং তাঁদের সামান্য একটু অসতর্কতার সুযোগে—

ঝোঁকের বশে এ-সব কথা বলতে গিয়েও থমকে গেল ডানিয়েল। মা-বাবার সঙ্গে এসেছে—এই কথাটা হয়ত সে জানাতে পারে কিন্তু সেই তথ্যটুকু জেনেই যদি মেয়েটি সন্তুষ্ট না থাকে? মা-বাবা এখন কোথায় আছেন, তাঁদেব ছেড়ে এই অজানা দেশের মাটিতে সে একা-একা কেন বেরিয়ে পড়েছে—এ-সব ব্যাপারে তার কৌতূহল যদি প্রবল হয়ে ওঠে?

ডানিয়েল তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'কে আমার সঙ্গে আসবে? আমি ছেলেমানুষ নাকি? একলাই আমি যেখানে খুশি যেতে পারি।' 'একলা' শব্দটার ওপর প্রয়োজনের অতিরিক্ত জোর দিয়ে বসল সে।

ডানিয়েলের বলার ভঙ্গিতে কোথায় যেন খানিকটা অস্বাভাবিকতা ছিল। মেয়েটি কিছুটা বিস্ময় বোধ করল বোধহয়। ঐ সামান্য বিস্ময় পর্যন্তই। এ প্রসঙ্গে আর কোনো প্রশ্ন করল না।

এরপর আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। হাওয়ার তরঙ্গে ভেসে আসা আরব সাগরের অশ্রান্ত গর্জন আর চারপাশে সেই কালো কালো সঙ্গীদের অর্ধস্ফুট গুঞ্জন ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই।

খানিকটা হাঁটার পর চোখের তারা দুটো কোণে এনে আবার মেয়েটির দিকে তাকাল ডানিয়েল। একটা ব্যাপারে তার মনের এক প্রান্তে একটু আগ্রহ দেখা দিয়েছে এবং সে সম্বন্ধে মেয়েটিকে দু'-একটি কথা জিজ্ঞেস করা দরকার।

কিন্তু মেয়েটির মুখ এই মুহূর্তে দূর আকাশের দিকে ফেরানো। খানিকক্ষণ আগের মতই আবার অন্যমনস্ক হয়ে গেছে সে। অন্যমনস্ক এবং মগ্ন। খুব বিভোর হয়ে কি যেন ভাবছে। কী ভাবছে সে?

যা-ই ভাবুক, মেয়েটি যেন কাছে থেকেও অনেক দূরের।

ডানিয়েল একবার ভাবল, ধ্যান ভাঙাবে না। কিন্তু নিজের মধ্যে কোথায় যেন একটু ছেলেমানুষ আছে। সেটা তাকে অস্থির আর ঝালাপালা করে তুলতে লাগল। অনেকক্ষণ সেই চঞ্চল ছেলেমানুষটার সঙ্গে যুঝল ডানিয়েল। মনে মনে তাকে ধমকাল, শাসন করল, চোখ পাকাল, কিন্তু সে বড় অবুঝ। অতএব মেয়েটির দিকে ফিরে ডানিয়েল বলল, 'একটা কথা বলছিলাম—'

মেয়েটি তাকাল। খুব আস্তে বলল, 'কী—'

'এখান থেকে আরোবিয়ান সী কতদূর?'

'বেশি দূর নয়, আধ মাইলের মধ্যেই।'

'মোটে আধ মাইল!'

'হ্যাঁ।'

'সেখানে স্নান করার মত বীচ্ আছে?'

'আছে।'

'ওহ্ হাউ গ্রাণ্ড, হাউ লাভ্‌লি—' হাততালিই দিয়ে উঠতে যাচ্ছিল ডানিয়েল, পরিবেশের কথা ভেবে শেষ পর্যন্ত আর দিল না। তবে খুশির উচ্ছ্বাসটাকে দমিয়ে রাখা তার পক্ষে সম্ভব হল না, 'জানেন আমি কোনোদিন সমুদ্রে স্নান করিনি।'

মেয়েটি উত্তর দিল না। ডানিয়েলের সমুদ্রস্নান সম্বন্ধে কৌতূহলও প্রকাশ করল না। তার মুখে নিঃশব্দ মৃদু হাসি ফুটল মাত্র।

উৎসাহের সুরে ডানিয়েল আবার বলল, 'কাল ভোরবেলা উঠেই সমুদ্র দেখতে যাব। স্নানও করব।'

মেয়েটি এবারও নিশ্চুপ। মৃদু হাসিটা অবশ্য তার মুখে লেগেই আছে।

আরো কী যেন বলতে যাচ্ছিল ডানিয়েল, বলা হল না। সেই মুহূর্তে মেয়েটি হঠাৎ বলে উঠল, 'আমরা এসে গেছি।'

কথায় কথায় কখন যে তারা গ্রামটার মধ্যে এসে পড়েছিল খেয়াল নেই। চকিত ডানিয়েল মেয়েটির মুখ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে চারিদিকে তাকাতে লাগল।

দূর থেকেই পশ্চিমঘাটের এই গ্রামখানা তার চোখে পড়েছিল। মানুষের এই বসতিটা যে কতখানি হতচ্ছাড়া চেহারার, দেখামাত্রই টের পেয়ে গিয়েছিল সে। দূর থেকে যে দীনতা তবু কিছুটা অস্পষ্ট মনে হয়েছিল, কাছে এসে তার উলঙ্গ চেহারাটা চোখে বিঁধতে লাগল ডানিয়েলের।

গ্রামখানার পেছনে যে কোনো পরিকল্পনা নেই, আগেই তা বোঝা গিয়েছিল। এলোমেলো ছড়ানো বাড়িগুলোর ভিত এবং দেয়াল পশ্চিমঘাটের চাঁই চাঁই পাথর কেটে তৈরি। বাতাস চলাচলের জন্য যে ছোট ছোট ফোকর রয়েছে সেগুলোর অন্য নাম জানালা। তুলনায় বড় ফোকরগুলো সম্ভবত মানুষ চলাচলের জন্য। ও-গুলোর নাম বোধহয় দরজা। অবশ্য দরজা-জানালাগুলোতে গরাদ বা পাল্লা কিছুই নেই।

হঠাৎ দেখলে মনে হয়, বাড়িগুলো যেন অর্ধপশুগঠন আদিম মানুষদের সারি সারি দুর্গবিশেষ। অথবা প্রাগৈতিহাসিক প্যাগান দেবতাদের কতকগুলো মন্দির।

বাড়িগুলোকে ইচ্ছামত ডাইনে এবং বাঁয়ে রেখে রাস্তাগুলো এঁকেবেঁকে আর পাক খেয়ে এগিয়ে গেছে। প্রতিটি বাড়ির জানালা এবং দরজায় অর্ধ-উলঙ্গ কালো কালো মেয়েমানুষের মুখ। তাদের ঘিরে একপাল করে শিশু।

শিশুগুলি এবং তাদের মায়েরা স্থির নিষ্পলকে তাকিয়ে তাকিয়ে ডানিয়েল নামে এক বিচিত্র আগন্তুককে দেখছে। কেউ একটা কথা বলছে না, হাত-পা নাড়তে পর্যন্ত তারা ভুলে গেছে। আধ মাইল দূরের অদৃশ্য পশ্চাৎপটে অশ্রান্ত সমুদ্র-কল্লোল ছাড়া এই মুহূর্তে কোঙ্কন উপত্যকার এই গ্রামখানা আশ্চর্য রকমের স্তব্ধ। দেখতে দেখতে ডানিয়েলের মনে হচ্ছে, এই গ্রামখানা, এখানকার বাসিন্দারা—কেউ এই শতাব্দীর নয়। মাটির অতল সমাধি থেকে পুরাকালের একটি জনপদকে তার সমস্ত জীবন্ত অধিবাসী সমেত তুলে এনে হুবহু একইভাবে রেখে দেওয়া হয়েছে।

দলটার সঙ্গে ডানিয়েল গ্রামখানার মধ্যে দিয়ে চলেছে তো চলেছেই। রাস্তাগুলো অপরিচ্ছন্ন উঁচুনিচু। ইঞ্চি ছয়েক পুরু বালি (সমুদ্র কাছে থাকার জন্য বাতাসের মুখে মুখে উড়ে এসেছে) তো আছেই। তার ওপর গাছের রাশি রাশি পাতা, কাঁকর, বড় বড় পাথরের টুকরো ইত্যাদি ইতস্তত ছড়ানো। প্রায় প্রতি পদক্ষেপে ঠোক্কর খেতে খেতে এগুতে হচ্ছে।

অবশেষে রাস্তা ফুরলো। প্যাগান মন্দিরের মত একটা বাড়ির সামনে এসে মেয়েটি থামল সঙ্গে সঙ্গে দলটাও থমকে দাঁড়াল অগত্যা ডানিয়েলকেও দাঁড়াতে হ'ল। কালো লোকগুলোর সঙ্গে কি একটু পরামর্শ করে মেয়েটি ডানিয়েলের দিকে ফিরল। সামনের বাড়িটা দেখিয়ে বলল, 'আসুন—' বলে নিজেই আগে পা বাড়িয়ে দিল।

প্রায় রাস্তা থেকেই পাথরের সিঁড়ি উঠে গেছে আগে আগে মেয়েটি চলেছে। ডানিয়েল তাকে অনুসরণ করতে লাগল। তার পিছু পিছু সেই লোকগুলো।

মোট সাতটা সিঁড়ি পার হয়ে বিশাল একখানা ঘরে পৌঁছুনো গেল। পাথরকাটা মেঝে এবড়ো খেবড়ো, অসমতল।

এককোণে দড়ির একটা খাটিয়া রয়েছে। সেটা দেখিয়ে মেয়েটি বলল, 'বসুন।'

বলামাত্র আর অপেক্ষা করল না ডানিয়েল। তৎক্ষণাৎ খাটিয়াটায় নিজেকে সঁপে দিল।

সমস্ত কোঙ্কন উপত্যকা জুড়ে সেই বিকেল থেকে যে সন্ধ্যার আয়োজন চলছিল এতক্ষণে তা পূর্ণ হয়েছে। ঘরের বাইরের ছায়াচ্ছন্ন ভাব যদিও কিছু ফিকে ভেতরে তার গাঢ়ত্ব অনায়াসেই টের পাওয়া যাচ্ছে। সেই মেয়েটি অথবা লোকগুলোকে দেখা যাচ্ছে ঠিকই, তবে তাদের চোখমুখ স্পষ্ট করে বুঝবার উপায় নেই। মানুষের দেহের অস্ফুট একেকটা আভাস দিয়ে তারা ঘরময় নড়াচড়া করছে।

এদিকে ডানিয়েলকে বসতে বলে সেই মেয়েটি একটি লোককে কি যেন বলল। সঙ্গে সঙ্গে লোকটা উর্ধ্বশ্বাসে ছুটল। একটু পরেই একটা জ্বলন্ত লণ্ঠন নিয়ে আবার ফিরে এল সে। দুর্বোধ্য ভাষায় মেয়েটি তাকে কী নির্দেশ দিয়েছিল এবার তা অনুমান করা গেল।

কেরোসিন তেলের লণ্ঠন। সেটা থেকে যেটুকু আলো পাওয়া যাচ্ছে তার হাজার গুণ মিলছে ধোঁয়া। ঘরের নিবিড় ছায়াচ্ছন্নতা পুরোপুরি কাটানো সেই স্তিমিত কুণ্ঠিত আলোটুকুর পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। শুধু গাঢ় অন্ধকার খানিক বিরক্ত হয়ে লণ্ঠনটার কাছ থেকে সামান্য দূরে সরে গেছে।

দড়ির সেই খাটিয়াটা জীর্ণ, ময়লা এবং বহুকালের প্রাচীন। তার ওপর বসে চারপাশে ছায়ামূর্তির মত কালো কালো মানুষগুলোকে যেন দেখতে পাচ্ছিল না ডানিয়েল। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় নির্জীব কেরোসিনের লণ্ঠনটাও তার চেতনায় রেখাপাত করতে পারছিল না। ডানিয়েল ভাবছিল।

পরশু জলগাঁও স্টেশন থেকে যদি নিরুদ্দেশে পাড়ি জমাবার ইচ্ছেটা না হত? বাবা-মাকে ফাঁকি দিয়ে ঝোঁকের বশে যদি উলটোদিকের প্ল্যাটফরমে গিয়ে কোলাপুরের ট্রেনে সে উঠে না বসত? ইণ্ডিয়ায় আসার আগে বাইশ-তেইশ বছর পর্যন্ত সে যা করেছে অর্থাৎ সুশীল সুবোধ বালকটির মত মা-বাবার সঙ্গে সঙ্গেই যদি থাকত তা হলে কী হত?

প্রথমত, পশ্চিমঘাটের অজানা উপত্যকায় এই দরিদ্র গ্রামখানা তার কাছে অনাবিষ্কৃতই থেকে যেত। দ্বিতীয়ত, অজন্তার অপূর্ব শিল্পকলা দেখে দু'-চোখ পরিতৃপ্ত হত এবং বোম্বাইতে ফিরে আরব সাগরের পটে সেই সুবিশাল হোটেলটায় অফুরন্ত বিলাস আর আরামের আরকে নিজেকে ডুবিয়ে রাখা যেত।

বোম্বাইয়ের সেই হোটেলটায় (মহারাষ্ট্র গভর্ণমেণ্ট যেখানে তাদের থাকার ব্যবস্থা করেছেন) খ্যাতি শুধু ইণ্ডিয়াতেই নয়, সারা এশিয়া জুড়ে। এমনকি আরব সাগর পাড়ি দিয়ে তার কিংবদন্তী ইউরোপেও ছড়িয়ে পড়েছে। প্রাসাদের মত সমস্ত হোটেল বাড়িটা

শীততাপ নিয়ন্ত্রিত। সেখানে 'ক্যাসিনো' আছে, সুবিস্তৃত 'বল্ রুম' আছে, 'বার' আছে, সুইমিং পুল আছে। আরো কত কি আছে, ডানিয়েলের জানা নেই।

তারা এ দেশের অতিথি। সুতরাং তাদের জন্য ব্যবস্থাটা পুরোপুরি রাজসিক। ডজনখানেক ওয়েটার আর আধডজন স্টুয়ার্ড ধবধবে নিখুঁত পোশাকে সর্বক্ষণ দুয়ারে তটস্থ হয়ে থাকত। উঠতে বসতে চলতে ফিরতে শুধু সেলাম—গণ্ডা গণ্ডা রাশি রাশি সেলাম। ডানিয়েলদের জন্য আলাদা লিফটের বন্দোবস্ত ছিল। তা ছাড়া, এত আরামের মধ্যেও কোথাও কোনো ত্রুটি থেকে যাচ্ছে কিনা তার খবরদারি করার জন্য মহারাষ্ট্র গভর্ণমেন্টের একজন অফিসার প্রতি তিন ঘণ্টা পর পর একবার করে হোটেলে আসতেন, ওয়েটারদের অকারণে ধমকাতেন, স্টুয়ার্ডদের আর ম্যানেজারকে উদ্ব্যস্ত করে তুলতেন এবং ডানিয়েলদের কাছে এসে বশংবদ ভঙ্গিতে জানতে চাইতেন, কোনোরকম অসুবিধে হচ্ছে কিনা।

সেই হোটেলটার সামনে দিয়ে অর্ধবৃত্তাকার একটা পথ অনেক দূরে চলে গেছে। এই মুহূর্তে অর্থাৎ রাতের এই শুরুতে অগণিত মার্কারি আলোয় রাস্তাটা নিশ্চয়ই জাদুকরী মোহময়ী হয়ে উঠেছে। কাব্য করে এবং গর্ব করে তাকে 'কুইন্‌স্ নেকলেশ' বলা হয়।

কাছে এবং দূরে, উঁচু উঁচু বাড়ির মাথায় আর ওভার ব্রীজের গায়ে রাশি রাশি নীওন জ্বলে উঠেছে। ওগুলো নানা কোম্পানির বিজ্ঞাপন। তাছাড়া নিচের রাস্তা দিয়ে চলেছে মানুষ এবং গাড়ীর অবিশ্রান্ত ঢল। সব মিলিয়ে বোম্বাই শহর এই মুহূর্তে রাতের মোহিনীমায়া।

বোম্বাইয়ের সেই আরামদায়ক স্মৃতির মধ্যে নিজের অজান্তেই অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল ডানিয়েল। হঠাৎ সেই মেয়েটির গলা শোনা গেল, 'এক্সকিউজ মী—'

অন্যমনস্ক ডানিয়েল চকিত হয়ে মুখ তুলল।

মেয়েটি বলল, 'সারাদিনে নিশ্চয়ই আপনার স্নান হয়নি?'

'না।'

'স্নান করবেন?'

'করতে পারলে তো ভালই হয়।' ডানিয়েল বলতে লাগল, 'সেই সকাল থেকে হাঁটছি। ঘামে-ধুলোয় আর বালিতে গা চটচট করছে।'

মেয়েটি বলল, 'আপনি একটু বিশ্রাম করুন। আমি আপনার স্নানের ব্যবস্থা করে আসছি।' বলেই আর অপেক্ষা করল না সে। প্রাগৈতিহাসিক দুর্গের মত এই বাড়িটা থেকে ক্ষিপ্র পায়ে বাইরে বেরিয়ে গেল। তার পিছু পিছু সেই কালো কালো মানুষগুলোও অদৃশ্য হল।

এই মুহূর্তে অজানা গ্রামের এই প্রায়ান্ধকার ঘরখানায় ডানিয়েল একা, একেবারে একা। বহুদূর পশ্চাৎপটে আরব সাগরের অশ্রান্ত গর্জন ছাড়া তার যেন আর কোন সঙ্গী নেই।

দূর সমুদ্রকল্লোল শুনতে শুনতে নিজের অজ্ঞাতসারে কখন যে খাটিয়ার ওপর পা তুলে শুয়ে পড়েছিল, ডানিয়েলের খেয়াল নেই। শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে চেতনা আচ্ছন্ন

হয়ে আসতে শুরু করেছে। আর সেই আচ্ছন্নতার মধ্যে নিজের কথাই বার বার মনে পড়ছে তার।

রাজার দুলালই তাকে বলা যায়। জীবনে কোনোদিন একসঙ্গে দু-ফার্লঙের বেশি সে হেঁটেছে কিনা, ডানিয়েল মনে করতে পারে না। বাড়ি থেকে এক পা বেরুতে গেলে সাতজন সোফার সাতখানা গাড়ি এনে পোর্টিকোর তলায় দাঁড় করাত। সেই গাড়িগুলোর একটা রোলস রয়েস, একটা মাস্টার বুইক, একটা ইম্পালা। অবশিষ্ট চারখানা চমকপ্রদ আমেরিকান এবং ফ্রেঞ্চ মডেলের। ট্রেনে কোথাও যেতে হলে এয়ার কণ্ডিসান্ড্ সেলুন কারেই গেছে।

অথচ—অথচ ইণ্ডিয়ায় এসে পরশু তৃতীয় শ্রেণীর ঠাসাঠাসি ভিড়ে, কাঠের বেঞ্চিতে ছারপোকার কামড় খেতে খেতে কোলাপুর পর্যন্ত পাড়ি দিয়েছিল সে। শুধু কি প্রচণ্ড ভিড় আর ছারপোকার কামড়ই, তৃতীয় শ্রেণীর সেই হরিজনদের মধ্যে কানে-তালা লাগানো চিৎকার ছিল। কেউ কামরার মধ্যেই থুতু ফেলছিল, কেউ পানের পিচ, কেউ বা উরু পর্যন্ত কাপড় তুলে ঘস্ ঘস্ করে খানিক চুলকেও নিচ্ছিল। একটি বয়স্কা মেয়েমানুষ তো এককোণে বসে চুল থেকে উকুন বার করে নখের ডগায় টিপে টিপে মারছিল।

এ সব ছাড়া আরো কিছু কিছু মনোহরণ দৃশ্য চোখে পড়েছে। যাত্রীরা প্রায় সবাই পরস্পরের কাঁধে মাথা রেখে ঢুলছিল। ডানিয়েলের কেমন যেন ধারণা হয়ে গেছে, এভাবে ট্রেনের কামরায় ঘুমনোই এদেশের রীতি।

চিত্রটি এতেই সম্পূর্ণ নয়। রাশি রাশি কলা এবং বাদামের খোসা, রুটির টুকরো, চায়ের খুরি, ভুক্তাবশেষ ডাল-তরকারি এবং শত শত চুট্টার ধ্বংসাবশেষ কামরাময় ছড়ানো।

ভিড় কিংবা অন্য কোনো কিছুই ডানিয়েলের অস্বস্তির কারণ হয়নি। বরং কৌতুকই বোধ করছিল সে। কিন্তু যাত্রীদের মুখে জ্বলন্ত চুট্টাগুলো (এর আগে চুট্টা দেখেনি ডানিয়েল, নামও জানত না। জিজ্ঞেস করে জেনে নিয়েছে) আর সেগুলোর তীব্র কটু গন্ধ তার শ্বাস প্রায় রুদ্ধ করে আনছিল। চুট্টার কথা জানা থাকলে একটা গ্যাস-মাস্ক পরেই হয়ত ট্রেনে উঠত সে।

ট্রেন-যাত্রায় একটা ব্যাপার তার কাছে সব চাইতে বিস্ময়কর মনে হয়েছে। বিস্ময়কর এবং কৌতুকময়। তা এইরকম। গাড়িটা যখনই এককেটা স্টেশনে থেমেছে, তখনই কামরার তাবৎ যাত্রী ভেতর থেকে দরজা ঠেলে রেখেছে আর বাইরে থেকে ক্রমাগত কিল চড় ঘুষি এবং লাথি পড়েছে। সেই সঙ্গে শোনা গেছে তুমুল চিৎকার। কামরার বাইরেটা যখন সরব এবং বিস্ফোরক তখন ভেতরটা অবশ্যই মুখে তালা লাগিয়ে থাকে নি। ভেতর থেকেও যোগ্য প্রত্যুত্তর গেছে। এদের ভাষা বুঝতে পারছিল না ডানিয়েল। তবে এটুকু টের পাচ্ছিল, উভয় তরফে যা বিনিময় হচ্ছে আর যা-ই হোক তা মথী বা লুকলিখিত সুসমাচার নয়।

এই দরজা ধাক্কাধাক্কির ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত আর অবোধ্য থাকে নি। অর্থাৎ বাইরের লোকগুলো ট্রেনে উঠতে চাইছিল কিন্তু স্থানাভাবের জন্য ভেতরের যাত্রীরা তাদের বাধা দিচ্ছিল।

এ নিয়ে একটা মজার ব্যাপারও ঘটেছিল।

প্রথম দিকে এককোণে বসে দু'চোখে বিস্ময় নিয়ে কাণ্ডটা দেখে গেছে ডানিয়েল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হাত-পা গুটিয়ে থাকা যায় নি। একটা মধ্যবয়সী লোক সামনে এসে হাত-পা নেড়ে ভেংচি কেটে কি যেন বলেছিল। তারপর হাতের ইঙ্গিতে দরজা দেখিয়ে দিয়েছিল।

ইঙ্গিতটা অবোধ্য নয়। লোকটার কথা একবর্ণ না বুঝলেও ইঙ্গিতটার সারমর্ম অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করা গেছে। সবাই মিলে কামরার দুর্গ রক্ষা করবে আর ডানিয়েল চুপচাপ বসে থাকবে—এমন চালাকি চলবে না। অতএব সবার রঙে রঙ মিশিয়ে, সবার ইচ্ছায় নিজেকে সঁপে দিয়ে ডানিয়েলকেও দুয়ার আগলাতে হয়েছে। তৃতীয় শ্রেণীতে এমন চমকপ্রদ ভ্রমণই কি শুধু, যে মানুষ কোনদিন দু'-ফার্লঙের বেশি একসঙ্গে হাঁটে নি, পশ্চিমঘাটের কর্কশ পাথুরে দেহের ওপর দিয়ে আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত সে মাইলের পর মাইল পাড়ি দিয়ে ফেলেছে।

জলগাঁও স্টেশনে মাথার ভেতর খেয়ালের সেই পোকাটা যদি নড়ে না উঠত তা হলে এতগুলো বিচিত্র অভিজ্ঞতা তার হত কি?

আরো কিছু ভাবতে যাচ্ছিল ডানিয়েল, তার আগেই পাথরের সিঁড়িতে অনেকগুলো পায়ের আওয়াজ শোনা গেল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সেই মেয়েটি এবং তার সাঙ্গোপাঙ্গ রা ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ল।

ডানিয়েলের হাত দুটি কপাল এবং চোখের ওপর আড়াআড়ি স্থাপিত। এখন তার চেতনা এমন এক জায়গায় যেখান থেকে সব কিছু বোঝা যায়, সব কিছু শোনা যায় কিন্তু কিছুই করতে ইচ্ছা হয় না। শ্রান্ত শরীর এলিয়ে শুধু শুয়ে থাকতেই ভাল লাগে।

মেয়েটির ডাক শোনা গেল, 'ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি?'

'না, জেগেই আছি।' চোখ এবং কপালের ওপর থেকে হাত সরিয়ে আস্তে আস্তে উঠে বসল ডানিয়েল।

'আপনার স্নানের ব্যবস্থা করে এসেছি। চলুন।'

'চলুন—' ডানিয়েল উঠে বসল।

মেয়েটি এবং তার দলবলের সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে আবার সেই সাতখানা পাথরের সিঁড়ি ভেঙে বাইরে চলে এল ডানিয়েল। রাস্তায় নেমে বেশ খানিকটা হাঁটতে হল। ডাইনে-বাঁয়ে অনেকগুলো চড়াই-উতরাই ভেঙে একসময় একটা ফাঁকা জায়গায় পৌঁছুনো গেল।

মেয়েটির সঙ্গীরা হাতে লণ্ঠন ঝুলিয়ে এসেছিল। সেই আলোতে দেখা গেল, একধারে প্রায় চতুষ্কোণ এবং সমতল একটুকরো পাথর। সেটার পাশে বড় বড় তিনটে জালায় জল ভর্তি। জালাগুলোর গা ঘেঁষে একটা কলাইকরা পুরনো মগও আবিষ্কার করা গেল।

অর্থাৎ এই খোলা জায়গায় পাথরের টুকরোটার ওপর দাঁড়িয়ে স্নান করতে হবে। সব দেখেশুনে পালিয়ে আসার আমোদটুকু চোখের সামনে ঝাপসা হয়ে আসতে লাগল।

সুসজ্জিত বাথরুমের বাইরে ডানিয়েল কোনদিন স্নান করেছে বলে মনে করতে পারে না। শাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে স্নান করতেই চিরদিন সে অভ্যস্ত। যে জল অজস্র মুখ থেকে তার জন্য বেরিয়ে আসে প্রথমত তা সুরভিত হওয়া চাই। দ্বিতীয়ত ডাক্তারী পরীক্ষার রায়ে অবশ্যই জীবাণুমুক্ত হতে হবে।

কিন্তু এই খোলা জায়গায় কলাইয়ের মগ দিয়ে গায়ে মাথায় একরাশ নোংরা জল ঢালতে হবে। ঐ জলে হয়ত কলেরার, হয়ত বসন্তের, নতুবা অন্য কোনো মারাত্মক রোগের কোটি কোটি জীবাণু কিলবিল করে বেড়াচ্ছে। ভাবতেও পায়ের তলা থেকে চুলের ডগা পর্যন্ত একটা আলোড়ন বয়ে গেল। মনে হল, স্নায়ুগুলো ক্রমশ কুঁকড়ে আসছে।

আর ঠিক সেই সময় মেয়েটির ডাক কানে এল। ডানিয়েল মুখ ফিরিয়ে তাকাতেই সে বলল, 'আপনার কি গায়ে মাথায় দেবার জন্যে তেল লাগবে?'

'না, ধন্যবাদ।' ডানিয়েল বলল।

কি ভেবে মেয়েটি আবার প্রশ্ন করল, 'যা পরে এসেছেন, তা ছাড়া আপনার সঙ্গে বাড়তি জামা-কাপড় আছে কি?'

'না।'

'যা পরে আছেন ওগুলো কি বদলাতে চান?'

'বদলাতে পারলে ভালই হয়। দু'দিন ধরে পরে আছি, ছাড়তে না পেরে ভারি অস্বস্তি লাগছে।'

একটু ইতস্তত করে মেয়েটি বলল, 'কিন্তু—'

ডানিয়েল বলল, 'কী?'

'এ গ্রামে ট্রাউজার্স কি শার্ট তো পাওয়া যাবে না। বড় জোর একখানা ধুতি আর চাদর পাওয়া যেতে পারে। ধুতি-চাদর পরতে কি আপনার অসুবিধে হবে?'

ডানিয়েল হাসল, 'কোনো দিন তো ওসব পরিনি।' একটু থেমে আবার বলল, 'কিভাবে পরতে হয় একটু দেখিয়ে দিলে কাজ চালিয়ে নিতে পারব।'

মেয়েটির হাতে একটা রঙিন গামছা ছিল। সেটা ডানিয়েলকে দিতে দিতে সে বলল, 'আপনি স্নান করতে থাকুন, আমি ধুতিটুতি নিয়ে আসছি।' বলে সবেমাত্র পেছনে ফিরেছে, ব্যগ্র গলায় ডানিয়েল ডেকে উঠল. 'শুনুন—'

মেয়েটি ঘুরে দাঁড়াল। ডানিয়েল বলল, 'আচ্ছা, এখানে কোন বাথরুম নেই?'

স্থির নিষ্পলকে কিছুক্ষণ ডানিয়েলের চোখের দিকে তাকিয়ে রইল মেয়েটি। তারপর খুব মৃদু গলায় বলল, 'আপনার বুঝি এভাবে খোলা জায়গায় স্নান করার অভ্যাস নেই?'

'না।'

একটু চুপচাপ। পরক্ষণেই মেয়েটি নীরবতা ভাঙল। আগের মতই অনুচ্চ স্বরে বলল, 'আপনি তো এই গ্রামটার ভেতর দিয়ে একটু আগে আমার সঙ্গে এসেছেন—'

ডানিয়েল বলল, 'তা এসেছি।'

'এ গ্রামের বাড়িঘর আর বাসিন্দাদের চেহারা নিশ্চয়ই আপনার চোখে পড়েছে।' মেয়েটি জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল।

সে কী বলতে চায় বুঝতে না পেরে বিমূঢ় মুখে ডানিয়েল বলল, 'হ্যাঁ, তা পড়েছে।' বলে নিজের অজান্তেই বুঝি ঘাড় কাত করল।

বিচিত্র হেসে মেয়েটি বলল, 'এই লোকগুলোকে দেখে কি আপনার মনে হয়েছে একখানা বাথরুম রাখার মত সৌখিনতা এদের থাকা উচিত?'

ডানিয়েল হতচকিত। মনে হল, গালের ওপব প্রচণ্ড একখানা চড় এসে পড়েছে। কিছু একটা বলতে চেষ্টা কবল সে, কিন্তু স্বরটাকে গলার ভেতর থেকে কিছুতেই বার করে আনতে পারল না।

কথা ক'টি বলে মেয়েটি আর দাঁড়ায় নি। ধুতি এবং চাদর যোগাড় করতে দ্রুত পা ফেলে চলে গেছে। কালো কালো লোকগুলো অবশ্য এবার আর তার পেছনে ছুটল না। ডানিয়েলের কাছাকাছি ছায়ার মত দাঁড়িয়ে রইল।

যে চড়খানা গালের ওপব এসে পড়েছিল সেটা সামলে উঠতে সময় লাগল ডানিয়েলের। স্তব্ধ মূর্তির মত অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে একসময় আস্তে আস্তে সেই চৌকো পাথরখানার ওপর গিয়ে উঠল সে। তারপর জামা আর রিস্ট-ওয়াচটা খুলে একপাশে রেখে মাথায় জল ঢালতে লাগল।

স্নান প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, সেই সময় মেয়েটি ক্ষারে কাচা লালচে ধুতি-চাদর নিয়ে ফিরে এল।

বাকি স্নানটুকু সেরে গামছা দিয়ে দ্রুত গা-মাথা মুছে ফেলল ডানিয়েল। আর কী পদ্ধতিতে লম্বা বহরের ন'-হাত ধুতি সামলাতে হয় তা জানিয়ে একটু দূরে সরে গেল মেয়েটি। কেননা, ডানিয়েল এবার কাপড় বদলাবে, একটি তরুণীর পক্ষে এসময় সমানে দাঁড়িয়ে থাকা রীতিমত অশোভনতাই।

মেয়েটি যেমন পরতে বলেছে যথাযথ তেমনটি হল না বলেই মনে হয়। না হওয়াই স্বাভাবিক। প্রথম দিন কতটুকু হওয়াই বা সম্ভব! তবু নিজের দিকে একবার তাকাল ডানিয়েল। বেশবাসের সামান্য হেরফেরে এমন রূপান্তর যে ঘটতে পারে, সত্যিই তা জানা ছিল না। তার মধ্যে যে এক অপরিচিত বিদেশীর বসতি ছিল, নিজেই কি তা কোনোদিন কল্পনা করতে পেরেছে ডানিয়েল?

এদিকে সেই মেয়েটি আড়াল থেকে এগিয়ে এসেছে। কাছে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। চকিত দৃষ্টিতে ডানিয়েলেব পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার দেখে নিল। ডানিয়েলের মনে হল, পলকের জন্য মেয়েটির চোখের ওপর দিয়ে মুগ্ধতার একটি ছায়া পড়তে না পড়তেই মিলিয়ে গেছে।

মেয়েটির হাতে কাঠের একটি চিরুনি ছিল। সেটা ডানিয়েলের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'চুলটা আঁচড়ে নিন।'

চুল আঁচড়ে চিরুনি ফেরত দিয়ে পাশের দিকে ঝুঁকল ডানিয়েল। উদ্দেশ্য, পরিত্যক্ত শার্ট আর প্যান্টটা কুড়িয়ে নেওয়া।

কুড়নো আর হল না। তার আগেই বাধা পড়ল। ব্যস্তভাবে মেয়েটি বলে উঠল, 'ওগুলোর জন্যে আপনাকে ভাবতে হবে না। আসুন আমার সঙ্গে।'

অগত্যা জামা প্যান্ট আর নিল না ডানিয়েল। তবে জামার পকেট থেকে মানিব্যাগটা বার করে আর রিস্ট-ওয়াচটা হাতে লাগিয়ে মেয়েটির খুব কাছে এসে দাঁড়াল।

মেয়েটি ততক্ষণে হাঁটতে শুরু করেছে। সে যেন অমোঘ নিয়তি। নিঃশব্দে তাকে অনুসরণ করতে লাগল ডানিয়েল। তাদের সঙ্গে সেই কালো নীরব ছায়ামূর্তিরাও চলতে লাগল।

এবার কাছাকাছি একটা জায়গায় যেতে হল। তিন-চারটে রাস্তা পার হয়ে অন্য একটা বাড়িতে মেয়েটি ডানিয়েলকে এনে তুলল।

আশ্চর্য! এ বাড়িটার চারপাশে রীতিমত একটা মেলা বসে গেছে যেন। খুব সম্ভব সারা গ্রামখানাই এখানে ভেঙে পড়েছে।

সবিস্ময়ে ডানিয়েল বলল, 'কী ব্যাপার! এখানে—'

মেয়েটি বলল, 'এখানে আপনার খাবার ব্যবস্থা হয়েছে।'

'তা এত লোক!'

'ওরা আপনার খাওয়া দেখতে এসেছে।'

'খাওয়া দেখতে!'

'হ্যাঁ।'

খাওয়াও যে একটা দর্শনীয় ব্যাপার হতে পারে, এ সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা ছিল না ডানিয়েলের। স্তম্ভিত বিস্ময়ে একবার চারিদিকের মানুষজন, আরেকবার মেয়েটিকে দেখতে লাগল সে। এবং এ প্রসঙ্গে আর কোনো প্রশ্ন করবার আগে লক্ষ্য করল, কখন যেন ঘরের মধ্যে এসে পড়েছে।

ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা চৌকো পুরু কাপড় পাতা। সেটা দেখিয়ে মেয়েটি বলল, 'ওখানে বসে পড়ুন।'

কাপড়ের টুকরোটার ওপর কেন বসতে হবে, বুঝতে না পেরে ডানিয়েল বলল, 'বসব!'

'বসবেন বৈকি। সারাদিন তো পেটে কিছু পড়ে নি। খেতে হবে না?'

ওখানে বসে খেতে হবে! ভাবতেই অদ্ভুত লাগল ডানিয়েলের। পরক্ষণেই নিজের অজ্ঞাতসারে চোখ দুটি ঘরের চারদিকে ক্ষিপ্র গতিতে একবার ঘুরে এল। না, বৃথাই। কোথাও চেয়ার নেই, টেবিল নেই। কাঁটা-চামচ-ফর্ক-সল্টপট-সস-ন্যাপকিন—এসব এখানে খুঁজতে যাওয়া নিতান্তই বিড়ম্বনা। অতএব নির্দেশমত সেই চৌকো কাপড়খানার ওপর গিয়ে বসল ডানিয়েল।

আর মেয়েটি ঘর থেকে বেরিয়ে কিছুক্ষণ পর যখন ফিরে এল, তখন তার হাতে কলাইয়ের একটা থালা, দুটো বাটি আর জলের একটা গেলাস। সেগুলো ডানিয়েলের সামনে সাজিয়ে দিয়ে কিছুটা দূরে সরে বসল সে। বলল, 'খান।'

থালার দিকে তাকিয়ে ডানিয়েলের চক্ষু স্থির। মোটা মোটা রাঙা চালের স্তূপীকৃত ভাত। তার এক পাশে কালো কালো অনেকখানি কী একটা বস্তু। সম্ভবত কোনো সেদ্ধ ভেজিটেবল্‌স্‌। একটা বাটিতে হলদে রঙের টলটলে খানিকটা তরল। কী ওটা? সুপ?

দ্বিতীয় বাটিটায় পাটকিলে রঙের যে বস্তুটি রয়েছে সেটা যে কী, ডানিয়েল আন্দাজ করতে পারল না।

ইণ্ডিয়ায় আসার আগে কোনদিন ভাত খায়নি ডানিয়েল। অবশ্য ভাত সম্বন্ধে তার স্পষ্ট ধারণা ছিল। রাইস গ্রেন ফুটিয়ে যে ভাত তৈরি করতে হয় এবং তা যে ইস্টের অর্থাৎ পূর্ব গোলার্ধের দরিদ্র বুভুক্ষু মানুষের প্রধানতম খাদ্য তা সে জানত।

ভারতবর্ষে এসে যে তিন-চার দিন তারা রাজধানী নয়াদিল্লীতে ছিল, তার মধ্যে বার দুয়েক ভাতের আস্বাদ পেয়েছে। 'ইণ্ডিয়ান ডেলিকেসি' বলে তাদের যা দেওয়া হয়েছিল তার নাম বিরিয়ানি। ধবধবে জেসমিন ফুলের মত সুস্বাদু সুরভিত সেই ভোজ্যের স্বাদ এখনও তার জিভে লেগে আছে। মনে পড়ে, প্রায় তিন ডিশ বিরিয়ানি সে চেয়ে চেয়ে খেয়েছিল। তার ধারণা হয়েছিল, ইস্টের মানুষ এই রকম ভাত খেতেই অভ্যস্ত। এদেশের খাদ্যরুচি সম্বন্ধে তার শ্রদ্ধা বেড়ে গিয়েছিল। পর মুহূর্তেই তার মধ্যে সংশয় দেখা দিয়েছিল, যাদের দৈনন্দিন আহার্য এই, তাদের ঠিক দরিদ্র বলা যায় কিনা।

কিন্তু ভাতেরও যে রকমফের থাকতে পারে সে ধারণা ডানিয়েলের ছিল না। পশ্চিমঘাটের এই নগণ্য জনপদে কলাই-করা নোংরা থালায় মোটা মোটা লাল চালের ভাত দেখতে দেখতে, ওগুলোর স্বাদ কী হতে পারে, অনেকখানিই যেন অনুমান করতে পারল। ওগুলো গলাধঃকরণ করতে হবে, ভাবতেই তার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল যেন।

মানুষের সুস্থভাবে বাঁচতে হলে কত ক্যালরি খাদ্যের প্রয়োজন? ডানিয়েল সঠিক জানে না। তবে ভাতের এই থালাটা আর বাটি দুটোর মধ্যে প্রয়োজনীয় ক্যালরির সিকি অংশও যে নেই, সে সম্বন্ধে সে নিঃসন্দেহ। এখানকার মানুষদের অপুষ্টি আর রুগ্নতার কারণ যেন সে হঠাৎ আবিষ্কার করে ফেলল।

হাত গুটিয়ে বসেই আছে ডানিয়েল। পাশ থেকে মেয়েটি বলল, 'কি হল, খান—'

থালার দিকে হাত বাড়াতে গিয়ে থমকে গেল ডানিয়েল। হাত দিয়ে খাবার অভ্যাস নেই। তা ছাড়া, কোনটা আগে খেতে হবে, ভাত না ভেজিটেবল্‌স্ অথবা বাটির ঐ খাদ্যগুলো—কিছুই সে জানে না। যা-ই হোক, মনে মনে সে সিদ্ধান্ত করে ফেলল, ভাত দিয়েই শুরু করবে।

শুরু তো করবে কিন্তু চামচ কোথায়? মেয়েটির কাছে একটা চামচ চাইবে নাকি? চাইতে গিয়ে আচমকা বাথরুমের কথা মনে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে চামচ সম্বন্ধে তার উৎসাহ নিভে গেল।

মেয়েটি আবার তাড়া লাগাল, 'আরম্ভ করুন।'

অগত্যা থালায় হাত নামিয়ে দিল ডানিয়েল এবং এক মুঠো শুধু ভাত মুখের ভেতর পুরতে চেষ্টা করল। কিন্তু কথায় বলে অনভ্যাসের ফোঁটা। অতএব আঙুলের ফাঁক এবং গালের পাশ দিয়ে ঝরঝর করে ভাতগুলো কতক থালায় পড়ল, কতক মেঝেতে। অবশিষ্ট দু'চার দানা মুখের মধ্যে গেল কি গেল না। খাবার ধরন তার অনেকটা শিশুর মত।

দ্বিতীয় বার ডানিয়েল যখন গ্রাস তুলতে যাবে সেইসময় মেয়েটি যুগপৎ হাত এবং মাথা নেড়ে বলে উঠল, 'উঁহু—উঁহু—'

ভাতের ডেলাটা থালায় নামিয়ে রেখে ডানিয়েল মেয়েটির দিকে তাকাল।

মেয়েটি বলল, 'শুধু ভাত খাচ্ছেন কেন? তরকারি দিয়ে মেখে নিন।' একটু থেমে আবার বলল, 'ঐ বাটি দুটোর একটায় ডাল আছে, অন্যটায় মাছ।' কিভাবে ভাত মাখতে হবে তা-ও বলে দিল মেয়েটি। নির্দেশ অনুযায়ী অপটু হাতে কোনোরকমে মেখে নিল ডানিয়েল কিন্তু খেতে গিয়ে সেই আগের বিপত্তি। ভাতগুলো যথাস্থানে পৌঁছুবার আগেই আবার ঝরঝরিয়ে পড়তে লাগল।

কিছুক্ষণ ডানিয়েলের খাওয়া দেখে মেয়েটি একসময় বলে উঠল, 'আপনি বুঝি কোনোদিন হাত দিয়ে খান নি?'

ডানিয়েল জানাল, 'না।'

মেয়েটি এবার অনেকখানি ঝুঁকল। সদয় কণ্ঠে বলল, 'অন্তত একটা চামচ পেলে ভাল হয়, তাই না?'

ডানিয়েল মুখে কিছু বলল না। শুধু কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাকিয়ে মাথা নাড়ল।

মেয়েটি নিঃশব্দে উঠে পড়ল। তারপর ঘরের বাইরে গিয়ে কোথা থেকে একটা প্রকাণ্ড পেতলের চামচ যোগাড় করে এনে ডানিয়েলের হাতে দিল।

এবার অনেকখানি সুবিধেই হয়েছে। ভাত অবশ্য পড়ছে ঠিকই। তবে আগের মত সবগুলো নয়। আগের চাইতে অনেক বেশিই এখন মুখে যাচ্ছে।

ভাত-ডাল-তরকারি, এ-সব মুখে পুরতে পুরতে ডানিয়েলের মনে হল, এমন স্বাদবর্জিত অখাদ্য জীবনে আর কোনোদিন সে খায়নি। কিন্তু পেটের ভেতর গনগনে খিদে রয়েছে। অতএব খাদ্যাখাদ্য বিচারের সময় এটা নয়। খিদের গুণেই খেয়ে যেতে লাগল ডানিয়েল।

ঘরখানার চারিদিকে দরজা এবং জানালা নামে যে ফোকরগুলো রয়েছে, সে-সব জায়গায় কালো কালো অসংখ্য মুখ। স্থির লুব্ধ চোখে তারা তার দিকেই তাকিয়ে আছে। তাদের দৃষ্টিতে শতাব্দীর ক্ষুধা যেন সঞ্চিত। তীক্ষ্ন ধারালো ফলার মত চোখ দিয়েই বুঝিবা লোকগুলো তাকে বিদ্ধ করে ফেলবে। ডানিয়েলের মনে হল, পারলে ওরা বোধহয় তার ভাতগুলো ছিনিয়েই খেত।

চারিদিকের মানুষগুলোকে দেখতে দেখতে সমস্ত সত্তার মধ্য দিয়ে শীতল স্রোত বয়ে যেতে লাগল। ডানিয়েলের বার বার মনে হল, এই কৃশ করুণ ক্ষুধার্ত মানুষগুলোর খাদ্যে অন্যায়ভাবে সে ভাগ বসিয়েছে। নিজেকে অত্যন্ত অপরাধী মনে হতে লাগল তার।

তাকিয়েই আছে। থাকতে থাকতে খাবার ইচ্ছাটা ক্রমশ বিলীন হয়ে যেতে লাগল ডানিয়েলের। একবার সে ভাবল, পাতের এককোণে ভাত-তরকারি যা অবশিষ্ট আছে, ওদের ডেকে সে সব দিয়ে দেবে কিনা।

ভাবনাটা বেশিদূর এগুলো না। মাঝপথেই সেই মেয়েটি বলে উঠল, 'হাত গুটিয়ে বসে থাকবেন না। তাড়াতাড়ি খেয়ে নিন।'

কথাগুলো যেন শুনতেই পেল না ডানিয়েল। যথারীতি বিহ্বলের মত কালো কালো মুখগুলির দিকে তাকিয়ে রইল।

খানিকক্ষণের স্তব্ধতা। এর মধ্যে ডানিয়েলের চোখমুখ দেখে তার মনের কথা বোধহয় পড়ে নিতে পারল মেয়েটি। চাপা ফিস ফিস স্বরে এক সময় সে বলে উঠল, 'ওরা বড় গরীব, বড় দুঃখী। ভাতের ওপর ডালটুকুর বেশি কোনোদিন জোটাতে পারে না। এই ডাল-ভাতও আবার মাঝে মাঝে জোটে না। বছরের কত দিন যে ওদের উপোস দিয়ে কাটে!' একটু থেমে আবার বলল, 'আপনি আজ এ গ্রামের অতিথি। ডাল তরকারি মাছের একটু ব্যবস্থা করা হয়েছে আপনার জন্যে। ওদের কাছে এ একেবারে মহোৎসবের ভোজের ব্যাপার। তাই দল বেঁধে সবাই আপনার খাওয়া দেখতে এসেছে।'

খাওয়া দেখার কথাটা বিদ্যুৎচমকের মত মনে পড়ে গেল ডানিয়েলের। স্নান সেরে এ বাড়িতে ঢোকার সময় এই কথাটা জানিয়ে দিয়েছিল মেয়েটি। খাওয়া যে একটা দ্রষ্টব্য ব্যাপার হতে পারে—এটা তখন রহস্যই মনে হয়েছিল ডানিয়েলের। কিন্তু কে জানত বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে এই স্বাস্থ্যহীন দীপ্তিহীন দরিদ্র গ্রামখানায় খাওয়া সত্যিসত্যিই দর্শনীয়। জগতে কত বিস্ময়ই যে আছে!

কোথায় যেন ডানিয়েল একখানা বইয়ের নাম শুনেছিল; 'জিওগ্রাফি অব হাঙ্গার'। বইটা হয়ত পড়েও থাকবে কিংবা পড়ে নি। জিওগ্রাফি অব হাঙ্গার—ক্ষুধার ভূমণ্ডল। ডানিয়েলের এই মুহূর্তে মনে হল, তেমনই এক পৃথিবীতে এসে পড়েছে সে।

একসময় ডানিয়েল বলে উঠল, 'আচ্ছা, এরা এত গরীব কেন?'

মেয়েটি বিচিত্র হাসল, কোনো উত্তর দিল না।

মেয়েটির হাসির মধ্যে এমন কিছু রয়েছে যাতে চকিত হয়ে উঠল ডানিয়েল। এমন একটা প্রশ্ন করে বসা বোধহয় বোকামিই হয়ে গেছে। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে ডানিয়েল আবার বলল, 'আচ্ছা ওরা কী করে?'

প্রশ্নটা ঠিক বুঝতে না পেরে মেয়েটি জিজ্ঞেস করল, 'কী করে মানে?'

'মানে চাকরি-বাকরি বা ব্যবসা—কিছু একটা করে তো খেতে হয়।'

অর্থাৎ জীবিকা প্রসঙ্গে জানতে চাইছে ডানিয়েল। মেয়েটি বলল, 'ওরা জেলে। মাছ ধরে বেচাই ওদের প্রধান ব্যবসা। তবে তার ফাঁকে মাস দুয়েকের মত মুক্তোরও চাষ করে থাকে।'

এতক্ষণ খেয়াল করে নি ডানিয়েল, কিন্তু প্রায় শুরু থেকেই মেয়েটির একটা কথা অস্পষ্টভাবে তার কানে বেজে যাচ্ছিল। এবার সে ব্যাপারে সচেতন হয়ে উঠল সে। এই গ্রামের বাসিন্দাদের প্রসঙ্গ যখনই উঠেছে, তখনই তাদের সম্বন্ধে সম্পর্কশূন্য তৃতীয় পক্ষের মত 'এরা', 'ওরা' বলেছে মেয়েটি।

তবে কি মেয়েটি এ গ্রামের কেউ নয়? যদি না-ই হয় তা হলে কে? ডানিয়েলের সমস্ত চেতনা জুড়ে কৌতূহল ছায়া ফেলল। এ নিয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল সে, বলা হল না। তার আগেই মেয়েটি তাড়া দিয়ে উঠল, 'আর বসে থাকবেন না। অনেক রাত হয়ে গেল, তাড়াতাড়ি খাওয়া চুকিয়ে ফেলুন।'

অতএব ঘাড় গুঁজে আবার ভাতের থালাটায় চামচ বাড়িয়ে দিতে হল। চারপাশে অসংখ্য লুব্ধ চোখ সাক্ষী রেখে গোগ্রাসে খেয়ে চলেছে ডানিয়েল। খেতে খেতে তার

মনে হল, খাদ্যগুলো আর নিচের দিকে নামতে চাইছে না। রাশি রাশি কাঁটার মত গলায় সেগুলো বিঁধছে।

খাওয়া শেষ হলে মেয়েটি তাকে সেই আগের বাড়িটায় নিয়ে এল। গ্রামে ঢুকে প্রথমে এখানে এসে বিশ্রাম করেছিল সে। তাদের পিছু পিছু কালো কালো একদল মানুষও এসেছে।

ঘরে ঢুকেই এককোণে সেই দড়ির খাটিয়াটার ওপর দ্রুত বিছানা পাততে শুরু করল মেয়েটি। তার হাতের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল ডানিয়েলের। স্নান করে আসার সময় প্যান্টের পকেট থেকে মানিব্যাগটা নিয়ে এসেছিল। তাড়াতাড়ি সেটা খুলে একখানা দশ টাকার নোট বার করল ডানিয়েল। মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনাকে একটু বিরক্ত করব।'

বিছানার ওপর মেয়েটির হাত থেমে গেল। ঘাড় ফিরিয়ে সে বলল, 'বলুন—'

হাতের নোটখানা এগিয়ে দিয়ে ডানিয়েল একবার ভেবে নিল, সে যা খেয়েছে তার দাম হিসেবে এই টাকাটা যথেষ্টই। বলল, 'এটা ধরুন—'

কিছুটা অবাক হয়ে মেয়েটি প্রশ্ন করল, 'কেন?'

'মানে, আমি খেলাম—' কুণ্ঠিত স্বরে ডানিয়েল বলল, 'তাই—'

'তাই তার দাম দিতে চাইছেন?'

'মানে ওরা খুব গরীব লোক—'

পরিপূর্ণ আয়ত চোখে ডানিয়েলের দিকে তাকিয়ে মেয়েটি হাসল। স্নিগ্ধ সুরে বলল, 'নিশ্চয়ই ওরা গরীব লোক। তবে আজকে আপনি যা খেলেন, তার জন্য দাম দিতে হবে না। কিছুতেই ওরা তা নেবে না।'

'কেন?'

'আজ আপনি এ গ্রামের অতিথি।' বলেই খাটিয়াটার ওপর ঝুঁকে আবার বিছানা পাততে শুরু করল মেয়েটি।

বিছানা পেতে মশারি টাঙিয়ে সে বলল, 'আপনি এবার শুয়ে পড়ুন। আমাকে অনেক দূর যেতে হবে।'

আগেই অস্পষ্টভাবে ডানিয়েলের মনে হয়েছিল এই শ্রীময়ী মেয়েটি এ গ্রামের কেউ নয়। তার চমৎকার চেহারা, সুগৌর গাত্রবর্ণ এবং পরিচ্ছন্ন মার্জিত ব্যবহার— কোনো কিছুর সঙ্গেই এখানকার কৃশ করুণ অর্ধউলঙ্গ মানুষগুলোর বিন্দুমাত্র মিল নেই।

ডানিয়েলের কৌতূহল প্রায় শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছে গেছে। সে বলল, 'অনেক দূর যেতে হবে মানে?'

'মানে মাইল খানেকের মত পাহাড়ী পথ ভাঙতে হবে।'

'আপনি কি এ গ্রামে থাকেন না?'

'না।'

'তা হলে—' এই পর্যন্ত বলে মাঝপথে হঠাৎ থেমে গেল ডানিয়েল।

ডানিয়েলের কথার অনুচ্চারিত দিকটায় একটি প্রশ্ন রয়েছে। মেয়েটি তা বুঝল। বলল, 'এখান থেকে মাইল খানেক দক্ষিণে গেলে একটা চার্চ পাওয়া যাবে। আমি সেখানেই থাকি।'

দ্বিধান্বিত সুরে ডানিয়েল বলল, 'চার্চে থাকেন?'

'হ্যাঁ—' মেয়েটি মাথা নাড়ল, 'আমি খ্রীস্টের সেবিকা।'

ডানিয়েল তাকিয়েই ছিল। মেয়েটিকে দেখতে দেখতে তার দু'চোখে যা ফুটে উঠল তার নাম অপাব অসীম বিস্ময়। সেই বিস্ময়ের সঙ্গে কিছুটা শ্রদ্ধাও যেন এবার মিশল। আস্তে আস্তে সে বলল, 'আপনার নামটা যদি দয়া করে বলেন—'

'সুভদ্রা যোসেফ।'

যোসেফ শব্দটা পরিচিত। কিন্তু সুভদ্রা? সম্ভবত এ দেশীয় ভাষার কোন শব্দ। অর্থ কী? তা জিজ্ঞেস করা বোধহয় সঙ্গত হবে না। সে যাই হোক, মনে মনে নামটা বারকয়েক উচ্চারণ করতে চেষ্টা করল ডানিয়েল। কিন্তু না, কিছুতেই মিলছে না। খাস ব্রিটিশ জিভে নেটিভ শব্দটা বেঁকেচুরে 'সুব-ড্রা' অথবা 'সুবা-দ্-রা'র মত রূপ নিচ্ছে।

মেয়েটি অর্থাৎ সুভদ্রা আবার বলে উঠল, 'আপনি এবার শুয়ে পড়ুন। আমি চলি। গুড নাইট—'

সুভদ্রা যোসেফ বেরুবার জন্য দরজার দিকে এগিয়ে গেল। আর সেই মুহূর্তে নিজের অজ্ঞাতসারেই বুঝি ডানিয়েল ডেকে উঠল, 'আচ্ছা—'

সুভদ্রা দাঁড়িয়ে পড়ল। মুখ ফিরিয়ে বলল, 'কী—'

'আবার কখন আপনার সঙ্গে দেখা হবে?'

'কাল বেলার দিকে আমি এখানে আসব। ততক্ষণ পর্যন্ত আপনি যদি এ গ্রামে থাকেন, দেখা হবে।'

ডানিয়েল চকিত হয়ে উঠল। সুভদ্রা, কি কালই তাকে চলে যাবার ইঙ্গিত দিচ্ছে? পরক্ষণেই তার মনে হল, এটাই স্বাভাবিক। ডানিয়েল নিজেই তো তাকে বলেছে, এ গ্রামে আজকের রাতটুকুর মত সে আশ্রয় চায়।

আরো কি ভাবতে যাচ্ছিল ডানিয়েল, ভাবনার বৃত্তটা সম্পূর্ণ হল না। তার আগেই সুভদ্রা আবার বলল, 'ভালো কথা, আপনার জামা প্যান্ট ধুয়ে রাখতে বলেছি। কাল সকালেই পেয়ে যাবেন।'

আর অপেক্ষা করল না সুভদ্রা। দ্রুত পা ফেলে ঘরের বাইরে অদৃশ্য হয়ে গেল। তার পিছু পিছু নিঃশব্দ ছায়ামূর্তিরাও উধাও হল।

সুভদ্রা চলে যাবার পর কতটা সময় কেটে গেছে ডানিয়েলের খেয়াল নেই। কখন যে পায়ে পায়ে বিছানায় এসে শুয়ে পড়েছে সে, তা-ও মনে করতে পারে না।

এখন কত রাত তা-ই বা কে বলবে। অবশ্য রেডিয়াম ডায়ালের রিস্ট-ওয়াচটা চোখের সামনে এনে রাতের বয়স অনায়াসে পড়ে নিতে পারা যায়। কিন্তু নিজের মনের কোথাও তেমন ইচ্ছাটুকু খুঁজে পেল না ডানিয়েল।

সুভদ্রারা ঘরেব একধারে একটা লণ্ঠন জ্বেলে রেখে গিয়েছিল। কখন যেন সেটা নিভে গেছে। আজ কী তিথি, কোন পক্ষ—কে জানে। অন্তত ডানিয়েলের সে খবর জানা নেই। চারিধারে যে পাল্লাহীন ফোকরগুলো রয়েছে সেগুলো দিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে কুয়াশা-মেশানো চাঁদেব আলো ঘরের ভেতর এসে পড়েছে। আর বহুদূরের পশ্চাৎপট থেকে আসছে আরব সাগরের অশ্রান্ত কলধ্বনি। শুয়ে পড়েছে কিন্তু ঘুম আসছে না।

সমস্ত ব্যাপারটাই ডানিয়েলের কাছে বিচিত্র স্বপ্নের মত মনে হচ্ছে। পরশু জলগাঁও স্টেশনে মা-বাবাকে ফাঁকি দিয়ে কোলাপুরের ট্রেনে ওঠার পর থেকে আজ এই মুহূর্তে পশ্চিমঘাটের এই অচেনা গ্রামটিতে এই অদ্ভুতগঠন ঘরের এককোণে শোওয়া পর্যন্ত সমস্ত ব্যাপারটাই যেন আশ্চর্য রকমের অবিশ্বাস্য। মনে হচ্ছে, কতকগুলো অলৌকিক ঘটনার যোগাযোগে সে বুঝি আরব্য রজনীর কোন একটি কাহিনীর নায়ক হয়ে গেছে।

যাই হোক, মা-বাবা অথবা এই গ্রাম, কুয়াশাবিলীন এই রাত—সব কিছুই ডানিয়েলের চেতনার বাইরের দিকটা স্পর্শ করে যাচ্ছে মাত্র। তার সমস্ত সত্তার কেন্দ্রে এখন শুধু একটি মানবীরই মুখ। সে সুভদ্রা যোসেফ।

সুভদ্রা জানিয়েছে সে খ্রীস্টের সেবিকা এবং গীর্জাবাসিনী। তবে কি মিশনারী 'নান'? ডানিয়েল শুনেছে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে ইণ্ডিয়ার অনেক নেটিভ খ্রীস্টান হয়ে গেছে। তাদের কেউ কেউ চার্চে গিয়ে ধর্মপ্রচারকের ভূমিকায় জীবন উৎসর্গ করেছে। কিন্তু—

কিন্তু গীর্জাবাসিনী 'নান' সম্প্রদায়ের তো বিশেষ পরিচয়বাহী পোশাক থাকে। সারপ্লিসই তাকে বলে বোধহয়। কিন্তু তেমন পোশাক তো সুভদ্রার পরনে ছিল না।

সুভদ্রা এ গ্রামের কেউ নয়। তবু মনে হয়, প্রায়ই সে এখানে আসে। শুধু আসেই না, ডানিয়েলের ধারণা, এ গ্রাম তারই রাজ্যপাট, এখানকার সে অধীশ্বরী? সুভদ্রার সামান্য অঙ্গুলিহেলনে কালো কালো অর্ধউলঙ্গ মানুষগুলো বুঝিবা প্রাণটুকু দিয়ে দিতে প্রস্তুত।

তবু প্রশ্ন থেকে যায়, কেন সে এ গ্রামে আসে? কিসের টানে অথবা কোন আকর্ষণে? নাঃ, এই মুহূর্তে তা জানা সম্ভব নয়।

রাত আরো ঘন, আরো গভীর হয়েছে। কখন যেন একসময় চোখের পাতা বুজে এল ডানিয়েলের। সেই সঙ্গে চেতনার শেষ অন্তরীপটিও ধীরে ধীরে অথৈ ঘুমে নিমজ্জিত হয়ে যাচ্ছে। তার চারিদিক থেকে এ মুহূর্তে চেনাশোনা সমস্ত জগৎ বিলুপ্ত হয়ে যেতে শুরু করেছে। শুধু হৃদ্‌পিণ্ডের অশ্রান্ত উত্থান-পতনে একটি নারীই বার বার, অসংখ্য বার তরঙ্গিত হতে লাগল। সে সুভদ্রা—গীর্জাবাসিনী সুভদ্রা যোসেফ।

পরের দিন কিন্তু পশ্চিমঘাটের এই গ্রামটা ছেড়ে ডানিয়েলের যাওয়া হল না। সকালে ঘুম ভাঙতেই সে অনুভব করল, মাথাটা সাঙ্ঘাতিক ভারী। কয়েক টন ওজন কেউ যেন সেটার ওপর চাপিয়ে রেখেছে। কপালের দু'পাশে দুটো শিরা খ্যাপা ঘোড়ার মত সমানে লাফিয়ে চলেছে। শরীরের যেখানে যত স্নায়ু আর গ্রন্থি আছে, সবগুলোর মধ্য দিয়ে অসহ্য যন্ত্রণার একটা স্রোত দুর্বার বেগে বয়ে যাচ্ছে।

ডানিয়েলের চিন্তাশক্তিটা এই মুহূর্তে বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত, শিথিল। তবু এখন সে কোথায় আছে, ভাবতে চেষ্টা করল। ভাবনাটা অবশ্য তড়িৎ-গতিতে নির্ভুল জায়গায় পৌঁছুল না। প্রথমে টুকরো টুকরো, অসংলগ্ন ক'টি ছবি মনে পড়ল। সীমাহীন পাহাড়ের কর্কশ পাথুরে দেহ, রুগ্ন চেহারার বাবলা আর কন্টিকারি, অফুরন্ত চড়াই-উতরাই, কালো কালো অর্ধ-ন্যাংটো মানুষ, প্যাগান মন্দিরের মত এলোমেলো অসংখ্য বাড়ি। এ সবের মধ্য দিয়ে তার ভাবনা অনেক ঘুরে অবশেষে পশ্চিমঘাটের এই অচেনা গ্রামখানায় এসে পৌঁছুল।

সঙ্গে সঙ্গে আরো একটা কথা মনে পড়ল ডানিয়েলের। কাল সারাটা দিন, সেই সকাল থেকে রাতের প্রথম প্রহর পর্যন্ত অবিরাম হেঁটেছে। যে আদরের দুলাল এক ফার্লং হাঁটলে বাবা-মা মূর্ছা যান, সে কিনা গোটা পশ্চিমঘাট পাহাড়টাই শুধু পা দু'-খানার ওপর ভরসা করে পাড়ি দিয়ে ফেলেছে! আর এই অনভ্যাসের হাঁটার ফল ভাল হয়নি।

কালই চড়াই-উতরাই ভাঙতে ভাঙতে টের পাওয়া যাচ্ছিল, কোমরের তলা থেকে পা পর্যন্ত ক্রমশ শিথিল হয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছিল দেহের ঐ অংশটা বুঝিবা একসময় খসেই পড়বে। হাঁটু আর গোড়ালির কাছে ফিক ব্যথার মত কি একটা যেন আটকে গিয়েছিল আর পা দুটো ফুলে ফুলে দ্বিগুণ মোটা হয়ে উঠেছিল। সে দুটো আর চলতে চাইছিল না। অবাধ্য বিদ্রোহী ঘোড়াকে যেভাবে চাবুক মেরে চালানো হয়, প্রায় সেইভাবেই তাদের ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে এসেছিল ডানিয়েল।

কাল অবশ্য সমস্ত দিন হাঁটার প্রতিক্রিয়াটা পুরোপুরি টের পাওয়া যায় নি। কেননা, পশ্চিমঘাটের এই অজানা উপত্যকায় অচেনা একটি গ্রাম আবিষ্কারের উত্তেজনা ছিল। কালো কালো কৃশ মানুষগুলোর মধ্যে গীর্জাবাসিনী সুভদ্রা যোসেফকে দেখার বিস্ময় ছিল। এ গ্রামের মানুষদের সীমাহীন দারিদ্র্য দেখার ছিল। এত চমক, এত বিস্ময়, এত আঘাত এবং উত্তেজনার তলায় অপরিসীম ক্লান্তি বুঝিবা সাময়িকভাবে চাপা পড়ে গিয়েছিল।

কিন্তু আজ শরীরময় অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে টের পাওয়া যাচ্ছে কালকের অনভ্যস্ত হাঁটাটার প্রতিক্রিয়া কতখানি সাংঘাতিক।

একসময় আস্তে আস্তে চোখ মেলল ডানিয়েল। দেখল, কখন যেন তার অজান্তে বেশ বেলা হয়ে গেছে। আর পাথরে তৈরি এই বিশাল ঘরখানার ফোকর দিয়ে রোদের ঢল নেমে এসেছে।

রোদটা কেমন? রক্তবর্ণ, না আগুনের মত? ঠিক বুঝতে পারা যাচ্ছে না। সেদিকে বেশিক্ষণ তাকিয়েও থাকতে পারল না ডানিয়েল। মনে হল মাথার ভেতর রক্ত চন চন করে উঠছে, আর হাজার ছুঁচের মতো রোদটা চোখে বিঁধছে।

ডানিয়েল চোখ বুজে ফেলল। অনেকক্ষণ সেইভাবে পড়ে থাকার পর আবার তাকাল। তাকিয়েই টের পেল, চোখ দুটো ভয়ানক জ্বালা জ্বালা করছে। কপালের দু'-পাশে সেই রগদুটোর দপদপানি আরো বেড়ে গেছে। ধমনীতে রক্ত ঝাঁ-ঝাঁ করতে শুরু করেছে। আর কানের কাছে ঝিঁঝির ডাকের মত একটানা অশ্রান্ত গুঞ্জন বেজে চলেছে।

একটু আগে রোদটা রক্তাভ মনে হয়েছিল। এখন মনে হচ্ছে গাঢ় নীল।

দেহময় এই নিদারুণ অস্বস্তির মধ্যে অতর্কিতে ডানিয়েলের মনে একটা সম্ভাবনা উঁকি দিল। তার কি জ্বর আসছে? তৎক্ষণাৎ ডান হাতটা কপালের ওপর রাখল সে। কিন্তু না, শরীরের উত্তাপ অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছে কিনা বুঝতে পারা গেল না। শুধু টের পাওয়া গেল, চোখের ভেতরকার সেই জ্বালাটা অতি দ্রুত সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে যাচ্ছে।

শারীরিক আরো একটা অস্বস্তি ভয়ানকভাবে টের পেতে লাগল ডানিয়েল। সেটা হল তৃষ্ণা। জিভটা শুকিয়ে একরাশ ধারাল বালির মত খরখরে হয়ে উঠেছে। বুকের ভেতরটা বুঝিবা শুষ্ক নীরস মাটির মত চৌচির হয়ে যাচ্ছে।

এই মুহূর্তে একটু জল চাই। কিন্তু কার কাছে চাইবে? এ ঘরে একমাত্র সে ছাড়া আর তো কেউ নেই। দেহের সমস্ত শক্তি জড়ো করে উঠে বসতে চেষ্টা করল ডানিয়েল। উদ্দেশ্য, দরজা পর্যন্ত যাওয়া। সেখানে পৌঁছতে পারলে কেউ না কেউ চোখে পড়ে যাবে। অন্তত তেমন সম্ভাবনাই বেশি। তখন তাকে ডেকে জলের কথা বলা যাবে।

কিন্তু বসতে গিয়ে মাথা ঝিম ঝিম করে উঠল। বিশাল এই ঘর, পশ্চিমঘাটের অজস্র রোদ, দূর থেকে ভেসে-আসা অশ্রান্ত সমুদ্রকল্লোল—সব একসঙ্গে ঘূর্ণির মত পাক খেয়ে গেল।

অতএব টলতে টলতে আবার শুয়ে পড়ল ডানিয়েল। অনেকক্ষণ পর কিছুটা সামলে উঠল সে। কিন্তু বুকের ভেতর অসহ্য তৃষ্ণা, এই মুহূর্তে একটু জল না পেলে সে নির্ঘাৎ মরে যাবে। শ্বাস ক্রমশ রুদ্ধ হয়ে আসতে লাগল তার।

দুঃসহ আকণ্ঠ তৃষ্ণায় সে যখন অস্থির ঠিক সেই সময় দৈব প্রেরিতের মত একটা লোক ঘরে এসে ঢুকল। এই গ্রামের কোনো বাসিন্দা হবে। হাতে কি একটা ঝুলিয়ে নিয়ে এসেছে সে।

লোকটা সোজা তার বিছানার কাছে চলে এল। তারপর যা নিয়ে এসেছিল, একপাশে নামিয়ে রেখে দুর্বোধ্য ভাষায় কি যেন বলল।

কাছাকাছি আসায় ডানিয়েল বুঝতে পারল লোকটা তার জামা-প্যান্ট নিয়ে এসেছে। কাল স্নানের সময় এগুলো ছেড়ে ধুতি-চাদর পরেছিল সে। লোকটার ভাষা দুর্জ্ঞেয় হলেও তার ভাবার্থ বুঝতে অসুবিধে হল না। অর্থাৎ তোমার পোশাক নিয়ে এলাম, দেখে এবং বুঝে নাও। প্রসঙ্গত আরো একটা কথা মনে পড়ল। কাল সুভদ্রা বলে গিয়েছিল, আজ সকালেই সে তার পরিত্যক্ত পোশাক ফেরত পাবে।

জামা-প্যান্ট সম্পর্কে দুর্ভাবনা ছিল না। লোকটার উদ্দেশে গোঙানির মত শব্দ করে ডানিয়েল বলল, 'হ্যালো, আই এ্যাম থার্স্টি। একটু জল আনতে পার?' বলেই খেয়াল হল, সুভদ্রা যোসেফকে বাদ দিলে এখানকার কেউ ইংরেজি বোঝে না। লোকটা তার দিকে জিজ্ঞাসু ভীরু দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ডানিয়েলের বক্তব্য সে বুঝতে পারছে না। কাজেই জগতের আদিমতম সেই ভাষাটার আশ্রয় নিতে হল! মুখের কাছে হাত এনে ইশারায় জল খাবার একটা ভঙ্গি করল ডানিয়েল।

তীক্ষ্ন নিবিষ্ট চোখে ডানিয়েলের ইশারাটা লক্ষ্য করল লোকটা। তারপর লম্বা লম্বা পা ফেলে অদৃশ্য হয়ে গেল।

লোকটা সেই যে গেল আর দেখা নেই। এদিকে গলা থেকে বুক পর্যন্ত অংশটা আরো শুকিয়ে প্রায় মরুভূমি হয়ে উঠেছে। মাথাটা তো ঘুম ভাঙার পর থেকেই ভারী হয়ে ছিল। এখন কেমন আচ্ছন্ন মনে হচ্ছে নিজেকে। মনে হচ্ছে এইভাবে আরো কিছুক্ষণ চললে সে অজ্ঞান হয়ে যাবে।

মূৰ্ছিত হবার কাছাকাছি পৌঁছে চকিতের জন্য মা-বাবার মুখ মনে পড়ল ডানিয়েলের। সেদিন জলগাঁও স্টেশন থেকে পালাবার দুর্বুদ্ধিটা মাথায় না চাপলেই বুঝি ভাল হত। কি একটা ভূত যে ভর করে বসেছিল!

মা-বাবার মুখ কিন্তু সিনেমার পর্দায় দ্রুতগামী ছবির মত মিলিয়ে গেল। পরক্ষণেই যার মুখ চোখের সামনে ভেসে উঠল সে গীর্জাবাসিনী সুভদ্রা যোসেফ। এই অসহনীয় তৃষ্ণার মুহূর্তে খ্রীস্টের সেবিকা সেই সামান্য-পরিচিতা মেয়েটি যদি শিয়রে এসে দাঁড়াত!

ভাবনার বৃত্তটা সম্পূর্ণ হল না। তার আগেই সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল। আরক্ত আচ্ছন্ন চোখ মেলে ডানিয়েল দেখল, সেই লোকটা একদল সঙ্গী নিয়ে ঘরে ঢুকেছে।

লোকটা সোজা বিছানার কাছে চলে এল। তার হাতে এনামেলের একটা বাসন ছিল। সেটা অন্য একটা কাঠের পাত্র দিয়ে ঢাকা। ঢাকনি সরিয়ে এনামেলের থালাটা ডানিয়েলের দিকে বাড়িয়ে দিল সে।

থালায় পোড়া পোড়া খানকয়েক রুটি, একটু মরিচ আর নুন সাজানো রয়েছে। লোকটা তার ইশারা ধরতে পারেনি। তৃষ্ণার্তের বদলে নিশ্চয়ই সে ডানিয়েলকে ক্ষুধার্ত ভেবে নিয়েছে।

প্রবল বেগে হাত এবং মাথা নেড়ে ডানিয়েল বলতে চাইল, এ সব তার প্রয়োজন নেই। ইঙ্গিতে বোঝাতে চাইল, জল—জল চাই।

লোকগুলো কি বুঝল কে জানে। নিজেদের মধ্যে চাপা ফিস ফিস করে কিছুক্ষণ পরামর্শ করল। তারপর ডানিয়েলের কাছে এসে অনেকখানি ঝুঁকে বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে কি যেন দেখল। অবশেষে ব্যস্ত ভঙ্গিতে ঘর থেকে সবাই একসঙ্গে বেরিয়ে গেল।

লোকগুলো চলে যাবার পর কতক্ষণ কেটেছে, ডানিয়েলের খেয়াল নেই। তার সমস্ত অস্তিত্ব এই মুহূর্তে চেতনা আর নিশ্চেতনার মাঝখানে দোল খাচ্ছে যেন। অথবা বলা যায় তার চেতনাটাই কি এক অথৈ গভীরে একবার ডুবছে, পরক্ষণে আবার ভেসে উঠছে।

নিজের এই অবস্থার মধ্যে ডানিয়েল এটুকুই শুধু ভাবতে পারল মা-বাবার কাছ থেকে অনেক—অনেক দূরে পশ্চিমঘাটের এই নগণ্য অখ্যাত উপত্যকায় আত্মীয়-বন্ধুহীন নিরুৎসব মৃত্যুই বুঝি তার জন্য অপেক্ষা করে আছে।

আরো একটা কথা ডানিয়েলের মনকে ছুঁয়ে গেল। তার সামান্য একটু সর্দি হলে কিংবা পেটব্যথার মত কিছু দেখা দিলে বাবা-মা খাস লণ্ডন শহরের স্পেশালিস্টদের ফোন করে করে উদ্বাস্ত করে তোলেন। এ রকম একটা গুরুতর কাণ্ড বাধিয়ে বসলে সম্ভবত বাড়িতে একটা মেডিক্যাল বোর্ডই বসিয়ে ফেলতেন। কিন্তু এখানে, এই

অস্বাস্থ্যকর প্রকাণ্ড ঘরখানায় কেউ নেই। হঠাৎ অত্যন্ত অভিমান হল ডানিয়েলের। সে অভিমান কার ওপর? মা-বাবার ওপর করার কোন অধিকারই তার নেই। তবে কি সুভদ্রা জোসেফের, না কি এই গ্রামের বাসিন্দাদের ওপর?

কিন্তু এই অসুখটা এবং নিঃসঙ্গ একটা ঘরে পড়ে থাকার জন্য কারো ওপর অভিমান করাই তার সাজে না। একমাত্র নিজের ওপরই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে পারা যায়।

আরো কতক্ষণ কাটল ডানিয়েল জানে না। একসময় চেতনাটা যখন পুরোপুরি নিমজ্জিত হয়ে যাচ্ছে, অস্পষ্টভাবে আরো কতকগুলো পায়ের শব্দ কানে এল। কোন রকমে আরক্ত চোখ মেলে তাকাল সে। মনে হল সেই কালো কালো লোকগুলোর সঙ্গে সুভদ্রা জোসেফ এসে দাঁড়িয়েছে। অসহ্য আবেগে একটা হাত সুভদ্রার দিকে বাড়িয়ে দিতে চেষ্টা করল ডানিয়েল, পারল না। বলতে চাইল, আমি আর বাঁচব ন' কিন্তু গলার ভেতর থেকে স্বরটাকে কিছুতেই মুক্ত করে আনা গেল না।

এই স্বজনবিহীন দেশে গীর্জাবাসিনী বিচিত্র মেয়েটির মধ্যে তার আবেগ কি সামান্য পরিমাণেও সঞ্চারিত হল? ডানিয়েল বুঝতে পারল না। তবে এটুকু অনুভব করতে পারল, সুভদ্রা অনেকখানি ঝুঁকে তার কপালে হাত রেখেছে। হাতের স্পর্শখানি ভারি কোমল আর শীতল।

মুহূর্তের জন্য হাতখানা রেখেই কপাল থেকে সরিয়ে নিল সুভদ্রা। তারপর?

তার পরের কথা আর মনে করতে পারে না ডানিয়েল।... আবার যখন সে চোখ মেলল, দেখতে পেল ঘরময় স্নিগ্ধ ছায়াচ্ছন্নতা। এখন ভোর অথবা সন্ধ্যার আগের মুহূর্ত, ঠিক বুঝতে পারল না ডানিয়েল। কেননা, রোদ ওঠার আগে দিনের চেহারা যেমন থাকে তার সঙ্গে দিনান্তের প্রচুর মিল। আরো একটা ব্যাপার লক্ষ্য করল সে। শিয়রের কাছে নেই মেয়েটি—সন্ন্যাসিনী সুভদ্রা জোসেফ বসে রয়েছে। সুভদ্রা ছাড়া এ ঘরে এ মুহূর্তে আর কেউ নেই।

বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা গেল না। স্নায়ুগুলো এখন ভয়ানক দুর্বল, মাথাটা অস্বাভাবিক ঘুরছে। আস্তে আস্তে চোখ বুজে ফেলল ডানিয়েল।

আচ্ছন্নের মত আরো অনেকটা সময় কাটিয়ে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে সুভদ্রার দিকে তাকাল ডানিয়েল। দেখল, শিয়রের কাছে থেকে উঠে এসে বেশ খানিকটা ঝুঁকে অপার অসীম আগ্রহ নিয়ে সুভদ্রা তার দিকেই তাকিয়ে রয়েছে।

চোখাচোখি হতে সুভদ্রা কি যেন বলল। ডানিয়েল বুঝতে পারল না। সমস্ত ইন্দ্রিয় এখন এত ক্ষীণ যে সেগুলো দিয়ে কিছুই ধরা যায় না। শ্রুতি-দৃষ্টি-স্পর্শ এবং ঘ্রাণময় যে জগৎ চারপাশে ছড়িয়ে আছে এখন তা যেন ছায়া-ছায়া, অস্পষ্ট, প্রায়-নিরাকার। শব্দ-গন্ধ-দৃশ্য—এই মুহূর্তে সব কিছুই একাকার হয়ে গেছে।

যাই হোক সুভদ্রা আর কিছু বলল না। পূব দিকের দেওয়ালে একটা কুলুঙ্গি রয়েছে। সেখান থেকে একটা শিশি থেকে গেলাসে খানিকটা কি ঢেলে ডানিয়েলকে খাইয়ে দিল।

খুব সম্ভব ওষুধই হবে। খাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই ডানিয়েলের মনে হল, চারিদিকের শব্দ-গন্ধ-দৃশ্য ধীরে ধীরে স্পষ্ট হতে শুরু করেছে।

শিশির ভেতর যা রয়েছে তা যদি ওষুধই হয় তাকে খাওয়াবার অর্থ কী? কী হয়েছে তার? ডানিয়েলের কাছে ব্যাপারটা দুর্বোধ্য ঠেকল।

গেলাস থেকে তরলটুকু মুখে ঢেলে দেবার পর স্থির নিষ্পলকে ডানিয়েলের দিকেই তাকিয়ে আছে সুভদ্রা। অনেকক্ষণ পর আস্তে আস্তে বলল, 'এখন কেমন লাগছে?'

সুভদ্রার কণ্ঠস্বর এবার কানে এল। নির্জীব সুরে ডানিয়েল উত্তর দিল, 'ভারি দুর্বল। মনে হচ্ছে গায়ে জোর নেই।' বলে হাতের ওপর ভর দিয়ে উঠে বসতে চাইল। কিন্তু এ কি! শরীরে এমন শক্তি আর অবশিষ্ট নেই যার জোরে সে উঠতে পারে।

ডানিয়েল ভেবে পেল না তার শরীরের সমস্ত সামর্থ্য কখন ও কিভাবে নিঃশেষিত হল? কেউ কি মন্ত্র পড়ে অথবা অন্য কোনো কৌশলে তার দেহ থেকে সব শক্তি বার করে নিয়েছে? তবু আরেক বার উঠতে চেষ্টা করল সে।

প্রথমবার তার ওঠার প্রচেষ্টাটা খেয়াল করেনি সুভদ্রা। এবার যুগপৎ উদ্বিগ্ন এবং ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'ও কি, ও কি করছেন! উঠবেন না—উঠবেন না।' বলেই কর্তব্য শেষ করল না। দু' হাতে কাঁধ ধরে তাকে নিরস্তও করল। তারপর ডানিয়েলের খাটিয়ার এক পাশে এসে বসল।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল ডানিয়েলের। সুভদ্রার দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলল, 'আচ্ছা, এখন ভোর না সন্ধ্যে?'

সুভদ্রা বলল, 'সন্ধ্যে হয়ে আসছে।'

'বলেন কি!' রীতিমত অবাকই হল ডানিয়েল।

সুভদ্রা হাসল, 'ঠিকই বলছি।'

স্মৃতিটা যদিও এই মুহূর্তে পুরোপুরি সজীব নয় তবু ডানিয়েল মনে করতে পারল, এই গ্রামে প্রথম রাতটা কাটাবার পর যখন সে চোখ মেলেছিল, দেখেছিল, ঘরখানা সকালের অজস্র রোদে ভেসে যাচ্ছে। তারপর এই সন্ধ্যা পর্যন্ত সে কি একটানা ঘুম লাগিয়েছে! আশ্চর্য তো!

সকাল থেকে সন্ধ্যা। অর্থাৎ দশ বার ঘণ্টা সময়, একটা দিনের প্রায় অর্ধেক। তার বাইশ-তেইশ বছরের জীবনে একটানা এতখানি সময় কোনোদিন ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিয়েছে কিনা, ডানিয়েল মনে করতে পারল না।

এই ভাবনার মধ্যেও সেই শিশিটার কথা কিন্তু কিছুতেই ভুলতে পারছে না ডানিয়েল।

সুভদ্রা তাকে ওষুধ খাওয়াল কেন? অবশ্য যদি শিশিটাব ভেতর ওষুধই থেকে থাকে।

হঠাৎ পাশ থেকে সুভদ্রা বলে উঠল, 'যাক, বাঁচালেন। যা দুর্ভাবনায় আপনি আমাদের সবাইকে ফেলেছিলেন!'

সুভদ্রা কী বলতে চায় বুঝতে না পেরে তাকিয়ে রইল ডানিয়েল। বিমূঢ়ের মত তার কথার প্রতিধ্বনি করে বলল, 'আপনাদের দুর্ভাবনায় ফেলেছিলাম।'

'দুর্ভাবনা বলে দুর্ভাবনা!' সুভদ্রা সস্নেহে হাসল, 'অচেনা জায়গায় এসে যা কাণ্ড বাধিয়ে বসেছিলেন! আমরা তো ভয়ে মরি।'

ব্যাপারটা বোধগম্য হচ্ছে না। এমন কী সে বাধিয়ে বসতে পারে যাতে সুভদ্রা যোসেফ সমেত এ গ্রামের তাবৎ বাসিন্দা সন্ত্রস্ত-শঙ্কিত হয়ে উঠেছে! ডানিয়েল বলল, 'আমার কী হয়েছিল বলুন তো?'

'বুঝতে পারছেন না?'

'না।'

কি উত্তর দিতে গিয়ে সুভদ্রা জানালার বাইরে একবার তাকাল। ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'ও কথা এখন থাক। সন্ধ্যে হয়ে গেল, আমি আলো নিয়ে আসছি।' বলেই ঘরের বাইরে চলে গেল।

খানিকটা পর আবার যখন সে ফিরে এল তখন তার হাতে একটা ধূমায়িত তেলের লণ্ঠন। সুভদ্রার সঙ্গে একটা লোকও এসেছে। লোকটার হাতে এনামেলের প্রকাণ্ড গেলাস।

লণ্ঠনটা একপাশে নামিয়ে রেখে সঙ্গীর হাত থেকে গেলাসটা নিয়ে সামনে এগিয়ে এল সুভদ্রা। ডানিয়েলের উদ্দেশে বলল, 'একটু কষ্ট করে পাশ ফিরতে পারবেন? থাক, জোর করে কিছু করতে হবে না। গণেশ আপনাকে সাহায্য করছে।' বলেই ঘুরে দাঁড়িয়ে সঙ্গের লোকটাকে কি যেন বলল।

লোকটা—সেই গণেশ কাছে এগিয়ে এল। প্রথমে তাকে ভাল করে লক্ষ্য করেনি ডানিয়েল, এবার ভাল করে দেখল। গণেশের বয়স খুব একটা বেশি নয়। বাইশ-চব্বিশের মধ্যেই। অর্থাৎ তারই প্রায় সমবয়সী। আরো একটা আশ্চর্য ব্যাপার এই অপুষ্টি আর স্বাস্থ্যহীনতার দেশে ছেলেটা আশ্চর্য ব্যতিক্রম। হাতের হাড় তার চওড়া, বিশাল বুক শক্ত পেশী দিয়ে সাজানো। কাঁধ-ঘাড়-উরু, শরীরের সব অংশেই যৌবনের উজ্জ্বল সবলতা। গায়ের রংখানি এদেশের আর সবার সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে কালোই। পশ্চিমঘাটের চাঙড়া চাঙড়া কালো পাথর কেটে তার শরীরখানি যেন তৈরি।

গণেশের সব আকর্ষণ তার চোখে। এতবড় প্রকাণ্ড একটা জোয়ান ছেলে, তবু তার চোখ দুটিতে শিশুর সারল্য মাখা এবং শিশুর বিস্ময়ও।

বলিষ্ঠ হাত দুটিকে যতখানি সম্ভব নরম করে সযত্নে, সাবধানে, খুব আস্তে আস্তে ডানিয়েলকে পাশ ফিরিয়ে দিল গণেশ।

এত তোড়জোড়, এত আয়োজন কী উদ্দেশ্যে, ডানিয়েল বুঝতে পারছে না। সে বলল, 'কী ব্যাপার বলুন তো? আমাকে এভাবে শোয়ালেন কেন?'

উত্তর দেওয়া বোধহয় অনাবশ্যক বোধ করল সুভদ্রা। হাতের প্রকাণ্ড গেলাসটা ডানিয়েলের মুখের কাছে এনে শুধু বলল, 'দুধটা খেয়ে নিন।'

চিরদিনই দুধ খেতে ডানিয়েলের ঘোরতর আপত্তি। মাথা নেড়ে সে বলল, 'উঁহু—'

'উঁহু মানে?'

'আমার দুধ খেতে ভাল লাগে না।'

'খুব দুর্বল হয়ে পড়েছেন। দুধ না খেলে শরীর আরো খারাপ হয়ে যাবে।'

'দুধ ছাড়া আমাকে অন্য কিছু দিন।'

তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল না সুভদ্রা। একদৃষ্টে কিছুক্ষণ ডানিয়েলের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবল। তারপর বলল, 'দুধ খেতে ইচ্ছে করে না?'

'না।' ডানিয়েল আবার মাথা নাড়ল।

হঠাৎ ধমক দিয়ে উঠল সুভদ্রা, 'যা বলছি তা-ই করুন। তাড়াতাড়ি খেয়ে নিন। আপনাকে নিয়ে বসে থাকার সময় আমার নেই।'

ডানিয়েল চমকে উঠল। এই গ্রামে আসার পর থেকে স্বল্পক্ষণের যে পরিচয়, তাতে সুভদ্রা যোসেফ নামে এই গীর্জাবাসিনীকে দূরমনস্ক আর মৃদুভাষিণী বলেই মনে হয়েছে তার। সে যে এভাবে ধমক দিয়ে উঠতে পারে, এ ছিল অভাবনীয়।

সুভদ্রার স্বর আরো চড়ল, 'কি হল, খেয়ে নিন—' তার মুখে বিরক্তির রেখা ফুটে বেরুল।

অবাক বিস্ময়ে সুভদ্রাকে দেখেই যাচ্ছে ডানিয়েল। এই মেয়েটি সম্বন্ধে মনে মনে যে ধারণা সে তৈরি করে নিয়েছিল সেটার সঙ্গে তার এখনকার চেহারার কোন মিলই নেই।

সুভদ্রাকে দেখতে দেখতে ডানিয়েলের দৃষ্টি হঠাৎ গণেশের দিকে ফিরল। মনে হল, অনেকক্ষণ থেকেই প্রাণপণে সে বোধহয় তার মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাইছিল। চোখাচোখি হতে গণেশ ইসারা করল। অর্থাৎ দুধটা এখুনি খেয়ে ফেলা বুদ্ধিমানের কাজ। নতুবা, মুখচোখের ভাব দেখিয়ে সে বোঝাতে চাইল, সুভদ্রা ভয়ানক রাগ করবে।

ডানিয়েল বেশ কৌতুক বোধ করল। সেই সঙ্গে এ-ও বুঝল, এ গ্রামের বাসিন্দারা সুভদ্রাকে রীতিমত ভয়ও করে থাকে।

এদিকে সুভদ্রা আবার ধমক দিয়ে উঠেছে, 'দুধ জুড়িয়ে জল হয়ে যাচ্ছে যে। ঠাণ্ডা দুধ খেয়ে কী উপকারটা হবে শুনি?'

নিজের স্বভাবের সেই ছেলেমানুষিটা এই মুহূর্তে ডানিয়েলকে পেয়ে বসল বোধ হয়। আদুরে জেদী ছেলের মত সে বলল, 'বললাম তো, দুধ খেতে আমার ভাল লাগে না।'

'ভাল লাগে না!'

'না।'

একদৃষ্টে কিছুক্ষণ ডানিয়েলকে দেখে নিয়ে সুভদ্রা বলল, 'এ গ্রামে থাকতে হলে আমার কথামত চলতে হবে। নইলে এক্ষুনি এখান থেকে চলে যেতে হবে। কী করতে চান, বলুন—'

দুধ খাবার বিপক্ষে আর কিছু বলতে সাহস হল না। গেলাসটা মুখের কাছে ধরেই রেখেছিল সুভদ্রা। ভয়ে ভয়ে তাতে চুমুক দিল ডানিয়েল।

খাওয়া শেষ হলে সুভদ্রার নির্দেশে গণেশ আবার ডানিয়েলকে ঠিক করে শুইয়ে দিল। সুভদ্রা তার মুখ মুছিয়ে স্নিগ্ধ একটু হাসল, 'দ্যাট্‌স্ লাইকএ গুড বয়—' তার মুখ থেকে একটু আগের বিরক্তি এবং রূঢ়তা বিলীন হয়ে গেছে। এখন মুখখানি স্নিগ্ধতায় ভরে গেছে।

ডানিয়েল প্রথমটা অবাক, তারপর চমৎকৃত। তা হলে সুভদ্রার ধমক-ধামক-বিরক্তি সব কিছুই মিথ্যে? তাকে দুধ খাওয়াবার জন্যই তবে এই কপটতাটুকুর আশ্রয় নিয়েছিল সে? আসলে সুভদ্রা যেন স্নেহময়ী জননী অথবা বড় বোন। বুঝিয়ে-সুঝিয়ে কিংবা বকে-ঝকে যেমন করে হোক খাওয়ানোটাই তাদের একমাত্র লক্ষ্য। না, পশ্চিমঘাটের এই অজানা উপত্যকায় পালিয়ে এসেও মায়ের হাত এড়ানো গেল না।

আড়চোখে সুভদ্রার দিকে একবার তাকাল ডানিয়েল। হ্যাঁ, সেই চিরন্তনী ম্যাডোনা মূর্তিই।

দুধ খাওয়াবার পর গেলাসটা গণেশের হাতে দিয়েছে সুভদ্রা। গেলাস নিয়ে ছেলেটা কিছুক্ষণ হল চলে গেছে আর সুভদ্রা আবার ডানিয়েলের খাটে এসে বসেছে।

হঠাৎ সেই কথাটা আবার মনে পড়ল ডানিয়েলের। বলল, 'কই, সে সম্বন্ধে কিছুই তো আর বললেন না।'

'কী সম্বন্ধে?' জিজ্ঞাসু চোখে সুভদ্রা তাকাল।

'এই আমি নাকি কী কাণ্ড বাধিয়েছিলাম! কী হয়েছিল বলুন তো আমার?'

'পরশুদিন দুপুর থেকে আপনি বেহুঁশ হয়ে ছিলেন।'

'বেহুঁশ!'

'হ্যাঁ।'

পরশু দুপুর থেকে আজকের বিকেল। প্রায় সোয়া দু'-দিন। দু'-দিনের ওপর তার জ্ঞান ছিল না। তাই কি স্নায়ুগুলো এত দুর্বল, এত নির্জীব? সমস্ত ব্যাপারটা কেমন যেন অবিশ্বাস্য মনে হল ডানিয়েলের।

সুভদ্রা আবার বলল, 'শুধু কি অজ্ঞান হয়েছিলেন, তার ওপর ছিল হাই টেম্পারেচার। গায়ে হাত লাগলে যেন ছ্যাঁকা লাগছিল। আরো একটা উপসর্গ জুটেছিল এর সঙ্গে। মাঝে মাঝেই প্রলাপ বকে যাচ্ছিলেন।'

যত শুনছে ততই অবাক হয়ে যাচ্ছে ডানিয়েল।

সুভদ্রা বলতে লাগল, 'পরশু আপনি এ গ্রামের শিবলের কাছে ইসারায় কিছু চেয়েছিলেন। বুঝতে না পেরে সে দৌড়ে আমাকে গীর্জা থেকে ডেকে নিয়ে এসেছিল। আমি এসে দেখি আপনার সাঙ্ঘাতিক জ্বর, জ্ঞানও নেই। অগত্যা গীর্জা থেকে রেভারেণ্ড আপ্তেকে আনাতে হল। উনি এল. এম. এফ. ডাক্তার। দেখেশুনে এই দু' আড়াই দিনে উনি গোটা-চারেক ইঞ্জেকসন দিয়েছেন। আমরা—মানে এ গ্রামের ক'জন লোক আর আমি আপনার শিয়রে দু'-রাত বসে আছি।'

এই দু'দিনে তার অজান্তে নেপথ্যে এত ঘটনা যে ঘটে গেছে, ডানিয়েল জানত না। অবশ্য না জানারই কথা। কিন্তু এই মেয়েটি, গীর্জাবাসিনী এই সুভদ্রা যোসেফের কথা যত বার সে ভাবল তত বারই বিচিত্র আবেগে বুকের ভেতরটা ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। কৃতজ্ঞতায় দৃষ্টি আসতে লাগল ঝাপসা হয়ে।

কিছুদিন আগে ভারতবর্ষ সম্পর্কে একখানা বই পড়েছিল ডানিয়েল। তাতে এ দেশ সম্বন্ধে মজার মজার চিত্তাকর্ষক সব কাহিনী রয়েছে। বিশেষত এদেশের মেয়েদের যে-সব কথা আছে সেগুলো তাকে আকর্ষণ করেছিল খুব বেশি মাত্রায়। তিনি চার

পুরুষ ধরে ভারতবর্ষের সঙ্গে তাদের পরিবারের সংযোগ। ঠাকুরদার বাবা কুইন ভিক্টোরিয়ার আমলে এদেশে এসেছিলেন। ঠাকুরদা এসেছিলেন একটি প্রদেশের গভর্নর হয়ে। বাবা অবশ্য স্থায়ীভাবে এখানে থাকেন নি, তবে মাঝে মাঝেই বিভিন্ন ডেলিগেসনের নেতা হিসেবে এ দেশ ঘুরে গেছেন। তাছাড়া ইণ্ডোলজি সম্পর্কে তাঁর প্রচুর অনুরাগ। ভারততত্ত্বের ওপর যেখানে যত গ্রন্থ বেরোয় সবই তিনি সংগ্রহ করেন। এটা তাঁর কাছে অদম্য নেশার মত। বাবার মুখেও ভারতবর্ষের মেয়েদের সম্বন্ধে অনেক চমকপ্রদ কাহিনী শুনেছে ডানিয়েল।

সেই বইটা পড়ে এবং বাবার মুখে শুনে শুনে অনেক তথ্যই তার জানা হয়েছে। তবে দুটি ব্যাপার তাকে সব চাইতে অভিভূত করেছিল। এ দেশ আইডোলেট্রির দেশ। এখানে সন্তানের অসুখ-বিসুখ হলে মায়েরা নাকি তার আরোগ্য কামনায় বুক চিরে ঈশ্বরের মূর্তির কাছে রক্ত মানত করে। অলৌকিক বিশ্বাসের দেশও এই ভারতবর্ষ। নীলগিরি না অমরকণ্টকে কোথায় যেন প্রচলিত বিশ্বাস আছে, দেবতার কাছে জীবন উৎসর্গ করলে তার বিনিময়ে মুমূর্ষু সন্তান অথবা স্বামীর প্রাণ রক্ষা পায়। এ দেশের মেয়েরা নাকি সেই বিশ্বাসে অক্লেশে নিজেকে বিসর্জন দেয়। এ ছাড়া সতীদাহের কিংবদন্তি ছেলেবেলা থেকে কতবার যে ডানিয়েল শুনেছে তার হিসেব নেই। তা যেমনই মর্মস্পর্শী তেমনই ভয়াবহ।

সন্তানের জন্য স্বামীর জন্য আত্মবিসর্জনের তবু একটা অর্থ আছে। কিন্তু এই মেয়েটি, সুভদ্রা যোসেফ, তার মত অনাত্মীয় অপরিচিত এক আগন্তুকের শিয়রে সারা গ্রাম নিয়ে যে পুরো দুটো রাত জেগে কাটিয়ে দিল তার পেছনে কোন্ স্বার্থ রয়েছে?

বুকের ভেতর সেই আবেগটা, কৃতজ্ঞতার সেই বোধটা আরো উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে। মনে হচ্ছে, শ্বাস বুঝিবা বন্ধই হয়ে আসবে।

এ প্রসঙ্গে নিজের মায়ের কথা মনে পড়ল ডানিয়েলের। পৃথিবীতে মায়ের স্নেহের নিশ্চয়ই তুলনা নেই। তবু সে জানে তার এমন অবস্থা দেখলে মা নিজের চাইতে শিক্ষিত নার্সের ওপরই বেশি নির্ভর করতেন। সুভদ্রার চাইতে তাঁর দুশ্চিন্তা যে বিন্দুমাত্র কম হত এমন অসঙ্গত ভাবনাকে প্রশ্রয় দেওয়া অবশ্যই অন্যায়। ডানিয়েল জানে, মা তার শিয়রে বসে রাতের অনেকখানি অংশ কাটিয়ে দিতেন ঠিকই কিন্তু তার ফাঁকে নিজের ঘরে গিয়ে একটু ঘুমিয়েও নিতেন। কেননা মা জানেন, ট্রেন্‌ড্ নার্স ঘরে থাকতে দ্বিতীয় আরেক জনের রাত জেগে অসুস্থ হওয়া নিরর্থক। নিজেকে সুস্থ রাখাটা কিছু দুর্ভাবনার অভাব নয়।

যে দেশের যেমন মানসিক গঠন। সুভদ্রা যোসেফের মত এমন সেবার মধ্যে নিজেকে বিলীন করে দেওয়া বোধহয় প্রাচ্যের মেয়েদের রীতি।

কতক্ষণ নানা ভাবনায় মগ্ন হয়েছিল, ডানিয়েলের খেয়াল নেই। হঠাৎ কপালে হাত পড়তে চমকে উঠল সে। দেখল হাতখানা সুভদ্রা যোসেফের।

কয়েক মুহূর্ত হাতটা রেখেই সরিয়ে নিল সুভদ্রা। বলল, 'নাঃ, জ্বরটা আজ বেশ কম। রেভারেণ্ড আপ্তে বলেছেন, হঠাৎ কোনো ধকলে জ্বরটা এসেছিল। নইলে ভয়ের

কারণ নেই। সে যাক। কাল যদি জ্বরটা ছেড়ে যায় পরশু রুটি খেতে দেব। পরশু ছাড়লে তার পরের দিন।'

ডানিয়েল কিছু বলল না। এদিকে সন্ধ্যা পেরিয়ে রাতের গাঢ় অন্ধকার নেমে এসেছে। জানালার বাইরে এই শ্রীহীন বিক্ষিপ্ত জনপদ একেবারেই অবলুপ্ত হয়ে গেছে। আকাশ নিরাকার। সেখানে একটি তারাও নেই। শুধু বিলীয়মান ছায়াপথ অপটু হাতের আঁকা বাঁকা আঁচড়ের মত ফুটে রয়েছে।

অতর্কিতে সেদিনের একটা কথা মনে হওয়াতে ব্যস্ত হয়ে উঠল ডানিয়েল। বলল, 'এ কি, আপনি এখনও বসে আছেন! রাত হয়ে গেল, চার্চে ফিরতে হবে না?'

'না, আজও আমি ফিরব না।' সুভদ্রা বলল।

'কেন?'

'আপনার শরীর এখনও খুব খারাপ। ঈশ্বর না করুন, রাত্তিরে জ্বরটা যদি আবার বেড়ে যায়। তা ছাড়া আপনার ভার আর কারো ওপর যে দিয়ে যাব তারও উপায় নেই। কেউ তো আপনার কথা বুঝবে না।'

একটু ইতস্ততঃ করে ডানিয়েল বলল, 'কিন্তু—'

'কী?'

'আপনি এ ঘরেই থাকবেন নাকি?'

সুভদ্রা হাসল, 'দু রাত তা হলে কোথায় ছিলাম? গণেশকে একটা খাটিয়া এনে দিতে বলব'খন। রাতটা বাইবেল পড়েই কেটে যাবে।'

ডানিয়েল বলতে যাচ্ছিল, গত দু রাত সুভদ্রা এ ঘরে কাটিয়েছে ঠিকই। তবে সে সময় সে নিজে ছিল নিশ্চেতন। অজ্ঞান অচৈতন্য একটি মানুষের ঘরে নির্ভয়ে রাত কাটানো যায়। কিন্তু আজ ডানিয়েল দুর্বল এবং অসুস্থ হলেও পুরোপুরি সজ্ঞান। তা ছাড়া সে যুবকও। ওদিকে সুভদ্রা যোসেফ খ্রীস্টের সেবিকা এবং সন্ন্যাসিনী হলেও তরুণী।

ইণ্ডোলজির সেই বইটায় ডানিয়েল দেখেছে, এ দেশের পুরুষশাসিত সমাজে সামান্য কারণে, এমনকি অকারণেও মেয়েদের নামে কুৎসা রটে যায়। তার জন্য পাছে সুভদ্রার কোনো ক্ষতি হয় সেই আশঙ্কায় ডানিয়েল বলে উঠল, 'আমি কিন্তু এখন ভালই আছি। আপনি স্বচ্ছন্দে চার্চে ফিরে যেতে পারেন।'

সুভদ্রা বলল, 'আপনি ভাল আছেন কি মন্দ আছেন, সে ভাবনাটা আপনাকে না ভাবলেও চলবে। ওটা আমার ওপরেই ছেড়ে দিন।'

'কিন্তু—'

'কী?'

'দু রাত জেগেছেন। তারপর আরো জাগলে শরীর খারাপ হয়ে যাবে যে।'

সুভদ্রা হাসল, 'রাতের পর রাত জাগার অভ্যাস আমার আছে।'

একটু চুপচাপ। তারপর সুভদ্রাই আবার বলে উঠল, 'কি ব্যাপার বলুন তো? আপনি যেন আমাকে তাড়াতে চাইছেন।'

ডানিয়েল কথাটা যেন শুনতে পেল না। খুব মগ্ন হয়ে কি ভাবছিল সে। হঠাৎ চোখ-কান বুজে প্রায় মরিয়ার মত বলে ফেলল, 'রাত্তিরবেলা আমার সঙ্গে একঘরে থাকতে আপনার ভয় করবে না?'

'ভয়! আপনাকে!' পরিপূর্ণ স্বচ্ছ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ ডানিয়েলের দিকে তাকিয়ে রইল সুভদ্রা। তারপর সশব্দে উচ্ছ্বসিতভাবে হাসতে লাগল। হাসির দুরন্ত তোড়ে তার নমনীয় মাঝারি শরীরখানি ভেঙে ভেঙে পড়তে লাগল।

ডানিয়েল স্তম্ভিত। সামান্য দু'-একদিনের পরিচয়ে সুভদ্রাকে মৃদুহাসিনী মৃদুভাষিণী বলেই মনে হয়েছে। এর আগেও সুভদ্রা হেসেছে। কিন্তু সে হাসি নিঃশব্দ।

ডানিয়েল বলল, 'ও কি, হাসছেন যে?'

সুভদ্রা সে কথার উত্তর দিল না। হঠাৎ যেমন হাসি শুরু করেছিল তেমন হঠাৎই হাসি থামিয়ে গম্ভীর স্বরে বলল, 'শুধু আপনাকে কেন, জগতের কোন মানুষকেই আমার ভয় নেই। যিনি আমাকে পায়ে আশ্রয় দিয়েছেন, আমি জানি, তিনি আমার দিকে সব সময় তাকিয়ে আছেন। বিপদে যদি কখনও পড়ি তাঁরই রক্ষা করার কথা। আমি জানি তিনিই আমাকে ভয়শূন্য করেছেন।'

সুভদ্রার শক্তির উৎসটা যে কোথায় ডানিয়েল বুঝতে পারল না। বিমূঢ়ের মত সে শুধু বলল, 'আপনাকে কে আশ্রয় দিয়েছেন?'

সুভদ্রা উত্তর দিল না, হাসল মাত্র। এ হাসি তার স্বভাবের। তেমনই বিচিত্র, শব্দহীন এবং গভীর-সঞ্চারী।

পরের দিন সকালে ঘুম ভাঙলে ডানিয়েল দেখল, সুভদ্রা ঘরে নেই। ইতিমধ্যে বেশ বেলা হয়ে গেছে। দরজা জানালা দিয়ে ঘরময় অজস্র ধারায় তীব্র ধারাল রোদ এসে পড়েছে।

আস্তে আস্তে হাতের ওপর ভর দিয়ে উঠে বসল ডানিয়েল। ভেবে পেল না, তাকে কিছু না বলে সুভদ্রা গেল কোথায়।

বেশিক্ষণ ভাবনার মধ্যে দোল খেতে হল না। একটু পরেই সুভদ্রা একটি কালো মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে এসে ঢুকল। কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, 'কখন উঠলেন?'

ডানিয়েল বলল, 'এই একটু আগে। আপনি কোথায় গিয়েছিলেন?'

সুভদ্রা বলল, 'স্নান করতে। ভোরবেলা আমার স্নানের অভ্যাস। যখন যাই তখন দেখলাম আপনি ঘুমোচ্ছেন। তাই আর ডাকি নি।'

ডানিয়েল আগে খেয়াল করে নি। এবার লক্ষ্য করল, সুভদ্রার চুলে আর গালে বিন্দু বিন্দু জল জমে আছে। সকালের প্রথম রোদ পড়ে সেগুলো হীরার কণার মত

জ্বলছে। পরনে ধবধবে শুভ্র শাড়ি আর ব্লাউজ। এই মুহূর্তে পশ্চিমঘাটের এই সুদর্শনা বিদেশিনীকে দেবী জুনোর মত আশ্চর্যরূপিনী মনে হচ্ছে। তার দিক থেকে চোখ আর ফেরাতে পারল না ডানিয়েল।

সুভদ্রা বলল, 'এই মেয়েটিকে দেখুন—' বলে নিজের সঙ্গিনী সেই কৃষ্ণাঙ্গী মেয়েটির দিকে আঙুল বাড়াল।

এতক্ষণ ডানিয়েলের সমস্ত আকর্ষণ আর মনোযোগের কেন্দ্রে বসেছিল সুভদ্রা। এবার আস্তে আস্তে কালো মেয়েটির দিকে তাকাল সে।

সুভদ্রা বলল, 'ওর নাম রতি—'

ইংরেজিতেই কথা বলছিল সুভদ্রা। তবু নিজের নাম কানে যেতে খিল খিল করে হেসে উঠল রতি।

একটু চমকে উঠে পরমুহূর্তেই ডানিয়েল বুঝতে পারল, মেয়েটা নিয়তহাসিনী। হাত-পা-চোখ-মুখ যেমন তার দেহের অংশ, হাসিটা তেমনি তার স্বভাবের। যখন-তখন, কারণে-অকারণে প্রমত্ত হাসিতে সে মেতে উঠতে পারে।

হাসিটা কিছু থিতিয়ে এলে ডানিয়েল লক্ষ্য করল, কালো মেয়েটি বেশ সুরূপাও। এই কৃশ দুর্বল মানুষের দেশে তার সর্বাঙ্গ জুড়ে উদ্দাম স্বাস্থ্য। নাকমুখও বেশ টানা টানা, আয়ত। হাতে রূপোর কাঙনা, নিটোল গলাটি বেষ্টন করে রূপোর বিছে হার কালো দেহে রূপোর ছটা রূপের হাট বসিয়ে দিয়েছে যেন। মুঠোর ভেতর বেড় পাওয়া যায় কোমরখানি এমনই সরু। তার নিচের দিকে বিশাল আববাহিকা। ওপর দিকে সে উদ্ধত। হলুদ রঙের একটা ছাপা শাড়ি তার দেহটিকে সাপটে ধরে আছে।

মেয়েটা যেন কালো-রং এক ময়ূরী। মদ্দা ময়ূরটা এসে ঠুকরে ঠুকরে তাকে সোহাগ জানাবে, খুনসুটি করবে—সেই আশায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই সে হেলছে, দুলছে। দু' চোখে ঘোর-লাগা, তার মধ্যে কৌতুকের একটু দীপ্তিও বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

এত কথা ডানিয়েল এই মুহূর্তে ভাবতে পারছে না। তবে রতিকে দেখে তার মনে যে সুরের দোলা লেগেছে সেটা ব্যাখ্যা করলে এইরকমই হয়ত দাঁড়ায়।

সুভদ্রা আবার বলল, 'রতিকে আমি সব বুঝিয়ে দিয়েছি। দিনকয়েক ও আপনার দেখাশোনা করবে। কাল—'

ডানিয়েলের বুকের ভেতর কোথায় একটা ছায়া পড়ল। সুভদ্রার কথা শেষ হবার আগেই সে বলে উঠল, 'ও কেন? আপনি—আপনি—'

ডানিয়েলের মনোভাব বুঝতে পাবল সুভদ্রা। মৃদু হেসে বলল, 'তিনদিন চার্চ ছেড়ে এ গ্রামে পড়ে আছি। আর থাকা সম্ভব নয়। তাছাড়া—'

'কী?'

'এই একটা গ্রাম নিয়ে থাকলেই আমার চলে না। আরো কত গ্রাম রয়েছে চারিদিকে। সে-সব জায়গার লোকেরা আমার মুখ চেয়ে আছে। তাদের কাছেও তো যেতে হবে। এখন দিন সাতেকের মত আমি এ গ্রামে আসতে পারব না।'

নিজের মধ্যেকার সেই ছেলেমানুষটা অস্থির হয়ে উঠল। ডানিয়েল বলল, 'অত গ্রামে গ্রামে ঘুরে কী হবে?'

সুভদ্রা হাসল, 'অনেক কাজ আছে।'

'কী কাজ?'

সুভদ্রার সেই শব্দহীন অস্পষ্ট হাসিটা আরেকটু বিস্তৃত হল। কোন উত্তর দিল না সে।

ডানিয়েল বলল, 'হাসছেন যে? কী কাজ বললেন না তো?'

সুভদ্রা বলল, 'এখানে যদি কিছুদিন থাকেন নিজেই বুঝতে পারবেন।'

একটু চুপচাপ। তারপর সুভদ্রা আবার বলে উঠল, 'সকালে-বিকেলে-দুপুরে-রাত্তিরে চার বার রতি খাবার নিয়ে আসবে। লক্ষ্মী ছেলের মত খেয়ে নেবেন। মোটেই অবাধ্যতা করবেন না। দুপুরবেলা রতি যখন আসবে মাথা ধুইয়ে ওষুধ খাইয়েও যাবে।' বলে রতির দিকে ফিরে হাসি হাসি মুখে কি যেন বলল।

সঙ্গে সঙ্গে সর্বাঙ্গ বাঁকিয়ে চুরিয়ে খিলখিলিয়ে হেসে উঠল রতি।

সন্দিগ্ধ চোখে সুভদ্রার দিকে তাকিয়ে ডানিয়েল বলল, 'ওকে কী বললেন?'

'বললাম ওর অবাধ্য হলে আপনার নাক কেটে নিতে। জেলের মেয়ে তো। ও কর্মটা খুব সহজেই করতে পারবে রতি।'

ডানিয়েল এবার হেসে ফেলল। তার স্বভাবটুকু বোধহয় ধরাই পড়ে গেছে সুভদ্রার কাছে।

সুভদ্রা বলল, 'এবার আমি যাই।' রতিকে নিয়ে সিঁড়ি পর্যন্ত গিয়ে কি ভেবে আবার ফিরে এল সে। রতি অবশ্য সিঁড়ির কাছেই দাঁড়িয়ে রইল।

ডানিয়েল উৎসুক চোখে তাকাল। সুভদ্রা রতির দিকে চকিত একটা দৃষ্টিক্ষেপ করে চাপা আধফোটা স্বরে বলল, 'গণেশকে মনে আছে?'

সেই বলিষ্ঠ স্বাস্থ্যবান ছেলেটি চোখের সামনে ভেসে উঠল। ডানিয়েল বলল, 'আছে।'

'রতির পিছু পিছু ও হারামজাদা হয়ত এখানে আসবে। তারপরে দুটোতে মজা করে আড্ডা জমাবে। রতি থাকলে ছোঁড়াটাকে কিন্তু ঘরে ঢুকতে দেবেন না।'

সুভদ্রা বলতে লাগল, 'এ বাড়িটা গ্রামের বাইরের দিকে। তার ওপর বেওয়ারিশ। বড় কেউ একটা এখানে আসে না। আপনি এখানে আছেন, ওদের কথাও বুঝবেন না। মনের সুখে ওরা এর সুযোগ নিতে চাইবে।'

ডানিয়েল উদ্‌গ্রীব হল, 'কী ব্যাপার বলুন তো?'

চোখ দুটি ইঙ্গিতময় হয়ে উঠল সুভদ্রার, 'বুঝতে পারছেন না?'

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ হেসে উঠল ডানিয়েল, 'তাই নাকি! এ তো খুব ভাল কথা।'

'আপনার কাছে হয়ত ভাল কিন্তু ওদের মা-বাপের কাছে খুব খারাপ। বার বার বলে যাচ্ছি, ওদের একদম প্রশ্রয় দেবেন না।' বলে আর অপেক্ষা করল না সুভদ্রা। রতিকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেল।

পরের দিনই জ্বর ছাড়ল। সুভদ্রার কথামত তার পরের দিন ঝোলরুটি পেল ডানিয়েল। ঝোলরুটির পরদিন পেল ভাত।

প্রতিদিন ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে পা ফেলে ফেলে সকাল-দুপুর-বিকেল এবং রাত্তিরে নির্ভুল নিয়মে হাজিরা দিয়ে যাচ্ছে রতি।

সুভদ্রার এই প্রতিনিধিটি তার চাইতে অনেক বেশি নির্দয়া। দুধ খাবার ব্যাপারে সেদিন গড়িমসি করেছিল বলে সুভদ্রা ধমকে উঠেছিল। রতি কিন্তু প্রথমে চোখ পাকায়। তাতে কাজ না হলে হাত ধরে টানাটানি শুরু করে। সেটা নিষ্ফল হলে সরাসরি গায়ের ওপর চড়াও হয়। একরকম গলা টিপে ধরে খাইয়ে দিতে চায়। সুভদ্রা যে বলে গিয়েছিল অবাধ্য হলে রতি তার নাক কেটে নেবে, মেয়েটার পক্ষে তা বোধহয় একেবারে অসম্ভব নয়।

অতএব খাওয়ার পালাটা মসৃণ নিয়মেই চুকে যাচ্ছে। রতি খাবার নিয়ে এলে আর কোনোদিকে তাকায় না ডানিয়েল। ঘাড় গুঁজে গোগ্রাসে খেয়ে যায়। ওষুধ খাওয়া এবং মাথা ধোবার ব্যাপারেও বিন্দুমাত্র গোলমাল করে না। রতি ইঙ্গিতে যা-যা করতে বলে সুশীল সুবোধ বালকটির মত মুখ বুজে তা-ই করে যায় ডানিয়েল।

সুভদ্রা খুব সম্ভব প্রতি বার খাবারের সঙ্গে একটা চামচ দিতে বলে গিয়েছিল। চামচ দিয়েই খায় ডানিয়েল। তবু অনভ্যাসের ভাত খাওয়াটা নিয়ে অসুবিধায় পড়তে হয় বৈকি। প্রথম দিনের মত মুখে তুলতে গেলে ঝরঝরিয়ে অর্ধেকই যায় পড়ে।

বয়স্ক মানুষটির এমন শিশুর মত খাওয়া দেখে রতি হেসেই অস্থির। হাসতে হাসতে বেঁকে চুরে গলে গলে পড়তে থাকে যেন। খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে বাসনকোসন নিয়ে যাবার সময়ও সে হাসে। তবে সে হাসি অন্য সময়ের মত ঝড় বইয়ে দেয় না। ঘাড়টি ঈষৎ হেলিয়ে তিন চারটি দাঁত বার করে বিচিত্র মধুর একটি ভঙ্গি করে সে। অর্থাৎ যা বলেছি লক্ষ্মীছেলের মত করেছ। এখন আমি চলি।

কেউ কারো ভাষা জানে না। তবু চোখের দৃষ্টিতে, ঠোঁটের কুঞ্চনে, হাতের আঙুলে ইশারা নামে যে আদিম ভাষাটি ফোটে সেটুকু পাঠ করেই পরস্পরকে তারা বুঝতে চেষ্টা করে। ভাষার অতীত, ইসারার অতীত, জগতের কোন মুদ্রায় ধরা যায় না এমন অব্যক্ত অনির্বচনীয় বুঝিবা কিছু আছে যা রতি আর ডানিয়েলকে খুব কাছে এনে দিয়েছে।

একটিমাত্র শব্দ ডানিয়েলের জানা আছে যা রতির বোধগম্য। সেটা রতির নাম। কারণে অকারণে নামটা মাঝে মাঝেই ডেকে ওঠে ডানিয়েল। রতি জিজ্ঞাসু চোখে তাকায়। এর পর ডানিয়েল কী বলবে ভেবে পায় না। বলতে সে অবশ্যই কিছু পারে তবে তা তো রতি বুঝবে না। কাজেই পরস্পরের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে দু'জনে হঠাৎ জোরে জোরে প্রবলবেগে হেসে ওঠে।

একদিন এক কাণ্ডই করে বসল ডানিয়েল। গণেশের সঙ্গে রতির সম্পর্কের একটা রমণীয় আভাস দিয়ে গিয়েছিল সুভদ্রা। সে সম্বন্ধে মজা করার লোভটা অদম্য হয়ে উঠল। খেতে খেতে বার বার রতির দিকে তাকিয়ে ঠোঁট টিপে হাসতে লাগল ডানিয়েল।

রতি কিছুক্ষণ তার হাসিটা লক্ষ্য করল। তারপর নিচের ঠোঁটে দাঁত গেঁথে দিয়ে ভুরু দুটো প্রশ্নের ভঙ্গিতে ওপর দিকে তুলল। অর্থাৎ ব্যাপারখানা কী? অত হাসি কেন?

ডানিয়েল হাসতেই লাগল।

এবার রতি করল কি, উঠে এসে ডানিয়েলের বাঁ হাতটা ধরে ঝাঁকাতে লাগল। সেই সঙ্গে তার ভুরু ঘন ঘন ওপর দিকে উঠতে লাগল। তার অর্থ, চালাকি নয়। এত হাসি কিসের জন্য, না বললে তোমাকে ছাড়ছি না।

দুষ্টুমিতে চোখদুটি মিটমিট করতে লাগল ডানিয়েলের। রতির চোখে চোখ রেখে ফস্ করে সে বলে ফেলল, 'গণেশ—'

এই নামটা শোনার জন্য প্রস্তুত ছিল না রতি। উচ্চকিত হয়ে উঠল সে। ডানিয়েলের চোখে চোখ রাখাও তার পক্ষে আর সম্ভব হল না। গণেশের নাম এই বিদেশী আগন্তুকটা কিভাবে জানতে পারল, সে হয়তো ভেবেই পাচ্ছে না আর পাচ্ছে না বলেই সলজ্জ আরক্ত মুখ নিচের দিকে নামিয়ে আনতে হল। ঘেমে উঠতে লাগল সে।

প্রাণের ভেতর কৌতুক ফেনিয়ে উঠছে। এই কালো-রং মেয়েটি খাওয়া নিয়ে এ ক'দিন তাকে যথেষ্ট জব্দ করে আসছে। এবার ব্রহ্মাস্ত্র হাতে পাওয়া গেছে। উঠতে-বসতে চলতে-ফিরতে এবার তাকে নাকাল করা যাবে। ডানিয়েল আবার বলে উঠল, 'গণেশ—গণেশ—'

চকিতে একবার চোখ তুলে পরমুহূর্তেই নামিয়ে নিল রতি। সে বিব্রত, সঙ্কুচিত। কালো মুখের ওপর দিয়ে বার বার রক্তোচ্ছ্বাস খেলে যাচ্ছে তার। সুঠাম শরীরটা সাপিনীর মত এঁকে বেঁকে যাচ্ছে।

ডানিয়েলের ছেলেমানুষিটা শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছেছে বুঝি। সে সমানে বলে যেতে লাগল, 'গণেশ—গণেশ, গণেশ—গণেশ—'

রতি আর বসে থাকতে পারল না। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে যুগপৎ জিভ ভেংচে এবং একটি কিল দেখিয়ে ছুটে পালাল।

ডানিয়েল হো হো করে উচ্ছ্বসিত অবারিত হাসি হাসতে লাগল।

কিছুক্ষণ পর রতি আবার ফিরে এল। চোখদুটি তার নিচের দিকে নামানো। ভঙ্গিটা জড়সড়। পা দুটিও ঠিকমত পড়ছে না। অপরিসীম লজ্জায় আর নিদারুণ কুণ্ঠায় ডানিয়েলের দিকে তাকাতেই পারছে না সে।

ইতিমধ্যে ডানিয়েলের খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। ঘরে ঢুকে কোনদিকে না তাকিয়ে সোজা খাওয়ার জায়গায় গিয়ে এঁটো বাসনগুলো ক্ষিপ্র হাতে গুছিয়ে ফেলতে লাগল রতি। নিজের খাটিয়াটার ওপর বসে দু'-চোখে অসীম কৌতুক নিয়ে কুণ্ঠিত নতমুখিনী মেয়েটাকে দেখতে লাগল ডানিয়েল।

এই পুষ্টিহীন রুগ্নতার দেশে দৃঢ়গঠনা সবলা মেয়েটিকে চমৎকার লাগছে। পাশাপাশি গণেশের চেহারাটাও চোখের সামনে ভেসে উঠল। দু'-জনকে মানাবে খুব ভাল। যেন কালো দেবদূত আর দেবদূতী।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সুভদ্রা যোসেফের কথাও মনে পড়ে গেল। রতি আর গণেশের প্রণয় তাদের মা-বাবার দিকে নাকি অবাঞ্ছিত। সুভদ্রা বার বার সতর্ক করে দিয়ে গেছে, সে যেন কোনোমতেই ওদের প্রশ্রয় না দেয়। কিন্তু ডানিয়েলের মন কিছুতেই তাতে সায় দিল না। এমন চমৎকার চেহারার দুটি ছেলেমেয়ের মিলন ঘটিয়ে দেওয়াটা এই মুহূর্তে জীবনের একমাত্র কর্তব্য মনে হল।

একটু ইতস্তত করল ডানিয়েল। তারপর সুভদ্রা যোসেফের সেই কথাগুলো এক ধাক্কায় মনের দেউড়ি পার করে দিয়ে পায়ে পায়ে রতির কাছে চলে এল। সস্নেহে কোমল সুরে ডাকল, 'রতি—'

রতি মুখ তুলল না। হয়ত ভাবল, বিদেশীটা তাকে খেপিয়ে মারবে।

একই সুরে ডানিয়েল আবার ডাকল।

রতি এবারও নতমুখিনী।

ডানিয়েল আরো কাছে এগিয়ে এসে রতির থুতনিতে আঙুল রেখে আস্তে আস্তে মুখটা ওপর দিকে তুলল।

চোখাচোখি হতে কিছুটা আশ্বস্ত হল রতি। না, তাকে খ্যাপাবার মত সামান্য দুষ্টুমিও এখন এই আগন্তুকটার চোখে-মুখে আবিষ্কার করা গেল না।

ডানিয়েল বলল, 'গণেশ—' ঐ একমেব শব্দটি উচ্চারণ করে প্রাণপণে নানা অঙ্গ ভঙ্গির সাহায্যে গণেশকে নিয়ে আসতে বলল।

প্রথমটা বুঝতে পারল না রতি। উত্থিত ভুরুর তলায় দৃষ্টিটা জিজ্ঞাসু হয়ে রইল। ডানিয়েল আরেক বার গণেশের নাম বলে আগের মত হাত-পা চোখমুখ নাড়ল। এবার রতি কি বুঝল, সে-ই জানে। সারা মুখে আরক্ত একটি হাসির রেখা টেনে এঁটো বাসনগুলো তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। তারপরেই দৌড়। দরজার মুখ পর্যন্ত গিয়ে একবার থমকে পেছন ফিরল সে। চোখের কোণে একটি রমণীয় ভ্রূকুটি হেনে এবং ঠোঁটের প্রান্ত টিপে বিচিত্র একটি ভঙ্গি করে কোমরে ক্ষিপ্র মোচড় দিল। পরক্ষণেই কাঠবিড়ালীর মত তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বিকেলবেলা সত্যিসত্যিই গণেশকে নিয়ে রতি হাজির।

নিজের ঘরের একটা জানালায় দাঁড়িয়ে ছিল ডানিয়েল। সেদিন খেয়েদেয়ে সুভদ্রার সঙ্গে সেই যে এ ঘরে এসে ঢুকেছিল তারপর থেকে আর বেরুনো হয় নি। শরীরটা এখনও এত দুর্বল যে বেরুতে সাহস হয় না। সুতরাং নিজেকে এই ঘরখানার

মধ্যেই নির্বাসিত রাখতে হয়েছে। বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে সামান্য যে যোগাযোগ তা এখন ঐ রতির কল্যাণেই।

যাই হোক, এই মুহূর্তে আকাশময় রক্তের উচ্ছ্বাস ছড়ানো। সূর্যটা যেন তীরবিদ্ধ হয়ে অতি দ্রুত নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে। অনেক উঁচুতে আকাশের নীল ছুঁয়ে ছুঁয়ে দলবদ্ধ অসংখ্য পাখি ভেসে বেড়াচ্ছে। কী নাম ওদের? মনোযোগটা একটু তীক্ষ্ণ করতেই ডানিয়েল চিনতে পারল, ওগুলো সী-গাল—সিন্ধুসারস। এই অচেনা দেশে চেনা পাখিগুলোকে ভারি ভাল লাগল ডানিয়েলের।

পরমুহূর্তেই তার মনে পড়ল, আরব সাগর এখান থেকে খুব কাছে। সমুদ্র কাছে না থাকলে ঐ পাখিগুলো আসবেই বা কোত্থেকে?

সেদিন এ গ্রামে আসার সময় সুভদ্রা আরব সাগরের কথা জানিয়েছিল। মনে মনে তখনই ডানিয়েল সঙ্কল্প করেছিল, সমুদ্রে স্নান করতে যাবে। আজ এই মুহূর্তে সে ভাবল, শরীরটা একটু সুস্থ হলেই হয়, তার প্রথম কাজ হবে আরব সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়া।

অলস দৃষ্টিতে বেলাশেষের বিষণ্ণ, রক্তাভ, পশ্চিমঘাটের অবারিত আকাশ আর পাখি দেখছিল ডানিয়েল। দেখতে দেখতে তার চোখ হঠাৎ নিচে নেমে সামনের পথটার দূর বাঁকে আটকে গেল।

বাঁকের মুখটা উঁচুনিচু ও চড়াই-উতরাইতে তরঙ্গিত। হঠাৎ উতরাইয়ের ঢালু থেকে রক্তবিন্দুশীর্ষ একটি মেয়ে উঠে এল। পরক্ষণেই তার পিছু পিছু একটি পুরুষ ভেসে উঠল।

ডানিয়েল যেখানে আছে সেটা গ্রামের পশ্চিম প্রান্ত। এই নিঃসঙ্গ বাড়িটা ছাড়া এখানে মানুষের আর কোন বসতি নেই। বাড়িটা যেন সবার ছোঁয়া বাঁচিয়ে অন্ত্যজের মত আত্মগোপন করে আছে।

অনেক দূরে পথের ঐ বাঁকটা পেরিয়ে গ্রাম ঘন হয়েছে। সেখানে বাড়িগুলো গা ঘেঁষাঘেঁষি করে ঘনিষ্ঠভাবে দাঁড়িয়ে আছে। সেখানে গেলে জীবনের সমস্ত কলরব, কুশ্রীতা, গৌরব, গ্লানি টের পাওয়া যায়। ডানিয়েল অচেনা বিদেশী বলেই কি গ্রামের মধ্যে জায়গা হয়নি? সবার কাছ থেকে তাকে দূর নির্বাসনে সরিয়ে রাখা হয়েছে?

স্থির নিবদ্ধ দৃষ্টিতে বাঁকটার দিকে তাকিয়েই রয়েছে ডানিয়েল। সেই রক্তবিন্দুশীর্ষ মেয়েটি এবং তার সহচর ইতিমধ্যে অনেক কাছে এসে পড়েছে।

এতক্ষণ তাদের চিনতে পারা যাচ্ছিল না। কাছে আসতে বোঝা গেল, রতি আর গণেশ। ডানিয়েলের চোখ কৌতুকে এবং খুশিতে ঝিকমিকিয়ে উঠল।

সবসময় রতি তার সমস্ত ইসারা বুঝতে পারে না। বোঝাবার জন্য প্রাণপণে অঙ্গ ভঙ্গি করতে হয়। কিন্তু গণেশ সম্বন্ধে ইঙ্গিতটা দেখা যাচ্ছে ঠিক ঠিক বুঝতে পেরেছে এবং বৃথা সময় নষ্ট না করে তাকে নিয়েও এসেছে। এ ব্যাপারে যুবতী মেয়েদের ইন্দ্রিয় বোধহয় খুবই প্রখর।

খুশিতে ডগমগ কালো-রং দুটো ময়ূর-ময়ূরী হেলে-দুলে এগিয়ে আসছে। মাঝে মাঝে মজার কথা কি যেন হচ্ছে তাদের মধ্যে; সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছ্বসিত হয়ে হেসে উঠছে

দু'-জনে, এবং পরস্পরের গায়ে ঢলে ঢলে পড়ছে। তাদের আনন্দ এত অপরিমিত, উচ্ছ্বাস এত বিপুল যে দেহের পাত্র ছাপিয়ে বাইরে উপচে উপচে পড়ছে।

আগে লক্ষ্য করেনি ডানিয়েল। এবার হঠাৎ চোখে পড়ল। বাঃ, বাঃ! আজ কি চমৎকারই না সেজেছে রতি! সুঠাম কালো দেহ ঘিরে লাল টুকটুকে একখানি শাড়ি, পায়ে আলতা, (এই মুহূর্তে আলতা কী, ডানিয়েল জানে না) কপালে লাল চীনা সিঁদুরের প্রকাণ্ড টিপ। চুলগুলো চূড়ো করে মাথার ঠিক মাঝখানে একটা আঁটো খোঁপায় আবদ্ধ। খোঁপাটিকে বেষ্টন করে রয়েছে একরাশ পলাশ। এই জন্যেই দূর থেকে তাকে রক্তবিন্দুশীর্ষ মনে হয়েছিল।

সব মিলিয়ে এই কৃষ্ণাঙ্গী মেয়েটা যেন আগুনের শিখার মত জ্বলছে। নিষ্পলক মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়েই রইল ডানিয়েল।

গণেশের সাজের বাহারও আজ খুলেছে। পরনে ক্ষারে কাচা ফর্সা ধুতি আর জামা। মাথায় একটা হলুদ রঙের পাগড়ি বাঁধা। চোখে কাজলের টান, পায়ে কাঁচা চামড়ার নাগরা। এই খালি গা, খালি পায়ের দেশে তার আজকের সাজসজ্জা রীতিমত চমকপ্রদ।

বিচিত্র এক নেশার ঘোরে আচ্ছন্নের মত হাঁটতে হাঁটতে একসময় বাড়িটার একেবারে সামনে এসে দাঁড়াল গণেশ আর রতি। দু'-জনে ফিস ফিস করে নিচু গলায় খানিকটা কি পরামর্শ করল। তারপর গণেশকে প্রকাণ্ড একটা পিপুল গাছের আড়ালে দাঁড় করিয়ে পায়ে পায়ে সিঁড়ি বেয়ে প্যাগান দুর্গের মত ঘরটার ভেতর চলে এল রতি।

ইতিমধ্যে জানালার কাছ থেকে সরে আবার বিছানায় গিয়ে বসেছে ডানিয়েল। গণেশকে বাইরে লুকিয়ে রেখে রতি একা একা কেন এল?

ডানিয়েল শুনেছে প্রাচ্যের মেয়েদের প্রণয়ী সম্পর্কে লজ্জা নাকি সীমাহীন। সেই জন্যই কি গণেশকে সঙ্গে নিয়ে রতি ভেতরে আসে নি? না-কি এই কৌতুকময়ী নিয়তহাসিনী মেয়েটার প্রাণে গণেশকে লুকিয়ে রাখার মধ্যে অন্য কোন খেলা আছে?

কী আছে, দেখাই যাক। ঠোঁট টিপে মিটমিটে চোখে রতিকে দেখতে লাগল ডানিয়েল।

এদিকে ঘরে ঢুকেই দাঁড়িয়ে পড়েছে রতি। মুখটা নিচের দিকে আনত। শাড়ির একটা খুঁট মাঝে মাঝে আঙুলে জড়াচ্ছে, পরক্ষণেই খুলে ফেলে দাঁত দিয়ে কামড়াচ্ছে। আবার আঙুলে জড়াচ্ছে, আবার কামড়াচ্ছে। আর এরই মধ্যে আড়ে আড়ে তাকাচ্ছে। তার সলজ্জ মুখে আরক্ত নিঃশব্দ হাসির একটি দীপ্তি ক্ষণে ক্ষণে বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

ডানিয়েল ডাকল, 'রতি—'

চোখ তুলেই নামিয়ে নিল রতি।

ডানিয়েল হাতের ইসারায় তাকে কাছে ডাকল।

দু'-পা এগিয়ে আবার দাঁড়িয়ে পড়ল রতি।

ডানিয়েল এবার উঠে এসে রতির একেবারে মুখোমুখি দাঁড়াল। আঙুলের ডগা দিয়ে তার নত চিবুক তুলে উচ্ছলিত কৌতুকে বলে উঠল, 'গণেশ—' সেই সঙ্গে ভুরুর একটা ইঙ্গিত করল। অর্থাৎ গণেশ কোথায়?

ডানিয়েলের আঙুলে রতির চিবুক স্থাপিত। সেই অবস্থায় চোখ বুজে জোরে জোরে মাথা নাড়ল রতি। ভাবখানা এই, গণেশের খবর সে জানে না।

ঠোঁট টিপে চোখ কুঁচকে একটু হাসল ডানিয়েল। যেন বোঝাতে চাইল, তবে রে দুষ্টু মেয়ে, গণেশের খবর তুমি জান না? জান কি জান না, আমি দেখছি।

ডানিয়েলের চোখমুখ দেখে তার মনোভাব বুঝতে পারল রতি। থুতনির তলা থেকে আঙুলটা এক ধাক্কায় সরিয়ে কোমরে ক্ষিপ্র মোচড় দিয়ে একটু দূরে গিয়ে মিটিমিটি হাসতে লাগল।

ডানিয়েলও হাসছে। হাসতে হাসতে আবার রতির কাছে চলে এল সে এবং মেয়েটা কিছু বুঝবার আগেই ছোঁ মেরে তার একটা হাত ধরে টানতে টানতে সেই জানালার কাছে নিয়ে গেল। ঝাঁকড়া-মাথা প্রকাণ্ড পিপুল গাছটা অদূরে দাঁড়িয়ে আছে। সেদিকে আঙুল বাড়িয়ে ডানিয়েল বলল, 'গণেশ—গণেশ—' ইসারায় বোঝাল ঐ গাছটার পেছনে তুমি তাকে লুকিয়ে রেখে এসেছ। যাও, এখন নিয়ে এস। আর চালাকির দরকার নেই।

লুকোচুরিটা ধরা পড়তে রতি যুগপৎ বিস্মিত, সচকিত। সে ভেবেই পাচ্ছে না, এই আগন্তুক বিদেশীটা গণেশকে দেখল কিভাবে? তারপরেই তার সহজ বুদ্ধিটা বলে দিল, হয়ত জানালার কাছে দাঁড়িয়ে ডানিয়েল তাদের আসতে দেখেছে।

এদিকে ডানিয়েল আবার তাড়া লাগাল। আরেক বার পিপুল গাছের দিকটা দেখিয়ে রতির কাঁধে মৃদু একটা ধাক্কা দিয়ে বলল, 'গণেশ—গণেশ—'

রতি বুঝল, গণেশকে নিয়ে আসার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছে ডানিয়েল। দরজার দিকে কয়েক পা এগিয়ে সলজ্জ রক্তিম মুখে অপরূপ একটা ভেংচি কেটে সে ছুট লাগাল।

খানিকটা পর গণেশকে নিয়ে ফিরে এল রতি। সেদিন পশ্চিমঘাটের এই দুটি ছেলেমেয়ে সম্বন্ধে যে উপমা সে ভেবেছিল, এই মুহূর্তে বিদ্যুৎচমকের মত তা মনে পড়ে গেল। সত্যিই কালো দেবদূত আর দেবদূতী।

দু'-চোখে চাপা দুষ্টুমির একটি হাসি ফুটিয়ে একবার গণেশ আরেক বার রতিকে দেখতে লাগল ডানিয়েল। সে যেন বোঝাতে চাইল, তোমরা দু'জনে কোন রসে ডুবে আছ আমি জানি। হুঁ-হুঁ বাবা, আমার কাছে কিছুই গোপন নেই।

ডানিয়েলের চোখমুখ দেখে দু'-জনে কিছু একটা আন্দাজ করল বোধহয়। গণেশ বোকাটে মুখে লজ্জার হাসি হাসতে লাগল। রতিও হাসতে লাগল ফিক ফিক করে আর তারই মধ্যে জিভ বার করে ঘন ঘন ডানিয়েলকে ভেংচি কাটতে লাগল।

কিছুক্ষণ দু'-জনকে দেখল ডানিয়েল। তারপর নিজের বিছানাটা দেখিয়ে ইঙ্গিতে তাদের বসতে বলল। কিন্তু রতি বা গণেশ কেউ তার এই নির্দেশ মানতে রাজী নয়। দু'জনে জোরে জোরে প্রবল বেগে মাথা নেড়ে জানাতে চাইল, তারা ওখানে বসবে না।

আবার তাদের বসতে বলল ডানিয়েল। রতি এবং গণেশ একই রকম মাথা নাড়ল। সুতরাং এবার এক কাণ্ডই করতে হল ডানিয়েলকে। হাত ধরে টানতে টানতে দু'জনকে জোর করে নিজের বিছানায় নিয়ে বসিয়ে দিল। উৎসাহিত করার

ভঙ্গিতে দু'-হাত নেড়ে বোঝাল, হাসিতে-গল্প-খুনসুড়িতে এবং প্রাণ যা চায় তাতে তোমরা মেতে ওঠ। আমি আপাতত দূরের ঐ জানালাটার কাছে গিয়ে দাঁড়াচ্ছি। তোমরা যা খুশি কর, আমি ফিরেও তাকাব না।

রতি-গণেশকে উৎসাহ দিয়ে দূর প্রান্তের সেই জানালাটার কাছে গিয়ে দাঁড়ায় ডানিয়েল। সূর্যটা পশ্চিমঘাটের দিগন্তবিসারী পট থেকে কখন যেন অদৃশ্য হয়ে গেছে! সমস্ত আকাশ জুড়ে সীমাহীন পর্দার মত ছায়াচ্ছন্ন শীতলতা নেমে এসেছে। সেই সিন্ধুসারসেরাও আর নেই। কখন তারা কোথায় ফিরে গেছে, কে বলবে। যে দিকেই চোখ ফেরানো যাক, এখন আসন্ন সন্ধ্যার দ্রুত পদক্ষেপ যেন শোনা যায়।

এদিকে রতি আর গণেশ ডানিয়েলের বিছানায় চুপচাপ বসে আছে। ডানিয়েলের আমন্ত্রণে এখানে এসে এমন একটা অবস্থার মধ্যে পড়তে হবে, এ ছিল তাদের পক্ষে অভাবনীয়। বিদেশী আগন্তুকটা তাদের নিয়ে এমন খেলা যে খেলবে তাই বা কে ভাবতে পেরেছিল।

তাদের মধ্যে যৌবনের অপরিমিত উচ্ছ্বাসে যে-সব কথা, যে-সব খুনসুড়ি, যে সব পরিহাস চলতে পারে তৃতীয় কারো উপস্থিতিতে তা একেবারেই অসম্ভব। অথচ ডানিয়েল এ-ঘরেই আছে। যদিও ডানিয়েলের মুখ জানালার বাইরে ফেরানো, যদিও তাদের ভাষা সে বুঝতে পারবে না তবু সঙ্কোচটাকে কিছুতেই যেন জয় করা যাচ্ছে না। সেটা অকারণে নয়, ভূগোলের কোলাহল থেকে অনেক অনেক দূরে তাদের এই নিভৃত উপত্যকায় যুবক-যুবতীর সম্পর্কের অনেকখানিই আদিরসের প্রান্তঘেঁষা। তাদের হাসি, পরিহাস, খুনসুড়ি—প্রায় সব কিছুই ঐ রসে ডোবানো।

ডানিয়েল তাদের কথা বুঝবে না ঠিকই, তবু তাকে সাক্ষী রেখে পরস্পরকে নিয়ে মেতে উঠতে রতি বা গণেশ, প্রথমটা কিছুতেই পেরে উঠল না।

অনেকক্ষণ ছেলেমেয়ে দুটো চুপচাপ। ব্যাপারটা কী, বুঝবার জন্য ডানিয়েল মুখ ফেরালো। ঠোঁট টিপে ইঙ্গিতে প্রশ্ন করল, 'কি, মুখ বুজে কেন? আমি জানি, তোমাদের বাপ-মা তোমাদের মেলামেশা পছন্দ করে না। গোপন মিলনের এমন সুযোগ করে দিলাম আর সেই সুযোগটা কিছুতেই কাজে লাগাচ্ছ না? আহাম্মক উজবুক কোথাকার!'

নিজের বুকে আঙুল দিয়ে সে বোঝাতে চাইল, আমার জন্য যদি অসুবিধা হয় তো বল, বাইরে যাই। তবে আমার বাইরে যাওয়া বা ভেতরে থাকা—দুই সমান। তোমাদের ভাষা আমার অবোধ্য। দুরন্ত আবেগে যদি কিছু করে বসো নিশ্চয়ই দেখে ফেলব। তবে যদি কথাই বলে যাও, সে কথা যত অন্তরঙ্গ যত রসালো আর যত সঙ্গোপনই হোক—আমার কেন সারা ব্রিটিশ নেশনের বাপেরও সাধ্য নেই যে বুঝতে পারে। আমাকে সঙ্কোচের কোনো কারণই নেই। প্রাণ যা চায় তা-ই বল, মন যা বলে তা-ই কব। চারদিকের পৃথিবীকে বিস্মৃত হয়ে দুর্বার স্রোতে ভেসে যাও। চোখমুখের ভঙ্গিতে এই কথা ক'টি বলে আবার জানালার বাইরে তাকাল ডানিয়েল। এদিকে পাশাপাশি বসে থাকতে থাকতে একসময় দুর্জয় সঙ্কোচটা অতিক্রম করে গেল রতি আর গণেশ। প্রথমে অনুচ্চ ফিস ফিস সুরে তারা কথা শুরু করল। ধীরে ধীরে তাদের স্বর স্পষ্ট হতে লাগল। কথার সঙ্গে কখন যে

পরিহাসের রঙ মিশল, কখন যে অবারণ অবারণ হাসির দোলায় দুটি যুবক-যুবতী তরঙ্গিত হতে লাগল—নিজেদেরই তাতে খেয়াল নেই।

তাদের কথা না বুঝলেও সেগুলো যে মাত্রাছাড়া রকমের উচ্ছল, তাদের হৃদয় এই মুহূর্তে যে অসীম উচ্ছ্বাসে ফেনায়িত—এ সব বুঝতে অসুবিধা হল না ডানিয়েলের। সে বুঝতে পারল, গণেশ এবং রতি এখন চারপাশের জগৎকে একেবারেই বিস্মৃত হয়েছে।

কি একটা কথায় হাসির মাত্রাটা আগের চাইতে হঠাৎ অনেক উঁচু পর্দায় উঠে গেল রতির। এমন উদ্দাম খিল খিল শব্দে সে হাসতে লাগল যে মনে হয়, সে হাসি আর থামবে না।

শুনতে শুনতে নিজের স্বভাবের সেই ছেলেমানুষটা আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়ল যেন। ডানিয়েল কথা দিয়েছিল, ঘরের ভেতরে তাকাবে না। সেই প্রতিশ্রুতির কথাটা হঠাৎ ভুলে গেল সে। মুখ ফিরিয়ে চোখ পাকিয়ে কপট শাসনের ভঙ্গিতে আওয়াজ করে উঠল, 'এ্যা-ও-ও-ও—' অর্থাৎ করছ কী তোমরা?

চমকে হাসি থামিয়ে দিল রতি। গণেশও চুপ। দু'-জনে কখন যেন খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে বসেছিল। তাড়াতাড়ি পরস্পরের কাছ থেকে ছিটকে অনেক দূরে সরে গেল।

দু'জনের সন্ত্রস্ত সচকিত চেহারা দেখতে দেখতে বুকের মধ্যে কৌতুক ফেনিয়ে উঠতে লাগল ডানিয়েলের। আচমকা হো হো করে হেসে উঠল সে।

একটু আগের সেই চোখ পাকানি আর গর্জনটা যে নিতান্তই কপটতা এবং কৌতুকেরই ছদ্মবেশ, সেটুকু বুঝতে পেরে গণেশ-রতি কিছুটা আশ্বস্ত হতে পারল। ধীরে ধীরে গণেশের মুখে মিটিমিটি একটি হাসি দেখা দিল। রতিও তার স্বভাবের মধ্যে ফিরে গেল। জিভ বার করে ডানিয়েলের উদ্দেশে ঘন ঘন ভেংচি কাটতে লাগল সে।

এর পর থেকে বিকেল হলেই রঙীন শাড়িতে, পলাশ ফুলে আর লাল পলার হারে নিজেকে মনোহরণ করে গণেশকে সঙ্গে নিয়ে হাজিরা দিতে লাগল রতি। তাদের এই আসাটা একেবারে নিয়মিত আর দৈনন্দিন হয়ে উঠল।

প্রথম দিনের সেই সঙ্কোচটা এখন আর নেই। ডানিয়েলের সামনেই আজকাল পরস্পরকে নিয়ে তারা মেতে ওঠে। দু'জনে হেসে-ঢলে কথার খৈ ফুটিয়ে বাড়িটাকে মুখর করে তোলে। উচ্ছ্বাসটা বাড়াবাড়ি রকমের হয়ে গেলে প্রথম দিনের মত চোখ পাকিয়ে গর্জন করে ডানিয়েল, 'এ্যা-ও-ও-ও' কিন্তু সেদিনের মত গণেশ বা রতি চমকে ওঠে না। ডানিয়েলের গর্জনকে তারা গ্রাহ্যই করে না। বরং সেটা কানে আসামাত্র দু'জনে প্রবল বেগে হেসে ওঠে। ডানিয়েলের চোখপাকানি আর সেই আওয়াজটা যেন একটা বিরাট কৌতুকের ব্যাপার।

গণেশ আর রতি যদি হাসতে থাকে, তার শাসন না মানে তা হলে কি আর করা যায়! প্রথমে হতাশ একটা ভঙ্গি করে ডানিয়েল। তারপর গণেশ আর রতির সঙ্গে গলা মিলিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে হেসে ওঠে।

মোট কথা তিনটি মানুষের মধ্যে বিচিত্র এক খেলা শুরু হয়েছে। ডানিয়েল এখানকার ভাষা জানে না, তবু মাত্র ইঙ্গিতটুকু সম্বল করে তাদের হৃদয়ের অন্তঃপুর পর্যন্ত বোধহয় পৌঁছুতে পেরেছে। নিবিড় গভীর এক বন্ধুত্ব ভাষার বাধা, জাতি-ধর্ম-বর্ণের বাধা, দেশাচার-কালচারের বাধা---যেখানে যত অস্বাচ্ছন্দ্য মাথা তুলে আছে সব অতিক্রম করে বেগবান স্রোতের মত তিনটি মানুষকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। ডানিয়েলের আজকাল মনে হয় হৃদয়ের রাজপথই জগতের শ্রেষ্ঠ পথ। সে পথে একবার যে পথিক যেতে পেরেছে সে বুঝি হাতের মুঠোয় জগতের পরমাশ্চর্যকে পেয়ে গেছে।

রতি আর গণেশের প্রাণে ডানিয়েলকে ঘিরে কোন তরঙ্গ ওঠে, তা পুরোপুরি বুঝে ওঠা সম্ভব নয়। তবে তাদের মুখের রেখায় ঠোটের, উচ্ছ্বলিত হাসিতে, চোখের তারায় যা ফোটে তা বোধহয় হৃদয়ের অতল থেকেই উৎসারিত। এ গ্রামের কেউ যখন তাদের ভাল চোখে দেখে না, লুকিয়ে চুরিয়ে সবার অগোচরে যখন তাদের মিলতে হয় তখন ভিন্ ভাষার ভিন্ ধর্মের এই মানুষটি তাদের দু'হাত বাড়িয়ে কাছে টেনে নিয়েছে, তাদের দুঃসাহসী প্রেমকে আশ্রয় দিয়ে অসীম মর্যাদায় মহিমান্বিত করেছে। সম্ভবত রতি-গণেশের চোখেমুখে এবং প্রাণের গভীরে যে আবেগ উদ্বেল হয়ে আছে তার অন্য নাম কৃতজ্ঞতা।

এই ভাবেই চলছিল। পশ্চিমঘাটের এই পলাতক জীবনে গণেশ-রতি এক উৎসব ডেকে এনেছে। বেগবর্ণময় এক ঘূর্ণির মাঝখানে এই ছেলেমেয়ে দুটো ডানিয়েলকে ছুঁড়ে দিয়েছে যেন।

প্রতিদিন বিকেল হলেই ডানিয়েল উন্মুখ হয়ে থাকে। কখন গণেশ-রতি আসবে, কখন আমোদে-আবেগে-হাসিতে পরিহাসে তার প্রাণকে দুলিয়ে যাবে, সে জন্য প্রতীক্ষার শেষ নেই তার।

কিন্তু এই মনোরম খেলাটার আয়ু খুব দীর্ঘ হল না। মুহূর্তের জন্য তার প্রাণকে দুলিয়ে দিয়ে রঙিন উৎসবটা বিলীন হয়ে গেল।

অন্যদিনের মত সেদিনও গণেশ-রতি এসেছে। সবেমাত্র তারা মেতে উঠতে শুরু করেছে ঠিক সেইসময় বাইরে অসংখ্য কণ্ঠের চিৎকার ভেসে এল।

প্রথমে বিভ্রান্ত বোধ করল ডানিয়েল। পরক্ষণেই ব্যাপারটা কী, বুঝবার জন্য জানালার দিকে ছুটে গেল। নিচে যে দৃশ্য চোখে পড়ল তাতে এক অজ্ঞাত শঙ্কার ছায়া সমস্ত সত্তার ওপর মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ল।

গ্রামের মেয়েপুরুষ কেউ আর বাকি নেই। সবাই এই বাড়িটার নিচে এসে ভিড় জমিয়েছে। সবার সামনে রয়েছে মধ্যবয়সী দুটো লোক। উর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত, পরনে সামান্য সংক্ষিপ্ত ময়লা ধুতি।

চোখাচোখি হতেই উত্তেজিত সুরে কি যেন তারা বলল, ডানিয়েল বুঝতে পারল না। লোক দুটো আবার কি বলল। তাদের বক্তব্য আগের মতই দুর্জ্ঞেয়। ডানিয়েল শঙ্কিত বিহ্বলতার মধ্যে দাঁড়িয়ে রইল।

লোক দুটো এবার হাতছানি দিয়ে তাকে ডাকল। তাদের উদ্দেশ্য না জেনে নিচে যাওয়া উচিত কি অনুচিত, স্থির করে উঠতে পারল না ডানিয়েল।

লোকদুটো আবার হাতের ইসারা করল। এবার তাদের চোখমুখের ভাব অত্যন্ত অসহিষ্ণু।

কিছুক্ষণ ইতস্তত করে ডানিয়েল সিদ্ধান্ত করল, নিচে যাবে। জানালার কাছ থেকে সরে দরজার দিকে যেতে যেতে চকিতের জন্য গণেশ এবং রতির দিকে তার দৃষ্টি আটকে গেল। ছেলেমেয়ে দুটো ঘরের এককোণে রক্তশূন্য পাংশু মুখে দাঁড়িয়ে আছে। এত প্রাণবন্ত তারা, এত টগবগে—কিন্তু এই মুহূর্তে জীবনের কোন লক্ষণই তাদের মধ্যে বুঝি অবশিষ্ট নেই।

একটুক্ষণ তাদের দিকে তাকিয়ে থেকে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল ডানিয়েল। সঙ্গে সঙ্গে সেই লোক দুটো ছুটে এল। চোখেমুখে তাদের প্রবল উত্তেজনা, দুর্বোধ্য ভাষায় তারা ফের কি বলল।

ডানিয়েল ইঙ্গিতে বোঝাল, তাদের কথা কিছুই বুঝছে না।

এবার লোক দুটো দাঁত খিঁচিয়ে চিৎকার করে উঠল। তাদের চেঁচানিটা সম্পূর্ণ বোধগম্য না হলেও দুটো শব্দ কানে এসে বিঁধল। শব্দ বললে ঠিক হয় না। বলা উচিত, নাম। গণেশ আর রতি।

নাম দুটো উচ্চারণ করে আঙুল দিয়ে ঘর দেখিয়ে দিলে তারা।

ব্যাপারটা এবার কিছু কিছু পরিষ্কার হচ্ছে! এই উত্তেজিত লোক দুটো সাঙ্গোপাঙ্গো সমেত ডানিয়েলের ওপর হানা দিতে আসেনি। তাদের লক্ষ্য গণেশ আর রতি। সম্ভবত ওরা এখানে আছে কিনা, সেটাই তাদের জিজ্ঞাস্য। অথবা তারা যে এখানে আছে সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে দলবল নিয়ে লোক দুটো ছুটে এসেছে এবং ছেলেমেয়ে দুটোকে বার করে দিতে বলছে।

এরা কারা? গণেশ রতির দুই বাপ কী?

সুভদ্রার সেই কথাগুলো আরেক বার মনে পড়ে গেল ডানিয়েলের। রতি-গণেশের প্রণয় তাদের মা বাবার কাছে একেবারে কাম্য নয়। সেই অবাঞ্ছিত প্রেমকে শ্বাসরুদ্ধ করার জন্যই সম্ভবত এই লোকগুলোর আবির্ভাব ঘটেছে। এখন কী করবে ডানিয়েল? সেটা স্থির করার আগেই লোক দুটো ক্রুদ্ধ স্বরে আবার চেঁচিয়ে উঠল, 'রতি-গণেশ—' বলে আবার ঘর দেখাল।

আর কোন অস্পষ্টতা নেই। রতি-গণেশকে নিয়ে যেতে এসেছে তারা। একবার এদের হাতে পড়লে ছেলেমেয়ে দুটোর ওপর নিগ্রহটা কি পরিমাণ হয়ে উঠতে

পারে, ভাবতেও সাহস হল না ডানিয়েলের। সে ঠিক করল, রতি আর গণেশের খবর জানাবে না। যেমন করে হোক এই ক্রুদ্ধ উত্তেজিত জনতার হাত থেকে তাদের রক্ষা করবে।

রক্ষা করার নৈতিক দায়িত্বও তারই। কেননা তার কথাতেই গণেশ-রতি রোজ এখানে আসে। এখানে এসে যদি তাদের বিপন্ন হতে হয় সে জন্য দায়ী কে? অবশ্যই ডানিয়েল নিজে।

কিন্তু ডানিয়েল কিছু বুঝবার বা করার আগেই সেই লোক দুটো এবং তাদের পিছু পিছু সেই দলবদ্ধ জনতা হুড়মুড় করে সিঁড়ি বেয়ে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ল। মুহূর্তের মধ্যে গণেশ আর রতিকে নিয়ে বেরিয়ে এল।

গণেশ-রতি যাবে না। রাস্তার মাঝখানে তারা শুয়ে পড়েছে।

কিন্তু সেই লোক দুটো এবং তাদের সঙ্গীরা নাছোড়। তারা গলা ফাটিয়ে সমস্বরে চেঁচাচ্ছে এবং চেঁচাতে চেঁচাতে হিড় হিড় করে ছেলেমেয়ে দুটোর পা ধরে কর্কশ পাথুরে পথের ওপর দিয়ে টেনে নিয়ে চলল। গণেশ আর রতি ভয়ে অথবা শারীরিক যন্ত্রণায় অসহ্য চিৎকার করতে লাগল। স্তম্ভিত বিমূঢ় ডানিয়েল চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে রইল, এগিয়ে গিয়ে যে লোকগুলোকে বাধা দেবে তেমন শক্তিটুকুও যেন তার মধ্যে অবশিষ্ট নেই।

দেখতে দেখতে পথের দূর বাঁকে গণেশ-রতিকে নিয়ে জনতা অদৃশ্য হয়ে গেল।

লোকগুলো কতক্ষণ চলে গেছে, খেয়াল নেই। যখন তারা এসেছিল তখন দিনটা সবেমাত্র বিকেলের দেউড়িতে এসে পৌঁছেছে। আর এখন সন্ধ্যার ধূসর ছায়ায় চারিদিক দ্রুত বিলীন হয়ে যাচ্ছে।

বাড়ির বাইরে সিঁড়ির ঠিক তলায় দাঁড়িয়ে এখনও পথের সুদূর বাঁকে তাকিয়ে আছে ডানিয়েল। অনেকক্ষণ আগে গণেশ-রতিকে নিয়ে লোকগুলো ঐখানে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল।

দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে একসময় মাথার ওপর দিয়ে এক ঝাঁক 'স্নাইপ' উড়ে গেল। তাদের চিৎকারে হঠাৎ স্নায়ুতে ঝাঁকানি লাগল ডানিয়েলের, অস্তিত্বের মধ্য থেকে চিত্রার্পিত স্তব্ধতা কেটে গেল। চারিদিকে তাকিয়ে সে দেখল, কখন যেন তার অজ্ঞাতসারে অন্ধকার নামতে শুরু করেছে।

আর দাঁড়াল না ডানিয়েল। ভারাক্রান্ত মনে ক্লান্ত পায়ে সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে নিজের আশ্রয়ে আবার গিয়ে ঢুকল।

দেখতে দেখতে সন্ধ্যা পেরিয়ে রাতের আয়ু এক প্রহর হয়ে গেল। বাড়ির সামনের ঝাঁকড়া-মাথা বিশাল পিপুল গাছটার মাথায় নাম-না-জানা পাখিরা সারাদিনের

ক্লান্তি গায়ে মেখে অনেক আগেই ফিরে এসেছে। তাদের ডানা ঝাপটানির শব্দ শোনা যাচ্ছে। শ্রান্ত স্বরে ফিসফিসিয়ে কি যেন বলাবলি করছে তারা। হয়ত পুরুষ-পাখিরা মেয়ে-পাখিদের সোহাগ জানাচ্ছে অথবা সঙ্গোপন কোন খুনসুড়িতে মেতে উঠেছে। কিংবা এ-ও হতে পারে সবাই মিলে কোন গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।

আরব সাগরের ঢেউ ছুঁয়ে ছুঁয়ে যে উদ্দাম উত্তুরে বাতাস অন্য দিন এসে পশ্চিমঘাটের এই গ্রামটাকে ঝালাপালা করে যায় আজ তার চিহ্নমাত্র নেই। এই বাড়িটা, তার চারপাশ—সব কিছুই স্তব্ধ, নিস্পন্দ। পশ্চিমঘাটের এই প্রান্তটা দম বন্ধ করে আছে যেন।

চুপচাপ নিজের বিছানায় বসে ছিল ডানিয়েল। কিছুই ভাল লাগছে না তার। খেলাচ্ছলে গণেশ-রতিকে প্রতিদিন এখানে ডেকে এনে হয়ত নিদারুণ ক্ষতিই করে ফেলেছে তাদের। ক্ষতির পরিমাণ কতখানি তা বুঝবার উপায় নেই। আর নেই বলেই নিজের ওপর ক্রমশ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে ডানিয়েল।

অন্য দিন সন্ধ্যা হলেই এ ঘরে আলো জ্বালিয়ে গণেশকে নিয়ে রতি চলে যায়। তারপর রাতের একটা প্রহর পার হলে ডানিয়েলের খাবার নিয়ে আরেক বার আসে। এই সময়টা গণেশ অবশ্য তার সঙ্গে থাকে না। একাই আসে রতি।

ঘরের এক কোণে লণ্ঠনটা রয়েছে। ইচ্ছা করলে একটা দেশলাইও পশ্চিম দিকের দেওয়ালের কুলুঙ্গি থেকে পাওয়া যেতে পারে। অতএব আলোটা জ্বালিয়ে নেওয়া এমন কিছু অসাধ্য ব্যাপার নয়। কিন্তু নিজের মধ্যে তেমন কোন উদ্যম খুঁজে পেল না ডানিয়েল। অন্ধকারে জড়স্তূপের মত বসে রইল সে।

আরো কতটা সময় কেটে গেল, ডানিয়েল মনে করতে পারে না। হঠাৎ তার চোখে পড়ল, সিঁড়ির মুখে দীর্ঘ ঘনতর খানিকটা অন্ধকার মাটি ফুঁড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ডানিয়েল চমকে উঠল। ভীত অস্বাভাবিক গলায় চেঁচিয়ে উঠল 'হু—হু'জ দেয়ার—'

দীর্ঘ গাঢ় অন্ধকারটা ঈষৎ নড়ে উঠল। তারপর মানুষের গলায় দুর্বোধ্য ভাষায় কিছু বলল।

ডানিয়েল শুনছে ইণ্ডিয়ার পথে-ঘাটে বনে-বাদাড়ে ভূত প্রেত নাকি কিলবিল করে বেড়ায়। 'স্পিরিট' সম্পর্কে অলৌকিক বিশ্বাস এ দেশকে গ্রাস করে রেখেছে। ডানিয়েলের নিজের অবশ্য এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র দুর্বলতা নেই। তবু সিঁড়ির মুখে চোখ রেখে বিছানা থেকে আস্তে আস্তে উঠে পড়ল সে এবং দ্রুত হাত চালিয়ে লণ্ঠন আর দেশলাইটা বার করে আলো জ্বেলে ফেলল।

এবার বোঝা গেল ভৌতিক কোন ব্যাপার নয়। সিঁড়ির কাছে একটা অর্ধউলঙ্গ কালো লোক এনামেলের থালা হাতে দাঁড়িয়ে আছে।

হাত নেড়ে লোকটাকে কাছে ডাকল ডানিয়েল। সে এলে চোখের ইঙ্গিতে প্রশ্ন করল, কী ব্যাপার? কী জন্যে আমার কাছে এসেছ?

লোকটা মেঝেতে থালা নামিয়ে দেখাল রাতের খাবার নিয়ে এসেছে।

মুহূর্তে সব পরিষ্কার হয়ে গেল। আজ আর রতি আসবে না। তার বদলে এই লোকটা এসেছে।

ডানিয়েল বলল, 'রতি—' তারপর চোখের ইঙ্গিত করল। অর্থাৎ সে কোথায়?

লোকটা জোরে জোরে মাথা নাড়ল। কী সে বোঝাতে চাইল, বোঝা গেল না।

ডানিয়েল এবার বলল, 'গণেশ—' তার মুখচোখে একটি অনুচ্চারিত প্রশ্ন রয়েছে। প্রশ্নটা এইরকম, অনেকগুলো লোক তাকে এবং রতিকে টানতে টানতে গ্রামে নিয়ে গেছে। এখন তাদের অবস্থা কী?

নিঃশব্দে আগের মতই মাথা নাড়ল লোকটা।

নাঃ, আর কিছু জিজ্ঞেস করা বৃথা। কোন উত্তরই লোকটার কাছ থেকে মিলবে না। রতি আর গণেশের গোপন মিলনের পরিণাম কী হয়েছে, জানতে না পেরে অসীম উৎকণ্ঠায় অস্থির হয়ে রইল ডানিয়েল। শঙ্কিত হয়ে থাকা ছাড়া আর কিছু করারও নেই। হঠাৎ নিজেকে অত্যন্ত বিষাদগ্রস্ত মনে হতে লাগল তার।

গণেশ এবং রতি সম্বন্ধে কিছু জানা সম্ভব হচ্ছে না। ডানিয়েলের সব ইঙ্গিত সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসছে।

লোকটা আবার মুখের কাছে হাত এনে খাওয়ার মুদ্রা দেখাল। অর্থাৎ ডানিয়েল খাওয়ার পালাটা চুকিয়ে দিলে সে কৃতার্থ হয়, বাসন-কোসন নিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে পারে।

অগত্যা কি আর করা, নিতান্ত অনিচ্ছায় খেতে বসল ডানিয়েল।

পোড়া পোড়া আটার রুটি, এক টুকরো পেঁয়াজ, একটা কাঁচা-লঙ্কা, এক বাটি হড়হড়ে আমতি (টকের ডাল) আর আলু উচ্ছে ভাজি—অসুখের পর ইদানীং প্রতিদিন রাত্রে এই সব খেতে দেওয়া হচ্ছে।

অন্য দিন এই পোড়া রুটি, টকের ডাল বা পেঁয়াজের টুকরো দিয়ে কখন যে পরম তৃপ্তির সঙ্গে খাওয়ার পর্ব মিটে যেত, নিজেরই খেয়াল থাকত না ডানিয়েলের। সেটা অকারণে নয়। খাবার সময় রতির সঙ্গে ঠাট্টায় পরিহাসে হাসিতে এমনভাবে সে মেতে থাকত যে বিশ্বভুবন একেবারে ভুলে যেত। কী খাচ্ছে আর কী খাচ্ছে না সে সব সম্বন্ধে তার হুঁশ থাকত না। মোট কথা রতির সঙ্গ এমনই আনন্দদায়ক যা বিস্বাদ খাবারে কখন যেন তার অজান্তে স্বাদুতার ছোঁয়া লাগিয়ে দিত। মেয়েটার স্বভাবের কোথায় যেন বিচিত্র খানিকটা সম্মোহন রয়েছে, ডানিয়েলকে তা কুহকিত করে রাখত।

আজ কিন্তু পোড়া রুটির টুকরোগুলো যতখানি কুস্বাদ তার চাইতে হাজার গুণ খারাপ মনে হল। গলার দেউড়ি পেরিয়ে কিছুতেই সেগুলো আর নিচের দিকে নামতে চাইছে না। গলনলীর মধ্যেই ক্রমাগত কুণ্ডলী পাকাচ্ছে।

কোনোরকমে দু'-চার টুকরো রুটি খেয়েই উঠে পড়ল ডানিয়েল। লোকটাও এই সুযোগের জন্য যেন মুখিয়েই ছিল, ছোঁ মেরে বাসন কোসন তুলে নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেল।

লোকটা চলে যাবার পর অনেকটা সময় কেটে গেছে। পায়ে পায়ে অন্যমনস্কের মত একসময় বাইরের দিকের জানালাটার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে ডানিয়েল।

আজও কুয়াশা পড়েছে তবে অন্য দিনের মত গাঢ় নয়, ফিনফিনে সিল্কের মত স্বচ্ছ এক মায়াবরণ চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। পশ্চিমঘাটের এই উপত্যকাটা সর্বাঙ্গে এক উলঙ্গবাহার শাড়ি জড়িয়ে নিয়েছে বুঝি। কুয়াশার ওপারে আজ কিছুই অস্পষ্ট নয়। আকাশময় ছড়ানো অসংখ্য তারা দিগন্তে বাঁকানো চাঁদের মনোহরণ একটি রেখা, বহুদূরে ছায়াপথ—সমস্ত কিছুই দেখা যাচ্ছে। পশ্চিম আকাশের ঢাল বেয়ে মীনপুচ্ছ এক উল্কা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গিয়ে আগুনের ফুল হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। দেখতে দেখতে সেই ফুলগুলো একরাশ ছাইয়ের মধ্যে বিলীন হয়ে গেল।

ডানিয়েল কিন্তু চারপাশে সাজানো পশ্চিমঘাটের মোহময় নিসর্গ দেখছে না। কিংবা দেখলেও তার চেতনায় এ-সব একেবারেই রেখাপাত করতে পারছে না। আজ তার সমস্ত সত্তাকে আচ্ছন্ন করে রয়েছে গণেশ আর রতি।

গণেশ আর রতি—কালো দেবদূত আর দেবদূতী। তার কাছ থেকে ছিনিয়ে গ্রামের লোকেরা তাদের নিয়ে কতখানি নির্যাতন করেছে, সে খবর কে দেবে?

আচমকা একটি ভাবনা ডানিয়েলের সমস্ত অস্তিত্বের মধ্য দিয়ে দুরন্তবেগে বয়ে গেল। সে যদি এখানকার ভাষা বুঝত ঐ লোকটির কাছে জিজ্ঞেস করে অনায়াসেই গণেশ-রতির খবর জানতে পারত। ঐ লোকটাই বা কেন, যারা গণেশ-রতিকে রাস্তার ওপর দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে গেছে তাদের কাছ থেকেই সমস্ত ব্যাপারটা জেনে নেওয়া যেত।

ডানিয়েল স্থির করল, এখানকার বাসিন্দাদের ভাষা শিখবে। পরমুহূর্তে একটা সমস্যা তাকে কিঞ্চিৎ চিন্তিত করে তুলল। শিখবে তো, কিন্তু কিভাবে?

একটু ভাবতেই সমস্যাটার সন্তোষজনক সমাধান পেয়ে গেল ডানিয়েল। একজনের কাছ থেকেই ভাষাটা শেখা যেতে পারে। সে সুভদ্রা—সুভদ্রা যোসেফ।

কিন্তু ক'দিন হল সুভদ্রা এ গ্রামে আসছে না। রতির হাতে তার ভার সঁপে দিয়ে সেই যে চলে গেছে, এখনও ফেরার নাম নেই! ডানিয়েল মনে মনে ভাবল, দু'-একদিনের মধ্যে সুভদ্রা যদি না আসে সে নিজেই তার সন্ধানে গীর্জায় গিয়ে হানা দেবে। যে-ভাবেই হোক যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই অর্ধউলঙ্গ কালো কালো মানুষগুলোব ভাষা তাকে শিখতেই হবে।

ভোরবেলা সমুদ্রগামী এক ঝাঁক সিন্ধুশকুনের চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙে গেল ডানিয়েলের। চোখ মেলে সে দেখল এখনও রোদ ওঠে নি। জানালার বাইরে পশ্চিমঘাটের চড়াই-উতরাই আর আকাশ কুয়াশায় ঢেকে আছে। কাল রাতে যে

কুয়াশা সিল্কের মত স্বচ্ছ, ফিনফিনে ছিল কখন যে তা গাঢ় হয়েছে, গভীর হয়েছে, জমাট বেঁধেছে—কে জানে।

কিছুক্ষণ জানালার বাইরে কুয়াশাবিলীন দিগন্তের দিকে তাকিয়ে রইল ডানিয়েল। তারপর চোখ দুটি দরজার কাছে ফিরিয়ে আনল।

কাল রাতে রতি আসে নি। ডানিয়েলের উদগ্রীব সত্তা যেন ফিসফিসিয়ে বলতে লাগল আজ মেয়েটা আসবে, নিশ্চয়ই আসবে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে উন্মুখভাবে সে প্রতীক্ষা করতে লাগল।

ভোরটা একসময় পার হয়ে গেল। গাঢ় কুয়াশার যে দেওয়াল জানালার বাইরে মাথা তুলে ছিল তার অলক্ষ্য ছিদ্রপথে দেখতে দেখতে কে যেন একটা দুটো করে সোনার তীর ছুঁড়তে লাগল। দেওয়ালটা খুব বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। চারিদিক ধসে গিয়ে সোনার ঢল নেমে গেল।

পশ্চিমঘাটের এই উপত্যকায় রোদ এসে পড়েছে। বাধাবন্ধহীন অজস্র অপর্যাপ্ত রোদ। আর সেই রোদই নিঃশব্দে এখানকার যতই চড়াই-উতরাইয়ের কানে কানে খবর পৌঁছে দিল, বেলা হয়ে গেছে।

বেলা যত চড়তে লাগল ডানিয়েলের হৃৎপিণ্ডের উত্থান-পতন জলদ্ বাজনার মত ততই দ্রুত হয়ে উঠতে লাগল। রতি আসবে, এখনই এসে পড়বে।

কিন্তু তার সমস্ত প্রত্যাশা আর প্রতীক্ষা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে গেল। রতি এল না। কালকের সেই লোকটাই এনামেলের বাসনে খাবার নিয়ে মাটি ফুঁড়ে আবার দেখা দিল। মুহূর্তে সারা অস্তিত্ব বিস্বাদ হয়ে গেল ডানিয়েলের। খিদে, তৃষ্ণা—সব কিছুর বোধ একেবারে লুপ্ত হয়ে গেল যেন। এত বেলা হয়েছে কিন্তু বিছানা ছেড়ে ওঠার ইচ্ছাটুকুও আর অবশিষ্ট নেই। হাত-পা-কোমর-আঙুল, সমস্ত শরীরটাই নিষ্ক্রিয় আড়ষ্ট বোধশূন্য মনে হতে লাগল।

লোকটা পায়ে পায়ে কাছে এগিয়ে এল।

নিদারুণ অনিচ্ছাসত্ত্বেও হাতের ওপর ভর দিয়ে আস্তে আস্তে বিছানায় উঠে বসল ডানিয়েল। লোকটা ইসারায় খাবার কথা বলল। ডানিয়েল হাত নেড়ে জানাল, খাবে না।

লোকটা স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে ভুরু দুটো ওপর দিকে তুলল। সত্যিই ডানিয়েল খাবে কিনা, তা যেন ভাল করে যাচাই করে নিতে চায়।

ডানিয়েল হাত নেড়ে আবার জানাল, খাবে না।

এবার লোকটা উৎসাহিত হয়ে উঠল। কালো মুখটায় হাসির বান ডাকল তার। হাসতে গিয়ে মুখটা অনেকখানি হাঁ হয়ে গিয়েছিল। দেখা গেল, দু' পাটিতে অন্তত গোটা সাতেক দাঁত নেই। অতিরিক্ত খুশিতে ছোট গোলাকার চোখ দুটো জ্বলতে লাগল তার।

বেশি দেরি করা প্রয়োজন বোধ করল না লোকটা। মেজেতে উবু হয়ে বসে ক্ষিপ্র হাত চালিয়ে থালায় যা যা ছিল গোগ্রাসে তার সদগতি করতে লাগল।

ডানিয়েল খাবে না, এটাই লোকটার অনুপ্রাণিত হবার পক্ষে যথেষ্ট। খুব সম্ভব ডানিয়েলের জন্য সে যা এনেছিল তা ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া নিরর্থক মনে করেছে সে।

নিমেষে থালাটা ফাঁকা করে উঠে পড়ল লোকটা। ডানিয়েলের দিকে তাকিয়ে একবার হাসল। হাসিটা উচ্ছ্বসিত কৃতজ্ঞতাব। ডানিয়েল না খাওয়ায় তার ভোজের যে সুবিধেটুকু হল হাসিটায় তারই অনুমোদন রয়েছে।

হাসিটুকু বিতরণ করে দাঁড়াল না লোকটা। থালা নিয়ে চলে গেল।

লোকটা চলে যাবার পর আরো কিছুক্ষণ বসে রইল ডানিয়েল। ইতিমধ্যে বেলা আরো বেড়ে গেছে। রোদ আরো প্রখর আরো ধারাল হয়ে উঠেছে।

বেলার চেহারা দেখতে দেখতে ডানিয়েলের মনে হল, ঘরের বাইরেটা অকুণ্ঠ হাতছানিতে তাকে ডাক দিয়ে যাচ্ছে।

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল ডানিয়েল। বাইরে এই অনাত্মীয় অচেনা গ্রামে যাবে কি যাবে না, একবার ভাবল। পরমুহূর্তেই স্থির করে ফেলল, যাবে। ক'দিন ধরে এই ঘরখানায় একরকম নির্বাসিত হয়ে আছে সে। আজ এই বন্দীত্ব আর ভাল লাগছে না। তা ছাড়া গ্রামে গিয়ে রতি-গণেশের খোঁজ নেওয়াটাও দরকার।

বালিশের তলা থেকে মানিব্যাগ আর রিস্টওয়াচটা বার করল ডানিয়েল। ব্যাগটা প্যান্টের পকেটে রেখে ঘড়িটা হাতে বাঁধতে গিয়ে হঠাৎ তার খেয়াল হল, এ ক'দিন ওটাতে দম দেওয়া হয় নি। কাজেই অনিবার্য নিয়মে সেটা বন্ধ হয়ে আছে।

সময় মিলিয়ে ঘড়িটাকে আবার সচল করা দরকার। সময় তো মেলাবে, কিন্তু কিভাবে? এখন ক'টা বেজে কত মিনিট কত সেকেণ্ড হয়েছে কি করে তা জানা সম্ভব? আর যা-ই হোক বেলার বয়স দেখে তা অনুমান করা ডানিয়েলের পক্ষে দুঃসাধ্য।

ভাবনারই কথা। একটু ইতস্তত করে অচল ঘড়িটাই হাতে বেঁধে ফেলল ডানিয়েল। আপাতত গ্রামেই চলেছে সে। ওখানে গিয়ে কোনো একটা ঘড়ি দেখে সময় ঠিক করে নিলেই চলবে।

ডানিয়েল আর দাঁড়াল না। লম্বা লম্বা পা ফেলে বাড়ির সামনে সেই আঁকাবাঁকা কর্কশ পথে নেমে গেল।

অসুস্থতার জন্য মাত্র কয়েকটা দিন এই ঘরে বন্দী হয়ে ছিল সে। তবু বাইরে পা দিয়ে মনে হল, একটা মাস না কি একটা বছর অথবা পুরোপুরি একটা যুগ পার করেই আজ মুক্তি পেয়েছে।

ঘরের ভেতর থেকে যেমন মনে হয়েছিল, বাইরে এসে টের পাওয়া গেল রোদটা তার চাইতে আরো অনেক গুণ তীব্র। এ ক'দিন জানালার ফ্রেমে আঁটা একটুকরো চৌকা আকাশ দেখেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল। আজ মাথার ওপর দিগন্তবিসারী অনাবরণ আকাশকে পাওয়া গেল।

পথের দু'পাশে সারিবদ্ধ গাছগুলো লাল ফুলে ছেয়ে আছে। ওগুলোর কী নাম, ডানিয়েল জানে না। তবে ফুলগুলোর লালে এত উগ্রতা যে গাছের ডালে কেউ

যেন থোকায় থোকায় আগুন জ্বালিয়ে রেখেছে মনে হয়। অথবা নিষ্করুণ কতকগুলো আগুনের পতাকা মাথার ওপর তুলে ধরে গাছগুলো নিশ্চল দাঁড়িয়ে রয়েছে।

গোটা চারেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে আধা-সমতল বিস্তৃত এক প্রান্তর পাওয়া গেল। এটা গ্রামের দক্ষিণ প্রান্ত, জায়গাটা একেবারে নির্জন। তবে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অসংখ্য জাল এখানে শুকোতে দেওয়া হয়েছে। সুভদ্রা যোসেফ আগেই জানিয়ে দিয়েছিল, এটা জেলে আর মুক্তোচাষীদের গ্রাম।

জালগুলো থেকে আঁশটে গন্ধ উঠে আসছে। সেই গন্ধ অগুণতি ছোট ছোট পাখিকে টেনে এনেছে। বোকা পাখিগুলো ছোঁ মারতে গিয়েই টের পেয়ে যাচ্ছে কতখানি প্রতারিত তারা হয়েছে। নাঃ, জেলেরা জালের ছোট বড় ফাঁসগুলোর ভেতর তাদের জন্য একটা আঁশও রেখে যায় নি।

ছেলেবেলায় মা-বাবার সঙ্গে একবার ডোভারে বেড়াতে গিয়েছিল ডানিয়েল। বেড়াতে বেড়াতে জেলেদের একটা গ্রামে গিয়েছিল তারা। সেখানেও এমন জাল দেখেছে সে, এমনই গন্ধ নাকে এসে লেগেছিল। পশ্চিমঘাটের এই গ্রাম তার দৃশ্য এবং গন্ধ দিয়ে ছেলেবেলার সেই স্মৃতিকে দুলিয়ে দিয়ে গেল।

যাই হোক প্রান্তরটা কোনাকুনি পাড়ি দিয়ে অবশেষে গ্রামে এসে পড়ল ডানিয়েল।

গ্রামের একেবারে মুখে যে বাড়িটা পাওয়া গেল তার সামনে দড়ির খাটিয়ায় দুটো বুড়ো বসে বসে সমানে কাশছিল আর চুট্টা ফুঁকছিল। ডানিয়েল তাদের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। বুড়ো দুটো তাকে দেখে যুগপৎ কাশি থামিয়ে এবং চুট্টা ফোঁকা স্থগিত রেখে ভীত সন্দিগ্ধ চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

ডানিয়েল স্নিগ্ধ একটু হাসল, ইঙ্গিতে বোঝাল তাকে দেখে ভয় পাবার কোন হেতু নেই।

হাসির চেহারা দেখে বুড়ো দুটো কি আন্দাজ করে নিল। ধীরে ধীরে তাদের মুখ থেকে উৎকণ্ঠা আর সন্দেহ কেটে যেতে লাগল। তার বদলে দেখা দিল সরল শব্দহীন অকপট হাসি। হাতের ইঙ্গিতে তারা ডানিয়েলকে খাটিয়ার ওপর বসতে বলল।

ডানিয়েল বসলে বুড়োদের একজন টিনের ছোট একটা বাক্স খুলে প্রকাণ্ড এক চুট্টা বার করে তার সামনে ধরল।

বীয়ার বাদ দিলে জীবনে আর কোন নেশা নেই ডানিয়েলের। না খেয়েছে সে জিন, না ভারমুখ, না দিয়েছে ফেনিল রামের পাত্রে চুমুক। কোনোদিন চুরুটে একটা টান দিয়েছে কিনা, সে মনে করতে পারে না। সিগারেট থেকে সহস্র মাইল দূর দিয়েই সে হেঁটেছে; বলা যায়, নেশাহীনতার দুর্গে তার চরিত্রটি ছিল একেবারে সুরক্ষিত। বীয়ারও যে ডানিয়েল খায় সেটা নেশার জন্য নয়, প্রয়োজনে। গ্রেট বৃটেনের শীতে শরীরের রক্ত যখন বরফের মত জমাট বেঁধে যায় তখন বীয়ারের উত্তাপ দিয়ে তার শীতলতা কিছু কমিয়ে না নিলে বাঁচাই কঠিন।

বুকের সামনে চুট্টাটা ধরা রয়েছে। সেটা দেখতে দেখতে শঙ্কিত হয়ে উঠল ডানিয়েল। চুট্টার ধোঁয়ার যে কী স্বাদ, কী গন্ধ তার কিঞ্চিৎ পরিচয় কোলাপুরের ট্রেনেই পেয়ে এসেছে সে। ভাবতে গিয়ে মাথার ভেতরটা পাক খেয়ে গেল যেন।

খানিকটা ইতস্তত করল ডানিয়েল। চুট্টাটা নেবে কি নেবে না, সে সম্বন্ধে কিছুতেই মনঃস্থির করে উঠতে পারছে না।

এদিকে বুড়োটার মুখের হাসি ক্রমশ মোহিনী হয়ে উঠতে শুরু করেছে। মাথা নেড়ে চুট্টাটা ধরার জন্য সে ডানিয়েলকে উৎসাহিত করতে লাগল।

কতকটা অনিচ্ছা এবং শঙ্কার মধ্যে হাত বাড়িয়ে চুট্টাটা ধরল ডানিয়েল। মনে মনে সে একটা মতলব ঠিক করে ফেলেছে। আপাতত চুট্টাটা পকেটে রেখে দেবে, পরে সুবিধামত ফেলে দিলেই চলবে।

কিন্তু কে জানত চুট্টাটা হাত পেতে নিলেই হবে না। বুড়ো দুটো অনুপ্রেরণা দিয়ে সেটা তার মুখেও তোলাল এবং সেটা ধরিয়ে দিয়ে এমন এক ভঙ্গি করল যাতে মনে হয় স্বর্গের সুধাই বুঝি তার ঠোঁটের কাছে তুলে ধরেছে।

অগত্যা কি আর করা! চোখকান বুজে কষে এক টান লাগাল ডানিয়েল। সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কের ভেতরে আগুনের চাকা ঘুরে গেল যেন। মুখটা উগ্র কটু ধোঁয়ায় ভরে গেছে।

মুখ থেকে ধোঁয়া বার করে ধাতস্থ হতে সময় লাগল ডানিয়েলের। এদিকে বুড়ো দুটো সমানে হাসছে। তাদের কথামত ডানিয়েল চুট্টা ফুঁকেছে, সম্ভবত সেজন্য তারা খুব খুশি। তাদের নিদাঁত ফোকলা মুখের হাসিতে বন্ধুত্বটা পাকা হয়ে গেছে।

কিন্তু একটি টান দিয়েই ঘেমে গেছে ডানিয়েল। মাথাটা যেভাবে ঘুরছে তাতে দ্বিতীয় আরেকটি টান দেবার মত দুঃসাহস সে আর সঞ্চয় করে উঠতে পারল না। পরম বিতৃষ্ণায় হাতের চুট্টাটা দূরে ছুঁড়ে দিল ডানিয়েল।

বুড়ো দুটোর হাসি থমকে গেল। দু'-জনেই ভুরু তুলে প্রশ্ন করল, ব্যাপারখানা কী? চুট্টার মত স্বর্গীয় এমন একটা নেশা বিদেশীটার কি ভাল লাগছে না? তারা স্তম্ভিত এবং মর্মাহত হল।

ঠোঁট উলটে ডানিয়েল জানাল, চুট্টার ধোঁয়া হজম করা তার সাধ্যাতীত।

বুড়ো দুটো ডানিয়েলের ইঙ্গিত বুঝল। মৃদু হাসল তারা। একজন উঠে গিয়ে ডানিয়েলের সেই চুট্টাটা খুঁজে পেয়ে নিয়ে এল এবং আয়েশ করে টানতে লাগল। টানতে টানতে মিটমিটিয়ে ডানিয়েলের দিকে তাকাতে লাগল সে। ভাবখানা এই, কী বস্তু থেকে তুমি বঞ্চিত হলে তা বুঝবার মত বুদ্ধি এখনও তোমার হয়নি অর্বাচীন।

একটু চুপচাপ। তারপর রিস্ট-ওয়াচটার কথা মনে পড়ল ডানিয়েলের। ঘড়িটা বুড়োদের দেখিয়ে ডানিয়েল অতি কষ্টে বোঝাল, এটা বন্ধ হয়ে গেছে। এ গ্রামে কারো ঘড়ি আছে কি? তা হলে তার সঙ্গে সময় মিলিয়ে ওটা সচল করে নেবে।

বুড়োদুটো ইসারায় জানিয়ে দিল এ গ্রামে কারো ঘড়ি নেই। ঘড়ির কাঁটায় জীবনকে বাঁধতে হলে যেখানে পৌঁছুতে হয়, এখনও ততদূর এগিয়ে আসতে পারে নি তারা। নিজেদের প্রয়োজনে নিরবধি সময়কে এখনও তারা সূক্ষ্ম মাপকাঠি দিয়ে ভাগযোগ করে নিতে শেখে নি।

মুশকিলেরই কথা। ঘড়িটা মেলানো যাবে না। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত এই সময়টুকু পাড়ি দেবার পথে কখন ক'টা বাজল, সূর্যটা বিপুল আকাশের কোন ফটকে

কখন কোন ঘণ্টায় দাঁড়ায় ডানিয়েল জানে না। অথবা রাতের কোন যামে ক'টার সময় শিয়ালেরা সমস্বরে বিলাপ শুরু করে দেয় তাই বা কে বলবে। মোট কথা সূর্য দেখে অথবা শিয়ালের ডাক শুনে ঘণ্টা-মিনিট-সেকেণ্ড নির্ণীয় করা তার পক্ষে দুঃসাধ্য।

ডানিয়েলের মনে হল, অনেক—অনেক দূরে কল্লোলিত ফেনায়িত মুখর জীবনস্রোত থেকে ছিটকে সময়ের হিসেবহীন এক স্তব্ধ বেগশূন্য পৃথিবীতে এসে পড়েছে।

আবার কিছুক্ষণ নীরবতা। এদিকে সূর্যটা আকাশের মাঝখানে প্রায় পৌঁছে গেছে। সেদিকে একবার তাকিয়ে ডানিয়েল উঠে পড়ল। বিশেষ করে যে উদ্দেশ্যে তার এ গ্রামে আসা এবার তার সন্ধানে বেরিয়ে পড়া দরকার। রতি আর গণেশের নাম দুটো উচ্চারণ করে চোখের ইঙ্গিতে তাদের বাড়ি কোন দিকে জিজ্ঞেস করল ডানিয়েল। বুড়ো দুটো কিছুটা চকিত হল। নিজেদের মধ্যে ফিস ফিস করে কি যেন খানিক পরামর্শ করে গ্রামের দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিল। অর্থাৎ রতি-গণেশ ওদিকেই থাকে।

ডানিয়েল আর দাঁড়াল না। লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গেল।

গ্রামের ভেতর আসতেই একদল কালো কালো ছেলে তার পেছন পেছন চলতে লাগল। তারা বিপুল উৎসাহে চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছে। সেই চিৎকারের মধ্যে থেকে একটি মাত্র শব্দই উদ্ধার করতে পারল ডানিয়েল। সেটা হল 'সাহেব'।

চিৎকারের সবটুকু না বুঝলেও তার সারার্থ বুঝতে ডানিয়েলের অসুবিধা হয় না। তাকে দেখে ছেলেগুলো খুশি হয়েছে।

ডানিয়েলও খুশি। মাঝে মাঝে ফিরে দাঁড়িয়ে তার পেছন পেছন যে জনতা আসছিল তাদের কারো গাল টিপে, কারো হাত ধরে একটা ঝাঁকানি দিয়ে, কাউকে ব. মাথার ওপর তুলে শূন্যে একবার পাক খাইয়ে বন্ধুত্বটা গাঢ় করে নিচ্ছে।

ডানিয়েলের এই গলা টেপা, ঝাঁকানি, পাক খাওয়ানো—ছেলেদের মাতিয়ে তুলছে। তারা উল্লসিত হয়ে উঠছে। ফলে হৈচৈটা আরো বেড়ে যাচ্ছে।

চলতে চলতে দু' পাশে ছড়ানো বাড়িগুলোর দিকে মাঝে মাঝে তাকিয়ে নিচ্ছে ডানিয়েল। প্রথম যখন সে এ গ্রামে পা দেয় সেই সময়টা ছিল সন্ধ্যা। কুয়াশায় আর অন্ধকারে পশ্চিমঘাটের এই জনপদ সেদিন পুরোপুরি স্পষ্ট ছিল না। তবে একটা দৃশ্য পরিষ্কার মনে আছে, তাকে দেখবার জন্য সমস্ত বাড়ির দরজা-জানালায় মেয়ে-পুরুষ আর শিশুরা ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল।

আজও সেই একই দৃশ্য। সে গ্রামে পা দেওয়া মাত্র চারদিকে সাড়া পড়ে গেছে। রান্নাবান্না, ঘর-গৃহস্থালির কাজ ফেলে সবাই হুড়মুড় করে আজ রাস্তায় ছুটে এসেছে। তাদের এই উপত্যকায় ডানিয়েল নামে এক পলাতক আগন্তুককে প্রথম দিনের মতই অপার বিস্ময় নিয়ে দেখছে। নাঃ, এ গ্রামের বাসিন্দাদের তার সম্পর্কে চমকটা এখনও কাটেনি দেখা যাচ্ছে।

আজ আর সেদিনের মত সন্ধ্যার অস্পষ্টতা নেই। মধ্যাকাশের সূর্য মাথায় নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ইণ্ডিয়ার এই অখ্যাত অজ্ঞাত গ্রামটা দেখতে লাগল ডানিয়েল। গ্রামটার কোথাও যেন কোন গোপনতা নেই। নিজের সমস্ত কিছু চারিদিকে উন্মুক্ত করে রেখেছে সে। জীবনযাত্রার প্রদর্শনী থেকে গ্রামের চরিত্র যেন অনেকখানিই বুঝতে পারা যায়।

কোথাও গরু চরছে, কোথাও একদল মোষ। বাড়ির সামনে কেউ ছেঁড়া 'ময়লা' বিবর্ণ কাঁথা শুকোতে দিয়েছে, কেউ শুকোতে দিয়েছে ধান আর কলাই, এক ঝাঁক চড়াই খুঁটে খুঁটে তাতে ভাগ বসাচ্ছে। কোথাও বাঁশের ফ্রেমে ভিজে কাপড় শুকোতে দেওয়া হয়েছে। কোনো ঘরে মাটির বড় বড় কলসী জলে পরিপূর্ণ হয়ে আছে, কোথাও দেখা গেল একপাল গৃহপালিত বেড়ালকে, পায়ে পায়ে ফেরা অনেকগুলো কুকুরও চোখে পড়ল। প্রতিটি বাড়ির সামনে 'কিচেন গার্ডেনে'র অনুকরণে কিছু কিছু শাক-সব্জির খেত।

এখানে জীবনের কোন বেগ নেই, স্রোত নেই, তরঙ্গ নেই। জীবন এখানে স্তিমিত, নিঃস্তরঙ্গ, নিঃস্রোত। সুদূর অতীতে পৃথিবী যেদিন শুধুমাত্র ভূমিনির্ভর, সেই কৃষিজীবী পশুপালন গোচারণের যুগ থেকে আধুনিক কালের দিকে এই গ্রামটা খুব বেশিদূর এগিয়ে আসতে পারে নি বোধহয়। সেই 'প্যাস্টোরাল' স্নিগ্ধতার মধ্যেই সে আত্ম-সমাহিত হয়ে আছে।

এখানকার বাসিন্দারা পৃথিবীর কাছ থেকে দূরে সরে এসে অজ্ঞাতবাস করতেই বুঝি ভালবাসে। বাইরের দ্রুতবহ উত্তেজক জীবন থেকে ছোটোখাটো এক আধটা ঢেউ এসে এখানে মৃদু একটু দোলা দিক, তা বোধহয় কেউ চায় না। জায়গাটাও এখানকার মানুষদের ইচ্ছার অনুকূলে। পশ্চিমঘাট-এর চারপাশে নিজের দেহ দিয়ে উঁচু উঁচু দেওয়াল তুলে রেখেছে। সেগুলো ডিঙিয়ে বাইরের হাওয়া এ জায়গাকে আলোড়িত করে যাবে, সাধ্য কি। সবার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন এখানকার মানুষগুলো হয়ত সুখেই আছে। সম্ভবত তাদের শান্তি একেবারেই বিঘ্নিত হয় না। তাদের জীবন নির্ঝঞ্ঝাট।

একটা ব্যাপার বিশেষভাবে চোখে পড়েছিল ডানিয়েলের। এই মুহূর্তে এই গ্রামে শিশু-বৃদ্ধ আর মেয়েদের শুধু দেখা যাচ্ছে কিন্তু কোথাও একটি যুবক বা প্রৌঢ় নেই। সুস্থ সবল সমর্থ পুরুষেরা কি এক মন্ত্রে এখান থেকে উধাও হয়ে গেছে। কোথায় গেছে তারা?

যাই হোক রতি-গণেশ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করায় সেই বুড়ো দুটো আঙুল দিয়ে এই দিকটা দেখিয়ে দিয়েছিল কিন্তু নির্দিষ্ট বাড়ি চিনিয়ে দেয় নি। কাজেই ডানিয়েলকে একবার থামতে হল। যে জনতা তার পায়ে পায়ে হাঁটছিল তাদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'গণেশ—' অর্থাৎ গণেশদের বাড়ি কোথায় কিংবা গণেশ কোথায় থাকে?

ছেলেরা তার অনুচ্চারিত প্রশ্নটা বুঝল। গ্রামের মধ্যে যে জায়গাটায় তারা এসে পড়েছিল সেখানে তিন দিক থেকে তিনটে রাস্তা এসে মিশেছে। দুটো ছেলে তার

হাত ধরে টানতে টানতে একটা বাড়ির সামনে এনে দাঁড় করাল এবং তাদের সেই দুর্জ্ঞেয় ভাষায় কি যেন বলল।

তাদের কথাগুলোর মধ্য থেকে গণেশের নামটাই শুধু বুঝতে পারল ডানিয়েল। ঐ নাম মাহাত্ম্যেই বোঝা গেল এটা গণেশদের বাড়ি।

এখানেও দরজায় জানালায় মেয়েমানুষদের একটি ভিড় দেখা গেল। গলা চড়িয়ে ডানিয়েল গণেশকে ডাকল, 'গণেশ—হে গণেশ—'

একটি প্রৌঢ় মহিলা, সম্ভবত গণেশের মা মাথা নেড়ে জানাল, গণেশ বাড়িতে নেই। মৃদু গলায় ভয়ে ভয়ে বলল, 'গণেশ সাগরে—'

গণেশ শব্দটা না হয় বোঝা গেল কিন্তু সাগর মানে কি? চারিদিকে তাকিয়ে মানে বুঝিয়ে দেবার মত একজনকেও খুঁজে পাওয়া গেল না।

অগত্যা ফিরতে হল। জনতার দিকে তাকিয়ে ডানিয়েল এবার রতিদের বাড়ি নিয়ে যেতে বলল।

রতিদের বাড়িটা গ্রামের উত্তর সীমান্তে। সেখানে এসে যখন পৌঁছুনো গেল তখন সূর্যের রথ পশ্চিম আকাশের ঢালু বেয়ে নামতে শুরু করেছে।

রতিদের বাড়ির দরজাতেও একটি ভিড় দেখা গেল। শিশু এবং মেয়েরা তো আছেই। কি আশ্চর্য! সেদিন যে লোকদুটো রতি-গণেশকে তার ঘর থেকে টানতে টানতে নিয়ে এসেছিল তাদের একজনকেও দেখা গেল।

লোকটা সম্ভবত রতির বাপই হবে। এই মুহূর্তে সমস্ত গ্রামখানা যখন প্রায় পুরুষশূন্য তখন এই সুস্থ সবল লোকটিকে বাড়িতে বসে থাকতে দেখে অবাক হয়ে গেল ডানিয়েল এবং মনে মনে অস্বাচ্ছন্দ্যও বোধ করতে লাগল।

স্থির নিষ্পলকে তাকিয়ে আছে লোকটা। চোখের যদি কোন ভাষা থাকে তা হলে বুঝতে হবে ডানিয়েল আসাতে সে আদৌ খুশি নয়। দৃষ্টি তার অপ্রসন্ন, অসন্তুষ্ট, রীতিমত সন্দিগ্ধ।

এক পলক লোকটাকে দেখে নিয়ে দরজার কাছে মেয়েদের ভিড়টার দিকে তাকাল ডানিয়েল। অস্থিরভাবে আঁতিপাঁতি করে খুঁজেও কিন্তু সেখানে রতিকে পাওয়া গেল না। ডানিয়েলের সংশয় হল, এই বাড়িটা সত্যিসত্যিই রতিদের কিনা।

বেশিক্ষণ মেয়েদের জটলার দিকে তাকিয়ে থাকা গেল না। হঠাৎ একটা কণ্ঠস্বর কানে আসতে মুখ ফেরাল ডানিয়েল। তৎক্ষণাৎ লোকটার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। লোকটা কি যেন বলতে চেষ্টা করল। ডানিয়েল বুঝল না, দুই ভ্রূর মাঝখানে একটা প্রশ্ন ফুটিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

লোকটা আগের সেই শব্দগুলিই বোধহয় আরেক বার বলে গেল। একটি বর্ণ না বুঝলেও তার বক্তব্য মোটামুটি অনুমান করতে পারল ডানিয়েল। কী উদ্দেশ্যে ডানিয়েলের আবির্ভাব, খুব সম্ভব সেটাই তার জিজ্ঞাস্য।

আন্দাজে ভর করেই ডানিয়েল বলে বসল, 'রতি—' অর্থাৎ রতির সঙ্গে দেখা করতে এসেছে সে।

নামটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে লোকটা প্রায় লাফিয়ে উঠল। চোখ রক্তবর্ণ হল তার, মুখ ভয়ানক রকমের উগ্র। উত্তেজিত গলায় চিৎকার করে খুব দ্রুত কি যেন বলে গেল সে।

ডানিয়েলের পক্ষে তা বুঝতে পারা অসম্ভব, বিমূঢ় মুখে সে তাকিয়ে রইল।

লোকটার চিৎকার থামে নি। দাঁতমুখ খিঁচিয়ে সমানে চেঁচাচ্ছে সে, লাফাচ্ছে আর হাত নেড়ে ডানিয়েলকে চলে যেতে বলছে।

অভ্যর্থনাটা কোনোমতেই উৎসাহজনক নয়। কাজেই কি আর করা। এখানে বোবা একটা সঙয়ের মত দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই। ডানিয়েলের পক্ষে নিজের কথা লোকটাকে বোঝানো সম্ভব হবে না, তার কথা বুঝতে পারাও দুরূহ ব্যাপার।

অবশ্য এটুকু অনুমান করা যাচ্ছে, সে আসাতে লোকটার মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটেছে। খুব সম্ভব রতি-গণেশের গোপন মেলামেশার যে ব্যবস্থাটুকু সে করে দিয়েছিল তাতে ভয়ানক চটেছে লোকটা। এমন গর্হিত অবাঞ্ছিত ঘটনা যাতে দ্বিতীয় বার না ঘটতে পারে সেজন্য গণেশেব কাছে থেকেই শুধু নয়, বিদেশী আগন্তুকটার কাছ থেকেও রতিকে তফাত রাখা প্রয়োজন। সেই কারণেই বোধহয় বাড়ির সীমানায় উঠতে না উঠতে ডানিয়েলকে বিদায় করে দিতে চাইছে সে। রতির সঙ্গে সামান্য চোখের দেখাটা করতে দিতেও সে সাঙ্ঘাতিক অনিচ্ছুক।

লোকটার মুখোমুখি আর দাঁড়িয়ে থাকা নিরর্থক। মলিন মুখে ফিরে যাবার জন্য পা বাড়াল ডানিয়েল। আর ঠিক সেই সময় বাড়িটার দক্ষিণ প্রান্তে একটা নির্জন জানালায় রতির মুখ দেখা গেল। সে মুখ করুণ, বিষণ্ণ, ব্যথাতুর। চোখ দুটি তার সজল, আচ্ছন্ন। দীর্ঘ পল্লব ডুবিয়ে দিয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় জল পড়ছে। নিয়তহাসিনী যে মেয়েটা সর্বক্ষণ মাতামাতি করে বেড়ায় আর অকারণ খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে থাকে তার প্রাণভ্রমরা কেউ যেন টিপে মেরে ফেলেছে।

রতিকে দেখতে দেখতে বুকের ভেতর মোচড় লাগল ডানিয়েলের। হৃৎপিণ্ডের সরু সরু তারগুলোতে ঝড়ের মত প্রবল ঝঙ্কারে কি যেন বেজে গেল। তৎক্ষণাৎ একটা ভাবনা তার সমস্ত সত্তাকে আলোড়িত করে গেল। রতি কি এখন বন্দিনী? তাকে কি ঐ ঘরটায় পুরে আটকে রাখা হয়েছে? ঐ কারাগার থেকে তাকে কি বেরুতে দেওয়া হয় না? না জেনে, না বুঝে নিতান্ত খেলাচ্ছলে মেয়েটার না জানি কতখানি ক্ষতি করে ফেলা হয়েছে।

অত্যন্ত বিমর্ষ বোধ করতে লাগল ডানিয়েল। একটা কষ্টকর ভারী আবেগ বুকের ভেতর ক্রমশ ফেনায়িত হয়ে শ্বাসটাকে রুদ্ধ করে আনতে লাগল।

ডানিয়েল ভাবল এদের ভাষাটা যদি তার জানা থাকত, পরস্পরকে বুঝতে পারা অনেক সহজ হত। এই লোকটিকে সে অন্তত বোঝাতে পারত একটি সবল স্বাস্থ্যবান যুবকের সঙ্গে একটি প্রাণবন্ত রসোচ্ছলা যুবতীর অভিসারের বন্দোবস্ত করে দিয়ে সে অন্যায় কিছু করে নি। যৌবনের পৃষ্ঠা ক'টি যাদের সযত্নে পড়া আছে তারা জানে এর চাইতে সৎ কাজ আর কিছু নেই, যৌবনধর্মের দিক থেকে এটাই একমাত্র শাস্ত্রসম্মত এবং হৃদয়সম্মত নির্দেশ।

জগতের কিছু কিছু আদিবাসী আর গ্রাম্য মানুষদের সম্বন্ধে বই পড়ে পড়ে যে সামান্য জ্ঞানটুকু সে সঞ্চয় করেছে তাতে জানতে পেরেছে প্রকৃতি-লালিত এই মানুষগুলোর মধ্যে বিন্দুমাত্র জটিলতা নেই। রাগ, আনন্দ, ক্ষোভ, এমনকি নারী-লালসা—মনের সবরকম অবস্থাকে এরা অনায়াসে, অসঙ্কোচে, বিন্দুমাত্র আবরণ না দিয়েই প্রকাশ করে ফেলে। রাগ হল তো ঘাড়ে এক কোপ বসিয়ে দিল। আনন্দ হল তো ধেই ধেই খানিক নেচে নিল। এরা সরল, সাবলীল, সহজ পথের পথিক। জীবনের যে আঁকাবাঁকা পথে শহুরে জটিল মানুষদের সঞ্চরণ সেই পথ নাকি এরা এড়িয়ে চলে।

ডানিয়েল ভাবল তার মত চতুর, শহর-থেকে-আসা ছেলে অজস্র কথা আর নানা যুক্তির ঘুঁটি সাজিয়ে এই অশিক্ষিত অমার্জিত গেঁয়ো লোকটাকে অক্লেশে মাত করে দিতে পারত। তার যুক্তির সামনে লোকটাকে আর মাথা খাড়া করতে হত না। হয়ত তার কথার ঘনঘটায় আচ্ছন্ন হয়ে ফস করে গণেশকে ডেকে এনে রতির সঙ্গে বিয়েও দিয়ে বসতে পারত।

কিন্তু মুশকিল বেধেছে যে আরেক জায়গায়, এদের ভাষাটাই জানা নেই। আগেও ডানিয়েল স্থির করেছিল এখানকার ভাষা শিখে নেবে। এই মুহূর্তে সেই সঙ্কল্পটা আরো দৃঢ় হল।

এদিকে লোকটা আবার চিৎকার করে উঠেছে।

চমকে ডানিয়েল তাকাল। লোকটা ঘন ঘন হাত আর মাথা নেড়ে তাকে চলে যেতে বলছে। অপমানিত বিতাড়িত ডানিয়েল মাথা নিচু করে নিজের আস্তানার দিকে ফিরে চলল।

চলতে চলতে কখন যে গ্রামের শেষ প্রান্তে চলে এসেছিল, মনে নেই। কখন সেই বালখিল্যের দল পেছন থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে কে বলবে।

ইতিমধ্যে সূর্যটা পশ্চিমে আরবসাগরের দিকে অনেকখানি নেমে গেছে। রোদের তাপ বেশ খানিকটা জুড়িয়ে গেছে! দিনের বয়স দুপুর পার হয়ে গেছে।

গ্রাম পেরিয়ে সেই আধা-সমতল মাঠে এসে পড়ল ডানিয়েল। জালগুলো এখনও রোদে শুকোচ্ছে, সেই বোকা পাখিগুলো বৃথাই এখনও জালের দিকে তাকিয়ে বসে আছে।

নির্জন প্রান্তরের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ কুঁই কুঁই একটা শব্দ শোনা গেল। চকিত ডানিয়েল থমকে ফিরে তাকাতেই দেখতে পেল, একটা রোগা কুকুরছানা তার পিছু পিছু হেঁটে আসছে।

জেলেদের ঐ গ্রামটা থেকে আর কেউ আসে নি, শুধু এই অবোধ পশুটাই সঙ্গ নিয়েছে।

কুকুরছানাটার গায়ের রং হলুদ, মাঝে মাঝে সাদা ফুটকি। নাকের ডগা থেকে কপাল বরাবর রাজটিকার মত দীর্ঘ কালো একটা রেখা। এই ক্ষুধিত দেশের সমস্ত চিহ্নই তার সর্বাঙ্গে সাজানো রয়েছে।

ডানিয়েল দাঁড়িয়ে পড়তেই কুকুরটাও থেমে গিয়েছিল। এখন পায়ের কাছাকাছি নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে, আর গলা সরু করে সমানে কুঁই কুঁই করছে। সেই সঙ্গে জোরে জোরে প্রবলবেগে ল্যাজ নাড়াও চলছে। এগুলো তার আদর এবং আনুগত্যের প্রকাশ।

একদৃষ্টে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে ডানিয়েল। এতবড় একখানা গ্রাম আর এত মানুষ থাকতে এটা তার পিছু নিল কেন? কে জানে কেন নিল? কুকুরের মনস্তত্ত্ব ডানিয়েলের জানা নেই।

তাকিয়ে থাকতে থাকতে একটা কথা মনে পড়ল। তার ভাষা এ গ্রামের মানুষ বোঝে না, কুকুরটার ভাষাও নিশ্চয়ই তাদের কাছে অবোধ্য। হঠাৎ কুকুরছানাটার সঙ্গে গভীর আত্মীয়তা বোধ করল ডানিয়েল।

কুকুরটা ল্যাজ নেড়েই চলেছে, কুঁই কুঁই আওয়াজটাও সেই সঙ্গে আছে। আস্তে আস্তে ডানিয়েলের মুখ স্নেহে তরল হয়ে গেল, চোখ দুটো কোমল হল। আচমকা কুকুরছানাটাকে কোলে তুলে হঠাৎ খুশিতে একটা পাক খেল সে। তারপর নাচের ভঙ্গিতে দোল খেয়ে খেয়ে উতরাই বেয়ে নিজের আস্তানার দিকে এগিয়ে চলল।

কালই ডানিয়েল স্থির করে রেখেছিল, সুভদ্রা যোসেফ যদি আজ না আসে সে-ই কাউকে সঙ্গে নিয়ে তার খোঁজে চার্চে চলে যাবে। শেষ পর্যন্ত যাওয়া কিন্তু হল না।

সকাল বেলা, তখনও ভাল করে ঘুম ভাঙে নি, সমস্ত শরীর আর মন সুখদায়ক এক তন্দ্রার মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে আছে, ঠিক সেই সময় মৃদু কোমল একটা স্বর কানে এল, 'উঠুন—উঠুন—'

আস্তে আস্তে অসীম আলস্যভরে চোখ মেলল ডানিয়েল। সামনের দিকে তাকাতেই মনে হল, আজকের দিনের সূর্যোদয় একমাত্র তার জন্যই হয়েছে। শিয়রের কাছে দেবী জুনোর মত সেই মেয়েটা—সুভদ্রা যোসেফ দাঁড়িয়ে আছে। লাফ দিয়ে উঠে পড়ল ডানিয়েল। বলল, 'আরে আপনি!' তার গলা থেকে অপরিমিত খুশি যেন উছলে পড়ল।

'হ্যাঁ, আমি।' নিরুচ্ছ্বাস শুষ্ক সুরে সুভদ্রা বলল, 'সেই চার্চ থেকে এক মাইল পথ ভেঙে এলাম। বেলা চড়ে মাথার ওপর রোদ গনগনে হয়ে উঠেছে, আর এখনও আপনি ঘুমুচ্ছেন। আমি না ডাকলে আরো কতক্ষণ পড়ে থাকতেন, কে জানে।'

ডানিয়েলকে অপ্রতিভ দেখাল। বোকাটে মুখে খানিকটা হেসে বলল, 'বেলা করে ঘুম থেকে ওঠা আমার অনেক দিনের অভ্যাস।'

গম্ভীর স্বরে সুভদ্রা বলল, 'অত্যন্ত বদভ্যাস।'

ভাল করে সুভদ্রার মুখখানা আরেক বার দেখে নিল ডানিয়েল। কড়া মিশনারি নানের মতই তাকে মনে হচ্ছে। আগের মত হেসে মাথা চুলকে ডানিয়েল বলল, 'তা যা বলেছেন। এত বয়স হল, অভ্যাসটা আর শোধরাল না। শোধরাবেই বা কি করে? আপনার মত—' এই পর্যন্ত বলে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে হঠাৎ থেমে গেল। সুভদ্রার স্বর গম্ভীরতর হল, 'আমার মত কী?'

আড়ে আড়ে তাকাল ডানিয়েল। তার চোখের তারায় দুষ্টুমি নেচে গেল। থেমে থেমে বলল, 'আপনার মত কড়া লোকের পাল্লায় পড়লে অনেক আগেই এই বদভ্যাস ছুটে যেত।'

সুভদ্রা কিছু বলল না। সম্ভবত গীর্জাবাসিনী মেয়েটা ডানিয়েলের প্রগলভতায় বিরক্ত হয়েছে।

ডানিয়েল মনে মনে ভয় পেয়ে গেল। তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ বদলে বলে উঠল, 'রোজই ভাবি আপনি আসবেন। আসেন আর না।'

সুভদ্রা সুরহীন নিস্তরঙ্গ গলায় বলল, 'আপনাকে তো সেদিনই বলে গিয়েছিলাম, ক'দিন আমি আসতে পারব না। সে যাক। আমি আসতে পারি নি, কিন্তু তার মধ্যে এ আপনি কী করে বসে আছেন?'

ডানিয়েলের মনে শঙ্কার ছায়া পড়ল। মুখ ফিরিয়ে ভয়ে ভয়ে সে বলল, 'কী করেছি বলুন তো?'

'বুঝতে পারছেন না?'

'না—মানে—'

অসন্তুষ্ট রাগত মুখে সুভদ্রা বলল, 'কতবার করে আপনাকে বারণ করে গেছি অথচ আমার কথাটা কিছুতেই শুনলেন না। এ-সব ছেলেমানুষির কোনো মানে হয়?'

আকাশ-পাতাল তোলপাড় করেও প্রথমটা বুঝতে পারল না ডানিয়েল। অনেকক্ষণ পর অস্পষ্টভাবে খানিকটা আন্দাজ করে ভীরু গলায় বলল, 'কী ব্যাপার বলুন তো?'

সংযমটা আর যেন রক্ষা করতে পারল না সুভদ্রা। সশব্দে ফেটে পড়ল, 'কেন, কেন রতি-গণেশকে আপনার এখানে আড্ডা জমাতে দিয়েছিলেন?'

আবহাওয়া যে রীতিমত প্রতিকূল তা টের পাওয়া যাচ্ছে। একটু আগে সুভদ্রাকে দেখে মনে হয়েছিল আজকের সূর্যোদয় আশ্চর্য প্রসন্ন। কিন্তু কে জানত তার মধ্যে এমন একটা দুর্যোগও ঘনিয়ে রয়েছে। যতদূর ডানিয়েল জানে, কাল পর্যন্ত সুভদ্রা এ গ্রামে আসে নি। তা হলে এ খবর সে পেল কী করে? তবে কি আজ এ গ্রামে পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে রতি এবং গণেশের বাড়ি থেকে এমন একটা ঘটনার কথা তার কানে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে?

সুভদ্রার চোখমুখ উগ্র হয়ে উঠল। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে সে বলতে লাগল, 'কি, চুপ করে রইলেন যে? আমার বারণ কেন শুনলেন না?'

সুভদ্রা কৈফিয়ৎই তলব করছে। অস্ফুট স্বরে ডানিয়েল বলল, 'মানে, আমি ভেবেছিলাম—'

'কী, কী ভেবেছিলেন আপনি?' সুভদ্রার স্বর আরেক পর্দা চড়ল।

'ভেবেছিলাম ওদের দু'জনকে মানায় ভারি ভাল। যেন দুটি ব্ল্যাক এ্যাঞ্জেল। তাই—'

'মানাক গে। তাতে আপনার কী? দু'-দিন এসে একেবারে হুলুস্থুল বাধিয়ে বসেছেন। জানেন, কী করেছেন আপনি?'

'কী?'

গীর্জাবাসিনীর শালীনতা, ধৈর্য, কঠোর সহিষ্ণুতা—সব ভুলে গিয়ে সুভদ্রা এবার ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। একরকম ভেংচেই বলল, 'খুব ভাল কাজ করেছেন! দুটো সংসারে আগুন ধরিয়ে দিয়েছেন। রতির বাপের সঙ্গে গণেশের বাপের খুব একচোট মারামারি হয়ে গেছে। দু'-জনের মুখ দেখাদেখি এখন বন্ধ। এরা এ রাস্তা ধরে গেলে ওরা হাঁটে ও রাস্তায়। মুখোমুখি হলে একেবারে খুনোখুনি হয়ে যাবে। রতি-গণেশকে নিজের ঘরে অভিসার করতে দিয়ে এই উপকারটুকু করেছেন।'

'কিন্তু—'

'কী?'

সুভদ্রাকে বুঝতে না দিয়ে তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার দেখে নিল ডানিয়েল। কিন্তু নাঃ, এই সুরূপা বিদেশিনীর কোথাও বিন্দুমাত্র প্রশ্রয় নেই। বার কয়েক ঢোক গিলে অর্ধফোটা গলায় সে বলল, 'এর মধ্যে আপত্তির কি থাকতে পারে আমি বুঝতে পারছি না। রতি-গণেশের বিয়ে হওয়া উচিত। আমার বিশ্বাস ওরা একজন আরেক জনকে একান্তভাবে চায়।'

সুভদ্রা ঝলসে উঠল, 'চাইলেও হবে না।'

'কেন?'

'ওদের দু'-জনের জাত আলাদা। গণেশরা জেলে, রতিরা ঘাটি।'

দু'-চোখে অসীম বিস্ময় নিয়ে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল ডানিয়েল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'আলাদা জাত মানে?'

'সে আপনি বুঝবেন না।' সুভদ্রা বলল, 'আর তা নিয়ে আপনার মাথা ঘামানোরও দরকার নেই। এ দেশের সামাজিক প্রথা, সংস্কার—কিছুই আপনি জানেন না। না জেনেশুনে এখানকার কোন সমস্যায় হাত দিতে গেলে গণ্ডগোলই শুধু বাড়বে। আর কিছু লাভ হবে না।'

সুভদ্রার কথাগুলো যেন শুনতে পাচ্ছিল না ডানিয়েল। কিংবা শুনলেও তার মাথায় সেগুলো দাগ কাটতে পারে নি। অন্যমনস্কের মত সে বলল, 'জাত আলাদা হলেই কি এদেশে বিয়ে হয় না?'

'হ্যাঁ।'

'ধরুন, আমরা গিয়ে যদি রতি গণেশের বাপ-মাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে—'

ধমকে উঠল সুভদ্রা, 'বললাম না, এ ব্যাপারে আপনাকে দুশ্চিন্তা করতে হবে না। ওরা যা ভাল বুঝবে তা করবে। ওদের ব্যাপারে কারো নাক গলাবার দরকার নেই।'

ডানিয়েল কিছু বলল না। তবে তার বেজার মুখ দেখে টের পাওয়া গেল সুভদ্রার কথাগুলো তার বিন্দুমাত্র মনঃপুত হয়নি।

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

তারপর সুভদ্রাই নীরবতা ভাঙল, 'দেখুন—'

মুখ ফিরিয়ে ডানিয়েল তাকাল। একটু আগের রাগের তীব্রতাটুকু আর সুভদ্রার মুখে নেই। অবাক হয়ে সে লক্ষ্য করল, উত্তেজনার বদলে সেখানে অসীম সঙ্কোচ ফুটে রয়েছে।

কুণ্ঠিত সুরে সুভদ্রা বলল, 'রতি-গণেশদের খবরটা শুনবার পর থেকে আমার মাথার ঠিক ছিল না। সকালবেলা আপনাকে ঘুম থেকে তুলে কতকগুলো গালমন্দ করলাম। কিছু মনে করবেন না। সত্যি, ভারি অন্যায় হয়ে গেছে। আমাকে ক্ষমা করবেন।'

ডানিয়েল ব্যস্তভাবে দু'-হাত নেড়ে বলে উঠল, 'না, না, ক্ষমা চেয়ে আমাকে লজ্জা দেবেন না। প্লীজ—'

সুভদ্রা বলতে লাগল, 'আপনি যা বলেছেন তা-ই হয়ত ঠিক। রতি-গণেশের বিয়েটা হওয়া একান্ত উচিত। কিন্তু মিস্টার ডানিয়েল—'

ডানিয়েল উদ্‌গ্রীব হল, 'বলুন—'

'জগতে উচিত অনুযায়ী ক'টা কাজ আর হয়ে থাকে।'

একটুক্ষণ নীরব থেকে ডানিয়েল শুরু করল, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

'স্বচ্ছন্দে।'

'এখানকার মানুষ কী ভাষায় কথা বলে?'

'মারাঠী। কেন?'

আচমকা সেই প্রথম দিনটার কথা মনে পড়ে গেল ডানিয়েলের। পশ্চিমঘাটের এই উপত্যকায় দাঁড়িয়ে কালো কালো স্বাস্থ্যহীন ছেলেগুলোর সঙ্গে ইংরেজিতে কথা বলতে গিয়ে এ দেশ সম্বন্ধে তার ধারণা সেদিন সাঙ্ঘাতিক ধাক্কা খেয়েছিল। রাষ্ট্রভাষা হিন্দির যে দু'-চারটি শব্দ নয়া দিল্লিতে থাকতে ডানিয়েল নিজের জ্ঞানের ঝোলায় তুলে নিয়েছিল এখানে তা খাটাতে গিয়ে দেখেছে, কাজ হয়নি। ইংরেজির মতই সেই হিন্দি এখানে দুর্বোধ্য; কোন অপরিচিত গ্রহান্তরের ভাষা।

ঈষৎ অন্যমনস্কের মত ডানিয়েল বলল, 'আচ্ছা—'

সুভদ্রা কিছু বলল না, জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল শুধু।

ডানিয়েল বলতে লাগল, 'আপনাদের এই ইণ্ডিয়ায় কতগুলো ভাষা আছে?'

'শত শত। আমি ঠিক সংখ্যাটা আপনাকে দিতে পারব না। তবে—'

'কী?'

'আমাদের সংবিধানে দেশের প্রধান চোদ্দটি ভাষাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।'

একটু ভেবে নিয়ে ডানিয়েল বলল, 'এক ভাষার সঙ্গে অন্য ভাষার নিশ্চয়ই খুব মিল আছে?'

সুভদ্রা আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল, 'আছে কিছু। তবে অধিকাংশ ভাষাই এসেছে সংস্কৃত থেকে। সংস্কৃতকে ভারতীয় ভাষাগুলোর মাদার বলতে পারেন। তবে সংস্কৃত ভেঙেচুরে প্রদেশে প্রদেশে এমন রূপ নিয়েছে যে একের সঙ্গে অন্যের মিল খুঁজে পাওয়া মুশকিল। যদিও কিছু সাদৃশ্য থাকে বলার দোষে অথবা বলার গুণে তা বুঝবার উপায় নেই। একেক জায়গার উচ্চারণরীতি একেক রকম।'

নিবিড় মনোযোগে কথাগুলো শুনে যাচ্ছিল ডানিয়েল। সুভদ্রা থামতেই সে বলে উঠল, 'তা হলে তো ভারি বিপদ। আমাদের মত বিদেশীর কথা ছেড়ে দিন, ইণ্ডিয়ার এক জায়গার লোক আরেক জায়গায় গিয়ে মনের কথা বোঝায় কী করে?'

'শহরে গেলে মোটামুটি ইংরেজিটা জানা থাকলে কাজ চলে যায়। তবে গ্রামের ভেতরে গেলে চলবে না। অবশ্য নর্থ ইণ্ডিয়ার ক'টা প্রভিন্সে হিন্দি দিয়ে চালিয়ে নেওয়া যায়।'

একটু চুপ করে থেকে ডানিয়েল বলল, 'এখানকার ভাষা তো বললেন মারাঠী, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'এ ভাষাটা শিখতে কতদিন লাগবে?'

চোখেমুখে যেন উৎসাহের ছোঁয়া লাগল সুভদ্রার। উৎসুক স্বরে সে জিজ্ঞেস করল, 'কে শিখবে?'

ডানিয়েল বলল, 'ধরুন আমিই যদি শিখি?'

'আপনি শিখবেন?'

'কেন, আপনার আপত্তি আছে নাকি?'

'না-না, আপত্তি কিসের—' ব্যস্তভাবে সুভদ্রা বলে উঠল।

'তা হলে?' দু'-চোখের নীল মণিতে প্রশ্ন ফুটিয়ে তাকিয়ে রইল ডানিয়েল।

সুভদ্রা বলল, 'ভাবছি আপনি বিদেশী মানুষ, ক'দিনের জন্যেই বা এখানে এসেছেন! আজ হোক কাল হোক, একদিন চলে যাবেন। ভাষা শেখার মত সময় কোথায় আপনার? তা ছাড়া—'

মনে মনে থমকে গেল ডানিয়েল। সুভদ্রা কি কৌশলে এ গ্রাম থেকে তার চলে যাবার কথাটা স্মরণ করিয়ে দিতে চাইছে?

কিছুটা আনমনে ডানিয়েল জিজ্ঞেস করল, 'তা ছাড়া কী?'

'চলেই যখন যাবেন তখন আর কষ্ট করে একটা ভাষা শিখে কী হবে?'

তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল না ডানিয়েল। কিছুক্ষণ পর আস্তে আস্তে বলল, 'মনে করুন খেয়াল। খেয়ালের বশে লোকে কত কিছুই তো করে। আমি না হয় একটা ভাষাই শিখলাম।'

একটু চুপ করে থেকে সুভদ্রা বলল, 'বেশ। মাস খানেক চর্চা করলে মোটামুটি কাজ চালাবার মত শিখে নিতে পারবেন।'

এবার অনুনয়ের সুরে ডানিয়েল বলল, 'আপনাকে কিন্তু আমার টিচার হতে হবে।'

'টিচার!'

'হ্যাঁ। আপনি ছাড়া এখানে কার কাছে শিখব বলুন?'

'তথাস্তু।' স্নিগ্ধ একটু হাসল সুভদ্রা। একটু কি ভেবে নিয়ে আবার বলল, 'কিন্তু—'

'কী?'

'আমি তো রোজ এ গ্রামে আসি না। পর পর দিন দশেক হয়ত এখানে এলাম। তার পরের দশদিন গেলাম অন্য গ্রামে, এক নাগাড়ে আমার পক্ষে শেখানো সম্ভব হবে না।'

'তাতে অসুবিধে হবে বলে তো মনে হয় না। যে ক'দিন আসতে পারবেন না সে ক'দিনের পড়া দিয়ে যাবেন। আমি তৈরি করে রাখব।'

'বেশ। তবে—'

'আবার কী?'

'শুধু বই থেকে শিখলেই তো চলবে না।'

সুভদ্রা কী বলতে চায় বুঝতে না পেরে তাকিয়ে রইল ডানিয়েল।

সুভদ্রা বলতে লাগল, 'সবসময় এখানকার লোকদের সঙ্গে মিশতে হবে। তারা কিভাবে কথা বলে লক্ষ্য করতে হবে। প্রতি মুহূর্তে কান সজাগ রাখা দরকার। এ-সব যদি পারেন চট করে ভাষাটা শিখে ফেলতে পারবেন।'

সোৎসাহে ডানিয়েল বলল, 'আমি তো লোকজনের সঙ্গে মিশতেই চাই। তবে দু'-চারটে অন্তত কথা না শিখে ওদের কাছে গেলে নেহাত বোবার মত দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।'

'তা তো বটেই।'

পরের দিন সকাল থেকে নতুন পর্যায়ে বিদ্যার্জন শুরু হল।

গীর্জা থেকে একখানা মারাঠী বর্ণপরিচয়ের বই নিয়ে এসেছিল সুভদ্রা। সুশীল সুবোধ ছাত্রের মত শুদ্ধ চিত্তে তার কাছে গিয়ে বসল ডানিয়েল।

জন্মের বাইশ তেইশ বছর পর বহুদূরের এক অচেনা দেশে অজানা এক ভাষার অক্ষর-পরিচয় আরম্ভ হল ডানিয়েলের। ছাত্র হিসেবে চিরদিনই সে জিজ্ঞাসু, মেধাবী এবং প্রখর। স্মৃতিশক্তি তার অসাধারণ। একটি সকালের মধ্যেই মারাঠী ভাষার সবগুলি বর্ণ কণ্ঠস্থ করে ফেলল ডানিয়েল।

সুভদ্রা বিস্মিত প্রশংসার সুরে বলল, 'ভেরি গুড।'

সলজ্জ হেসে ডানিয়েল জিজ্ঞেস করল, 'এবার কী করতে হবে?'

'অক্ষরগুলো মুখস্থ করলেই চলবে না, ওগুলো লিখতেও হবে। কাগজ পেন্সিল দিয়ে যাচ্ছি। আজ আমার দেখিয়ে দেবার সময় নেই। আপনি নিজে দেখে দেখে লিখবার চেষ্টা করবেন। না পারলে কাল দেখিয়ে দেব।' কাপড়ের একটা সাইডব্যাগ নিয়ে এসেছিল সুভদ্রা। সেটার ভেতর থেকে একখানা খাতা আর পেন্সিল বার করে ডানিয়েলের হাতে দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

ডানিয়েল বলল, 'এখন ক'দিন এ গ্রামে আসছেন তো?'

'হ্যাঁ। পর পর দিন দশেক আসতে হবে।'

তার পরের দিন সুভদ্রা আরো চমৎকৃত। একদিনেই অক্ষরগুলো নির্ভুল লিখতে শিখে ফেলেছে ডানিয়েল। লিখবার সময় তার বই দেখতে হয় না।

সুভদ্রা বলল, 'বাঃ, বাঃ! লেখাও দেখি শেষ করে ফেলেছেন! আপনার মত ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র আগে আর দেখিনি।'

ডানিয়েল বলল, 'বেশি প্রশংসা করবেন না। তা হলে কিন্তু আমার ল্যাজ মোটা হয়ে যাবে।' বলতে বলতে হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠল, 'কি বললেন, আমার মত ছাত্র আগে দ্যাখেন নি? তার মানে নিশ্চয়ই আরো অনেক ছাত্র আপনার আছে।'

একটু যেন থতমত খেয়ে গেল সুভদ্রা। অতি গোপন কিছু ধরা পড়ে গেলে চেহারা যেমন হয় সুভদ্রাকে সেইরকম দেখাল। ধীরে ধীরে সে বলল, 'আছে। আশেপাশের বারো চোদ্দখানা গ্রামে যত ছোট ছোট ছেলেমেয়ে রয়েছে সবাই আমার ছাত্র। গীর্জা থেকে সব গ্রামেই একটা করে প্রাইমারি স্কুল বসানো হয়েছে। আমি ঘুরে ঘুরে ক্লাস নিই।'

এতদিনে এই গ্রামটার সঙ্গে সুভদ্রা যোসেফের সম্পর্ক কী তার একটা ক্ষীণ সূত্র যেন পাওয়া গেল।

সুভদ্রা বলতে লাগল, 'প্রায় সব গ্রামেই আমাকে সাহায্য করার জন্য টিচার রয়েছে। শুধু তিনটে গ্রামে নেই। এই গ্রামটা ছাড়া নোনপুরা আর মান্দভি বলে আর দুটো গ্রামে। মাসে দশ দিন করে ঘুরে এই তিনটে গ্রামে আমি পড়াই। বাকি কুড়ি দিন পড়া বন্ধ থাকে।'

ডানিয়েল বলল, 'আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না—'

'কী?'

'সকাল বেলা আমাকে পড়িয়ে আপনি নিশ্চয়ই গ্রামে গিয়ে ক্লাস নেন।'

'তা নিই।'

'এতে দু'-বার করে আপনার খাটতে হয়। তার চাইতে আমি যদি আপনার স্কুলে গিয়ে সবার সঙ্গে পড়ি আপনার একবারের খাটুনিটা অন্তত বেঁচে যায়।'

'তা হয়ত যায়। তবে আপনি গেলে কিছু অসুবিধে হবে।'

'কিরকম?'

'একই ক্লাসের ভেতর একবার মারাঠীতে ওদের বোঝাতে হবে, ইংরেজিতে বোঝাতে হবে আপনাকে। আপনি বরং মারাঠী ভাষাটা মোটামুটি বোঝার মত শিখে নিন। যদি দরকার বুঝি আমিই তখন আপনাকে স্কুলে যেতে বলব।'

'আপনি যা ভাল মনে করেন।'

একটু চুপ করে থেকে সুভদ্রা বলল, 'অক্ষর চেনা আর লেখা তো শেষ করে ফেলেছেন। আজ থেকে যুক্তাক্ষর শিখবেন।'

'বেশ।' ডানিয়েল সাগ্রহে মাথা নাড়ল।

প্রথমে স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণের প্রভেদ বুঝিয়ে দেয় সুভদ্রা। তারপর একটি অক্ষরের সঙ্গে অন্য অক্ষরের সংযোগ কিভাবে ঘটাতে হয়, কিভাবে নির্দিষ্ট চিহ্ন দিয়ে হ্রস্ব-ই দীর্ঘ-ঈ, হ্রস্ব-উ, বা এ-কার ঐ-কার যুক্ত করতে হয় পর পর বুঝিয়ে দিল। এবং বই থেকে সে-সব সংক্রান্ত পাঠ ও অনুশীলনীও পর্যাপ্ত পারিমাণে দিয়ে দিল। তারপর বলল, 'আজ থেকে কিছু কিছু শব্দ আপনাকে শিখতে হবে। ওয়ার্ডবুক অবশ্য আনিনি। আজ মুখে মুখেই শিখুন। কাল থেকে মুখে মুখেও শিখবেন, ওয়ার্ড বুক থেকেও শিখবেন।'

ডানিয়েল মাথা নাড়ল, সে রাজী।

সুভদ্রা বলল, 'মাদার মানে আঈ—'

ডানিয়েল প্রতিধ্বনি করল, 'মাদার—আঈ।'

'ব্রাদার—ভাও।'

'ব্রাদার—বাও।'

'নো—নো-নো, নট বাও, সে ভাও।'

উচ্চারণ পদ্ধতিটা খুব মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করল ডানিয়েল, কিন্তু কিছুতেই ভাও শব্দটা যথাযথ বলতে পারল না। 'ভাও' বলতে গিয়ে 'ব' এবং 'ভ' এর মাঝামাঝি একটা শব্দ করল।

সুভদ্রা বুঝল, প্রথম দিন এর চাইতে বেশি আশা করা অন্যায়। যেটুকু ডানিয়েলের কাছে পাওয়া গেছে তা প্রায় আশাতীত।

'আঈ' আর 'ভাও'-এর পর একে একে ডানিয়েল জানতে পারল, মাছের সমশব্দ 'মাসা', পাখির 'পক্ষি', পাথরের 'ডগর', ইত্যাদি ইত্যাদি।

মুশকিল বাধল 'ঢগ' শব্দটা নিয়ে। ঢগ অর্থ মেঘ। কিছুতেই 'ঢগ' উচ্চারণ করতে পারল না ডানিয়েল। বার বার শব্দটা বেঁকে চুরে ভেঙে 'টখ' হয়ে যেতে লাগল।

সুভদ্রা বলল, 'টখ না ঢগ। বলুন ঢগ—ঢগ—ঢগ—'

ডানিয়েল বলল, 'টখ—টখ—টখ—'

প্রায় হাল ছেড়ে দিয়ে সুভদ্রা এবার বলল, 'না, আপনাকে দিয়ে ঢগ বলানো যাবে না।'

আড়ে আড়ে সুভদ্রাকে একবার দেখে নিয়ে ডানিয়েল খানিকটা সাহস সঞ্চয় করল। আস্তে আস্তে বলল, 'নিশ্চয়ই যাবে।'

হঠাৎ কি এক কৌতুকে চোখ দুটি ঝিকমিক করে উঠল সুভদ্রার। সামনের দিকে খানিকটা ঝুঁকে সে বলল, 'হবে বলছেন?'

ডানিয়েল চুপ করে রইল।

সুভদ্রা আবার বলল, 'আচ্ছা, আপনার জিভটা দেখি।'

ডানিয়েল অবাক। সবিস্ময়ে বলল, 'জিভ দেখবেন!'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, চট করে বার করুন।'

অগত্যা কি আর করা, জিভের ডগাটা একটুখানি বার করল ডানিয়েল।

সুভদ্রা ধমকে উঠল, 'ঐটুকুন বার করলে হবে না। সবটা দেখাতে হবে।'

একবারে নয়, তাড়া খেয়ে খেয়ে একটু একটু করে পুরো জিভটা বার করল ডানিয়েল। ওপর থেকে, নিচ থেকে, ঘুরে ফিরে চারপাশ থেকে সেটা ভাল করে দেখল সুভদ্রা। তারপর চোখ গোলাকার করে বলল, 'হুঁ, যা ভেবেছি তা-ই।'

সট করে জিভটা মুখের ভেতর পুরে দিয়ে ডানিয়েল বলল, 'কী ভেবেছেন?'

'আপনার জিভ বেজায় ভারী, ওটা দিয়ে সব শব্দ উচ্চারণ করা যায় না।'

'আমার জিভ ভারী?'

বিশেষজ্ঞের মত মাথা নেড়ে সুভদ্রা বলল, 'নিশ্চয়ই। রোজ সাতবার করে জিভ ছুলবেন। তাতে ওটা পাতলা হবে। তখন সব কথা স্পষ্ট করে বলতে পারবেন।'

'আপনি বলছেন আমার জিভ ভারী! তেইশ বছর বয়েস হয়ে গেল। কেউ কোনোদিন ও-কথা বলে নি। এতদিন পর আপনি বললেই আমার জিভ ভারী হয়ে যাবে?' বলে সরাসরি সুভদ্রার চোখের দিকে তাকাল ডানিয়েল।

সুভদ্রাও তাকিয়ে ছিল। গম্ভীর গলায় বলল, 'আমি বললেই হবে।' তার স্বরের গাম্ভীর্য যে কপট সেটুকু বুঝতে অসুবিধে হল না।

যাই হোক ডানিয়েল এবার আর কিছু বলল না, সুভদ্রার চোখ থেকে চোখও সরাল না।

পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে হেসে উঠল দু'-জনে।

হাসি থামলে সুভদ্রা বলল, 'বেলা হয়ে গেল, বিদ্যার তপস্যা আজ এই পর্যন্তই থাক। ওদিকে ছেলেমেয়েগুলো হয়ত গ্রাম মাথায় তুলে ফেলেছে, আমাকে উঠতে হবে।' কাপড়ের সাইড-ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে উঠে দাঁড়াল সে।

সুভদ্রা বাইরে বেরুবার জন্য পা বাড়িয়েছে, ঠিক সেইসময় কথাটা মনে পড়ে গেল। ব্যস্তভাবে ডানিয়েল বলল, 'একটু শুনুন—'

সুভদ্রা ফিরে দাঁড়াল।

সেদিন গণেশকে খুঁজতে গিয়ে ডানিয়েল শুনে এসেছিল, গণেশ নাকি সাগরে। সাগর শব্দটার অর্থ সে জানে না। বলল, 'আচ্ছা সাগর মানে কী?'

সুভদ্রা বলল, 'সাগর মানে 'সী'।'

এতদিনে বোধগম্য হল। গণেশ তা হলে সেদিন সমুদ্রে গিয়েছিল। সমুদ্রে যখন, নিশ্চয়ই তখন 'আরেবীয়ান সী'তে। ডানিয়েলের মনে পড়ল, এখনও তার আরবসাগরে যাওয়া হয়ে ওঠে নি।

সুভদ্রা জিজ্ঞেস করল, 'কি, আর কিছু বলবেন?'

মাথা নেড়ে 'না' বলতে গিয়েও হঠাৎ ডানিয়েল বলে বসল, 'আরেকটা কথা—'

'বলুন।'

'ইংরেজি 'লাভ' শব্দটাকে এখানে কী বলে?'

তরুণী সন্ন্যাসিনীর মুখে নিতান্ত অকারণেই রক্তোচ্ছ্বাস খেলে গেল। পরক্ষণেই বিরক্ত একটি ভ্রূকুটি হেনে কঠিন শীতল সুরে বলল, 'ওটা এমন কিছু দরকারী কথা নয়। আপাতত ওটা না জানলেও পেটের ভাত হজম হবে।'

ডানিয়েল থতমত, হতচকিত। অর্বাচীন বিদেশী সুভদ্রার বিরক্তির কারণ প্রথমটা বুঝে উঠতে পারল না। তারপর কী মনে হতে তাড়াতাড়ি জিভ কেটে কোনরকমে বলতে পারল, 'না, মানে—'

তার বক্তব্য শেষ করতে দেবার মত ধৈর্যটুকুও বুঝি অবশিষ্ট নেই সুভদ্রার। ক্ষিপ্ত অসহিষ্ণু পায়ে সে বাইরে বেরিয়ে গেল।

দিনকয়েক আর বেরুল না ডানিয়েল। পশ্চিমঘাটের এই নির্জন ঘরখানায় দিবারাত্রি নিজেকে বন্দী রেখে মারাঠী ভাষার ধ্যানে মগ্ন হয়ে রইল।

এভাবে একটা অপরিচিত ভাষা শেখায় রোমাঞ্চ আছে। এর উচ্চারণ-রীতি, বিচিত্র সব শব্দ, তাদের ধ্বনি ডানিয়েলকে প্রতি মুহূর্তে বিস্মিত চমৎকৃত করে তুলতে লাগল। এর মধ্যে প্রায় তাবত তাবত যুক্তাক্ষর শরীরে, কালঘাম ছুটিয়ে আয়ত্ত করে ফেলেছে ডানিয়েল। তা ছাড়া শ' তিনেকের মত দরকারী শব্দও মুখস্থ করেছে। ব্যাকরণটা অবশ্য এখনও নাগালের বাইরে। মারাঠী ভাষার বাক্য গঠনের পদ্ধতি কেমন, কোথায় ক্রিয়া বসাতে হয়, কোথায় কর্ম—এসব জানতে এখনও তার অনেক দেরি। তবে যে তিনশ' নিত্য ব্যবহার্য শব্দ সে কণ্ঠস্থ করেছে তার মধ্যে থেকে প্রয়োজনীয় কয়েকটি বেছে নিয়ে পর পর সাজিয়ে মোটামুটি মনের কথা প্রকাশ করতে পারে ডানিয়েল। তাতে হয়ত ক্রিয়াপদটি থাকে না, বিভক্তি হয়ত অভিমানে কাছেই ঘেঁষে না। সব মিলিয়ে অপমানে লজ্জায় ব্যাকরণের মাথা কাটা যায়। তবু এ ছাড়া উপায়ই বা কী? পদ্ধতিটি নিজের মস্তিষ্ক থেকে উদ্ভাবন করে নি ডানিয়েল, সুভদ্রা যোসেফ এভাবে বলতে শিখিয়েছে। কোনোরকমে নিজের বক্তব্য বোঝাতে পারলেই হল। তারপর লোকের সঙ্গে কথা বলতে বলতে একদিন ক্রিয়া আসবে, কারক যথাযথ হবে, বিভক্তিও দূরে বসে থাকবে না।

জেলে আর মুক্তোচাষীদের গ্রামটা থেকে বিচ্ছিন্ন এই বাড়িটায় মারাঠী ভাষায় বর্ণ-পরিচয়, শব্দ পরিচয়, প্রাথমিক ব্যাকরণ ইত্যাদি খানকয়েক পাঠ্য বই ছাড়া ডানিয়েলের আর কোন সঙ্গী নেই। এতে সুবিধেই হয়েছে। অখণ্ড মনোযোগ ভাষা শিক্ষার মধ্যে ঢেলে দিতে পেরেছে সে।

অবশ্য রতির বদলী সেই কালো লোকটাকে সারা দিনে বার চারেক দেখা যায়। তিন বার সে খাবার নিয়ে আসে, একবার আনে স্নানের জল। নিঃশব্দে সে আসে, ডানিয়েলের স্নান-খাওয়া হয়ে গেলে একমুহূর্তও অপেক্ষা করে না, বাসন-কোসন নিয়ে নিমেষে উধাও হয়ে যায়।

ভোরবেলা মাত্র একটি বারের জন্য সুভদ্রা আসে। ডানিয়েলের পড়াশোনার ধারা কেমন চলছে, সে সম্বন্ধে সাগ্রহে খোঁজখবর নেয়। নতুন পড়া দিয়ে যায়। ডানিয়েলের পাঠের অগ্রগতিতে সে বিস্মিত, চমৎকৃত। সুভদ্রার বিশ্বাস যেভাবে এই বিদেশী আগন্তুক এগিয়ে চলেছে তাতে বছর খানেকের মধ্যেই সারা মারাঠী সাহিত্য মন্থন করে ফেলবে।

শব্দ শিক্ষা এবং উচ্চারণ-রীতি রপ্ত করার সঙ্গে সঙ্গে আরো একটা দিকে ডানিয়েলকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে সুভদ্রা। কিভাবে প্রথম দেখা হলে কুশল প্রশ্নাদি করতে হয়, শিষ্টাচার সহবতের কী ভাষা, এসব শিখে ফেলেছে ডানিয়েল। 'তুমি কেমন আছ?' 'তোমার নাম কী?' 'ছেলেপুলেরা সব ভাল তো?' ইত্যাদি ইত্যাদি সব কথাই সে মারাঠী ভাষায় বলতে পারে!

সুভদ্রা যোসেফ আর সেই কালো লোকটিকে বাদ দিলে সর্বক্ষণের আরো একটি সহচর অবশ্য আছে ডানিয়েলের। সেদিন রতি-গণেশের সন্ধানে গ্রামে গিয়ে ফিরবার পথে একটা কুকুরছানা তার সঙ্গ নিয়েছিল। তাকে কোলে তুলে নিজের আস্তানায় ফিরে এসেছিল ডানিয়েল।

সেই থেকে কুকুরছানাটা এখানেই পাকাপাকি বন্দোবস্ত করে নিয়েছে। স্নান-খাওয়া-আহার-বিহার, সবই তার ডানিয়েলের সঙ্গে। সর্বক্ষণ পায়ে পায়ে ঘুরছে। ডানিয়েল যখন পড়ে, চুপচাপ বংশবদ ভঙ্গিতে সে কাছে বসে থাকে। রাত্রে ডানিয়েল যে খাটিয়াটায় শোয় তার তলায় কুকুরছানাটা নাক ডাকায়। একেক দিন ঘুম ভেঙে ডানিয়েল দ্যাখে খাটিয়ার তলা থেকে ওপরে উঠে তার কোলের কাছে দিব্যি কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে। মোট কথা, এই ঘরটার আধাআধি স্বত্ব এখন তার দখলে।

সপ্তাখানেক এভাবে কাটবার পর সুভদ্রা বলল, 'মারাঠী ভাষায় রীতিমত মাস্টার হয়ে উঠলেন দেখছি।'

সলজ্জ মুখে ডানিয়েল বলল, 'ঠাট্টা করছেন?'

সুভদ্রা ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'আরে না-না, মোটেও ঠাট্টা নয়। সত্যি, সাতদিনে একটা সম্পূর্ণ অজানা ভাষা আপনি যতখানি শিখেছেন তা ঈর্ষা করার মত। আমি নিজেও এতখানি পারতাম না।'

প্রশংসাটুকু নীরবে মাথা পেতে নিল ডানিয়েল।

সুভদ্রা আবার বলল, 'সবই ঠিক হচ্ছে, তবে উচ্চারণটায় খুঁত থেকে যাচ্ছে। এবার ওটা আপনাকে শোধরাতে হবে।'

ডানিয়েল প্রথম থেকেই লক্ষ্য করেছে তার মারাঠী ভাষা শেখার ব্যাপারে সুভদ্রার প্রচুর আগ্রহ। প্রতিদিন সযত্নে সে তাকে পড়িয়ে যায়। কিন্তু আজ সেই আগ্রহটা সীমাহীন মনে হচ্ছে। খুবই উৎসাহিত বোধ করল ডানিয়েল। বলল, 'কী করলে এই খুঁত সারানো যায়?'

'আপনাকে তো সেদিন বলেছি এখানকার মানুষদের সঙ্গে সবসময় মিশতে হবে। কথা বলতে হবে। তারা কিভাবে উচ্চারণ করে সেটা লক্ষ্য করতে হবে।'

'বেশ।'

'আপনি যা শিখেছেন তাতে মোটামুটি এখন কাজ চলে যেতে পারে। চলুন, আজ থেকেই আপনি গ্রামে বেরুবেন।'

'আজ থেকেই!'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, শুভস্য শীঘ্রম। আরেকটা কথা—'

'কী?' দু'চোখে প্রশ্ন নিয়ে ডানিয়েল তাকাল।

সুভদ্রা বলল, 'আমার স্কুলটা আজ আপনাকে দেখিয়ে দেব। কাল থেকে এখানে আর আসব না, আপনি স্কুলে গিয়ে অন্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে পড়বেন।'

'খুব ভাল কথা।' বলেই লাফ দিয়ে উঠে পড়ল ডানিয়েল। নিমেষে জামাটা পরে নিয়ে বলল, 'আমি রেডি, চলুন—'

ঘর থেকে বেরুতেই দেখা গেল কুকুরছানাটা সঙ্গ নিয়েছে। তাকে কোলে তুলে সুভদ্রার পাশাপাশি হাঁটতে লাগল ডানিয়েল।

খানিকটা চলার পর সুভদ্রা বলল, 'রেভারেণ্ড আপ্তের কথা আপনাকে বলেছিলাম, মনে আছে?'

'হ্যাঁ।' ডানিয়েল ঘাড় কাত করল, 'আমার অসুখ তো উনিই সারিয়েছিলেন।'

'হ্যাঁ। রেভারেণ্ড আপ্তে আমাদের চার্চের বড় পাদ্রী। উনি আপনাকে একবার নিয়ে যেতে বলেছেন।'

'বেশ তো যাব। কবে যেতে হবে বলুন।'

'কবে যাবেন?' একটু ভেবে নিয়ে সুভদ্রা বলল 'কাল—কালই চলুন না। স্কুল ছুটি হয়ে গেলে নিয়ে যাব।'

'আচ্ছা।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ। এর মধ্যে একটা চড়াই পার হয়ে গেল দু'-জনে। উতরাইয়ের দিকে নামতে নামতে সুভদ্রা বলল, 'রেভারেণ্ড আপ্তেকে তো আপনি দ্যাখেন নি?'

'কি করে দেখব বলুন। উনি যখন এসেছিলেন আমি তো তখন বেহুঁশ।' ডানিয়েল হাসল।

'তা তো ঠিকই।' সুভদ্রা বলতে লাগল, 'আলাপ হলে দেখবেন এমন চমৎকার মানুষ খুব কম দেখেছেন। সত্যিকারের 'গুড কৃশ্চান।' ধর্মের জন্যে আর মানুষের জন্যে জীবন একেবারে উৎসর্গ করে দিয়েছেন।'

ডানিয়েল কিছু বলল না, নীরবে শুনে যেতে লাগল।

কি ভেবে নিয়ে আড়চোখে ডানিয়েলের দিকে তাকিয়ে সুভদ্রা আবার শুরু করল, 'রেভারেণ্ড আপ্তের খুব ইচ্ছে—' এই পর্যন্ত বলে হঠাৎ থেমে গেল।

ডানিয়েল উৎসুক। বলল, 'কী ইচ্ছে?'

'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনি মারাঠী ভাষাটা শিখে ফেলুন।'

'কেন বলুন তো?'

তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল না সুভদ্রা। ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে কি একটু চিন্তা করে বলল, 'রেভারেণ্ড আপ্তেই আপনাকে তা বলবেন।'

ডানিয়েল বুঝল, এ প্রসঙ্গে কিছু বলবে না সুভদ্রা। কাজেই জোরজার করা অভদ্রতা। তার মত অপরিচিত আগন্তুকের মারাঠী ভাষা শেখার ব্যাপারে রেভারেণ্ড আপ্তে কেন এত উৎসাহী, সেটাই বুঝে উঠতে পারা যাচ্ছে না। আর যাচ্ছে না বলে কৌতূহল এবং উৎকণ্ঠা মেশানো বিচিত্র এক আবেগ ডানিয়েলকে তরঙ্গিত করতে লাগল।

নিঃশব্দে আরো গোটা তিনেক চড়াই-উতরাই পার হয়ে গেল দু'-জনে। আর যেতে যেতে এতদিন পর হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তে ভয়ানক চমকে উঠল ডানিয়েল। বিদ্যুৎগতিতে সঙ্গিনীর দিকে ফিরে সে বলল, 'দেখুন—'

'কী?' সুভদ্রা মুখ ফেরাল।

'আপনার কাছে আমি ভীষণ লজ্জায় আছি।'

'লজ্জা!'

'হ্যাঁ।'

সবিস্ময়ে সুভদ্রা বলল, 'কী ব্যাপার বলুন তো?'

কুণ্ঠিত কাঁচুমাচু মুখে ডানিয়েল বলতে লাগল, 'অনেকদিন আগেই আমার খোঁজ নেওয়া উচিত ছিল কিন্তু হুঁশটুশগুলো আমার বড্ড কম।'

'আপনাকে নিয়ে আমি আর পারি না।' সুভদ্রা বলল, 'আসল কথাটা বলবেন, তা নয়। খালি ভনিতা আর ভনিতা।'

ডানিয়েল বলল, 'নিজের চোখেই তো দেখেছি এ গ্রামের লোকেরা কত গরীব। অথচ দিনের পর দিন এদের ঘাড়ে বসে খেয়ে যাচ্ছি।'

'সে জন্যে আপনাকে ভাবতে হবে না।'

'কী বলছেন আপনি—ভাবতে হবে না! এভাবে গরীব লোকগুলোর খাবারে ভাগ বসাতে পারব না।' ডানিয়েল বলতে লাগল, 'প্রথম দিন আমি ছিলাম এ গ্রামের অতিথি। সেদিনটা বাদ দিয়ে যে ক'দিন এখানে আছি, আর যা খেয়েছি তার একটা হিসেব করে দিন।'

'হিসেব দিয়ে কী হবে?' ঘাড় কাত করে সুভদ্রা তাকাল।

একটু ইতস্তত করে নতমুখে ডানিয়েল বলল, দামটা দিয়ে দেব। আমাকে খাওয়াতে গিয়ে নিশ্চয়ই ওদের সংসারে টান পড়ে যাচ্ছে।'

সুভদ্রা হাসল, 'দাম দিতে হবে না, আর এ ব্যাপারে আপনার দুশ্চিন্তার দরকার নেই।'

চকিতে মুখ তুলল ডানিয়েল। সে কিছু বলার আগে সুভদ্রা আবার বলল, 'চার্চ থেকে আপনার খাওয়ার খরচ দেওয়া হচ্ছে। কাজেই নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, এ গ্রামের লোকজনের কাছে আপনার সঙ্কোচের কোনো কারণ নেই।'

দু'চোখে অসীম বিস্ময় নিয়ে এবার ডানিয়েল বলল, 'চার্চ থেকে আমার খাওয়ার খরচ দেওয়া হচ্ছে!'

'হ্যাঁ। রেভারেণ্ড আপ্তে এই ব্যবস্থা করেছেন।'

'কী ব্যাপার বলুন তো? হঠাৎ চার্চ থেকে আমার খাওয়ার দায়িত্ব নেওয়া হল যে?'

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল না সুভদ্রা। একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আপনি একজন কৃশ্চান তো?'

'অবশ্যই।' ডানিয়েল মাথা নাড়ল।

'দূর দেশে এসে একজন কৃশ্চান যদি অসুবিধেয় পড়েন, চার্চেরই তো দেখবার কথা।'

দ্বিধান্বিত সুরে ডানিয়েল বলল, 'কিন্তু—'

'কী?'

'এখনও আমি তেমন অসুবিধেয় পড়িনি। আমার কাছে কিছু টাকা আছে।'

'তা থাক। আর এ সম্বন্ধে যদি আপনার কোন আপত্তি থাকে রেভারেণ্ড আপ্তেকে বলবেন, কারণ ব্যবস্থাটা তাঁরই।'

ডানিয়েল আর কিছু বলল না। তার সত্তার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত দীর্ঘ বিচিত্র এক ছায়া পড়ল। রেভারেণ্ড আপ্তে তার ভাষা শিক্ষাটা ত্বরান্বিত হোক এই চান। তা ছাড়া গীর্জা থেকে তার খরচ যুগিয়ে যাচ্ছেন। যে মানুষ তার অজ্ঞান অবস্থায় চিকিৎসা এবং পরিচর্যা করে গেছেন, যাঁকে সজ্ঞানে কোনোদিন সে দ্যাখে নি পর্যন্ত; সেই অজ্ঞাত অপরিচিত রেভারেণ্ড আপ্তে কি শতপাকের বন্ধনে তাকে জড়াতে চান? ডানিয়েলের কাছে কোনো প্রত্যাশা আছে কি তাঁর?

একসময় সুভদ্রার সঙ্গে গ্রামের ভেতর চলে গেল ডানিয়েল।

আরেক দিন একা একা এখানে এসেছিল সে। সেদিনকার মত কিছু কিছু দৃশ্য আজও চোখে পড়ল। গ্রামের পশ্চিম দুয়ার জুড়ে সেই বুড়ো দুটো বসে বসে চুট্টা ফুঁকছে আর সমানে কাশছে। ডানিয়েলের কেন জানি মনে হল, আজ নয় কাল নয় পরশু নয়—কোন অনাদি অতীত থেকে বুড়ো দুটো ঐ একই ভাবে পশ্চিম সীমান্ত আগলে বসে আছে।

ডানিয়েলকে দেখামাত্র তারা অতিরিক্ত চঞ্চল আর খুশি হয়ে উঠল। ইতিপূর্বেই তাদের সঙ্গে বন্ধুত্বটা চুট্টার ধোঁয়ায় শোধন করে নিয়েছিল ডানিয়েল। বুড়ো দুটো বলে উঠল, 'কাসা কায়?'

সেদিন তাদের ভাষা বুঝতে পারে নি ডানিয়েল। ইঙ্গিত আর ইশারাই ছিল পরস্পরকে বুঝবার পক্ষে একমাত্র অবলম্বন। আজকের ব্যাপার সম্পূর্ণ ভিন্ন। এর মধ্যে তার জ্ঞানের ঝাঁপিতে অসংখ্য মারাঠী শব্দ জমেছে। 'কাসা কায়ে'র অর্থ যে 'কেমন আছ' সেটা অনায়াসেই টের পেয়ে গেল ডানিয়েল। মারাঠীতেই সে বলল, 'ভাল আছি। প্রন্নে সমাচারম? (তোমাদের খবর কী?) আছ কেমন?' বুড়ো দুটো চমৎকৃত। এক সপ্তাহ আগে যে বিদেশী বোবার মত হাত-পায়ের মুদ্রায় মনোভাব প্রকাশ করতে চেয়েছে আজ সে-ই মারাঠী ভাষায় কথা বলছে। কিছুক্ষণ নিষ্পলক অবাক চোখে তারা তাকিয়ে রইল। তারপর প্রচণ্ড চেঁচামেচি করে উঠল, 'আরে আরে, তুমি আমাদের কথা বলতে পার দেখছি!'

ডানিয়েল হাসল শুধু, কোন উত্তর দিল না।
বুড়ো দুটো আবার বলল, 'তা হলে সেদিন বোবা সেজে ছিলে কেন?
'সেদিন তোমাদের ভাষা জানতাম না।' ডানিয়েল বলল।
'এই ক'দিনেই শিখে ফেললে!'
ডানিয়েল হেসে ঘাড় কাত করল।
'খুব ভাল কথা। এই ধর, মৌজ করে একটা চুট্টা খাও।'
দুই হাত আর মাথা প্রবল বেগে নাড়তে লাগল ডানিয়েল। ব্যাকরণ-বর্জিত কয়েকটা শব্দ পর পর বসিয়ে বোঝাতে চাইল, চুট্টার ধোঁয়া হজম করার মত কলজের তাগদ তার নেই। অতএব বুড়োরা তাকে যেন ক্ষমা করে।
এতক্ষণ নীরব ভূমিকা ছিল সুভদ্রার। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সকৌতুকে ডানিয়েল আর বুড়ো দুটোর কথা শুনে যাচ্ছিল সে। এবার তাকে সাক্ষী মেনে বুড়ো দুটো বলে উঠল, 'তোমার এই বিদেশীটা লোক ভাল, তবে আহাম্মক। ব্যাটা চুট্টা ফুঁকতে চায় না।'
সুভদ্রা হাসল। ডানিয়েলের দিকে ফিরে ইংরেজিতে বলল, 'এদের সঙ্গে বেশ জমিয়ে নিয়েছেন দেখছি।'
'সেদিন এসেছিলাম। খানিকটা আলাপ-পরিচয় হয়েছিল, এই আর কি।'
ডানিয়েলও হাসল।
সুভদ্রা বলল, 'এবার চলুন—'
'চলুন।' সামনের দিকে পা বাড়াতে গিয়ে বুড়ো দুটোর দিকে তাকাল ডানিয়েল, 'এখন চলি। পরে আবার দেখা হবে।'
'আচ্ছা।' বুড়ো দুটো মাথা নাড়ল এবং উপদেশের ভঙ্গিতে বলল, 'একটা কথা মনে রাখবে। যত তাড়াতাড়ি পার চুট্টাটি ধরে ফেল। এ হল নোনা জায়গা, উটি না ধরলে একেবারে হেজেমেঁজে যাবে।'
মূল্যবান উপদেশটি শিরোধার্য করে হাসতে হাসতে সুভদ্রার সঙ্গে এগিয়ে চলল ডানিয়েল।
গ্রামের ভেতর এসে দেখা গেল সমস্ত জনপদটা সেদিনের মতই পুরুষশূন্য। তবু সেদিন রাস্তায় রাস্তায় অল্প বয়সের ছেলেমেয়ের দঙ্গল চোখে পড়েছিল। আজ তারাও নেই। শুধু প্রতিটি বাড়ির দরজায়-জানালায় আগের মতই কালো কালো মানবীর মুখ চোখে পড়ল।
ডানিয়েল বলল, 'আচ্ছা—'
তার দিকে মুখ ফিরিয়ে সুভদ্রা জিজ্ঞেস করল, 'কি বলছেন?'
'দিনকয়েক আগে এখানে এসেছিলাম। সেদিন কোনো পুরুষমানুষ চোখে পড়েনি; আজও তাদের কাউকে দেখছি না। এরা সব গেছে কোথায়?'
'আরেবীয়ান সী'তে।'
'সেখানে কী?'
সোজাসুজি উত্তর দিল না সুভদ্রা। একটু ঘুরিয়ে খানিক রহস্য করে বলল, 'সেখানে তাদের বাঁচা-মরার দায়। সেখানে একদিন না গেলে তাদের চলে না।'

'মানে?' সরাসরি সুভদ্রার চোখের ভেতর তাকাল ডানিয়েল।

'আপনার কি কিছুই মনে থাকে না! আগেই তো বলেছি এটা মুক্তোচাষী আর জেলেদের গ্রাম। ওদের কি ঘরে বসে থাকার উপায় আছে। রাত থাকতে থাকতে ওরা সমুদ্রে ছোটে, সমস্ত দিন মাছ ধরে সেই মাছ আড়তদারদের ঘরে তুলে দিয়ে ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে যায়।'

দিনের বেলা সমর্থ সাবালক পুরুষগুলোর গ্রামে অনুপস্থিতির কারণ এতক্ষণে পরিষ্কার হল। প্রসঙ্গত ডানিয়েলের মনে পড়ল, এখনও তার সমুদ্রে যাওয়া হয় নি। বলল, 'পুরুষগুলো না হয় সমুদ্রে গেছে, বাচ্চাগুলোকে তো দেখছি না। তারা সব কোথায়?'

'তারা স্কুলে আমার জন্যে বসে আছে।' বলেই তাড়া লাগাল সুভদ্রা, 'এভাবে আস্তে হাঁটলে চলবে না, জোরে জোরে পা চালান।'

একটু পরেই দু'-জনে স্কুলে পৌঁছে গেল।

স্কুলটা গ্রামের উত্তর প্রান্তে। লম্বা একচালা একখানা ঘর, পিপুল কাঠের খুঁটির মাথায় ইনু ঘাসের পচা ছাউনি। একদা চারিধারে কাদা-পাথরের দেওয়াল ছিল, তিন দিকেরটা কবেই ধসে গেছে। বাকি একটা দিক কোনোরকমে মাথা তুলে আছে। একটা খুঁটির গায়ে টিনের সাইনবোর্ড ঝুলছে। তাতে লেখা আছেঃ মনপুরা প্রাইমারি স্কুল। মনপুরা। পরিচালনা ঃ ওয়েস্টার্ন ঘাট কৃশ্চিয়ান মিশন।

স্কুল বাড়িটায় আর জায়গা নেই। গ্রামের তাবত ছেলেমেয়ে এখানে এসে ভিড় জমিয়েছে। সবার হাতেই ছেঁড়া মলিন বর্ণপরিচয় বা প্রথমভাগ-দ্বিতীয় ভাগের ধ্বংসাবশেষ, ভাঙা শ্লেটের টুকরো। দু'-চারজনের হাতে উড পেন্সিল এবং দোয়াত কলমও চোখে পড়ল।

যাই হোক সুভদ্রার সঙ্গে ডানিয়েলকে দেখামাত্র সাড়া পড়ে গেল। শিশুর পাল সমস্বরে চেঁচামেচি শুরু করে দিল, 'সুভদ্রা মাসি এসেছে। সুভদ্রা মাসি এসেছে।' 'সাহেব এসেছে। সাহেব এসেছে।'

বলা বাহুল্য আজ আর কথাগুলো বুঝতে অসুবিধে হল না ডানিয়েলের। ঘাড় দুলিয়ে দুলিয়ে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল সে।

ঘরটার এককোণে জলচৌকি জাতীয় উঁচু বসবার জায়গা। সুভদ্রা কোনো দিকে না তাকিয়ে সোজা তার ওপর গিয়ে বসল।

নিচে সামনের দিকে ছেঁড়া বিবর্ণ চাটাই পাতা। সেখানে ছাত্র-ছাত্রীদের বসবার ব্যবস্থা। সুভদ্রা কিছু বলবার আগেই বালখিল্যদের দলে গিয়ে ঝুপ করে বসে পড়ল ডানিয়েল।

ছেলেমেয়ের দল প্রথমটা অবাক, তারপর সুভদ্রার উদ্দেশে বলল, 'মাসি, সাহেব আমাদের সঙ্গে বসে পড়ল যে!'

সুভদ্রা উত্তর দেবার আগেই ভাঙা ভাঙা স্বরে ডানিয়েল বলে উঠল, 'আমি তোমাদের স্কুলে পড়ব।'

'সত্যি!'

'হ্যাঁ, সত্যি।'

সবাই একসঙ্গে চিৎকার জুড়ে দিল, 'কি মজা! কি মজা! সাহেব আমাদের সঙ্গে পড়বে।'

এই আনন্দিত কলরবের মধ্যে একটা ছোট মেয়ে টুক করে মন্তব্য করল, 'ই-হি, এত বড় ছেলে আমাদের সঙ্গে পড়বে! ই-হি—'

সঙ্গে সঙ্গে সারা স্কুল ঘরটায় হাসির ধুম পড়ে গেল। এমনকি গম্ভীর গীর্জাবাসিনী সুভদ্রা যোসেফও হেসে ফেলল।

মোটামুটি ঘণ্টা তিনেকের মধ্যেই পড়াশোনার পালা চুকল। তারপর স্কুল ছুটি দিয়ে দিল সুভদ্রা। এতক্ষণ একটা বেগবান প্রচণ্ড স্রোতকে যেন আটকে রাখা হয়েছিল, ছুটি পাওয়ামাত্র জলোচ্ছ্বাসের দিশেহারা স্রোতের মত ছেলের দল হৈ চৈ বাধিয়ে চারদিকে ছুটে গেল।

সুভদ্রার কাছে সর্বক্ষণের সঙ্গী একটা চিত্রবিচিত্র কাপড়ের ঝোলা রয়েছে। আর আছে একটা ছাতা। ঝোলাটা কাঁধে ঝুলিয়ে, ছাতাটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল সুভদ্রা। বলল, 'চলুন—'

নিঃশব্দে উঠে পড়ল ডানিয়েল।

বাইরে আসতেই দেখা গেল সূর্যের অদৃশ্য রথ মধ্য আকাশের দেউড়িতে পৌঁছে গেছে। ছাতা খুলে সুভদ্রা বলল, 'এর তলায় আসুন। আমি এখন চার্চে ফিরব, আপনি তো যাবেন আপনার আস্তানায়?'

'হ্যাঁ।'

'একসঙ্গে খানিকটা পথ যাওয়া যাবে। যতটুকু পারেন রোদের হাত থেকে মাথাটা বাঁচান।'

'একটু ইতস্তত করল ডানিয়েল। কিন্তু সুভদ্রা যদি অসঙ্কোচে ডাকই দিতে পারে তার কুণ্ঠা কেন? আস্তে আস্তে ছাতার তলায় গিয়ে দাঁড়াল সে।

যেতে যেতে সুভদ্রা বলল, 'স্কুল কেমন দেখলেন?'

'ছাত্র-ছাত্রী অনেকগুলো। সেদিক থেকে ভালই। তবে—'

'কী?'

কিছু বলতে গিয়েও বলল না ডানিয়েল।

সুভদ্রা বলল, 'কি, চুপ করে কেন? বলুন।' একটু থেমে ডানিয়েলের মুখে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আবার বলল, 'যা মনে হয়েছে বিনা দ্বিধায় বলুন।'

খানিকটা সাহস পেল যেন ডানিয়েল। ধীরে বলল, 'একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম, সব ছেলেমেয়েই একসঙ্গে ক্লাস করছে। এদের মধ্যে পড়াশোনায় কেউ এগিয়ে আছে, কেউ পিছিয়ে। এ অবস্থায় ছাত্র অনুযায়ী ক্লাস ভাগ করে নেওয়া দরকার। তাতে সুশৃঙ্খলভাবে কাজ করা যায়। নইলে সব জাতের ছাত্রকে নিয়ে একসঙ্গে ক্লাস করলে গোলমাল হবে, একটু আগে তাই দেখলাম।'

'ঠিকই বলেছেন। এ বিষয়ে আমিও ভেবেছি। তবে ক্লাস ভাগ করার অসুবিধেটা কোথায় জানেন?'

'কোথায়?'

'আমি একা মানুষ, তিন চারটে আলাদা ক্লাস যদি করে নিই সামলাব কেমন করে? এমনিতে মাসে দশ দিন স্কুল করতে পারি। একসঙ্গে সবাই পড়ে বলে গোলমালের মধ্যেও কিছু কিছু শিখতে পারছে। ক্লাস ভাগ করলে একদিনে একটার বেশি ক্লাস নিতে পারব না, বাকি ক্লাসগুলো হাত-পা গুটিয়ে মুখ বুজে বসে থাকবে।'

'তা বটে, তা বটে।' ডানিয়েল মাথা নাড়ল।

খানিকটা পর ডানিয়েল আবার বলল, 'আরেকটা বিষয়ে আমার কিছু বলবার আছে।'

'কী বিষয়ে?'

'স্কুলের গায়ে একটা টিনের সাইনবোর্ড রয়েছে। সেটায় লেখা আছে এই প্রাইমারি স্কুলটার পরিচালনায় দায়িত্ব ওয়েস্টার্ন ঘাট ক্রিশ্চিয়ান মিশনের।'

জিজ্ঞাসু সুরে সুভদ্রা বলল, 'হ্যাঁ, তাতে কী হয়েছে?'

ডানিয়েল বলল, 'আপনি হয়ত অসন্তুষ্ট হবেন, তবু না বলে পারছি না। মিশন যখন দায়িত্ব নিয়েছে তখন স্কুলটার চেহারা আরেকটু ভাল হওয়া উচিত ছিল। ভাঙাচোরা বাড়ি, হাফনেকেড্ ছেলেমেয়ে, পুরনো ময়লা বই, বেঞ্চি নেই, টেবিল নেই—এই সব মিলিয়ে এমন দুরবস্থা যে বলবার নয়। শুনেছি ইণ্ডিয়ায়, আফ্রিকায় এবং অন্যত্র মিশনারিরা যে-সব প্রতিষ্ঠান চালায় সেগুলো খুবই সন্তোষজনক। কিন্তু আপনাদের এখানে এসে দেখছি অন্যরকম।'

সুভদ্রার মুখের আলো যেন একেবারে নিভে গেল। নির্জীব সুরে সে বলল, 'এর চাইতে ভাল কিছু করার উপায় আমাদের নেই।'

'কেন?'

'বোম্বাইয়ের মিশন থেকে আমরা আর্থিক সাহায্য পাই না। কিভাবে স্কুলগুলোর চেহারা ভাল হবে বলুন?'

ডানিয়েল বলল, 'কিন্তু আমি তো জানি এ জাতীয় জনকল্যাণের কাজে চার্চগুলো প্রচুর সাহায্য পেয়ে থাকে। তা হলে আপনারা পান না কেন?'

তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল না সুভদ্রা। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'আপনি যখন এখানে আছেন, আস্তে আস্তে সবই জানতে পারবেন।'

এ প্রসঙ্গে আর কোনো প্রশ্ন করা সঙ্গত মনে হল না ডানিয়েলের।

কথামত পরের দিন স্কুল ছুটির পর ডানিয়েলকে নিয়ে চার্চে রওনা হল সুভদ্রা। যেতে যেতে রীতিমত উত্তেজনা অনুভব করতে লাগল ডানিয়েল। ধমনীতে দ্রুত ঝঙ্কারে ক্রমাগত কি যেন বেজে যাচ্ছে। সুভদ্রা সম্বন্ধে এখন পর্যন্ত বিশেষ কিছুই জানা যায়

নি। পশ্চিমঘাটের এই গীর্জাবাসিনী মেয়েটা তার জীবনযাত্রার প্রায় সবখানিই যবনিকার আড়ালে ঢেকে রেখেছে। সামান্য যেটুকু তার সম্বন্ধে জানা গেছে সেটুকুতে ডানিয়েলের কৌতূহল আদৌ তৃপ্ত নয়, বরং সুভদ্রা সম্বন্ধে তার আগ্রহ সীমাহীন। আজ হয়ত চার্চে গিয়ে এই মেয়েটার চারপাশ থেকে দু'-একটা পর্দা সরানো যাবে।

তা ছাড়া রেভারেণ্ড আপ্তের সঙ্গেও পরিচয় হবে। তাঁরই আমন্ত্রণে আজ চার্চে চলেছে ডানিয়েল। রেভারেণ্ড আপ্তে কেমন দেখতে, ব্যবহার তাঁর কিরকম. কিছুই জানা নেই। অথচ তার বেহুঁশ অবস্থায় এসে এই মানুষটি একদিন প্রাণ বাঁচিয়ে গিয়েছিলেন। সেজন্য ডানিয়েল অসীম কৃতজ্ঞ। আবার কিছু কিছু উৎকণ্ঠাও আছে। সুভদ্রার মুখে যেটুকু সে শুনেছে তাতে মনে হয়েছে তাকে ঘিরে রেভারেণ্ড আপ্তের কোনো গভীর উদ্দেশ্য রয়েছে। সেই উদ্দেশ্যটা যে কী, কে জানে। আজ ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হলে হয়ত কিছু আভাস পাওয়া যেতে পারে।

রেভারে আপ্তে তাকে কী বলবেন, কোনো অবাঞ্ছিত জেরার সম্মুখীন হতে হবে কিনা, আগে থেকে সে ব্যাপারে জোর করে কিছু বলা যায় না। ডানিয়েলের প্রাণের এক কোণে ভয়ের একটি ছায়া আছে। তার আশঙ্কা রেভারেণ্ড আপ্তে হয়ত কথায় কথায় নাম ঠিকানা পিতৃ-পরিচয় বংশ-পরিচয় ইত্যাদি সম্পর্কে প্রশ্ন করতে করতে পালিয়ে আসার প্রসঙ্গে চলে যেতে পারেন। পালানোর কথাটা সুভদ্রার কাছে গোপন রাখা গেছে। রেভারেণ্ড আপ্তে যদি জেরায় জেরায় সেটা বার করে নেন? ডানিয়েল স্থির করল নিজেকে সে সতর্ক রাখবে এবং রেভারেণ্ডআপ্তের প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দশ বার করে ভেবে দেবে। যেভাবেই হোক পালিয়ে আসার কথাটা তাকে এড়িয়ে যেতেই হবে।

একই ছাতার তলায় সুভদ্রা যোসেফের সঙ্গে পাশাপাশি চলতে চলতে বিচিত্র অস্থিরতায় ডানিয়েলের সমস্ত অস্তিত্ব দোল খেতে লাগল।

গ্রাম থেকে বেরিয়ে যে পাহাড়ী রাস্তাটা চড়াই-উতরাইতে তরঙ্গিত হতে হতে খাড়া উত্তরে গেছে সেটা ধরে অনেক দূর এসে পড়েছে দু'-জনে। রাস্তাটার একপাশে উঁচু পাহাড়, আরেক পাশে অতল খাদ। খাদে বা পাহাড়ে যেদিকে চোখ ফেরানো যাক পশ্চিমঘাটের অপূর্ব বনশ্রী দুপুরের শাণিত রোদে জ্বলছে।

যতদূর মনে পড়ছে, মাসটা অক্টোবর অর্থাৎ শরৎকাল। সুদূর পশ্চিমঘাটে শরৎই কি তবে ফুল ফোটাবার ঋতু? পুবে-পশ্চিমে-উত্তরে-দক্ষিণে—যেদিকেই ডানিয়েল তাকাচ্ছে শুধু ফুল আর ফুল। হলুদ-নীল-লাল-সাদা—অজস্র রঙের সমারোহে চারিদিক ভেসে গেছে যেন। আকাশে আর দু'-পাশের বনচূড়ায় নানা রঙের নানা চেহারার অসংখ্য পাখি ডানা মেলে আছে।

ডানিয়েল অবাক। ক'দিন আগে কোলাপুর থেকে যে পথ ধরে সে এখানে এসেছিল সেদিকটা ছিল রুক্ষ, কর্কশ, ধাতব। ক্বচিৎ দু'-চারটে কন্টিকারি আর বাবলা জাতীয় কাঁটাগাছ চোখে পড়েছিল। মাটি থেকে প্রাণদায়িনী রস টেনে নিতে পারে নি বলেই ঘাসের চেহারা ছিল রুগ্ন, রং ছিল হলুদ। আর এদিকটায় শ্যামল সরস প্রাণ তার প্রদর্শনী সাজিয়ে রেখেছে। এত কাছাকাছি কোথাও পশ্চিমঘাট সজীব উচ্ছ্বাসে রঙিন ফুলের

গয়নায় সেজে আছে। আবার কোথাও নির্জীব মরুনীরস। বিচিত্র লীলা এই পাহাড়ের। এক জায়গায় সে প্রসূতি হলে আরেক জায়গায় মৃতবৎসা।

প্রকৃতির এই স্বদেশে পাখি আর ফুল দেখতে দেখতে নিজের অজান্তে কখন যেন মুগ্ধ হয়ে গেল ডানিয়েল। রেভারেণ্ড আপ্তের কথা আর মনে রইল না। কোন পাখিটার কী নাম, হলুদ রঙের ফুল যে গাছটা ফুটিয়েছে তার কী পরিচয়, যে সবুজ শ্যামলী লতাটা এঁকেবেঁকে পল্লবিত হয়ে আছে তাকে এখানে কী বলে— ইত্যাদি ইত্যাদি নানা প্রশ্ন করে সঙ্গিনীকে ঝালাপালা করে তুলতে লাগল।

সুভদ্রার বিন্দুমাত্র বিরক্তি নেই। চোখে মুখে স্নিগ্ধ একটি হাসি ফুটিয়ে প্রবীণ অভিভাবিকা যেভাবে শিশুর সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যায় সেইভাবে সে বলে যেতে লাগল, ঐ পাখিটার নাম শারিক, ঐ পাখিটার নাম তোতা, ঐ গাছটার নাম পিপুল, ঐ ফুলটার নাম পলাশ।

কথায় কথায় কখন যে পায়ের তলা থেকে দীর্ঘ পাহাড়ী পথ সরে গেছে, খেয়াল নেই। ডানিয়েলের কৌতূহল মেটাতে মেটাতে হঠাৎ সুভদ্রা বলে উঠল, 'আমরা এসে গেছি।'

ঈষৎ চমকে সামনের দিকে তাকাল ডানিয়েল। সেখানে একটা চড়াইয়ের মাথায় পাথরের সুবিশাল চার্চটা দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার তীক্ষ্ম চূড়ায় একটা ক্রশ। ডানিয়েল খেয়াল করে নি, নইলে অনেক আগেই ওটা তার চোখে পড়ার কথা। মানবপুত্র একদিন নিজের শোণিতে এই কলঙ্কিত পাপবিদ্ধ পৃথিবীকে পবিত্র করে গিয়েছিলেন। সুদূর পশ্চিমঘাটের এই প্রান্তে সেই তারই চিরন্তন সংবাদ ঘোষণা করার জন্য ঐ ক্রশটা বুঝি মাথা তুলে রয়েছে। ঐ ক্রশ হিংস্র ভয়ঙ্কর জগৎকে শুদ্ধ, নিষ্পাপ এবং পবিত্র হওয়ার প্রেরণা দিয়ে চলেছে।

সামনের দিকটায় বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা সবুজ ঘাসের বড় মাঠ। ডানিয়েলকে নিয়ে মাঠ পেরিয়ে গীর্জার সিঁড়ির কাছে এসে পড়ল সুভদ্রা। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতেই প্রকাণ্ড বারান্দা, গোথিক ধরনের মোটা মোটা অনেকগুলো থামও চোখে পড়ল।

বারান্দায় আসতেই তাঁকে দেখা গেল। সাড়ে ছ'ফুটের মত দীর্ঘ, মেরুদণ্ড সোজা, সরু কোমরের ওপর দিকে বিশাল বুক, হাতের আঙুল জানুর কাছে নেমে এসেছে। দীর্ঘ প্রসন্ন চোখ। একটি চুলও আর কালো নেই। মুখের চামড়া শিথিল হয়ে গেছে, কপালে অসংখ্য সরু সরু রেখা। গায়ের রং পোড়া ব্রোঞ্জের মত। পরনে ধবধবে সারপ্লিস। গলায় কালো কারে পিতলের ছোট খ্রিস্ট মূর্তি। বয়স নিঃসন্দেহে ষাটের ওপর। ষাটের কতখানি উর্ধ্বে সেটা অবশ্য অনুমান করা গেল না।

দেখামাত্রই ডানিয়েল অনুভব করল, এই ঋজু সবল মানুষটি দৈর্ঘ্যেই শুধু তার চাইতে বড় নয়। চোখের দৃষ্টিতে অথবা প্রকাণ্ড বাহুতে কিংবা বিশাল বুকখানায়— কোথায় যে তাঁর প্রবল অনমনীয় একটা ব্যক্তিত্ব আছে, কে বলবে। এই মানুষটির সংস্পর্শে যে-ই আসুক তাকে সম্মোহিত হতেই হবে। নিজের দীর্ঘ ছায়া দিয়ে সম্ভবত ইনি অন্যকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে পারেন।

দীর্ঘ প্রসন্ন পুরুষটি পায়ে পায়ে এগিয়ে এলেন। ডানিয়েলের দিকে একটা হাত বাড়িয়ে বিশুদ্ধ ইংরেজিতে বললেন, 'আপনার জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছি।'

পাশ থেকে সুভদ্রা ডানিয়েলের কানে ফিসফিস করল, 'ইনি রেভারেণ্ড আপ্তে।'

না বলে দিলেও চলত, আগেই তা আন্দাজ করেছে ডানিয়েল। সসম্ভ্রমে অনেকখানি ঝুঁকে রেভারেণ্ড আপ্তের বাড়ানো হাতখানা ধরল সে। আর ধরেই অবাক হয়ে গেল। রেভারেণ্ড আপ্তে কৃশ্চান হলেও ইণ্ডিয়ান নেটিভ। এই নেটিভদের সম্বন্ধে অনেক কাহিনী পড়েছে ডানিয়েল। ইণ্ডিয়ায় কিছুদিন কাটিয়ে যে সব খাস ব্রিটিশ সন্তান নিজেদের দ্বীপে ফিরে এদেশ সম্বন্ধে ঢাউস বই ফেঁদে ফেলে তাদের মারফত চোলাই হয়ে কিছু কিছু জ্ঞান ডানিয়েলের কাছেও পৌঁছেছে। ঐ সব লেখকের শতকরা নিরানব্বুই জনই ইণ্ডিয়া সম্পর্কে অনুদার, সহানুভূতিহীন, নির্দয়। কলোনিয়াল ওভারলর্ডদের দৃষ্টিতে তারা এদেশের মানুষকে দেখেছে। সবগুলো কালো রং ইণ্ডিয়ার নেটিভদের মুখে ছুঁড়ে দিয়ে সেই বিকৃত চেহারার প্রদর্শনী তারা জগতের সামনে মেলে ধরেছে। ফলে দেখা গেছে এই সব নেটিভ ভীরু, কুকুরের মত কামুক, কাপুরুষ, বিশ্বাসঘাতক ইত্যাদি ইত্যাদি। তাদের সম্বন্ধে শ্রদ্ধা সম্ভ্রমের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। কিন্তু এই মানুষটি—রেভারেণ্ড আপ্তেকে দেখে তো তা মনে হচ্ছে না। বরং তাঁর হাতখানা নিজের মুঠোর ভেতর টেনে নিয়ে ডানিয়েলের মনে হতে লাগল, ব্রিটিশ লেখকরা সবাই মিলে এ দেশের নেটিভদের সম্বন্ধে তার মনে যে ধারণা এঁকে দিয়েছিল, ইনি একাই তা সবটাই মুছে দিতে পারেন।

রেভারেণ্ড আপ্তে আবার বললেন, 'এখন কেমন আছেন?'

'ভাল আছি।' ডানিয়েল বলল।

'কোনরকম অসুস্থতা বোধ করছেন না ত?'

'আজ্ঞে না।'

'দুর্বলতা?'

'না।'

রেভারেণ্ড আপ্তে ডানিয়েলের চোখে দৃষ্টি রেখে হাসলেন, 'তা হলে পারফেক্টলি অলরাইট?'

ডানিয়েলও হাসল, 'পারফেক্টলি অলরাইট।'

হঠাৎ কিছু মনে পড়তে এবার ব্যস্ত হয়ে উঠলেন রেভারেণ্ড আপ্তে, 'ঐ দেখুন, এখানে দাঁড় করিয়েই কথা বলে যাচ্ছি। আসুন, ভেতরে আসুন।' বলে নিজেই প্রথমে পা বাড়িয়ে দিলেন।

তাঁকে অনুসরণ করে ডানিয়েলরা চার্চের অন্দরমহলে এসে ঢুকল। বারান্দার পরই সুবিশাল অলটার। সেখানে উঁচু বেদীর ওপর মানবপুত্রের ক্রুশবিদ্ধ মূর্তি। ব্রোঞ্জে তৈরি ধাতুমূর্তিটি প্রায় দশ ফুটের মত। নিচে সারি সারি সাজানো অসংখ্য বাইবেল। পাথরের ধূপাধার থেকে এই মুহূর্তে সুরভিত ধোঁয়া মৃদু রেখায় উঠে আসছে। আর আছে ফুল, ধবধবে সাদা যুঁই এবং রজনীগন্ধা।

অল্টারে এসে ঢোকামাত্র মাথা আপনিই নত হয়ে আসে। যুগে যুগে যত উদ্ধত দিগ্বিজয়ী বীর ঝলসিত তরবারিতে পৃথিবী কাঁপিয়ে বেড়িয়েছে তারা যদি সবাই দল বেঁধে এখানে আসে, মাথা নামিয়ে থমকে দাঁড়াতে হবে। এই অল্টার তার সমস্ত শুচিতা নিয়ে সত্তার গহন কেন্দ্রে সঞ্চারিত হয়ে যায় যেন।

খ্রিস্টমূর্তির সামনে দিয়ে যেতে যেতে একবার দাঁড়িয়ে পড়লেন রেভারেণ্ড আপ্তে। চোখ বুজে বুক, বাহুসন্ধি আর কপাল ছুঁয়ে ক্রশ আঁকলেন। তিনি থামতে ডানিয়েলরাও দাঁড়িয়ে পড়েছিল। নিজেদের অজ্ঞাতসারে বুঝি তারাও ক্রশ আঁকল।

এদিকে রেভারেণ্ড আপ্তে আবার চলতে শুরু করেছেন। মন্ত্রচালিতের মত ডানিয়েলও চলেছে। তার পাশে সুভদ্রা যোসেফ।

যেতে যেতে রেভারেণ্ড বললেন, 'দু-দিনের ওপর বেহুঁশ হয়ে ছিলেন। আমি একদিন গিয়ে দেখে এসেছিলাম, ইঞ্জেকসানও দিয়েছিলাম।'

'হ্যাঁ, মিস জোসেফের কাছে আমি শুনেছি।' ডানিয়েল বলল।

'তারপর আরো যাওয়া উচিত ছিল কিন্তু এই চার্চ ছেড়ে কিছুতেই বেরুতে পারিনি। নানা ঝামেলায় আটকে পড়েছিলাম। তবে সুভদ্রার কাছে প্রতিদিন আপনার খোঁজ নিয়েছি, আপনি কেমন আছেন জেনে নিয়ে ওষুধের ব্যবস্থা করেছি।'

'মিস যোসেফ আমাকে বলেছেন।' ডানিয়েল বলতে লাগল, 'আমার অজ্ঞান অবস্থায় আপনি গিয়েছিলেন। জ্ঞান হবার পর আপনার কথা শুনে আপনাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করত। আপনি আমার প্রাণ—' এই পর্যন্ত বলে হঠাৎ থেমে গেল সে। স্বাভাবিক কৃতজ্ঞতার বশে রেভারেণ্ড আপ্তেকে নিশ্চয়ই তার দেখতে ইচ্ছা হয়েছে। কিন্তু তাঁর সেই উদ্দেশ্যটার কথা আচমকা মনে পড়ে যেতে নিজের উচ্ছ্বাস গুটিয়ে নিল ডানিয়েল।

মুখ ফিরিয়ে রেভারেণ্ড আপ্তে বললেন, 'প্রাণ বাঁচাবার কথা বলছেন? আমি বাঁচাবার কে? সবই করুণাময়ের ইচ্ছা।'

ডানিয়েল এবার কিছু বলল না, কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে একবার তাকাল শুধু।

রেভারেণ্ড আবার বললেন, 'এখানে এসে ক'টা দিন খুব কষ্ট পেলেন।'

'কষ্ট কোথায়—' ডানিয়েল মাথা নাড়ল, 'আপনারা যেভাবে সেবা-যত্ন করেছেন তাতে কষ্ট পাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।'

অল্টার পেরিয়ে সবাই চার্চের ভেতর চলে এল। রেভারেণ্ড আপ্তে বললেন, 'এখন আর কোনো কথা নয়। সুভদ্রা, মিস্টার ডানিয়েলকে তোমার ঘরে নিয়ে যাও। এতটা পথ রোদে হেঁটে এসেছেন, একটু বিশ্রামের পর স্নানের ব্যবস্থা করে দেবে।' ডানিয়েলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনি সুভদ্রার সঙ্গে যান। স্নান হলে ওর সঙ্গে চলে আসবেন। আমরা আজ একসঙ্গে খাব।'

রেভারেণ্ড আপ্তে আর অপেক্ষা করলেন না। লম্বা করিডর ধরে দীর্ঘ পা ফেলে এগিয়ে চললেন। আর সুভদ্রা যোসেফ ডানিয়েলকে নিয়ে গেল বাঁ দিকে।

সুভদ্রার মাঝারি মাপের ঘরখানা চার্চের উত্তর প্রান্তে। সেখানে আসবাব বলতে কাঠের একটা তক্তাপোষ, তার ওপর সামান্য সংক্ষিপ্ত বিছানা। শিয়রের দিকে কাঠের জলচৌকি। এককোণে দড়িতে টাঙানো খান-দুই সাদা শাড়ি আর ব্লাউজ। পূর্ব দিকের দেওয়ালে যীশুখ্রিস্টের একখানা ছবি। কোথাও বাহুল্য নেই, চোখ ধাঁধাবার চেষ্টা নেই। সর্বত্যাগিনী সন্ন্যাসিনীর নিরলঙ্কার আবাস।

সুভদ্রা বলল, 'বসুন।'

ডানিয়েল জলচৌকিতে বসলে স্নানের জন্য একখানা তোয়ালে আর তেল নিয়ে এল সুভদ্রা। ডানিয়েল বলল, 'তেল লাগবে না।'

'না-না, আপনি মাখুন। এ নোনা রাজ্য। তেল না মাখলে ''' খসখসে হয়ে যাবে।'

সতর্কবাণীটা ডানিয়েলকে বিশেষ চিন্তিত করতে পারল বলে মনে হয় না। কিছুতেই গায়ে বা চুলে তেল মাখল না সে।

খানিকক্ষণ বিশ্রাম করে স্নানের পালা চুকিয়ে সুভদ্রার সঙ্গে রেভারেণ্ড আপ্তের ঘরে চলে এল ডানিয়েল। সুভদ্রার মত এ ঘরটিতেও কোনোরকম বাহুল্য নেই।

রেভারেণ্ড আপ্তে তাদেরই প্রতীক্ষায় ছিলেন। দেখা গেল মেঝেতে তিনখানা আসন পাতা এবং আসনগুলোর সামনে বেতের ঝুড়ি দিয়ে খাবার ঢাকা রয়েছে।

রেভারেণ্ড আপ্তে আসন দেখিয়ে বললেন, 'বসুন।'

তিন জনে খেতে বসল। ইতিমধ্যে মাত্র কয়েক দিনের পলাতক জীবনে আসনে বসে খাওয়ার মোটামুটি একটা অভ্যাস করে ফেলেছে ডানিয়েল। কী আর করা! যস্মিন দেশে যদাচারঃ।

ঝুড়ি খুলতেই দেখা গেল মোটা মোটা রাঙা চালের ভাতে থালা সাজানো। তিনটে বাটিতে ডাল, তরকারি আর ভাজা রয়েছে। জেলেদের গ্রামে ডানিয়েল যা খাচ্ছে, চার্চে তার চাইতে ব্যতিক্রম কিছু নেই। খাদ্য সম্পর্কে সমস্ত প্রলোভন এবং বিলাসিতা তারা দূরে সরিয়ে রেখেছে।

ভাত মাখতে মাখতে রেভারেণ্ড আপ্তে বললেন, 'আমাদের এখানে মাছ-মাংসের প্রবেশ নিষিদ্ধ। নিরামিষ খেতে নিশ্চয়ই আপনার অসুবিধে হবে।'

অসুবিধে যে হবে, বলাই বাহুল্য। ভদ্রতার খাতিরে ডানিয়েল ব্যস্তভাবে বলে উঠল, 'না-না, অসুবিধে আর কি। তবে একটা চামচ পেলে ভাল হত।'

'ও, আচ্ছা।' বলেই রেভারেণ্ড আপ্তে গলার স্বর উঁচুতে তুলে ডেকে উঠলেন, 'কে আছিস, একটা চামচ নিয়ে আয়।'

একটা লোক ছুটে এসে চামচ দিয়ে গেল।

খেতে খেতে রেভারেণ্ড আপ্তে বললেন, 'যা খাচ্ছি, এর চাইতে বেশি কিছুর সংস্থান করা চার্চের পক্ষে সম্ভব নয়। তা ছাড়া—'

'কী?' ডানিয়েল উন্মুখ হল।

'আপনি ত মনপুরায় আছেন। ওখানকার লোক কী খেতে পায় জানেন। শুধু ওরা নাকি, আশেপাশে যত গ্রাম আছে সব জায়গাতেই এক অবস্থা, ওরা যদি ঐ

রকম খায়; ওদের কাছ থেকে ভালমন্দ আমরা কি মুখে তুলতে পারি? না তেমন প্রবৃত্তি হওয়া উচিত?'

'তা তো বটেই, তা তো বটেই।' ডানিয়েল বুঝতে পারল, রেভারেণ্ড আপ্তে এবং এই চার্চ চারিদিকের জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। বরং তাদের সঙ্গে এই চার্চের আত্মার সংযোগ।

কিছুক্ষণ নীরবতা। শুধু তিনটি মানুষের ভাত মাখা এবং চিবানোর শব্দ ছাড়া আর কোনো আওয়াজ নেই।

একসময় রেভারেণ্ডই স্তব্ধতা ভাঙলেন। ডানিয়েলের দিকে ফিরে বললেন, 'সুভদ্রার কাছে শুনেছি আপনি ইংলিশম্যান।'

চামচ দিয়ে ভাত তুলতে গিয়ে থমকে গেল ডানিয়েল। তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে একবার রেভারেণ্ডকে দেখে নিল সে। তার স্নায়ুগুলো অস্পষ্টভাবে টের পেল, এবার হয়ত অবাঞ্ছনীয় জেরাটা শুরু হবে। খুব সতর্ক ভঙ্গিতে সে বলল, 'হ্যাঁ, আমি ইংলিশম্যান।'

'ম্যারেড?'

'ওহ্, নো।'

'মা-বাবা আছেন?'

'আছেন।'

'ভাই-বোন?'

'না। আমি একাই।'

'বাবা কী করেন?'

একটু চিন্তা করে মিথ্যেই বলল ডানিয়েল, 'লণ্ডনের একটা অফিসের একজিকিউটিভ।'

'আপনিও কি চাকরি করেন? না ছাত্র? ছাত্র নিশ্চয়ই।' রেভারেণ্ড হাসলেন।

'হ্যাঁ, ছাত্র। অক্সফোর্ড ডিগ্রি কোর্সের। এ বছর ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েছি।'

'ইণ্ডিয়ায় কদ্দিন এসেছেন?'

'দিন কুড়ি বাইশ।'

'পরীক্ষার পর ছুটি কাটাতে নিশ্চয়ই?'

ডানিয়েল আরাম বোধ করল। রেভারেণ্ড আপ্তেকে যতখানি ভয়াবহ মনে হয়েছিল, দেখা যাচ্ছে, আসলে তিনি তা নন। প্রশ্নগুলো করছেন বটে, সেই সঙ্গে উত্তরগুলোও ডানিয়েলের হাতের কাছে এগিয়ে দিচ্ছেন। ফলে জবাব দেওয়া সহজ হচ্ছে। নইলে বানিয়ে বানিয়ে ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে বলা রীতিমত কষ্টকর হয়ে উঠত।

ডানিয়েল তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'হ্যাঁ, ছুটি কাটাতেই এখানে এসেছি। অবশ্য ইণ্ডিয়ায় আসার আগে আরো ক'টা দেশ ঘুরেছি।'

রেভারেণ্ড উৎসাহিত হলেন। তাঁর চোখ ঝকমকিয়ে উঠল। সাগ্রহে বললেন, 'হিচ হাইক করে?'

'না।' ডানিয়েল বলতে লাগল, 'প্লেনে আর ট্রেনে টিকিট কেটে ঘুরেছি।'

ডানিয়েলের কথাগুলো শুনতে পেলেন না রেভারেণ্ড। তাঁর চোখেমুখে স্মৃতিলোকের ছোঁয়া লাগল যেন। সত্তরের সীমান্তে এসে আচমকা সমস্ত অস্তিত্ব সময়ের তরঙ্গে দোল খেতে খেতে কয়েক যুগ পিছিয়ে গেল। আস্তে আস্তে বললেন, 'আমাদের দেশে 'হিচ হাইকিং'য়ের রেওয়াজ বা সুযোগ কোনোটাই নেই। তবু পড়াশোনা শেষ করে আমি আর আমার এক বন্ধু দু'-জনে মিলে একবার চেষ্টা করেছিলাম। ফল খারাপ হয়নি, সারা ইণ্ডিয়া ঘুরে বেড়াতে পেরেছিলাম।'

'হিচ হাইকিং করে বেড়াতে পারলে চমৎকার সব অভিজ্ঞতা হয় কিন্তু। আমারও খুব ইচ্ছে ওভাবে দেশ ঘুরতে।' রেভারেণ্ড আপ্তের দুঃসাহসী অভিযান সম্ভবত ডানিয়েলকে প্রভাবিত করে ফেলেছে।

'ইচ্ছে হলে বেরিয়ে পড়লেই পারেন। এখন কোনোরকম বাধা নেই, বন্ধন নেই, পিছুটান নেই। এটাই তো বেরিয়ে পড়ার বয়েস।'

'বেরিয়ে পড়তে বলছেন!' ডানিয়েলের মুখখানা বিরস দেখাল।

রেভারেণ্ড কিছুটা অবাক। বললেন, 'না পড়বার কি আছে।'

'আপনি তো আর আমার মা-বাবাকে—' এই পর্যন্ত বলে হঠাৎ ভয়ানক চমকে থেমে গেল ডানিয়েল। সর্বনাশ, ঝোঁকের মাথায় ফাঁদে পা বাড়াতে যাচ্ছিল সে।

চোখ তুলে রেভারেণ্ড একবার ডানিয়েলের দিকে তাকালেন। কি অনুমান করলেন তিনিই জানেন। এ প্রসঙ্গের আর জের টানলেন না। ডানিয়েলের ঘাড়ে যে খাঁড়া ঝুলছিল শেষ পর্যন্ত সেটা আর নামল না। ফাঁড়াটা এখনকার মত কেটে গেল। বুকের ভেতর যে বাতাস তার রুদ্ধ হয়েছিল, ধীরে ধীরে সহজ নিশ্বাসে সেটা বেরিয়ে এল।

নিঃশব্দে আরো কিছুক্ষণ খাওয়া চলল।

একসময় রেভারেণ্ড আপ্তে ফের শুরু করলেন, 'তারপর বলুন, আমাদের এ জায়গাটা আপনার কেমন লাগছে?'

সোৎসাহে ডানিয়েল বললেন, 'চমৎকার।'

'ও-ও, নটি বয় ডোন্ট টেল লাই।' চোখ বড় করে রেভারেণ্ড বললেন, 'এখানে টেলিভিসন নেই, ক্যাবরে নেই, ক্লাব নেই, গাড়ি নেই, ঘোড়া নেই, গার্ল ফ্রেণ্ড নেই! নেই বলতে কিচ্ছু নেই। আর আপনার ভাল লাগলেই হল!'

ডানিয়েল থতমত খেয়ে গেল, 'না, মানে—'

হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠলেন রেভারেণ্ড। হাসির উদ্দামতা কিছু স্তিমিত হলে বললেন, 'অলরাইট, ধরে নিলাম কোনো কিছু না থাকা সত্ত্বেও এই হাফনেকেড, হাফ-ফেড, শিক্ষা-সহবতহীন বাসিন্দাদের দেশটা আপনার মনোহরণ করে ফেলেছে। তা এখন পড়াশোনা কেমন চলছে?'

রেভারেণ্ডের ব্যবহার বন্ধুবৎ, সহজ, উদার। ডানিয়েল বুঝতে পারল, ভাষা শেখা সম্পর্কে তিনি জানতে চাইছেন। বলল, 'এই একরকম।'

'একরকম হবে কেন? সুভদ্রা রোজই এসে খবর দেয়, রীতিমত প্রোগ্রেস করেছেন।'

'উনি বাড়িয়ে বলেছেন।' ডানিয়েল লাজুক হাসল।

'বাড়িয়ে বলার মেয়ে ও নয়।'

ডানিয়েল চুপ।

রেভারেণ্ড আবার বললেন, 'মারাঠী ভাষা কেমন লাগছে?'

'ভেরি ইন্টারেস্টিং। তা ছাড়া—'

'কী?'

'ভাল টিচার পেয়েছি। আমার শেখার চাইতে তাঁর শেখাবার কৃতিত্ব ঢের বেশি।' বলে পার্শ্ববর্তিনীর দিকে চোরা দৃষ্টি হানল। দেখল, তরুণী সন্ন্যাসিনীর মুখ আরক্ত হয়ে উঠেছে।

'তাই নাকি।' সস্নেহে হাসলেন রেভারেণ্ড আপ্তে।

'তবে—'

'কী?'

আড়চোখে আবার সুভদ্রার দিকে তাকাল ডানিয়েল। দুই ঠোঁটের প্রান্তে দুষ্টুমির একটি হাসি টিপে ধরে থেমে থেমে বলল, 'উনি সব জিনিসই ভাল করে বুঝিয়ে দেন। কিন্তু একটা আধটা শব্দের মারাঠী সিনোনিম (সমশব্দ) জিজ্ঞেস করলে ভয়ানক চটে যান। চটবার কারণটা আমি ঠিক বুঝতে পারি না।'

চকিতে মুখ তুলল সুভদ্রা। ডানিয়েলের সঙ্গে চোখাচোখি হতে আরক্ত মুখ আরো লাল হল। সঙ্গে সঙ্গে চোখ নামিয়ে থালায় ঝুঁকে পড়ল সে।

রেভারেণ্ড জিজ্ঞেস করলেন, 'কী শব্দের সিনোনিম জানতে চেয়েছিলেন?'

সুভদ্রার অবস্থা এবার অবর্ণনীয়। ডানিয়েল পাপের বোঝা আর বাড়াল না। নিরীহ সুরে বলল, 'কী জিজ্ঞেস করেছিলাম এখন ঠিক মনে পড়ছে না।'

খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। রেভারেণ্ড বললেন, 'যাক ও কথা। আশা করি কিছুদিন আপনি এ দেশে থেকে যাবেন।'

'সেইরকমই ইচ্ছে।'

'যত তাড়াতাড়ি হয় একটু কষ্ট করে মারাঠীটা শিখে ফেলুন।'

'শিখবার চেষ্টাই করছি।' ডানিয়েল হাসল।

আর হঠাৎ দূরমনস্ক হয়ে পড়লেন রেভারেণ্ড, 'জানেন, আপনাকে ঘিরে ক'দিন ধরে একটা পরিকল্পনা আমার মাথায় আসছে।'

ডানিয়েল উদ্‌গ্রীব হল, 'কিসের পরিকল্পনা?'

'বলব, তার আগে আমাদের চার্চটা একটু ঘুরে ফিরে দেখুন।'

খাওয়া-দাওয়ার পর সুভদ্রা কোথায় যেন অদৃশ্য হল। আর রেভারেণ্ড বললেন, 'আপনি কি কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নেবেন?'

'না, দিনের বেলা ঘুমের অভ্যাস আমার নেই।' ডানিয়েল মাথা নাড়ল।

'দ্যাট্‌স্ গুড। তা হলে চলুন, আমাদের চার্চটা আপনাকে ঘুরে দেখাই।'

'চলুন।'

চার্চের এক প্রান্তে রয়েছে 'নানারী' অর্থাৎ সন্ন্যাসিনীদের মঠ। জানা গেল, মঠবাসিনীদের সংখ্যা খুব বেশি নয়, মোট পাঁচজন। সুভদ্রা যোসেফ ছাড়া এই মুহূর্তে চার্চে আর কেউ নেই। সবাই দূর দূরান্তের গ্রামে চলে গেছেন। 'নানারী'র বিপরীত প্রান্তে সেবাব্রতী মিশনারিদের থাকার জায়গা। তাঁরা সংখ্যায় অনেক। রেভারেণ্ড আপ্তে একে একে সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। রেভারেণ্ড নায়েক, রেভারেণ্ড বীরকার, রেভারেণ্ড পরাঞ্জপে বা রেভারেণ্ড যোশি—এঁরা সবাই নেটিভ খ্রিস্টান। সুদূর ইণ্ডিয়ার এই দুর্গম পর্বতমালায় কৃশ্চানিটির মহিমা এঁরা ঊর্ধ্বে তুলে রেখেছেন।

চার্চের নানা দিক ঘুরে সন্ন্যাসব্রতী মানুষগুলির জীবনযাত্রার একটা ছবি ধরতে পারল ডানিয়েল। এটা শুধু মিশনারিদের আশ্রয়ই নয়, পেছন দিকের বিস্তীর্ণ চত্বর জুড়ে হস্তশিল্পের কারখানা চোখে পড়ল। কোথাও হ্যাণ্ডলুমের তাঁত চলছে। কোথাও কার্পেন্টারি, বাঁশ এবং বেত দিয়ে নানা শৌখিন জিনিস তৈরির ব্যবস্থা। লক্ষণীয় ব্যাপার, সব জায়গাতেই মিশনারিরা শ্রমিক।

চার্চের ভেতর এমন অর্থকরী কাণ্ডকারখানা দেখে ডানিয়েল অবাক। চার্চ সম্বন্ধে তার একটি মাত্র ধারণাই রয়েছে। সেখানে শুদ্ধচিত্ত সন্ন্যাসীর দল সর্বক্ষণ সুনীতি, সংযম, সহিষ্ণুতার পাঠ নেবে। বাইবেল নির্দিষ্ট পথের বাইরে একটি পা-ও ফেলবে না। মহাপুরুষবাণী দিয়ে প্রতি মুহূর্তে জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করবে। আর চলবে প্রীচিঙ, কৃশ্চানিটির মহিমা মানুষের প্রাণে প্রাণে এঁকে দেওয়াই চার্চের প্রধানতম কাজ। নিজের জীবন দিয়ে এই পাপাসক্ত অন্ধকার জগৎকে নিষ্পাপ ধ্রুবলোকে পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন মানবপুত্র। সেই কথাই দিগ্‌দিগন্তে ছড়িয়ে দেওয়া চার্চের একমাত্র কর্তব্য।

ডানিয়েলের মুখচোখ দেখে রেভারেণ্ড আপ্তে কিছু আন্দাজ করলেন। বললেন, 'তাঁত-টাত দেখে আপনি খুব আশ্চর্য হয়ে গেছেন, নয়?'

ডানিয়েল উত্তর দিল না, মুখের চেহারায় মনোভাবটাও গোপন রাখল না।

রেভারেণ্ড আবার বললেন, 'এ ছাড়া কোনো উপায় নেই। চার্চের এতগুলি মানুষকে খেয়ে বাঁচতে হবে তো। এখানে যা যা তৈরি হয়—হ্যাণ্ডলুমের শাড়ি, ঝুড়ি, ব্যাগ, কাঠের আসবাব—সব কোলাপুরে বিক্রি করে আসা হয়। তাতে যে লাভ হয় সেটুকু আমাদের জীবিকা। নিতান্ত প্রাণে বাঁচতে হলে যা প্রয়োজন তার অতিরিক্ত একটি পয়সাও আমরা উপার্জন করি না। প্রাচুর্য এলেই ভোগের স্পৃহা আসবে। আর ভোগ শরীরের রিপুগুলোকে জাগিয়ে তুলে রসাতলে নিয়ে যাবে।'

এ সব কথার কোন উত্তর না দিয়ে হঠাৎ ডানিয়েল বলে বসল, 'আচ্ছা—'

'বলুন।'

'মিস যোসেফের কাছে আমি একটা কথা শুনেছি।'

'কী?'

'আপনারা নাকি বোম্বাইয়ের মিশন থেকে কোনরকম আর্থিক সাহায্য পান না?'

'না। সাহায্য, ডোনেসন—কিছুই না।'

'কেন?'

'আমাদের চার্চ থেকে প্রীচিঙ করা হয় না, তাই।'

ডানিয়েল হতবাক, 'প্রীচিঙ করা হয় না?'

গম্ভীর সুরে রেভারেণ্ড বললেন, 'না।'

'কেন?'

'বলে আমি বোঝাতে পারব না। চারিদিক দেখেশুনে আপনাকে বুঝতে হবে।'

ভাসা ভাসা উত্তরটা ডানিয়েলকে সন্তুষ্ট করতে পারল না। ক্ষুব্ধ স্বরে সে বলল, 'আমি যতদূর জানি চার্চের একটা বড় কাজ হল প্রীচিঙ।'

'ঠিকই বলেছেন।' রেভারেণ্ড বলতে লাগলেন, 'তবে এখানকার ব্যাপার বুঝতে হলে আপনাকে কিছুদিন ধৈর্য ধরতে হবে।'

ডানিয়েল চুপ করে রইল।

সমস্ত চার্চ-বাড়িটা ঘুরিয়ে ঘুবিযে দেখালেন রেভারেণ্ড আপ্তে। ফাঁকে ফাঁকে এখানকার জীবন-চিত্রটি আরো সম্পূর্ণ আরো সুসংবদ্ধ ভাবে চোখের সামনে তুলে ধরতে লাগলেন।

নেটিভ পাদ্রীরা নিতান্ত প্রাণ ধারণের জন্য যেটুকু সময় প্রয়োজন তাঁত-ঘরে, কি বেত-বাঁশের মনোহারি জিনিস তৈরিতে কাটান। নইলে তাঁদের আসল কাজ অন্যত্র। পশ্চিমঘাটের এই প্রান্তে মুক্তোচাষী, জেলে, কার্পাসচাষী ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন জীবিকার যত মানুষ আছে, তাদের গ্রামে গ্রামে ঘুরে এঁরা স্কুল খুলেছেন। মহামারী লাগলে ওষুধপত্র নিয়ে ছুটে যান, দিবারাত্রি সেবা করেন। রেভারেণ্ডরা এই দেশেরই মানুষ। কিভাবে চাষ আবাদ করলে ফলন ভাল হবে, আরব সাগরের কোন স্রোতে বেশি মাছ মেলে—এ সব সম্বন্ধে তাঁদের প্রচুর জ্ঞান। এ ব্যাপারে তাঁরা গ্রামে গ্রামে গিয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকেন। তা ছাড়া চার্চের দৈনন্দিন প্রেয়ার বা সারভিস তো আছেই।

কথায় কথায় বিকেল হয়ে গেল। সমস্ত চার্চ বাড়িটা দেখিয়ে ডানিয়েলকে আবার নিজের ঘরে নিয়ে এলেন রেভারেণ্ড আপ্তে।

এতক্ষণ শুধু দেখে আর শুনে গেছে ডানিয়েল। হঠাৎ কি মনে পড়তে ব্যস্তভাবে বলে উঠল, 'সেই কথাটা তো বললেন না! তখন বলেছিলেন চার্চটা ঘুরিয়ে দেখানোর পর বলবেন।'

'কী কথা বলুন ত?'

'আমাকে নিয়ে আপনার কী সব পরিকল্পনা রয়েছে।'

একটু চুপ করে রইলেন রেভারেণ্ড। তারপর আস্তে আস্তে বললেন। 'আজ থাক।' মারাঠী ভাষাটা শিখে ফেলুন, তখন বলব।'

কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল ডানিয়েল, সেই সময় দরজায় এসে দাঁড়াল সুভদ্রা। খাওয়া-দাওয়ার পর সেই যে সে অদৃশ্য হয়েছিল এতক্ষণে আবার তাকে দেখা গেল। রেভারেণ্ড আপ্তের দিকে তাকিয়ে সুভদ্রা বলল, 'আমাকে একবার মনপুরায় যেতে হবে ফাদার। আজ আর ফিরতে পারব না।'

ডানিয়েল যে গ্রামটায় আশ্রয় পেয়েছে তার নাম মনপুরা।

রেভারেণ্ড বললেন, 'এখনই যাবে?'

'হ্যাঁ।'

'তা হলে এক কাজ কর। ডানিয়েলকে সঙ্গে নিয়ে যাও। এই পাহাড়ী রাস্তায় একা একা ও ফিরতে পারবে না। কোন দিকে যেতে কোন দিকে চলে যাবে।'

রেভারেণ্ড এবার ডানিয়েলের দিকে ফিরলেন, 'আপনাকে আজ আর ধরে রাখব না। সুভদ্রার সঙ্গে চলে যান।'

ডানিয়েল উঠে পড়ল।

অল্টার পার হয়ে ঘাসের মাঠ পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এসেছিলেন রেভারেণ্ড। ডানিয়েলরা রাস্তায় নামলে বললেন, 'আবার আসবেন।'

ডানিয়েল বলল, 'আসব।'

অনেক দূর এগিয়ে এসেছে দু-জনে। চার্চের তীক্ষ্ম চূড়ায় সেই পবিত্র ক্রশ আর দেখা যাচ্ছে না। পশ্চিমঘাটের কোন চড়াই-উতরাইতে তা হারিয়ে গেছে।

দুপুরবেলা এই পথে চার্চে এসেছিল ডানিয়েল। দু'ধারে সেই ফুল, সেই পাখি, পশ্চিমঘাটের সেই অপূর্ব বনশ্রী। এদিকে বিকেলটা দ্রুত পায়ে সন্ধ্যার দিকে দৌড় লাগিয়েছে।

কোনো দিকে লক্ষ্য নেই ডানিয়েলের। খুব নিবিষ্ট হয়ে রেভারেণ্ড আপ্তেকে ঘিরে আজ সারাদিনের অভিজ্ঞতাটাই মনে মনে বিশ্লেষণ করে নিচ্ছিল সে। এই চার্চের কেন্দ্রে তিনিই যে সর্বময় ঈশ্বর সে সম্বন্ধে সংশয়ের অবকাশ নেই। এতগুলি মহিলা এবং পুরুষ মিশনারি তাঁরই অঙ্গুলিহেলনে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকেন। ইংরেজিতে যাকে 'এ্যাডভেঞ্চারাস স্পিরিট' বলে, ভদ্রলোকের তা আছে। যৌবনে 'হিচ হাইক' করে সমস্ত ইণ্ডিয়া তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন। তা ছাড়া বেশ সদালাপী, সুরসিক, বিনয়ী। তাঁর ভালত্বের মধ্যে কোথাও খুঁত থাকত না যদি ডানিয়েল জানতে পারত এই চার্চ প্রীচিঙের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছে। প্রীচিঙ করে না—এই কথাটা ডানিয়েল যতবার ভাবল ততবারই তার খ্রিস্টান সত্তা কুণ্ঠিত হতে লাগল। কুণ্ঠিত এবং অপ্রসন্ন। তা ছাড়া, তাকে ঘিরে রেভারেণ্ডের কি এক গোপন পরিকল্পনা রয়েছে, সেটাও জানা গেল না। মোট কথা, ভাল লাগার অসীম সমুদ্রে কিছু কিছু অস্বস্তি দ্বীপের মত মাথা তুলে রইল।

পাশ থেকে সুভদ্রা হঠাৎ ডেকে উঠল, 'এক্সকিউজ মী—'

চমকে ডানিয়েল তাকাল, 'কিছু বলবেন?'

'হ্যাঁ—' সুভদ্রা মাথা নাড়ল।

ডানিয়েল উদ্গ্রীব হয়ে রইল।

গম্ভীর সুরে সুভদ্রা বলল, 'আপনাকে একটা কথা জানিয়ে দিতে চাই।'

'কী?'

'আমি একজন মিশনারি নান'—'সন্ন্যাসিনী।'

অবাক বিস্ময়ে ডানিয়েল বলল, 'ও কথা নতুন করে জানাবার দরকার আছে কি! প্রথম দিন থেকেই আপনার পরিচয় আমার জানা।'

'কিন্তু—'

'বলুন—'

'আমার পরিচয়টা আপনি মাঝে মাঝে ভুলে যান।'

'কিরকম?'

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে সুভদ্রা বলল, 'রেভারেণ্ড আপ্তের কাছে আমাকে ওভাবে বিব্রত করলেন কেন?'

এতক্ষণে সুভদ্রার গাম্ভীর্য অপ্রসন্নতা এবং বিরাগের একটা সঙ্গত কারণ অনুমান করা গেল। সঙ্গে সঙ্গে স্বভাবের সেই দুষ্টুমিটা প্রাণের ভেতর ফেনিয়ে উঠতে লাগল ডানিয়েলের। নিপাট ভালমানুষের মত মুখ করে সে বলল, 'আপনাকে বিব্রত করেছি?'

'নিশ্চয়ই।'

'কিভাবে করলাম, বুঝে উঠতে পারছি না। সেদিন একটা শব্দের মারাঠী সিনোনিম জানতে চেয়েছিলাম। আপনি কিছুতেই বললেন না। সেই কথাটাই শুধু রেভারেণ্ড আপ্তেকে জানিয়েছি। এর ভেতর বিব্রত করার কী আছে বুঝতে পারছি না।'

'অনুগ্রহ করে ঐ সব শব্দ আমার সামনে উচ্চারণ করবেন না।'

'কেন?'

অসহিষ্ণু রাগত সুরে সুভদ্রা বলল, 'আমার ইচ্ছে নয়।'

চোখের প্রান্ত কুঁচকে সুভদ্রার দিকে অনেকখানি ঝুঁকে ডানিয়েল প্রশ্ন করল, 'ঐ শব্দগুলো নিষিদ্ধ নাকি?'

একটু চমকে পরক্ষণেই খেপে উঠল সুভদ্রা, 'একশ'বার নিষিদ্ধ।'

তার চোখে চোখ রেখে নিরীহ মুখে ডানিয়েল বলল, 'আমি ঠিক জানতাম না।'

সুভদ্রা উত্তর দিল না, মুখটা দ্রুত অন্য দিকে ফিরিয়ে নিল।

গোটা দুই চড়াই-উতরাই পেরিয়ে যাবার পর ডানিয়েল ডেকে উঠল, 'আচ্ছা—'

না তাকিয়েই সুভদ্রা বলল, 'কী?'

'যে সব কথা আপনার না-পছন্দ তার একটা লিস্ট করে দেবেন। তা হলে আমার পক্ষে সুবিধে হবে। ওগুলোর সিনোনিম জানতে চাইব না।'

প্রবল বিতৃষ্ণায় সুভদ্রা বলল, 'লিস্ট করে দিতে হবে কেন? আপনার যথেষ্ট জ্ঞান-বুদ্ধি আর বয়েস হয়েছে। মিশনারি নানকে কোন কথা জিজ্ঞেস করা যায়, কোনটা যায় না সে-সব আপনার জানা উচিত।'

'আপনি ঠিকই বলেছেন। তবে—'

'তবে আবার কী?' উত্তেজিত ভঙ্গিতে মুখ ফেরাল সুভদ্রা।

'আমার বড় ভুলো মন। সব কথা সব সময় মনে রাখতে পারি না।' নিষ্পাপ দেবশিশুর গলায় বলে উঠল ডানিয়েল।

সন্দিগ্ধ বিরক্ত সুরে সুভদ্রা বলল, 'আপনি কী বলতে চান?'

'বলছিলাম নিজের অজান্তে হয়ত 'লাভ', 'রোমান্স' এই সব কথা বলে ফেলব। আপনি আবার কিছু মনে করবেন না যেন।'

'অজান্তে নয়, ইচ্ছে করেই আপনি বলবেন।'

ডানিয়েল তাড়াতাড়ি জিভ কেটে বলল, 'মা মেরীর নামে দিব্যি কেটে বলছি, ইচ্ছে করে কিছুতেই ও সব বলব না।'

সুভদ্রা রেগে উঠল, 'থাক, থাক। মা মেরীকে আর টানাটানি করতে হবে না।'

'আপনি যখন বলছেন, করব না।'

'আরেকটা কথা শুনে রাখুন। আপনি যদি ঐ সব কথা বলে আমাকে উদ্ব্যস্ত করতে চান, রেভারেণ্ড আপ্তেকে তা হলে ব্যাপারটা জানাতে হবে।'

ঠোঁট কুঁচকে কিছুক্ষণ কি চিন্তা করে ডানিয়েল বলল, 'রেভারেণ্ড আপ্তেকে জানাবেন?'

'আপনি যদি আমাকে বাধ্য করেন।'

'বেশ, জানাবেন। আমিও তা হলে বলব—' এই পর্যন্ত বলে ঠোঁট টিপে হাসল ডানিয়েল।

রুক্ষ সুরে সুভদ্রা জানতে চাইল, 'কী বলবেন আপনি, শুনি—'

'বলব 'লাভ অফ গড' এর মানে জানতে চেয়েছিলাম। আপনি রেগে গেছেন।' বলে ঠোঁট টিপে টিপে হাসতে লাগল ডানিয়েল।

আর হকচকিয়ে গেল সুভদ্রা। চোখদুটো বড় বড় করে সভয় বিস্ময়ে বলল, 'আপনি তো ভয়ঙ্কর লোক দেখছি। আমাকে ফ্যাসাদে ফেলার জন্য ডাহা মিথ্যে বলতে আপনার আটকাবে না?'

ডানিয়েল উত্তর দিল না, মুখ ঘুরিয়ে খুক খুক করে হাসতে লাগল।

এরপর একেবারে নীরবতা। গ্রামের কাছাকাছি এসে ডানিয়েল বলল, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করতে একদম ভুলে গেছি।'

সুভদ্রা তাকাল, 'আবার কী?'

'সকালবেলা একবার এসেছিলেন। এতখানি রাস্তা ঠেঙিয়ে আবার মনপুরায় চলেছেন যে? রেভারেণ্ড আপ্তেকে বলে এলেন আজ আর ফিরবেন না। ব্যাপার কী?'

'চলুন, গেলেই বুঝতে পারবেন।'

মনপুরায় পৌঁছুতে পৌঁছুতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। আজ কী তিথি, কে জানে। খুব সম্ভব পূর্ণিমাপক্ষ চলছে। দিগন্তের ওপার থেকে গোলাকার একখানা চাঁদ উঠে এসেছে। আকাশময় তারার মেলা সাজানো। কুয়াশার একটি আবরণ আছে বটে কিন্তু তা খুবই ফিনফিনে, হালকা আর স্বচ্ছ।

সোজা গ্রামের মাঝখানে একটা খোলা মাঠের ভেতর ডানিয়েলকে নিয়ে চলে এল সুভদ্রা। সেখানে বড় বড় গোটাকয়েক কেরোসিনের লণ্ঠন জ্বলছে। আলোগুলোকে ঘিরে মনপুরা গ্রামের তাবত সাবালক সমর্থ পুরুষ ভিড় করে আছে। চুপ করে তারা বসে নেই। সবাই প্রায় একসঙ্গে কথা বলছে। ফলে জায়গাটা সরগরম। আরো একটা বিষয় লক্ষ্য করা গেল, সবার চোখমুখ অসীম উত্তেজনায় জ্বলছে। কোনো গুরুতর ব্যাপারের জন্যই যে এই জমায়েত তাতে সন্দেহ নেই।

আগে বার দুয়েক ডানিয়েল এ গ্রামে এসেছে। তখন দেখে গেছে মনপুরা পুরুষবর্জিত। অবশ্য দিনের বেলা এসেছে সে। সুভদ্রার কাছে জিজ্ঞেস করে জেনেছে জীবিকার সন্ধানে এখানকার পুরুষদের ভোরবেলা উঠেই সমুদ্রে ছুটতে হয়। সমস্ত দিন নোনা জলের সঙ্গে সংগ্রাম করে সন্ধ্যেবেলা তারা গ্রামে ফিরে আসে।

কিন্তু এখানে সবাই কেন জমা হয়েছে, সেটাই বোঝা যাচ্ছে না। আর যাচ্ছে না বলেই উৎকণ্ঠিত হয়ে রইল ডানিয়েল।

সুভদ্রাকে দেখে লোকগুলো নড়েচড়ে বসে। সরাসরি তাদের মাঝখানে গিয়ে চারিদিকে দ্রুত দৃষ্টি চালিয়ে কাকে যেন খুঁজল সুভদ্রা। ধীরে ধীরে তার চোখ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। পাশ থেকে ডানিয়েলের মনে হল, সুভদ্রা যাকে খুঁজছে সে এখানে নেই।

ভিড়টার দিকে তাকিয়ে সুভদ্রা জিজ্ঞেস করল, 'তোমাদের সবাইকে ত দেখছি, বিষণ নায়েক কোথায়?'

লোকগুলো একসঙ্গে চেঁচামেচি করে উঠল। অশ্রাব্য এবং মোটামুটি সহনীয় দু-জাতীয় খিস্তি দিয়ে বলে উঠল, 'সে শালা শুয়ারের বাচ্চা এল না।'

'এল না কেন?'

'বললে তার কাজ আছে।'

'আজ সাতদিন ধরে খালি কাজ দেখাচ্ছে লোকটা। আমার কথা বলেছিলে? বলেছিলে আমি তাকে দেখা করতে বলেছি?'

'বলি আবার নি!'

'আমার কথা বলতে সে কী বললে?'

'বিচ্ছিরি একটা গালাগাল দিয়ে বললে, সে তোমার বাপের চাকর নয়। তুমি ডাকলেই তাকে ছুটে আসতে হবে এমন দাসখত সে লিখে দ্যায় নি।'

যে তিন শ'টা নিত্য-ব্যবহার্য শব্দের পুঁজি ডানিয়েলের তা দিয়ে এত সব কথোপকথন বুঝতে পারা সম্ভব নয়। তবে অনুমানে অনেক কিছুই ধরতে পারছিল। লোকগুলোর কথা শেষ হতেই সে লক্ষ্য করল সুভদ্রার মুখ কালো হয়ে উঠেছে। পরক্ষণেই চোয়াল কঠিন হল তার। তীক্ষ্ণ গলায় বলল, 'দাসখত লেখার কথা আসছে কিসে? সাতদিন ধরে সে বলছে, সন্ধ্যেবেলা আসবে। সে আসবে বলে আমিও সাতদিন ধরে সন্ধ্যেবেলায় গীর্জা থেকে আসছি। এমন হয়রানি করার মানে কী?'

ডানিয়েল সবিস্ময়ে সুভদ্রার দিকে তাকাল। তা হলে রোজ একবার ভোরবেলা মনপুরায় এসে লেখাপড়া শিখিয়ে চার্চে ফিরে আবার সন্ধ্যেবেলা এখানে আসে

সে! দ্বিতীয় বার এখানে আসার কারণটা কী, তা জিজ্ঞেস করার অবকাশই পাওয়া যাচ্ছে না।

লোকগুলো বলল, 'কেন হয়রানি করছে, আমরা কি করে বলি! শালার ব্যাটার পেটের ভেতর কী মতলব ঠাসা আছে সে-ই জানে।'

সুভদ্রা এবার কিছু বলল না, দাঁতে দাঁত চেপে দাঁড়িয়ে রইল।

লোকগুলো ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এখন কী করতে চাও?'

কথাগুলো যেন শুনতে পেল না সুভদ্রা। আগের মতই কঠিন চোয়ালে দাঁতে দাঁত চেপে দাঁড়িয়ে রইল! বোঝা গেল এই মুহূর্তে তার সমস্ত অস্তিত্বের ভেতর নিদারুণ এক আলোড়ন চলছে। অনেকক্ষণ পর একটা সিদ্ধান্তে যেন পৌঁছে গেল সে। চারিদিকের অর্ধ-উলঙ্গ উৎকণ্ঠিত মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে প্রায় আদেশের ভঙ্গিতে বলল, 'চল।'

'কোথায়?'

'চান্দায়।'

'চান্দায় কেন?'

সুভদ্রা ধমকে উঠল, 'চান্দায় বিষণ নায়েকের বাড়ি, তা তোমরা জানো না?'

জনতা নিজেদের মধ্যে কিছুক্ষণ মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। তারপর ভীরু গলায় জিজ্ঞেস করল, 'এখন বিষণ নায়েকের বাড়ি যেতে চাও নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'কেন বল দিকি?'

সুভদ্রা ভেংচে উঠল, 'নেমন্তন্ন খেতে!'

খানিকটা ইতস্তত করে জনতা বলল, 'না, বলছিলাম চান্দা ত এখান থেকে কম দূর নয়। ছ-সাতটা পাহাড় পার হয়ে যেতে হবে। আর যেতে যেতে রাতও হয়ে যাবে ঢের।'

'যত রাতই হোক, যেতে হবে। ব্যাপারটা আর ঝুলিয়ে রাখা ঠিক নয়। আজই এর একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলা দরকার! নাও, সব উঠে পড়।' বলে আর দাঁড়াল না সুভদ্রা। ভিড়ের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে হাঁটতে শুরু করল।

মনপুরা গ্রামের বিশাল জনতা আর কিছু বলার মত দুঃসাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারল না। সুভদ্রা যখন বলেছে তখন যত রাতই হোক চান্দায় তাদের যেতে হবে। নিঃশব্দে সবাই উঠে পড়ে গীর্জাবাসিনী সেই মেয়েটির পিছু পিছু হাঁটতে লাগল। ভিড়ের মধ্যে থেকে উঠে যাবার সময় ডানিয়েলকে একটি কথাও বলে যায়নি সুভদ্রা, এমনকি তার দিকে ফিরেও তাকায় নি। খুব সম্ভব উত্তেজনার ঝোঁকে এসব তার খেয়াল ছিল না।

সবাই চলে গেছে, একমাত্র ডানিয়েল ছাড়া! শূন্য মাঠখানায় হতভম্বের মত একাই বসে আছে সে। এই মুহূর্তে তার কী করণীয় ঠিক বুঝে উঠতে পাবা যাচ্ছে না। ওদিকে সুভদ্রা এবং তার সঙ্গীরা দক্ষিণ দিকের রাস্তার দূর বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেছে। বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ স্নায়ুগুলোতে প্রচণ্ড ঝাঁকানি লাগল ডানিয়েলের।

চান্দা গ্রামে বিষণ নায়েকের বাড়ি কেন সুভদ্রারা যাচ্ছে, সে জানে না। তবে এটুকু অনুমান করা গেল, সেখানে সাঙ্ঘাতিক একটা কিছু ঘটবে। অতএব আর বসে থাকা শ্রেয় মনে হল না। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বিদ্যুৎগতিতে দূর বাঁকটার দিকে ছুটতে শুরু করল ডানিয়েল।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই সাঙ্গোপাঙ্গ-সমেত সুভদ্রাকে ধরা গেল। ডানিয়েলকে আসতে দেখে সুভদ্রা অবাক। বলল, 'এ কি, আপনি!'

'হ্যাঁ, চলে এলাম।' ডানিয়েল হাসল।

'আপনি আবার আসতে গেলেন কেন?'

'সবাই যাচ্ছে, তাই—'

বিরক্ত একটি ভ্রুকুটি ফুটিয়ে সুভদ্রা বলল, 'কেউ সেখানে নাচতে যাচ্ছে না, যাচ্ছে একটা জরুরি কাজে।'

ডানিয়েল উত্তর দিল না।

সুভদ্রা বলতে লাগল, 'আপনার সেখানে যাবার কোনো কারণ নেই, প্রয়োজনও নেই, তবু এই রাত্তির বেলা ছ-সাত মাইল ভেঙে চললেন। অকারণে সুস্থ শরীর ব্যস্ত করে তোলা। কোনো মানে হয়?'

ডানিয়েল এবারও চুপ। সে বোঝাতে পারল না, যদিও মনপুরা গ্রামের জীবনস্রোতে এখনও সম্পূর্ণ ভেসে যেতে পারে নি, যদিও এই গ্রামটা এবং তার বাসিন্দাদের প্রাণের বাইরের স্তরেই হয়ত ভাসা-ভাসাভাবে সে জড়িয়ে আছে তবু তার পলাতক জীবনের এই আশ্রয়দাতাদের ভালবেসে ফেলেছে। এদের সুখ-দুঃখ বা জীবনের কোনো সমস্যায় নিতান্ত অপরিচিতের মত সে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে পারে না। সবার সঙ্গে তাকেও এগিয়ে আসতে হয় এবং না আসাটা রীতিমত অন্যায়। তা ছাড়া সুভদ্রা রয়েছে। এই মেয়েটি সেদিন না থাকলে ডানিয়েলকে কোথায় কিভাবে দিন কাটাতে হত, ভাবতেও সাহস হয় না। হয়ত পশ্চিমঘাটের কোন নির্জন পাথরের ভাঁজে পালানোর নেশাটা চিরদিনের মত ছুটে গিয়ে মরে পড়ে থাকতে হত। এই সহৃদয়া করুণাময়ী মেয়েটির প্রতি অন্য কোনো কারণে না হোক, নেহাত কৃতজ্ঞতার বশেও চান্দা গ্রামে তার যাওয়া উচিত।

সুভদ্রা আর কিছু বলল না। নিঃশব্দে ডানিয়েল তার পাশাপাশি চলতে লাগল।

অনেকগুলো চড়াই-উতরাই ভাঙার পর ডানিয়েল বলল, 'কিছু যদি মনে না করেন একটা কথা বলি।'

নিস্পৃহ সুরে সুভদ্রা বলল, 'বলুন—'

'বিষণ নায়েক কে?'

'মাছের আড়তদার।'

একটু চুপ করে থেকে ডানিয়েল বলল, 'খানিকটা আগে আপনাদের কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছিল বিষণ নায়েকের সঙ্গে কিছু একটা গণ্ডগোল বেধেছে। ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারি না। যদি আপত্তি না থাকে বলবেন?'

সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিল সুভদ্রা ব্যাপারটা এইরকম। এ অঞ্চলে মোট জন দশেকের মত আড়তদার রয়েছে। বিষণ নায়েক তাদের একজন। সমুদ্রের ধার ঘেঁষে তাদের সারি সারি আড়ত এবং গদী।

এ দিকে যত জেলে মানুষ আছে তাদের সবার জীবন এই আড়তদারদের হাতের মুঠোয়। সারা দিনে যে যত মাছ ধরে সন্ধ্যের সময় আড়তদারদের ঘরে তুলে দেয়। আড়তদারেরা সেই মাছের একটা অংশ কাটিয়ে, নুন মাখিয়ে, শুকিয়ে 'শুটকি' তৈরি করে। বর্ষার সময় মাছ যখন দুর্লভ সেই 'শুটকি' চালান দেওয়া হয়। বাকি যে তাজা মাছ থাকে সেগুলো বরফ দিয়ে কোলাপুর কি সাবন্তবতী অথবা আরো দূরবর্তী শহরের বাজারে পাঠানো হয়।

যাই হোক মনপুরার তাবত মৎস্যজীবী বিষণ নায়েকের ঘরেই মাছ জমা দেয়। বিষণের আড়তের নিয়ম রোজকার মাছের দাম রোজ দেওয়া হয় না। রোজ কে কত মাছ দিল সব লিখে রাখে বিষণ। তারপর সপ্তাহান্তে হিসেব করে টাকা দিয়ে দেয়।

খানিকটা ইতস্তত করে ডানিয়েল বলল, 'নিয়মটা তো খুব খারাপ মনে হচ্ছে না।'

'না, নিয়মের কোন দোষ নেই।' সুভদ্রা মাথা নাড়ল।

'তবে?'

'কারচুপিটা অন্য জায়গায়।'

অবাক হয়ে ডানিয়েল জিজ্ঞেস করল, 'কি রকম?'

সুভদ্রা বলতে লাগল, 'বদমাসটা মাছের ওজন কম করে লিখে রাখে। সপ্তাহের শেষে হিসেবের সময় দেখা যায় জেলেরা ঠিকমত টাকা পাচ্ছে না।'

'বলেন কি!'

'ঠিকই বলি।'

'গরীব মানুষদের এভাবে কেউ ঠকায়?'

'না ঠকালে ওর পেট মোটা হবে কি করে?'

খানিকক্ষণ চিন্তা করে ডানিয়েল বলল, 'এক কাজ করলে হয় না?'

চাঁদের আলোয় তার মুখের দিকে তাকাল সুভদ্রা, 'কী?'

'আপনি তো বললেন, এখানে জনাদশেক আড়তদার রয়েছে। জেলেরা বিষণ নায়েককে মাছ না দিয়ে অন্য কাউকে দিলেও তো পারে।' বলে ডানিয়েল এমন মুখের চেহারা করল যেন বিরাট একটা সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান করে ফেলেছে।

বিচিত্র একটু হাসল সুভদ্রা। সে হাসিতে হতাশা মেশানো। বলল, 'কোন লাভ নেই। সব শিয়ালেরই এক রা। রোজকার দাম রোজ কেউ মিটিয়ে দেয় না। বিষণ নায়েক তবু হপ্তা কাবার হলে দাম দেয়। অন্যেরা দেয় মাসের শেষে। সেখানে কারচুপির সুবিধে ঢের বেশি। মোট কথা ফাঁদ সব জায়গায় পাতা রয়েছে।'

ডানিয়েলকে এবার চিন্তিত দেখাল, 'তা হলে উপায়?'

সুভদ্রা বলল, 'এই হিসেবের ব্যাপার নিয়ে মাসে চারবার করে বিষণের সঙ্গে জেলেদের ঝগড়াঝাটি হচ্ছে। জেলেরা বলছে কম পাচ্ছি, বিষণ গণপতির দিব্যি দিয়ে বলছে, ঠিক দিচ্ছি। জেলেদের রাগ আর ক্ষোভের সব ঝামেলা এসে পড়ছে আমার ওপর। এর একটা বিহিত করার জন্যে সবাই আমাকে পাগল করে মারছে।'

গাঢ় স্বরে ডানিয়েল বলল, 'আপনাকে ছাড়া কাকেই বা ওরা ধরবে বলুন। তা এই প্রতারণা ঠেকাবার জন্যে আপনি কি কিছু ঠিক করেছেন?'

'করেছি।'

'কী?'

'জেলেদের বলে দিয়েছি, রোজ কে কত মাছ দিল বিষণের কাছ থেকে একটা করে চিরকুট যেন লিখিয়ে আনে। ওরা তো লেখাপড়া কিছু জানে না। ঠিক করেছিলাম রোজ রাতে একবার মনপুরায় এসে জেলেদের জিজ্ঞেস করে চিরকুটের লেখাটা মিলিয়ে নেব। তাতে ধরা পড়বে বিষণ সঠিক ওজন লিখে দিয়েছে কিনা।'

ডানিয়েল উৎসাহিত হয়ে উঠল, 'এ তো চমৎকার ব্যবস্থা।'

'আপনি তো বলছেন চমৎকার।' অসীম নৈরাশ্যভরে হাত ওল্টায় সুভদ্রা, 'কিন্তু জোচ্চোরটা কিছুতেই লিখে দিচ্ছে না। খালি টালবাহানা করছে। আমি তাকে ডাকিয়ে পাঠিয়েছি। সাত দিন ধরে রোজ 'আসব আসব' করছে কিন্তু কিছুতেই আসছে না।

চান্দা গ্রামে বিষণ নায়েকের বাড়ি পৌঁছুতে বেশ রাত হয়ে গেল। ইতিমধ্যে দিগন্তের সেই গোলাকার চাঁদখানা মাথার ওপর এসে উঠেছে। কুয়াশা আরেকটু গাঢ় হয়েছে মাত্র। পুব দিক থেকে ঝিরঝিরে হাওয়া দিয়েছে।

বিষণ নায়েকের বাড়িখানা দোতলা। অবশ্য ইটের নয়, পাথরেরই। মাথায় নতুন টিনের ঝকঝকে ছাউনি। সামনের দিকে দিশী ফলের প্রকাণ্ড বাগান। গাছপালার মধ্য দিয়ে পথ।

দলটাকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ির সদরে এসে দাঁড়াল সুভদ্রা। সমস্ত বাড়িটা এখন নিঝুম। কেউ কোথাও জেগে নেই, গভীর গাঢ় ঘুমে সবাই আচ্ছন্ন হয়ে আছে।

ডানিয়েলের খুব অবাক লাগছিল। কোথায় লণ্ডন শহর, কোথায় পুরুষাক্রমে বংশাভিমান, আভিজাত্য, কোথায় জীবনের চারিদিকে ছড়ানো অনায়াস আরাম এবং বিপুল স্বাচ্ছন্দ্য আর কোথায় এই পশ্চিমঘাট পাহাড়! রাতের মাধ্যমে একদল হাভাতের সঙ্গে তাদের ন্যায্য প্রাপ্য আদায় করতে সে এক মেছো আড়তদারের বাড়ি হানা দিয়েছে, ভাবতেই তাদের লড ফ্যামিলির প্রতিটি মানুষের মাথা কাটা যেত। চর্ম চক্ষে তাঁরা যদি এমন একটা অবিশ্বাস্য দৃশ্য দেখে ফেলতেন, হয়ত মূর্ছাই যেতেন। বেরিয়াল গ্রাউণ্ডে শায়িত পূর্বপুরুষের দল এমন একটা ন্যাক্কারজনক ব্যাপারের জন্য তাকে হয়ত প্রাণভরে অভিসম্পাত দিয়ে চলেছেন। ভাবতেই ভারি মজা লাগে ডানিয়েলের।

এদিকে সুভদ্রা এবং মনপুরায় জেলেরা ডাকাডাকি শুরু করে দিয়েছে, 'হে-এ-এ বিষণ—হে-এ-এ—

অনেকক্ষণ চেঁচামেচির পর ভেতর থেকে সাড়া এল, 'কে?'

'আমরা মনপুরার লোক।'

'দাঁড়াও, আসছি।'

কিছুক্ষণ পর দোতলার একটা ঘর বাতি জ্বলল। প্রায় পরমুহূর্তে সদর দরজা খুলে লণ্ঠন হাতে মধ্যবয়সী একটা লোক বেরিয়ে এল। চেহারার কোথাও বৈশিষ্ট্য বা বিস্ময় নেই। মুখ চোখ অত্যন্ত সাধারণ, বিরল চুলে সিঁথির বালাই নেই। মুখময় দিন কয়েকের কাঁচাপাকা দাড়ি। লণ্ঠনের স্পল্পালোকে গায়ের চামড়া তামাটে এবং শিথিল বলেই মনে হয়। শরীরটা মাঝারি মাপের। পরনে সংক্ষিপ্ত একটা লুঙ্গি।

একসঙ্গে এতগুলো লোককে দেখে প্রথমটা হকচকিয়ে গেল সে। এই বিশাল জনতা এত রাতে কী উদ্দেশ্যে হানা দিয়েছে, বুঝতে পাবা যাচ্ছে না। নিশ্চয়ই কোনো সদুদ্দেশ্যে যে নয়, তা যেন আন্দাজ করা যাচ্ছে।

সবার ওপর দিয়ে চোখ দুটো ঘুরিয়ে নিতে নিতে সুভদ্রার কাছে এসে থামল লোকটা। তার মুখে দৃষ্টি স্থির রেখে বলল, 'কী ব্যাপার, এত রাতে—'

রূঢ় সুরে সুভদ্রা বলল, 'এত বাতে শখ করে ছ'মাইল পাহাড় ঠেঙিয়ে তোমার ঘুম ভাঙাতে আসি নি।'

'ব্যাপারটা আমি ঠিক—' লোকটা মিন মিন করতে লাগল।

আরেক পর্দা স্বর চড়িয়ে সুভদ্র বলল, 'তুমি আমাদের আসতে বাধ্য করেছ।'

লোকটা এবার কুঁকুড়ে গেল যেন, 'আমি!'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি। সাতদিন ধরে মনপুরায় 'যাব যাব' কবছ অথচ যাচ্ছ না। আর তুমি যাবে বলে রোজ সন্ধ্যেবেলা চার্চ থেকে আমাকে আসতে হচ্ছে। কথা দিয়েও কেন যাচ্ছ না সেইটে জানবার জন্যেই আজ আমাকে আসতে হল।'

সব কথা বুঝতে পারছে না ডানিয়েল, তবু অনুমান করতে পারল এই লোকটাই মাছের আড়তদার বিষণ নায়েক। সঙ্গে সঙ্গে তাব স্নায়ুগুলো টান টান হয়ে গেল। লণ্ঠনটা একপাশে নামিয়ে রেখে হাত কচলাতে কচলাতে বিষণ বলল, 'আপনি ডেকে পাঠিয়েছেন, নিশ্চয়ই আমি যেতাম। কোলাপুরে কিছু মাছ চালান দেবার ব্যাপারে ক'টা দিন বড় ঝামেলায় বয়েছি। ঝামেলাটা মিটলেই যাব, ঠিক করেছিলাম। আপনি আবার শুধু শুধু কষ্ট করে এতখানি পথ এলেন।

বিষণের মুখচোখের ভঙ্গি অত্যন্ত নিরীহ। গলার স্বর শান্ত, নিরুত্তেজ। সুভদ্রার কাছে অসীম বিনয়ে একেবারে অবনত হয়েই আছে। তাছাড়া ডানিয়েলের আশঙ্কা ছিল, এখানে আসামাত্র একটা সংঘর্ষ বেধে যাবে। কিন্তু এতগুলো মানুষের সামনে বিষণ একাই বেরিয়ে এসেছে। না আছে তার হাতে একটি লাঠি, না একটা বল্লম, না অন্য কোনো মারণাস্ত্র। এ অবস্থায় যুদ্ধের চেহারা আন্দাজ করে ডানিয়েলের আশঙ্কাটা নিষ্প্রভ হয়ে গেল।

সুভদ্রা বলল, 'কই, ঐ ঝামেলাটার খবর তো আমাকে দাও নি। রোজই বলে পাঠিয়েছ, আজ যাচ্ছি, কাল যাচ্ছি। আর আমাকে হয়রানি করিয়েছ।'

বিষণ এবার বলল, 'গরীবের ডেরায় যখন পায়ের ধুলো দিয়েছেন তখন রান্নাবান্নার ব্যবস্থা করে ফেলি। এত রাতে আর—'

তার কথা শেষ হবার আগেই সুভদ্রা ধমকে উঠল, 'তোমার বাড়ি নেমন্তন্ন খেতে আসি নি। যে জন্যে এসেছি সেটা চুকে গেলেই আমরা খুশি।'

বিষণ বলল, 'তা-ই কখনো হয়! আপনি এসেছেন, একটু কিছু মুখে না দিলে—' বলেই বাড়ির দিকে ফিরে চেঁচামেচি জুড়ে দিল, 'ওরে তারা, মুন্তি, টুলিয়া, লাচ্চু—সবাই উঠে পড়। বাইরের ঘরগুলো খুলে দে—'

দু-হাত তুলে সুভদ্রা চিৎকার করল, 'থাক থাক, তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না। তোমার বাড়ি আমরা কেউ খাব না। একটা কাজের কথা নিয়ে এসেছি, তাড়াতাড়ি সেটা চুকিয়ে আমাদের ফিরতে হবে।'

'কথা তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না। তা হবে'খন একসময়। তার আগে—'

'তোমার অনুরোধ আমরা রাখতে পারব না বিষণ। কথাটা সেরে ফেল।'

বিষণ নায়েককে এবার অত্যন্ত বিমর্ষ দেখাল। বিষণ্ণ সুরে সে বলল, 'এত করে বলছি তবু যখন খাবেন না তখন আমি আর কী করব!'

'কিছুই তোমাকে করতে হবে না।' সুভদ্রা বলল, 'শুধু একটা কথার জবাব দাও।'

'বলুন।'

'প্রত্যেক দিন—' নিজের সঙ্গীদের দেখিয়ে সুভদ্রা বলল, 'এদের কাছ থেকে যে মাছ নিচ্ছ তার ওজন লিখে দিচ্ছ না কেন?'

বিষণ বলল, 'আমি নিজেই তো খাতায় লিখে রাখি। আবার দু'বার করে জনে জনে লিখে দেওয়া ভারি হ্যাঙ্গাম। তা ছাড়া—'

'কী।'

'এমন করে লিখে দেবার রেওয়াজ নেই। আপনি খোঁজ নিয়ে দেখুন, কোনো আড়তদারই এভাবে লিখে দেয় না।'

'অন্য আড়তদারের কথা থাক।'

'থাকবে কেন?' বিষণ নায়েক বলতে লাগল, 'আমি কি দেশছাড়া রাজ্যি ছাড়া লোক?'

ভ্রূকুটি করে সুভদ্রা বলল, 'কিন্তু আমি যখন ওদের দিয়ে বলে পাঠিয়েছিলাম তখন কথা দিয়েছিলে লিখে দেবে।'

'না, ঠিক কথা আমি দিই নি—' তা-না-না-না করতে লাগল বিষণ।

সুভদ্রা চেঁচিয়ে উঠল, 'নিশ্চয়ই কথা দিয়েছিলে।'

চোখ কুঁচকে কি একটু ভেবে বিষণ নায়েক বলল, 'ঐ লেখা লেখা করে আপনি এত অধৈর্য হচ্ছেন কেন? ধর্মের নামে বলছি একটা পয়সাও ওদের আমি মারছি না।'

'ধর্ম-অধর্ম বুঝি না। ওরা চাইছে তুমি লিখে দাও, তোমাকে তা দিতে হবে। অন্যায় কিছু ওরা চাইছে না। এতে যদি লোকগুলো সন্তুষ্ট হয়, তোমার আপত্তি কী?'

সুভদ্রার মুখে চকিত একটা দৃষ্টিনিক্ষেপ করে চাপা গলায় বিষণ নায়েক বলল, 'ওরা চাইছে, না আপনি চাইছেন?'

মুখে কঠিন রেখা দেখা দিল, সুভদ্রার চোয়াল হল দৃঢ়বদ্ধ। চোখের তারা দুটো উঠল দপদপিয়ে। রীতিমত উত্তেজিত দেখাচ্ছে তাকে। কর্কশ সুরে সুভদ্রা বলল, 'কী বলতে চাও তুমি? আমি ওদের খেপাচ্ছি? আমি যদি এ দিকের জেলেদের খ্যাপাই তোমরা আড়তদারি করতে পারবে?'

'ঠিকই বলেছেন। তবে আরেকটা দিক আপনি ভেবেছেন?'

'কী?'

'আমরা যদি ব্যবসা গুটোই এরা খাবে কী?'

সুভদ্রার গলার স্বর উত্তেজনার শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছে গেল, 'ভয় দেখাচ্ছ!'

আধ হাত খানেক জিভ কেটে বিষণ নায়েক তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'আপনাকে ভয় দেখাব, এত বড় বুকের পাটা আমার আছে! ও একটা কথার কথা। আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন।' একটু থেমে আবার বলল, 'বেশ আপনি যখন লেখাপড়াই চান, তাই হবে। তবে—'

'কী?'

'আমার আড়তে বাড়তি এমন লোক নেই যে লিখে দিতে পারে। তা ছাড়া আমারও সময় হবে না। ওদের বলবেন নিজেরাই যেন মাছের ওজন লিখে আমাকে দেখিয়ে নেয়। আমার সইয়ের রবার স্ট্যাম্প আছে। আমি তাতে একটা করে ছাপ মেরে দেব।'

মুখের চেহারা অস্বাভাবিক হয়ে উঠল সুভদ্রার। তীক্ষ্ণস্বরে সে বলল, 'আমার সঙ্গে চালাকি করতে যেও না বিষণ।'

বিষণ নায়েক যেন আকাশ থেকে সোজা মাটিতে এসে পড়ল। নিরীহ ভালমানুষের মত মুখ করে বলল, 'চালাকি! কী বলছেন আপনি!'

'কী বলছি, কিছুই বুঝছ না! এমন ভাব দেখাচ্ছ যেন ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানো না।' সুভদ্রা বলতে লাগল, 'তুমি তো খুব ভাল করেই জানো ওরা লিখতে পড়তে পারে না। তবু ওদেরই লিখে নিতে বললে। ওরা যখন বলবে লিখতে জানে না, তখন সাফাই গাইতে পারবে, 'আমি কি করব, আমি তো লিখে নিতেই বলেছিলাম।' তাতে তোমার মতলব ঠিকই হাসিল হবে।'

ব্যথিত করুণ মুখে বিষণ বলল, 'আমাকে আপনি খালি উলটোই বুঝছেন। আপনাকে তো আগেই বললাম, আমার একেবারে সময় নেই। আড়তে গিয়ে কিরকম হ্যাঙ্গামা পোয়াতে হয় তা যদি জানতেন! তার ওপর লেখার ঝামেলা যদি এসে চাপে, মরে যাব।'

'তা হলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এটাই আমায় বুঝিয়ে দিচ্ছ, লিখে তুমি দেবে না?'

ব্যস্তভাবে বিষণ নায়েক বলে উঠল, 'ঐ দেখুন, আপনি আবার আমাকে ভুল বুঝছেন।'

সুভদ্রা বলল, 'ঠিক আছে, আজ আমি যাচ্ছি। দেখি তোমার কাছ থেকে লেখা আদায় করা যায় কিনা।'

ক্লান্ত, ক্ষুধিত, কালো কালো সেই মানুষের দলটাকে টানতে টানতে আবার মনপুরায় ফিরে চলল সুভদ্রা। পশ্চিমঘাটের অন্তহীন চড়াই-উতরাই চাঁদের আলোয় ধুয়ে যাচ্ছে। যেদিকেই তাকানো যাক রাত ঝিম ঝিম করছে। সব কিছু আচ্ছন্ন, নিস্তব্ধ। শুধু পৃথিবীর নিভৃত আত্মার তলদেশ থেকে অশ্রান্ত বিলাপের মত ঝিঁঝির ডাক উঠে আসছে।

পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে ডানিয়েল বলল, 'কি, লোকটা লিখে দিতে রাজী হল?'

বিরক্ত মুখে সুভদ্রা বলল, 'না।'

'এত কী কথা বললেন ওর সঙ্গে?'

এতক্ষণের কথাবার্তার সংক্ষিপ্ত একটা বিবরণ দিয়ে সুভদ্রা বলল, 'লোকটা পয়লা নম্বরের শয়তান। চালখানা ভালই চেলেছে।'

'তাই তো দেখছি।'

সুভদ্রা এবার আর কিছু বলল না।

নিঃশব্দে কিছুক্ষণ চলার পর ডানিয়েল বলল, 'আচ্ছা এক কাজ করলে হয় না?'

'কী?'

'এখানকার আড়তদারেরা তো সব একজাতের। যার ঘরে যাওয়া যাক অবস্থা একই হবে। তার চাইতে এখানে মাছ না বেচে জেলেরা যদি অন্য কোথাও বেচে আসে?'

সুভদ্রা হাসল, 'তা সম্ভব নয়।'

'কেন?'

'আশেপাশে আর কোন গঞ্জ নেই, আড়তও না। এক আছে সেই কোলাপুরে। সারাদিন মাছ ধরে অতখানি পথ বোঝা বয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব না। তা ছাড়া যেতে যেতে মাছ পচে উঠবে।'

ডানিয়েলকে চিন্তান্বিত দেখাল। অনেকক্ষণ পর দুর্ভাবনার ভাবটা কেটে গিয়ে মুখ আলো হয়ে উঠল তার। ঈষৎ কাঁপা সুরে বলল, 'হয়েছে—'

স্বরের অস্থির কম্পনটা সুভদ্রার কানে কিভাবে বাজল সে-ই জানে। খানিকটা অবাক হয়ে সে মুখ ফেরাল, 'কি ব্যাপার?'

'আমার তো সারাদিনে ভাষা শেখা ছাড়া কোনো কাজ নেই। বিকেলের দিকে জেলেদের সঙ্গে আড়তে গিয়ে যদি মাছের ওজন লিখে বিষণের সই নিয়ে আসি কেমন হয়?'

স্থির দৃষ্টিতে একটুক্ষণ তাকিয়ে রইল সুভদ্রা। তার চোখ মুখ দেখে মনে হল, একটা গভীর দুশ্চিন্তার ক্রমশ অবসান ঘটছে। আস্তে আস্তে সে বলল, 'আপনি যাবেন?'

'নিশ্চয়ই যাব।'

'তা হলে তো বেঁচে যাই। তবে—'

'কী?'

'তার আগে দুটো কাজ আপনাকে করতে হবে।'

'বলুন কী করব।' সাগ্রহে তাকাল ডানিয়েল।

'প্রথমত এখানকার ভাষাটা তাড়াতাড়ি শেখা। দ্বিতীয়ত মাছের ব্যবসার হালচাল আপনার খুব ভাল করে জেনে নেওয়া দরকার। নইলে বিষণ হারামজাদা ওজনের ব্যাপারে কোন প্যাঁচ খেলবে, বুঝতে পারবেন না।'

'তা তো বটেই।' ডানিয়েল ঘাড় কাত করল।

মনপুরায় প্রতি মাসে দশদিনের বেশি আসে না সুভদ্রা। এবার কিন্তু মেয়াদটা আরো এক সপ্তাহের জন্য বাড়িয়ে দিল। মনপুরায় বিদ্যাদান শেষ করে সে 'সুখনা'তে গিয়ে পাঠশালা খোলে। এবার 'সুখনা'তে পড়াবার কী বন্দোবস্ত হল কে বলবে।

মনপুরায় আসার তাগিদটা এবার যেন খুবই বেশি সুভদ্রার। তার মনোযোগের একেবারে কেন্দ্রে বসে আছে ডানিয়েল। যত দ্রুত সম্ভব মারাঠী ভাষায় আর এই অঞ্চলের জীবনযাত্রায় ডানিয়েলকে চৌখস করে তোলার জন্য তার চেষ্টার ক্রটি নেই।

সন্দেহ কি, ডানিয়েল অত্যন্ত মেধাবী কিন্তু এমন শয়তান ছেলে ভূ-ভারতে আর দ্বিতীয়টি নেই। দু-চারদিন ক্লাস করতে না করতেই এখানকার স্কুলের যাবতীয় শয়তানিগুলো শিখে ফেলল সে।

সুভদ্রার চোখকে ফাঁকি দিয়ে মনপুরার ছেলেরা ঢেঁড়া-গোল্লা খেলে। প্রচণ্ড উৎসাহে সেই খেলায় যোগ দেয় ডানিয়েল।

পাশের ছেলেটি হয়ত শ্লেটে ঢেঁড়া গোল্লার ছক কেটে একটা ঢেঁড়া দিল। সুভদ্রা যাতে বুঝতে না পারে সেইজন্য নিরীহ চোখে তার দিকে তাকিয়ে টুক করে একটি গোল্লা বসিয়ে দিল ডানিয়েল।

ফাঁকি দিতে চেষ্টা করলেও একেক দিন ধরা পড়ে যায় ডানিয়েল। তার মুখচোখের চেহারা থেকে কিছু একটা আন্দাজ করে কড়া গলায় সুভদ্রা বলে, 'কী হচ্ছে ওখানে?'

চোখ পিট পিট করে দ্রুত মাথা নেড়ে ডানিয়েল বলে, 'কই, কিছু না তো।'

সুভদ্রা বলে, 'ঘুনার শ্লেটে কী লিখছিলেন?'

'আমি!' নিজের বুকে একখানা আঙুল রেখে ডানিয়েল এমন মুখ করে যাতে মনে হয় সোজা আকাশ থেকে পড়েছে।

'হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনি। এমন ভাব করছেন যেন ভাজা মাছটি উলটে খেতেও জানেন না।' সুভদ্রার স্বর এবার তীক্ষ্ণ হয়, 'দেখি শ্লেটটা। এই ঘুনা নিয়ে আয়—'

বলা নিষ্প্রয়োজন, ঘুনা ডানিয়েলের পার্শ্ববর্তী পড়ুয়াটি।

ঘুনা আসার আগেই ছোঁ মেরে শ্লেটটা তার হাত থেকে তুলে নিয়ে তড়াক করে উঠে দাঁড়ায় ডানিয়েল। বলে, 'আমি নিয়ে আসছি—' এবং চক্ষের নিমেষে সুভদ্রার কাছে হাজির হয়ে যায়, 'এই নিন শ্লেট।'

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে শ্লেটখানা পরীক্ষা করে সুভদ্রা। কিন্তু না, চিকে গোল্লার চিহ্নমাত্র কোথাও নেই। বরং তার বদলে যুক্তাক্ষরের বানান বসানো রয়েছে।

ঠোঁট কামড়ে চোখ কুঁচকে ডানিয়েলের দিকে তাকায় সুভদ্রা, 'ঐগুলো কোথায়? মুছলেন কখন?'

'কোনগুলো? কী মোছার কথা বলছেন?' ডানিয়েলের দু'চোখে অসীম বিস্ময়।

টেনে টেনে বিদ্রূপের সুরে সুভদ্রা বলে, 'বুঝতে পারছেন না?'

চোখ বুজে মাথা নাড়ে ডানিয়েল।

সুভদ্রা আবার বলে, 'এক মাঘে শীত যায় না। দিস ইজ স্কুল। কোনো দিন চিকে-গোল্লা যদি ধরতে পারি অন্য ছেলেদের মত নীলডাউন করিয়ে রাখব। যান, বসুন গিয়ে।'

চাপা ঠোঁটে আধফোটা একটা ভঙ্গি করে নীল চোখে হাসি-হাসি শয়তানি ফুটিয়ে পায়ে পায়ে নিজের জায়গায় ফিরে যায় ডানিয়েল।

আর সুভদ্রা গজ গজ করতে থাকে, 'পয়লা নম্বরের ধড়িবাজ। চিকে-গোল্লার আঁক মুছে জোড় বানান লিখে রেখেছে।'

একেক দিন অন্য সমস্যা দেখা দেয়। সুভদ্রা হয়ত যোগ অঙ্ক দিয়েছে।

ডানিয়েলকে অবশ্য অঙ্ক কষতে হয় না। ভাষা শেখাই তার একমাত্র কাজ।

অঙ্ক করতে না হলে কি হয়, পরমানন্দে ডানিয়েল আশেপাশের পড়ুয়াদের সঙ্গে চাপা গলায় গল্প জুড়ে দেয়। মজার মজার এমন কথা সে বলে যাতে সবাই হি হি করে হাসে। আর তখনই সুভদ্রার ধমক শোনা যায়, 'অত হাসি কিসের?'

হাসির শব্দটা নিমেষে থেমে যায় বটে, কিন্তু ছেলেমেয়েগুলোর মুখচোখ দেখেই টের পাওয়া যায় ঠোঁটে ঠোঁট টিপে দুর্দমনীয় একটা কিছু চাপবার চেষ্টা করছে। একটু ফাঁক পেলেই ফিনকি দিয়ে তা যেন বেরিয়ে আসবে।

সবার ওপর দিয়ে সুভদ্রার দৃষ্টিটা ঘুরতে ঘুরতে ঘুনার মুখে এসে থামে। ক'দিন ধরে সে লক্ষ্য করছে, ইদানীং ঘুনা ডানিয়েলের খুব ভক্ত হয়ে পড়েছে। স্কুলে ডানিয়েলের ঠিক পাশটিতে তার বসা চাই।

কঠিন গলায় সুভদ্রা বলে, 'এই ঘুনা, তোর অঙ্ক হয়েছে?'

আড়চোখে ডানিয়েলের দিকে একবার তাকাল ঘুনা। দেখা গেল, তার শ্লেটের ওপর ঝুঁকে পড়ে দ্রুত ডানিয়েল কি লিখছে। আশ্বস্ত ভঙ্গিতে ঘুনা তাড়াতাড়ি বলে, 'হয়েছে।'

'নিয়ে আয়।'

ডানিয়েলের হাত থেকে শ্লেটটা নিয়ে সুভদ্রার কাছে চলে আসে ঘুনা। অঙ্কটা ভাল করে দেখে সন্দিগ্ধ সুরে সুভদ্রা বলে, 'তুই কষেছিস?'

থতমত খেয়ে ঘুনা বলে, 'হ্যাঁ।'

'যা।'

ঘুনা নিজের জায়গায় ফিরে আসে।

এদিকে আশে পাশের সবার শ্লেট নিয়ে সুভদ্রার অলক্ষ্যে অঙ্ক কষে দিয়েছে ডানিয়েল। ঘুনার পাশের ছেলেটাকে এবার ডাকে সুভদ্রা, 'এই ছুটুয়া, অঙ্ক নিয়ে এদিকে আয়।'

ছুটুয়া শ্লেট হাতে সামনে গিয়ে হাজির হয়।

অঙ্কটা দেখে সুভদ্রা বলে, 'তুই কষেছিস?'

'হ্যাঁ—' ছুটুয়া ঘাড় কাত করে। ছেলেটা রীতিমত অকালপক্ক। বলে, 'আমি করিনি তো, আমার অঙ্ক কে করে দেবে?'

'হারামজাদা রামানুজ আইনস্টাইন হয়ে উঠেছে। যা নিজের জায়গায়।'

ছুটুয়া ফিরে আসে।

ছুটুয়ার পর একে একে এল শিবা, লক্ষ্মী, দুর্গা, কমলা, গণপতি, শম্ভা। সবাই অঙ্কগুলো নির্ভুল কষে রেখেছে। সুভদ্রার কেমন যেন সংশয় হয় রাতারাতি এদের ওপর স্বয়ং বিদ্যার দেবী ভর করে বসল নাকি! কিছুক্ষণ আঙুল কামড়ায় সে। তারপর হঠাৎ কিছু মনে হতে দ্রুত মুখ তুলে ডানিয়েলের দিকে তাকায় এবং চোখের ইঙ্গিতে কাছে ডাকে।

পায়ে পায়ে এগিয়ে আসে ডানিয়েল। হাঁটার ভঙ্গিটা এমন, যেন নিষ্পাপ দেবশিশু আসছে। নিঃশব্দে ভ্রূদুটো বার দুই ওপর দিকে তুলে নামিয়ে নেয় সুভদ্রা। অর্থাৎ ব্যাপারখানা কী।

ডানিয়েল বলে, 'আমাকে কিছু বলবেন?'

'নিশ্চয়ই।'

'বলুন—'

'আমি জানতে চাই ওরা অঙ্কগুলো কি করে পারল?' ডানিয়েলের চোখের তারায় নিজের দৃষ্টি স্থির করে সুভদ্রা আবার বলল, 'বলুন, তাড়াতাড়ি বলুন—'

এ জাতীয় বিস্ময়কর প্রশ্ন আগে আর কোনোদিন শোনে নি, এমন ভঙ্গিতে ডানিয়েল উত্তর দেয়, 'বা রে, আমি তা কী করে জানব?'

'আপনি জানেন না?'

'এর ভেতর জানাজানির কী আছে। ওদের অঙ্ক ওরাই কষেছে নিশ্চয়।'

'ওরা কষে নি। এতদিন পড়াচ্ছি আর আমি জানি না, কোন অঙ্ক ওরা পারবে আর কোন অঙ্ক পারবে না। দু-চারজন হয়ত পারবে কিন্তু সবার পক্ষে সম্ভব নয়।'

'তা হলে কে কষল ওদের অঙ্ক?'

'সেটাই তো আমার জিজ্ঞাস্য। বলে ফেলুন দয়া করে—'

'কি আশ্চর্য, এ প্রশ্নের জবাব আমাকে দিতে হবে নাকি?' ডানিয়েল হতবাক।

'আপনি ছাড়া আর কে দেবে? কারণ—'

'কী?'

'আপনিই তো নাটের গুরু। অঙ্কগুলো আপনিই কষে দিয়েছেন।'

'আপনি দেখেছেন?'

'নিশ্চয়ই দেখেছি।'

'দেখলে অঙ্ক কষবার সময় আমাকে ধরলেন না কেন?'

সুভদ্রা থতমত খেয়ে যায়। পরক্ষণেই সামলে নিয়ে কড়া গলায় বলে, 'কাল থেকে পেছনে বসবেন না। একেবারে সামনের সারিতে আমার কাছে বসবেন।'

দু-চার দিন সামনে বসবার পর দেখা গেল আবার পুরনো জায়গায় ফিরে গেছে ডানিয়েল। ভ্রূ কুঁচকে সুভদ্রা বলে, 'কি হল, ওখানে কে যেতে বলেছে আপনাকে?'

ঘাড় চুলকে ডানিয়েল বলে, 'কেউ বলে নি। আমি নিজেই বসেছি।'

কঠোর গলায় সুভদ্রা জিজ্ঞেস করে, 'কেন?'

'আপনার সামনা সামনি বসে থাকতে আমার ভীষণ ভয় করে।'

'ভয় করে!'

'হ্যাঁ।'

'মিথ্যে কথা।' সুভদ্রা চেঁচিয়ে ওঠে, 'আসলে সামনে বসলে শয়তানি করার অসুবিধে, তাই পেছনে গিয়ে আবার জুটেছেন।'

মুখখানা কাঁচুমাচু করে ডানিয়েল বলে, 'আর দুষ্টুমি করব না।'

'ঠিক?'

'ঠিক।'

কাজেই পুরনো জায়গায় আবার বসবার অনুমতি পায় ডানিয়েল। কিন্তু মাত্র দু-একটা দিনই নির্ঝঞ্ঝাটে সুভদ্রাকে ক্লাস করতে দেয় সে। তারপরে নতুন করে উৎপাত শুরু করে। এবারের উপদ্রবটা রীতিমত গুরুতর এবং তা এইরকম।

পড়াতে পড়াতে হঠাৎ সুভদ্রা লক্ষ্য করল, এক টুকরো চৌকো কাগজ ক্লাসময় হাতে হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ছেলে মেয়েগুলো লুকিয়ে সেটা দেখছে আর দেখামাত্র হি-হি করে হেসে উঠছে। হাসি আর তাদের থামতে চায় না।

কিছুক্ষণ বসে বসে হাসির সেই ধুমটা লক্ষ্য করল সুভদ্রা। ধীরে ধীরে তার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠতে লাগল। তীক্ষ্ণ এবং সন্দিগ্ধ। তারপর কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়ে আচমকা একটা ছেলের হাত থেকে কাগজের টুকরোটা ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়ে নিজের জায়গায় ফিরে গেল।

গিয়েই কিন্তু বসল না সুভদ্রা। সমস্ত ক্লাসের ওপর দিয়ে দৃষ্টিটা একবার ঘুরিয়ে আনল। তার আকস্মিক হানায় হাসিটা থেমে গেছে ঠিকই কিন্তু পুরোপুরি জেরটা কাটে নি। সবার চোখে-মুখে তার রেশ এখনও লেগে আছে।

ধীরে সুস্থে কাগজের টুকরোটা টান-টান করে চোখেব সামনে মেলে ধরল সুভদ্রা এবং সঙ্গে সঙ্গে পায়ের কাছে সাপ দেখার মত আঁতকে উঠল।

একটি বধূবেশিনী সুশ্রী তরুণীর চেহারা আঁকা রয়েছে কাগজটায়। তার পাশে বিপুলাকার কদর্য কালো এক পুরুষমূর্তি। ঠোঁট নাক পেট—সবই তার স্থূল, বিশাল। এক পায়ে হাঁটু পর্যন্ত প্যান্টের ঝুল নেমে এসেছে, আরেক পায়ে এসেছে পাতা পর্যন্ত। কোমরে বেল্টের বদলে মোটা দড়ি বাঁধা। সারা গায়ে উদার অভ্যুদয় হয়েছে লোমের,

বুকের মাঝখানে প্রকাণ্ড লকেটের মত একটা টাইম পীস ঝুলছে, মাথায় বেঢপ এক মুকুট।

বলা বাহুল্য, তরুণীটি আর কেউ নয়, স্বয়ং সুভদ্রা যোসেফ। ছেলেমেয়েরা বিয়ের ব্যাপার না বুঝলেও তাদের পরিচিত সুভদ্রা মাসির পাশে কালো হোতকা বনমানুষের মত একটা লোককে দেখে ভারি আমোদ পেয়েছে। আর সেই জন্য হাসিটা চেপে রাখা তাদের পক্ষে দায়। ছবিটা যার আঁকা নিঃসন্দেহে সে নিপুণ চিত্রকর। কয়েকটি নিখুঁত টানে সুভদ্রার চেহারাখানি চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছে। এই মুহূর্তে সুভদ্রা যদি একটু সহৃদয়া হত তা হলে ছবিটাকে তারিফ করে হয়ত শিল্পীকে শিরোপা দিয়ে বসত। কিন্তু তার বোধহয় মাথার ঠিক নেই। চোখের তারা দুটো এখন এত লাল, মনে হয় দুটুকরো আগুন ধকধক করছে কিংবা শরীরের সমস্ত রক্তই বুঝি সেখানে উঠে এসেছে। দ্রুত লয়ে বুকটা উঠছে নামছে। হাতের আঙুলগুলো থরথর করছে। আর সেই থরথরানি অতি দ্রুত সর্বাঙ্গে সঞ্চারিত হয়ে যাচ্ছে। মুখ দেখেই টের পাওয়া যাচ্ছে, সন্ন্যাসিনী মেয়েটার মধ্যে নিদারুণ তোলপাড় চলছে। হঠাৎ চোখ ফিরিয়ে ডানিয়েলের দিকে তাকাল সুভদ্রা। পরমুহূর্তে উন্মাদের মত চিৎকার করে উঠল, 'মিস্টার ডানিয়েল—'

চমকে উঠে দাঁড়ায় ডানিয়েল। সুভদ্রার গলায় এমন ডাক আগে আর কখনও শোনা যায় নি। সমস্ত সত্তার মধ্য দিয়ে শীতল স্রোতের মত একটা শিহরণ বয়ে গেল তার।

সুভদ্রা আগের স্বরেই বলল, 'এ সবের মানে কী?'

ভয়ে ভয়ে ডানিয়েল জানতে চাইল, 'কোন সবের?'

'এই ছবিটার—'

'ছবিটা আপনার ভাল লাগে নি? আঁকাটা কিন্তু চমৎকার হয়েছে।'

কিন্তু না, সুভদ্রাকে শিল্পরসিক করে তোলা গেল না। বরং গলার শির ছিঁড়ে আরো জোরে চেঁচিয়ে উঠল সে, 'আপনি কি তামাসা করছেন?'

ভয়ে ভয়ে ডানিয়েল বলল, 'তামাসা করব কেন? ছবিটা ভাল হয়েছে, তাই বলছিলাম—'

'আমার পরিচয় তো আপনি জানেন। আমি সর্বত্যাগিনী 'নান'। তবু এত বড় একটা তামাশা করার ধৃষ্টতা কেমন করে আপনার হল ভেবে অবাক হয়ে যাচ্ছি।

কাজটা যে অত্যন্ত গর্হিত হয়েছে, অতক্ষণে তা নিঃসংশয়ে বুঝতে পারল ডানিয়েল। ঝোঁকের বশে এমন মাত্রাছাড়া রসিকতা না করে বসলেই বোধহয় ভাল হত।

ডানিয়েলের একবার ইচ্ছা হল বলে ফেলে, ছবিটা আঁকতে তো আর সুভদ্রা তাকে দেখে নি। বলতে গিয়েও থমকে গেল সে। কেননা, ব্যাপারটা কার আঁকা বলে না দিলেও বুঝতে অসুবিধা হয় না। ডানিয়েল ছাড়া এমন ছবি এই বালখিল্যদের মধ্যে কে-ই বা আঁকতে পারে। এ জাতীয় রসিকতা আর কার পক্ষেই বা সম্ভব?

সন্ত্রস্ত মুখে ডানিয়েল বলল, 'ব্যাপারটা আপনি এভাবে নেবেন, বুঝতে পারি নি। আমার খুব অন্যায় হয়ে গেছে। ক্ষমা করুন।'

সুভদ্রার ক্রোধ তাতে বিন্দুমাত্র পড়ল না। সে বলল, 'সব অপরাধের ক্ষমা হয় না। এর আগেও রেভারেণ্ড আপ্তের সামনে আপনি আমাকে অপদস্থ করেছেন। সে ব্যাপারটা আমি ক্ষমা করে নিয়েছি। কিন্তু একজন ব্রহ্মচারিণী 'নান' সম্বন্ধে ঐ ছবিটায় যা ইঙ্গিত রয়েছে তা যেমন কুৎসিত তেমনি বিশ্রী। কোনোমতেই তা ক্ষমার যোগ্য নয়।'

স্বর প্রায় খাদে বসে গেল ডানিয়েলের। করুণ ম্লান সুরে সে বলল, 'আমার সত্যি অপরাধ হয়ে গেছে, একশ' বার তা স্বীকার করে নিচ্ছি।'

'অপরাধ স্বীকার করলেই সাত খুন মাপ হয়ে যায় না। অনুগ্রহ করে আপনি আর কাল থেকে স্কুলে আসবেন না।' বলে স্কুল ছুটি দিয়ে সাইড ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে গীর্জার দিকে হাঁটতে শুরু করল সুভদ্রা।

ডানিয়েল তার সঙ্গ ছাড়ল না, পেছন পেছন চলতে লাগল। নিজের অন্যায়ের কথাটা হাজার বার বলে সমানে ক্ষমা চাইতে লাগল।

গনগনে রোদ মাথায় নিয়ে আধ মাইল হাঁটার পর বুঝি সদয় হল সুভদ্রা। ভবিষ্যতে আর কোনদিন এ জাতীয় তামাসা করবে না, এমন প্রতিশ্রুতি দেবার পর ডানিয়েলকে ক্ষমা করল সে। আর ক্ষমা যখন একবার পেয়েছে তখন স্কুল আসার অনুমতিটাও আদায় করে ছাড়ল ডানিয়েল।

আরো দিন কয়েক কাটল।

আজকাল গ্রাম থেকে অনেক দূরে সেই বিচ্ছিন্ন নিঃসঙ্গ বাড়িটায় বড় একটা থাকে না ডানিয়েল। সারা দিনের অধিকাংশ সময়ই এখন তার কাটে মনপুরায়। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে বইখাতা আর কুকুরছানাটাকে নিয়ে চলে আসে। স্কুল ছুটির পর ছেলের দলে ভিড়ে গ্রামের ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়ায়।

সুভদ্রা বলেছিল, জেলে এবং মুক্তোচাষীদের এই নগণ্য জনপদটায় প্রতিটি বাড়িতে তাকে নিয়ে সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে। ডানিয়েল রাজী হয় নি। তার ইচ্ছা, নিজের চেষ্টাতেই সবার সঙ্গে আলাপ করবে, পরিচিত হবে। সে বলেছে, 'এ ব্যাপারে আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না। আপনাদের ভাষা কতখানি শিখতে পারলাম একবার পরীক্ষা করে দেখা যাক।'

মৃদু হেসে সুভদ্রা বলেছে, 'বেশ।'

প্রথম প্রথম দু-চারদিন ছোট ছেলেমেয়েদের সেই বাহিনীটি নিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরেছে ডানিয়েল। তারপর থেকে একাই যায়।

ডানিয়েল যখন সারা গ্রামে টহল দিয়ে ফেরে সে সময় মনপুরায় একটি পুরুষকেও দেখা যায় না। তারা তখন 'আরেবীয়ান সী'তে, বিপুল উদ্দাম সমুদ্রের সঙ্গে জীবন-সংগ্রামে ব্যস্ত। সুতরাং এই সময়টা মনপুরা গ্রাম পুরোপুরি মেয়েমানুষ এবং শিশুর রাজ্য।

শিশুদের আগেই জয় করা গেছে। এবার মেয়েদের পালা।

এই শিক্ষাদীক্ষাবর্জিত অজানা দেশে মেয়েদের হৃদয় কিভাবে জয় করতে হয় সে জাদু ডানিয়েল জানত না। এ সম্বন্ধে সহজ একটা পদ্ধতি শিখিয়ে দিয়েছে সুভদ্রা। ডানিয়েলের কাছে ব্যাপারটা পরম উপভোগ্য এবং কৌতুককর। সুভদ্রা জানিয়েছে, এ দেশের মেয়েদের কাছে শিশু সেজে থাকাটাই শ্রেষ্ঠ পন্থা। তাতেই নাকি তাদের প্রাণের দুয়ার খুলে যাবে। মা এবং সন্তানের সম্পর্ক পাতিয়ে নিতে পারলেই সব চাইতে ভাল। এ দেশের, বিশেষত গ্রামের মেয়েরা, সে যত নাবালিকাই হোক, জননী হতে ভালবাসে। তাদের চোখ মায়ের চোখ, তাদের মন, তাদের হৃদয় সবই মায়ের। মা হওয়াটাই তাদের অমোঘ নিয়তি।

যে দেশের মানসিক গঠন যেমন। অতএব কি আর করা। সুভদ্রার পদ্ধতি অনুযায়ী কোনো বাড়িতে ঢুকে সোজা রান্নাঘরে চলে যায় ডানিয়েল। সবাইকে অবশ্য 'মা' বলে না সে। বয়স অনুসারে কাউকে ডাকে দিদি, কাউকে পিসি, কাউকে ঠাকুমা। সবাইকে মা ডাকতে গেলে মুশকিল, গ্রামসুদ্ধ এতগুলো জননীর একে ডাকতে গেলে ও সাড়া দেবে। কাজেই দু-দশটা পিসি-দিদি-মাসি থাকলে ডাকের একঘেয়েমি থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে, সম্পর্কের মধ্যেও বৈচিত্র্য আসবে।

তা ছাড়া দিদি-পিসিও তো মায়েরই অন্য রূপ। সেখানেও আপন বয়স্ক সত্তাকে আড়াল করে শিশু হয়ে থাকা যায়।

এমনিতেই এ দেশের মেয়েরা স্বভাব-ভীরু, লজ্জা এবং সঙ্কোচ দিয়ে ঘেরা তাদের সমস্ত অস্তিত্ব। প্রথম প্রথম এই বিদেশী আগন্তুকটাকে রান্নাঘরে হানা দিতে দেখে তারা ভয় পেত। কেউ কেউ তাকে দেখলেই ছুটে পালিয়ে যেত। তারপর ধীরে ধীরে তাদের আড়ষ্টতা কেটে গেল, সঙ্কোচটা কখন যেন অজ্ঞাতসারে খসে পড়ল। তারা বুঝতে পারল, অচেনা ভুবন থেকে আসা এই বিদেশী ছেলেটাকে যতখানি ভীতিকর মনে করা গিয়েছিল আদৌ সে তা নয়। বরং নিজের কোলের শিশুটির চাইতেও সে শিশু, তবে কিছু দুরন্ত।

ঘরে ঘরে হানা দিয়ে ডানিয়েল সবার খবর নেয়। কোথাও গিয়ে বলে, 'কী করছ গো দিদি?' কাউকে বলে, 'গালে হাত দিয়ে অত কী ভাবছ?' কারো রান্নাঘরে গিয়ে আসন পিড়ি হয়ে বসে বলে, 'কী রাঁধছ? আলুর বড়া নাকি?' যদি উত্তর আসে, 'হ্যাঁ', ডানিয়েল উৎসাহিত হয়ে ওঠে। ডান হাতখানি বাড়িয়ে দিয়ে বলে, 'দাও তো দুটো।'

শুধু খোঁজ খবরই নেয় না ডানিয়েল, গৃহস্থালির টুকিটাকি কাজে সবাইকে কিছু কিছু সাহায্যও করে। অবশ্য কেউ তাকে করতে বলে না, নিজের ইচ্ছাতেই সে করে। কোথাও পা পেতে দু দণ্ড চুপচাপ বসা তার স্বভাববিরুদ্ধ। কাউকে ঝর্না থেকে দু

বালতি হয়ত জল এনে দিল। কারো হাত থেকে বঁটি কেড়ে নিয়ে ছোট বড় বেঢপ আকারে ঘচ্ ঘচ্ করে খানিক আনাজ পাতি কেটে দিল। কারো কোল থেকে বাচ্চাটা ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে লোফালুফি শুরু করল, তারপর হাসিয়ে কাঁদিয়ে এক কাণ্ডই বাধিয়ে বসল।

মাঝে মাঝে আবার রান্না শেখার সাধ জাগে ডানিয়েলের। উনুনের দিকে এগিয়েও যায় সে। বলে, 'তুমি সর। ঐ ওখানে বসে দেখিয়ে দাও, আমি রেঁধে ফেলছি।'

যার উদ্দেশে বলা সেই মেয়েমানুষটি এবার শঙ্কিত হয়ে ওঠে। ডানিয়েলকে রাঁধিয়ের ভূমিকায় সে বোধহয় দেখতে চায় না। ব্যস্তভাবে যুগপৎ মাথা এবং হাত নেড়ে বলে, 'না-না, তোমাকে রাঁধতে হবে না।'

'ভয় পাচ্ছ নাকি?'

'কিসের ভয়?'

'ভাবছ আমি রাঁধতে পারব না?'

উত্তরটা এড়িয়ে গিয়ে মেয়েমানুষটি বলে, 'আগুন নিয়ে কাজ। অভ্যেস তো নেই। অসাবধান হলেই হাত-পা পুড়িয়ে বসবে। তার চাইতে আমার আনাজগুলো কুটে দাও।'

ডানিয়েল কিন্তু নিরস্ত হয় না। সুতরাং মেয়েমানুষটিকে একটি কৌশলের আশ্রয় নিতে হয়। তাড়াতাড়ি কড়াইতে মারাত্মক উগ্র একটা সম্বরা দিয়ে বসে সে। ফলটি হয় চমৎকার। তীব্র ঝাঁঝে একমুহূর্তও ঘরের ভেতর টিকে থাকা মুশকিল। হাঁচতে হাঁচতে আর কাশতে কাশতে ঘর থেকে এক লাফে বাইরে বেরিয়ে যায় ডানিয়েল।

ডানিয়েলের পালানোর ব্যতিব্যস্ত ভঙ্গিটা রীতিমত উপভোগ্য। হাসতে হাসতে শরীর বাঁকিয়ে চুরিয়ে মেয়েমানুষটি গড়িয়ে পড়ে। সেই অবস্থাতেই হাত নেড়ে কৌতুকরুদ্ধ সুরে ডাকতে থাকে, 'ও কি, পালাচ্ছ কেন? রাঁধার সাধ মিটে গেল?'

ডানিয়েল আর ফিরেও তাকায় না।

এই গ্রামের প্রতিটি নারী ডানিয়েলের কাছে আপন প্রাণের দরজা খুলে দিয়েছে। ডানিয়েল তাদের সখা, বন্ধু, সহচর।

স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে এ গ্রামের প্রতিটি মানুষের কঠোর জীবনসংগ্রাম। পুরুষেরা তো উদয়াস্ত সমুদ্রের ঢেউয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। মেয়েরা তার চাইতে বেশি আরামে নেই। ঘর-সংসারের সমস্ত দিকই তাদের দেখতে হয়। পুরুষদের এদিকে নজর দেবার অবসর কোথায়?

মনপুরায় খাবার জল প্রায় মেলেই না। মাইল খানেক চড়াই-উতরাই ভেঙে ঝর্না থেকে মেয়েদেরই তা নিয়ে আসতে হয়। তা ছাড়া ছেলেপুলে সামলানো, রাঁধাবাড়া—এ সব তো আছেই। তার ওপর পাথুরে মাটি কুপিয়ে মরসুমী আনাজ-পাতিটা তারাই ফলায়। এতে দুটো পয়সা সাশ্রয়ও হয়। প্রতি ঘরেই এক আধখানা তাঁত চোখে পড়ে। প্রধানত মেয়েরাই তা চালায়।

এত কাজের মধ্যেও দুপুরবেলা স্নান খাওয়ার পর মেয়েরা নিজেদের জন্য একটু অবকাশ করে নিয়েছে। এই সময়টা গ্রামের মাঝখানে একটা শিশু গাছের তলায় বসে সবাই আড্ডা জমায়। একজন আরেক জনের চুল বেঁধে দেয়, কেউ মারে উকুন, কেউ ঘামাচি খোঁটে। তার ওপর আছে নানা ধরনের গল্প। মেয়েদের এই অবকাশের সময়টায় ধীরে ধীরে অপরিহার্য হয়ে উঠল ডানিয়েল।

আগে আগে ঘুম থেকে উঠে এখানে স্কুল করে, ঘরে ঘরে হানা দিয়ে দুপুর হলেই নিজের আস্তানায় ফিরে যেত ডানিয়েল। আজকাল আর দুপুরবেলা ফেরা হয় না, ফিরতে ফিরতে রাত অনেক হয়ে যায়।

রেভারেণ্ড আপ্তে চার্চ থেকে ডানিয়েলের খাওয়ার ভার নিয়েছেন। এই গ্রামের এক বিধবা বুড়ী নাম তার ভামুয়া, সংসারে তার কেউ নেই, রান্না করে দেয়। আগে তার খাবার নিয়ে প্রথমে রতি, পরে সেই কালো লোকটা দিয়ে আসত। ইদানীং দুপুরবেলা ভামুয়া বুড়ীর কাছে গিয়ে নিজেই খেয়ে আসে ডানিয়েল। তারপর মেয়েদের দলে আড্ডা দিতে বসে।

দিবস-রজনী এত যে পরিশ্রম, এত দারিদ্র্য, জীবনধারণের জন্য এত সংগ্রাম তবু এই মেয়েমানুষগুলোর মুখ থেকে হাসি মরে না। সরসতা, সজীবতা—এ সব যেন তাদের সহজাত। এরা রসোচ্ছলা, প্রাণময়ী। দারিদ্র্যের সঙ্গে নিয়ত যুদ্ধ করেও জীবনের কোনো অংশেই এরা মরুভূমি সৃষ্টি হতে দেয় নি। প্রাণের এই প্রাচুর্য একেক সময় ডানিয়েলকে অবাক এবং মুগ্ধ করে দেয়।

ডানিয়েল সম্বন্ধে মনপুরার মেয়েদের প্রাণে অসীম বিস্ময় আর কৌতূহল। ডানিয়েল জানতে চায় এখানকার জীবনযাত্রার কথা, সামাজিক এবং ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের কথা। কিন্তু চারিদিক থেকে ডানিয়েল সম্বন্ধেই ঝাঁকে ঝাঁকে প্রশ্ন আসতে থাকে।

একজন হয়ত বলল, 'তোমাদের দেশ কোথায় সাহেব?'

সুদূর দিগন্তের দিকে আঙুল বাড়িয়ে ডানিয়েল উত্তর দেয়, 'সে অনেক দূর। সাত সমুদ্র পাড়ি দিয়ে যেতে হয়।'

'এলে কী করে? তেপনায় (একজাতীয় নৌকা) চড়ে?'

ভূমণ্ডলের এই প্রান্তে মানুষের কল্পনা এখনও নৌকোর যুগেই পড়ে আছে। সমুদ্র পাড়ি দিতে হলে নৌকো ছাড়া তাদের কাছে আর কোনো বাহন নেই! সকৌতুকে ডানিয়েল বলে, 'হুঁ; তেপনায় করেই এসেছি।'

'কতদিন লাগল?'

'তা দু-চার বচ্ছর লেগে গেল।'

'বাব্বা, বল কী!'

আরেক কোণ থেকে আরেকজন ডেকে ওঠে, 'আচ্ছা সাহেব—'

'বল—' ডানিয়েল তাকায়।

'তোমার রঙ তো এমন ফর্সা। তোমাদের দেশের সবাই তোমার মতন?'

'হ্যাঁ।'

যে প্রশ্ন করছে সে অবিবাহিতা তরুণী। তার চোখ চকচক করে ওঠে। সে বলে, 'তোমরা কী করে এমন ফর্সা হও গো?'

বোঝা যায় ফর্সা রঙটির প্রতি মেয়েটির নিদারুণ পক্ষপাত। চোখ টিপে ডানিয়েল বলে, 'ফর্সা হবার মন্তর আছে, সেটা আমরা জানি।'

'মন্তর না আরো কিছু।' মেয়েটি অবিশ্বাসী চোখে তাকায়।

'ফর্সা রঙ তোমার খুব ভালো লাগে, তাই না দিদি?'

'ও মা, লাগবে না!'

'তা হলে এক কাজ করি?'

'কী?'

'আমার দেশে চিঠি লিখে একটা ছেলে আনাই, তারপর তোমার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিই।'

'ই-হি-হি-হি, আমি তাই বলেছি নাকি!' মেয়েটি জিভ ভেংচে আরক্ত মুখে উঠে দাঁড়ায়, 'খচ্চর কুত্তা কোথাকার।'

এদিকে মেয়েমানুষের জটলাটা খিল খিল করে হেসে উঠেছে। সবাই সমস্বরে বলে, 'দাও, একটা সাহেব এনেই ওটার সঙ্গে গেঁথে দাও। সাহেব ভাতার পেয়ে ফর্সা রঙের সাধ মিটুক ছুঁড়ির।'

মেয়েটি আর দাঁড়াতে পারে না, দু হাতে মুখ ঢেকে উর্ধ্বশ্বাসে ছুট লাগায়। আর হেসে হেসে গড়িয়ে পড়ে তার পালানোটা সবাই উপভোগ করে।

কেউ হয়ত বলে, 'কি গো সাহেব, তুমি তো আমাদের এখানে পড়ে আছ। দেশে ফিরবে না?'

একটু চমকে ওঠে ডানিয়েল। তার ব্যক্তিগত কোন প্রশ্ন উঠলেই সেই পালিয়ে আসার প্রসঙ্গটা এসে পড়ার সম্ভাবনা। অতএব খুব সতর্ক ভঙ্গিতে সে বলল, 'দেশে ফিরতে আর মন চায় না।' বলে আড়ে আড়ে জটলাটার দিকে তাকায়।

'কেন গো?'

'তোমাদের এই জায়গাটা আমার ভারি ভাল লেগেছে।'

'এখানে তো শুধু পাহাড় আর সাগর, সাগর আর পাহাড়। এসব তোমার ভাল লেগে গেল!' যে প্রশ্ন করেছে তার চোখেমুখে সীমাহীন বিস্ময়।

'গেল তো।' ডানিয়েল বলতে লাগল, 'পাহাড় আর সাগর ছাড়া আরো অনেক কিছু তো আছে।'

'কী?'

'তোমরা।'

'আমাদের মতন কালো কুষ্টিদের তোমার ভাল লেগেছে।'

'হুঁ—' ডানিয়েল ঘাড় কাত করল, 'কালো রঙটা আমার ভারি ভাল লাগে।' সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে সাড়া পড়ে যায়। আর সেই হৈচৈ-এর মধ্যে একজন মধ্যবয়সী সুরসিকা মেয়েমানুষ বলে উঠল, তা হলে এক কাজ কর না।'

'কী?'

'একটা কালো ছুঁড়ি যোগাড় করে দি, বিয়ে করে এখানেই সংসার পেতে ফেল।'

জটলাটা উল্লাসে কৌতুকে একেবারে ফেটে পড়ে। একসঙ্গে সবাই চিৎকার করতে লাগল, 'খুব ভাল হয়, খুব ভাল হয়। আসছে মাসে গণপতি পুজোটা হয়ে গেলে সাহেবের বিয়ে দিয়ে দাও।'

খুব সাবধানে উত্তর দিয়ে যাচ্ছিল ডানিয়েল। এবার কৌতুকচ্ছটা তার সঙ্গে মিশল, 'ভালই তো। লাগিয়ে দাও দিকি একটা বিয়ে।'

আড্ডার দূর প্রান্ত থেকে কে যেন ফস করে বলে ওঠে, 'তা ঐ ছুঁড়ির সঙ্গেই সাহেবকে গেঁথে দাও, ওর তো ফর্সা রঙের বাতিক।'

'মোন্দ বলিস নি।' ভিড়টা খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে, 'তা হ্যাঁ গো সাহেব, করবে নাকি ঐ ছুঁড়িকে বিয়ে?'

মাপা আধা হাত জিভ কেটে ডানিয়েল বলে, 'ছি ছি, অমন কথাটি মুখে আনবে না। ওকে আমি দিদি বলে ডাকি।'

'তবে তো বিপদ। এ গাঁয়ের সবাইকেই তো তুমি হয় দিদি, না হয় মা, না হয় মাসি বলে ডাকো। তা হলে বিয়েটা হবে কার সঙ্গে শুনি?'

স্বভাবের সেই দুষ্টুমিটা ঠোঁটের প্রান্তে টিপে ধরে ডানিয়েল বলে, 'সেটা তোমরা বোঝো।'

সেই সুরসিকা আবার চেঁচিয়ে ওঠে, 'মনে করেছ, মাসি-পিসি দেখিয়ে উড়ে উড়ে বেড়াবে, সেটি হবে না। ফাঁদে তোমাকে আমরা ফেলবই। এ গাঁয়ের না হোক, অন্য গাঁ থেকে মেয়ে এনে তোমার সঙ্গে গণপতি পুজোর মাসে গেঁথে দেব।'

'বেশ তো, তা-ই দিও। তা, হ্যাঁ গো—'

'বল।'

'গণপতি পুজোর মাস আর কত দেরি?'

'বেশি দেরি নেই গো সাহেব, বেশি দেরি নেই। মাঝখানে মোটে দেড়টা মাস। তারপরেই গণপতি পুজো।'

'এখনও দেড়মাস!' হতাশ একটা ভঙ্গি করে ডানিয়েল।

উকুন বাছা ঘামাচি মারা স্থগিত রেখে মেয়েমানুষগুলো একসঙ্গে কলকল করে ওঠে, 'তর বুঝি আর সইছে না তোমার? বাবা গো, বিয়ে করার কি শখ!'

চোখের মধ্যে হেসে ডানিয়েল বলে, 'সত্যি, তর আর সইছে না। তার আগে বিয়ে হবার কোনো উপায় নেই?'

এরপর হাসির আওয়াজে মনপুরা গ্রাম চৌচির হয়ে যায়। রসোচ্ছলা মেয়েমানুষগুলো কপট সান্ত্বনা দিয়ে বলে, 'গণপতি পুজোর আগে বিয়ের আর লগ্ন নেই। প্রাণ ফেটে গেলেও ততদিন ধৈর্য ধরে থাকতে হবে।' তারপর মুখে মুখেই মেয়েরা স্থির করে ফেলে, বিয়ের পর ডানিয়েলকে অতদূর আর থাকতে দেবে না, পুরুষদের বলে মনপুরা গ্রামের ভেতরেই একখানা ঘর তুলে সংসার পেতে দেবে।

হঠাৎ ডানিয়েল বলে ওঠে, 'আচ্ছা, গণপতি-পুজোর মাসটা বুঝি খুব ভাল মাস?'

'হ্যাঁ, খুব ভাল।' সবাই একসঙ্গে মাথা নাড়ে।'

'সে সময় কী হয়?'

'কী হয়, তুমি জানো না!' ডানিয়েলের অজ্ঞতায় মেয়েমানুষগুলো হতবাক। গণপতি-পুজোর মাসে মনপুরা গ্রামে কী কী ঘটে তা না জানা যেন নিদারুণ অপরাধ।

'কিভাবে জানব বল।' ডানিয়েল বলতে থাকে, 'আমি তো তোমাদের দেশে নতুন এসেছি।'

ডানিয়েলের কথার মধ্যে যথেষ্ট যুক্তি আছে। যে মানুষ এ অঞ্চলে নবাগত তার পক্ষে বিশদভাবে এখানকার সব কিছু জানা সম্ভব নয়। অতএব মেয়েমানুষগুলো তার অপরাধ অনায়াসে ক্ষমা করে নিতে পারে এবং জানায় গণপতি-পুজোয়, এই মনপুরায়, শুধু মনপুরায় কেন, সারা দেশ জুড়ে উৎসবের বান ডেকে যায়। একটা দুটো দিন নয়, পুরো একটি মাস উৎসবটাকে ঘিরে মত্ততার ঘোর লেগে থাকে। নাচ-গান-মেলা-সং ইত্যাদি ব্যাপারে নিস্তব্ধ স্তিমিত মনপুরা গ্রাম তখন উদ্দাম স্রোতে ভেসে যায়। মাত্র দেড়টা মাস। সে ক'টা দিন অপেক্ষা করলে নিজের চোখেই সব কিছু দেখতে পাবে সে।

ডানিয়েল মনে মনে স্থির করল, সাগ্রহে উদ্‌গ্রীব প্রতীক্ষায় ততদিন বসে থাকবে।

উৎসবের কথা বলতে বলতে মেয়েমানুষগুলোর চোখেমুখে হঠাৎ আতঙ্কের ছোঁয়া লাগে। তারা বলে, 'পুজোর মাসটা ভালই কাটবে, তারপরেই শুরু হবে একটানা দুটো মাস আতান্তর।'

ডানিয়েল চমকে ওঠে, 'আতান্তর?'

'হ্যাঁ। এই দু-মাস যে কিভাবে কাটে তা আমরাই জানি। কোনো দিন আধপেটা খেয়ে, কোন দিন উপোষ দিয়ে শরীর তখন পাত হয়ে যাবে।'

'ফি বছরই এরকম হয় নাকি?'

'ফি বছর।'

মেয়েমানুষগুলো জানায় বাৎসরিক মন্বন্তরটা অমোঘ নিয়তির মত। এর হাত থেকে মুক্তির কোনো পথ নেই। তখন শুধু অভাব, অভাব আর অভাব। না মিলবে তখন একদানা ভাত, না লোকের হাতে থাকবে একটা পয়সা। সর্বব্যাপী এক দুর্ভিক্ষ শকুনের ছায়ার মত মনপুরা গ্রামকে শীতল মৃত্যুভয়ে শুধু আতঙ্কিত করে রাখবে।

ডানিয়েল শঙ্কিত, সচকিত, বিহ্বল। দারিদ্র্য আর অভাব যে কত নিদারুণ হতে পারে এই গ্রামে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে সে টের পেয়ে আসছে। মনপুরার মানুষ তাতেই অভ্যস্ত। কিন্তু এর চাইতেও নাকি ভয়ঙ্কর দিন বছরে একবার করে তাদের জীবনে হানা দেয়। দারিদ্র্যে অভ্যস্ত মানুষগুলো যে দিনের আবির্ভাবে আতঙ্কিত না জানি সে দিন কত ভয়াবহ? আজন্ম স্বাচ্ছন্দ্য আর আরামে লালিত ডানিয়েল এই মুহূর্তে সেই মারাত্মক অবস্থার কথা ভাবতে পারে না। তবু একবার কল্পনা করতে চেষ্টা করল সে। দুর্ভিক্ষের কিছু কিছু কাহিনী তার পড়া আছে। পড়াই শুধু, নিজের চোখে দেখা নেই। বইয়ের পৃষ্ঠায় দুর্ভিক্ষের যে ছবি আঁকা আছে তাতেই তার সমস্ত

অস্তিত্ব শিহরিত হয়ে উঠেছে। তবে কি তেমন মৃত্যু, মহামারী এবং অনশন পশ্চিমঘাটের এই উপত্যকায় দু'মাস রাজত্ব চালিয়ে যাবে?

ডানিয়েল বলল, 'ঐ দুটো মাস তোমাদের বড় কষ্ট, না?'

'তা একটু হয় বৈকি। তবে বছর বছর এ অবস্থা হয় বলে গা সওয়া হয়ে গেছে।'

'আচ্ছা, ঐ সময়, না খেয়ে লোকটোক মারা যায়?'

জটলাটা এবার খিল খিল করে হেসে উঠল, 'তোমার দেখি খুব ভাবনা শুরু হয়ে গেছে সাহেব।'

ডানিয়েল বলে, 'না না, ঠাট্টা নয়। বল না, মরে কিনা?'

বিষয়টার ওপর বিন্দুমাত্র গুরুত্ব না দিয়ে মেয়েমানুষগুলো বলে, 'যে বেশি উপোস করতে পারে না, আর যার পেটে অখাদ্য কুখাদ্য সয় না, তেমন দু-চারজন মরে বৈকি।'

উদাসীন সুরে এবং মুখে একটিও ভয়ের রেখা না ফুটিয়ে কেউ যে অমন নিদারুণ কথা বলতে পারে, ডানিয়েলের ধারণা ছিল না। একটা শীতল স্রোত তার মেরুদণ্ডের মধ্যে দিয়ে দ্রুতগতিতে বয়ে গেল। উত্তরে কী বলা উচিত সে ভেবে পেল না।

মেয়েমানুষগুলো আবার বলে ওঠে, 'তবে কি জানো সাহেব, আমাদের পেট তো আর সৌখিন নয়। তাতে যা ঢোকাব তা-ই সয়ে যাবে। উপোসও যদি দিনের পর দিন করে যাই, বিছানা হয়ত নেব কিন্তু মরব না। এমন ঝাড়ে আমাদের জন্ম যেখানে মরাটা সহজে আর হয়ে ওঠে না।'

নির্বাক বিস্ময়ে মৃত্যুঞ্জয় রক্তবীজের ঝাড়গুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে ডানিয়েল। অনেকক্ষণ পর বলে, 'আচ্ছা, তখন কি খাওয়া-দাওয়া একেবারেই পাওয়া যায় না?'

'থাকো না, নিজের চোখেই সব দেখতে পাবে।'

একেক দিন অন্য প্রসঙ্গও এসে পড়ে। সেদিন হয়ত মেয়েমানুষগুলো বলে, 'এতদিন তো আমাদের এখানে পড়ে আছ, দেশের জন্য মন কেমন করে না?'

'উঁহু।' ডানিয়েল মাথা ঝাঁকায়।

'দেশে তোমার কে কে আছে?'

দু-হাত উল্টে দিয়ে ডানিয়েল বলে, 'কেউ না।'

'মা-বাবা?'

'উঁহুঁ।'

'ভাই-বোন?'

'উঁহু—'

'বউ?'

'উঁহু—'

'তাই বুঝি বিবাগী হয়ে সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে পড়েছ?'

তর্জনী তুলে ঘাড় হেলিয়ে ডানিয়েল বলে, 'ঠিক ধরেছ।'

কোনোদিন মেয়েরা বলে, 'তোমাদের দেশটা কেমন গো সাহেব? আমাদের মত এমন গাঁ, না কোলাপুরের মত পেল্লায় শহর?'

কোলাপুর দেখে এসেছে ডানিয়েল। রাজধানী নয়, সুবৃহৎ শিল্পনগরী নয়, নিতান্তই ঘিঞ্জি অস্বাস্থ্যকর নোংরা আঞ্চলিক শহর। বোঝা গেল শহর সম্বন্ধে এদের জ্ঞান কোলাপুরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। মনপুরার গ্রামবাসিনীরা কোলাপুরকেই জগতের শ্রেষ্ঠ নগরী ভাবতে ভালবাসে। বিশালতা, আড়ম্বর, মর্যাদা, শখ এবং প্রমোদের উপকরণ মিলিয়ে যে শহর, তাদের কল্পনায় তার চূড়ান্ত রূপ হচ্ছে কোলাপুর।

ডানিয়েল তাদের কল্পনাকে অসম্মান করল না, মৃদু গলায় বলল, 'তোমাদের গ্রামের চাইতে বড়, তবে—'

'কী?'

'কোলাপুরের চাইতে অনেক ছোট।'

মেয়েমানুষগুলোর মুখ উজ্জ্বল দেখায়। তারা বলে, 'আচ্ছা, তোমাদের বাড়িঘর কেমন? আমাদের মত এমন পাথর দিয়ে তৈরি?'

চোখের সামনে লণ্ডন শহরের অভিজাততম অংশে তাদের সেই সুবিশাল ভিক্টোরীয় যুগের ক্যাসেল, লন, ছড়ানো আউট হাউস, সমুদ্রের পারে সামার হাউস—সব এক সঙ্গে ভেসে উঠল। এই দরিদ্র ক্ষুধার্ত অর্ধনগ্ন মানবীগুলোর কাছে সেই আড়ম্বর আর প্রাচুর্যের কথা বলতে গিয়ে সত্তা স্বভাবতই সঙ্কুচিত হয়ে আসে। আড়ষ্ট সুরে ডানিয়েল বলল, 'প্রায় তোমাদের মতই।'

'তাই নাকি, তাই নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'তা হলে তো আমাদের সঙ্গে তোমাদের খুব মিল।'

ডানিয়েল উত্তর দিল না।

দিনের পর দিন কেটে যায়। প্রথম প্রথম মনপুরা গ্রামের প্রান্তসীমায় নিতান্ত অপরিচিতের মত সে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ধীরে ধীরে এখানকার জীবনের অন্তঃপুরে তার পদক্ষেপ ঘটতে শুরু করেছে।

মনপুরা-বাসিনীদের সবার সঙ্গেই আলাপ-পরিচয় হয়েছে, ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। ডানিয়েল তাদের সারাদিনের সহচর, অবসর বিনোদনের সহায়। তাদের মনোরঞ্জনের জন্য প্রতিদিন কত গল্পই তাকে করতে হয়।

এদের মধ্যে দু-জন তাকে সব চাইতে বেশি আকর্ষণ করেছে। শুধু আকর্ষণই করেনি, ডানিয়েলের হাত ধরে একেবারে নিজেদের হৃদয়ের অন্দর মহলে নিয়ে গেছে। এই দু-জনের প্রথমা হল ভামুয়া বুড়ী, দ্বিতীয়ার নাম গঙ্গাবাঈ।

চার্চ তো চাল-ডাল-আটা মশলা পাঠিয়ে খালাস। সেগুলো রান্না বান্না করে ডানিয়েলের জন্য খাবারে পরিণত করার দায়িত্ব ভামুয়া বুড়ীর।

প্রথম দিনকয়েকের কথা বাদ দিলে ইদানীং দুপুরে এবং রাত্তিরে দু-বেলাই ভামুয়া বুড়ীর বাড়িতে খেতে যায় ডানিয়েল।

ভামুয়া বুড়ীর বাড়িটা গ্রামের ঠিক মাঝখানে। এখানকার আর সব বাড়ির মতই সেটার চেহারা। কোথাও কোনো পার্থক্য নেই। তবে বাড়িটা পুরনো, জরাগ্রস্ত, অনেককাল তার চাল বদলানো হয় নি। দেওয়াল আধাআধি ধসে পড়েছে। ফুটো ঝুরঝুরে টিনের চাল রোদ-বৃষ্টি-ঝড় কোনটাকেই আটকাতে পারে না। ঘরের ভেতর তাদের চলাচল অবাধ। ভামুয়া বুড়ীর সঙ্গে প্রকৃতিও এই বাড়িখানার ওপর নিজের স্বত্ব কায়েম করে বসেছে।

সংসারে ভামুয়া বুড়ী একা, একেবারে একা। যৌবনের মাঝামাঝি সময়ে তার স্বামী মারা গেছে। না আছে একটা ছেলে, না একটা মেয়ে। সে নিঃসন্তান। স্বামী না থাকলেও স্বামীর সম্পর্কে আত্মীয় পরিজন থাকতে বাধা ছিল না। কিন্তু ভামুয়া বুড়ীর এমন কপাল যে একটা দেওর, একটা ভাসুর অথবা শ্বশুর-শাশুড়ি কিছুই নেই তার।

স্বামী হারানোটা অবশ্যই নিদারুণ ক্ষতি। তবে যে বয়সে ভামুয়া বুড়ী স্বামী হারিয়েছে সেটা আক্ষেপের বয়স নয়। কেননা তখনও যৌবন তার সর্বাঙ্গে আকর্ষণের মেলা সাজিয়ে রেখেছে। তাদের সমাজে বিধবার বিয়ে এমন কিছু অপরাধ নয়, বরং তা প্রচলিত রীতি। নিজের ভবিষ্যতের জন্য, নিজের নিরাপত্তার খাতিরে অনায়াসেই আরেকটি স্বামী জোগাড় করে নিতে পারত ভামুয়া বুড়ী।

এ ব্যাপারে যে খুব একটা কষ্ট করতে হত তা নয়। সেই বয়সে সর্বাঙ্গে যৌবনের প্রদর্শনী সাজানো রয়েছে। সমান্য একটু ইঙ্গিত করলেই যে কেউ তার পায়ে জীবন-স্বত্ব বিকিয়ে দিতে পারত। অবিবাহিত ছোকরাগুলি লুব্ধ পতঙ্গের মত তার চারপাশে ঘুরঘুর তো করছিলই।

কিন্তু ভামুয়া বুড়ী বিয়ে করে নি। ভবিষ্যতের সমস্ত অনিশ্চয়তা অগ্রাহ্য করে স্বামীর ভিটেয় একা একাই জীবন কাটিয়ে চলেছে।

কিন্তু প্রাণধারণ বলে একটা শব্দ আছে, দিন কাটানো তো শুধু কথার কথা নয়। সে জন্য প্রতিদিন পেটে কিছু দিতে হয়, গায়ে কিছু তুলতে হয়। সে সব আসে কোথা থেকে? স্বামী ছিল দরিদ্র জেলে। ঘরে এমন কিছু সোনাদানা গিনি মোহরের পাহাড় সে জমিয়ে রেখে যায় নি। যাতে পায়ের ওপর পা তুলে দুর্ভাবনাশূন্য নিশ্চিত জীবন যাপন করা যায়। তা ছাড়া মনপুরার গ্রামবাসীদের অবস্থা বা মন কোনোটাই এমন ধনে ধনী নয় যে বসিয়ে বসিয়ে তাকে খাওয়াবে। অতএব নিজের চিন্তা, নিজের ব্যবস্থা তার নিজেকেই করে নিতে হয়েছে।

ভামুয়া বুড়ী বিধবা হবার পর প্রথম প্রথম মনপুরা গ্রামের ঘরে ঘরে সুদূর ঝর্না থেকে জল এনে দিত, বজরা পিষে দিত। কারো রান্নাবান্না করত, কারো ছেলে ধরত। প্রসবের সময় ধাইগিরি করত। নানা উঞ্ছবৃত্তিতে জীবন ছিল চারিদিকে ছড়ানো।

তখনকার দিনকাল এমন ছিল না। আজ থেকে দু-যুগ আগে সস্তার বাজারে জল টেনে ধাইগিরি করে যা মজুরি মিলত তাতে একা মানুষের সংসার ভালভাবেই চলে যেত। খুব একটা সচ্ছলতা না থাকলেও কোনোদিন অভাব ছিল না।

কিন্তু মনপুরার মানুষ এমন সৌখিন নয় যে দীর্ঘকাল জল টানা, বজরা পেষার মত সামান্য কাজ মজুরি দিয়ে করাবে। তা ছাড়া দিনকালের মতিগতিও দ্রুত খারাপ হয়ে উঠতে লাগল। আগে যেখানে টাকায় আট রতল (এক রতল আধসেরের সমান) চাল মিলত সেখানে ক্রমশ ছয় রতল, পাঁচ রতল, অবশেষে চার রতলের বেশি পাওয়া দুষ্কর হয়ে উঠল। কাজেই জীবিকা বদলাতে হল ভামুয়া বুড়ীকে।

মনপুরা গ্রামে যারা তার হিতৈষী তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে জাল বুনতে এবং রিপু করতেও শুরু করল ভামুয়া। তা ছাড়া মুক্তো ওঠার সময় দিনমজুরিতে ঝিনুক ভাঙত।

এ অঞ্চলের জেলেদের উদয়াস্ত সমুদ্রের সঙ্গে জীবন সংগ্রাম। সারাদিন পরিশ্রমের পর তাদের এমন জীবনীশক্তি আর অবশিষ্ট থাকে না যাতে নতুন জাল বুনতে অথবা পুরনো জখমী জাল রিপু করতে বসা যায়। সুতরাং ভামুয়া বুড়ীর দুয়ারে সবাইকে আসতে হ'ত। আজ বিশ বছর ধরে ঐ কাজই করে আসছে সে। অবশ্য মুক্তোচাষের সময় আজকাল আর দিনমজুরি করে না।

ভামুয়া বুড়ীর যে দিকটা ডানিয়েলকে সব চাইতে আকর্ষণ করেছে সেটা তার সংগ্রামী রূপ। কয়েক হাজার মাইল দূরে তাদের সেই দ্বীপপুঞ্জে একটি রমণীর পক্ষে একা একা মর্যাদার সঙ্গে জীবন কাটানো সম্ভব। কেননা সেখানকার সমাজ-ব্যবস্থা তার অনুকূলে।

কিন্তু ডানিয়েল শুনেছে প্রাচ্যের এই পুরুষ-শাসিত সমাজে নারীর ভূমিকা অনেকটা ক্রীতদাসীর মত। তা ছাড়া এখানকার পরিবেশটাই এমন সংস্কারাচ্ছন্ন অনুদার যে একা একা একটি স্ত্রীলোকের পক্ষে টিকে থাকা প্রায় অসম্ভব। বিশেষত যে বয়সে ভামুয়া বুড়ী বিধবা হয়েছে সেই বয়সে একা একা মর্যাদার জীবন যাপন করা খুবই কঠিন।

ইওরোপে আমেরিকায় স্বাধীন জীবনযাত্রার সবরকম সুবিধা থাকা সত্ত্বেও কোনো নারী বিধবা হবার পর দুটো দিনও নিঃসঙ্গ থাকতে চায় না, আবার বিয়ে করে বসে। পশ্চিমঘাটের এই সুদূর উপত্যকায় বিধবা বিবাহের রীতি প্রচলিত। তথাপি নিজের জীবনে দ্বিতীয় পুরুষকে ডেকে আনেনি ভামুয়া বুড়ী। স্বামীর স্মৃতিই তার কাছে সব চাইতে মূল্যবান সম্পদ। জীবনের প্রথম পুরুষটিকেই সে অদ্বিতীয় করে রাখতে চেয়েছে। তার ঘর সংসার আঁকড়ে ধরে আয়ুর অবশিষ্ট অংশটা কাটিয়ে দেওয়াই একমাত্র করণীয় মনে হয়েছে ভামুয়া বুড়ীর। আরেকটি পুরুষকে ডেকে এনে স্বামীর স্মৃতিকে মলিন করতে চায়নি সে।

মৃত্যু এসে মুছে নিয়ে যাবার পরও একটি পুরুষের প্রতি এই যে একাগ্রতা, এই যে আনুগত্য এবং প্রেম—এ সবের বুঝি তুলনা নেই। ভামুয়া বুড়ীর চরিত্রের এই দুর্লভ অংশগুলি ডানিয়েলকে অভিভূত, মুগ্ধ করে ফেলেছে।

দু-বেলা খেতে বসে নানা কথা বলে দুজনে। ভামুয়া বুড়ী ডানিয়েলের জীবনের বিভিন্ন খুঁটিনাটি সম্পর্কে জানতে চায়। কিন্তু ডানিয়েলের সমস্ত কৌতূহলের কেন্দ্রে বসে আছে ভামুয়া বুড়ী। নিজের কোনো প্রসঙ্গ উঠলেই কৌশলে ডানিয়েল তা ভামুয়া বুড়ীর দিকে বইয়ে দেয়।

কোনো দিন ডানিয়েল বলে, 'আচ্ছা ঠাকুমা, ঠাকুদ্দা মরবার পর তো তুমি একলা হয়ে গেলে। তার ওপর তখন তুমি যুবতী।'

'হ্যাঁ, তাতে কী হয়েছে?' ভামুয়া বুড়ী চোখ তুলে তাকায়।

'এই বাড়িতে রাত্রিবেলা তুমি একাই থাকতে?'

'একা ছাড়া দোকা আর কোথায় পাচ্ছি বল। তোর মত একটা রাঙা টুকটুকে নাতি থাকলেও না হয় কথা ছিল। পেরানটা তোর পায়েই ঢেলে দিতাম।' বলে ভামুয়া বুড়ী ডানিয়েলের দিকে কটাক্ষ হানে।

ডানিয়েল বলে, 'ঠাট্টা নয় ঠাকুমা। সত্যি করে বল তো একা একা রাত কাটাতে গিয়ে কোনোদিন বিপদে পড়েছ কিনা?'

মুহূর্তে স্মৃতির মধ্যে ডুবে গেল ভামুয়া বুড়ী। অনেকক্ষণ পর আস্তে আস্তে মুখ তুলে বলল, 'একবার একটা ভারি মজার ব্যাপার হয়েছিল। এখন অবশ্যি মজা লাগছে, সেদিন মনে হয়েছিল ভয়ঙ্কর বিপদ।'

'কী হয়েছিল?'

'বেওয়া হবার পর যে লোকটা আমায় বিয়ে করার জন্য সব চাইতে বেশি জ্বালাতন করত তার নাম যশোবন্ত। তার তখন উঠতি বয়েস, গোঁফের রেখা পুরুষ্টু হয়ে উঠেছে, পেল্লায় জোয়ান চেহারা, বাঁশি বাজাতে পারত। মাথায় ছিল বাবরি চুল। একেবারে বংশীধারী কেষ্ট ঠাকুর।'

'কেষ্ট ঠাকুর কে?'

'সে আমাদের এক দেবতা। তারপর শোন, আমাকে একা পেলেই যশোবন্ত ধরত আর বিয়ের জন্যে ঘ্যানঘ্যানানি শুরু করত। আমি তাকে ভাগিয়ে দিতাম।'

'অমন সুন্দর চেহারা, জোয়ান ছেলে, বিয়ে করে ফেললেই পারতে।'

হি হি করে খানিক হেসে ভামুয়া বুড়ী বলে, 'কি বলছিস রে মুখপোড়া, ও যে আমার চাইতে আট দশ বছরের ছোট। ওর সঙ্গে আমার বিয়ে হবে কী করে?'

এ এক নতুন অভিজ্ঞতা বটে। এদেশে যে মেয়েমানুষ বয়সে বড় অপেক্ষাকৃত কমবয়সী পুরুষকে সে বিয়ে করতে পারে না। সকৌতুকে ডানিয়েল বলল, 'বয়েস দেখেই বুঝি পিছিয়ে গেলে, নইলে তাকে মনে নিশ্চয়ই ধরেছিল।'

ডালের কড়াই থেকে হাতা তুলে উঁচিয়ে ধরে ভামুয়া বুড়ী। কপট রাগে চোখ পাকিয়ে বলে, 'আবার বদমাইসি—'

'আচ্ছা, আচ্ছা আর ওসব মুখে আনব না।' ডানিয়েলের চোখেমুখেও কপট ভয়ের ছায়া পড়ে, 'যা বলছিলে বল।'

একটু কি ভেবে ভামুয়া বুড়ী আবার শুরু করে, 'একদিন রাত্তির বেলা খেয়েদেয়ে শুয়েছি। সারাদিন খুব খাটুনি গেছে। বিছানায় গা ঠেকানো মাত্তর মড়ার মত ঘুমিয়ে

পড়েছিলাম। হঠাৎ আমার মনে হল কেউ যেন পাশে বসে আছে। তার নিশ্বাস আমার মুখে এসে পড়ছিল, তার একখানা হাত সারা গায়ে চলে বেড়াচ্ছে। প্রথমটায় বুক ধক করে উঠল, গায়ে কাঁটা দিল, তারপরেই মনটাকে শক্ত করে ফেললাম।'

রুদ্ধশ্বাসে ডানিয়েল জিজ্ঞেস করে, 'কী করলে তুমি?'

'বল তো কী করেছিলাম?'

'বা রে, আমি কেমন করে বলব।'

'পারলি না তো বলতে?' ভামুয়া বুড়ী হাসে, 'বেশ, আমার কাছেই তা হলে শোন।'

শিয়রের কাছে ছিল এক দাঁ, অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে সেটা বার করলাম। তারপর সেটা বাগিয়ে আন্দাজে ঝাড়লাম এক কোপ। পাশে যে বসে ছিল, একটা চিৎকার করে বাইরে ছুট লাগাল।

'তারপর?'

'তারপর আর কি, সকালবেলা উঠে দেখি, যশোবন্তর মাথায় পেল্লায় ফেট্টি বাঁধা।'

'যশোবন্তই তা হলে সেদিন তোমার ঘরে ঢুকেছিল?'

'তা বলতে পারব না। তবে সে রটিয়ে বেড়িয়েছিল, পাহাড়ে পা পিছলে মাথা ফাটিয়েছে।'

সভয় বিস্ময়ে ডানিয়েল বলে, 'মাই গড্, তুমি তো সাঙ্ঘাতিক লোক। একেবারে ডাকাত।'

ভামুয়া বুড়ী হাসে, 'সেদিন রাতের ব্যাপারটা আমি সবাইকে জানিয়ে দিয়েছিলাম।'

সেই থেকে গ্রামের লোকেরা নাম দিয়েছিল 'বাঘিনী।'

বাঘিনীই বটে! ডানিয়েলও হাসে।

ভামুয়া বুড়ী আবার বলে, 'সেদিন থেকে আরেকটা কী কাণ্ড হয়েছিল জানিস? যশোবন্ত আর আমার কাছে ঘুরঘুর করত না। আমাকে এ পথে দেখলে অন্য পথ দিয়ে দৌড় লাগাত।'

'আচ্ছা, লোকটা কে বল দিকি? এখনও বেঁচে আছে?'

'শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে আছে বৈকি। পশ্চিম দিকের শেষ মাথায় দুটো বুড়োকে চুট্টা ফুঁকতে দেখেছিস?'

'হ্যাঁ।'

'তাদের মধ্যে যেটা বেশি লম্বা সেটাই যশোবন্ত।'

বুড়ো দুটোর সঙ্গে মোটামুটি ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। ডানিয়েল মনে মনে সিদ্ধান্ত করল, যশোবন্তের সঙ্গে আলাপ এবং অন্তরঙ্গতাটা আরো পাকা করে তুলবে এবং সুযোগ পেলেই প্রথম যৌবনের সেই ব্যর্থ অভিসারের প্রসঙ্গ তুলে জ্বালিয়ে মারবে।

যাই হোক, ভামুয়া বুড়ীর ঘরময় স্তূপীকৃত জাল। কোনোটা নতুন বোনা হয়েছে। কোনোটার বোনার কাজ বাকি। কোথাও জালের কাঠি ছড়িয়ে রয়েছে, কোথাও তাল তাল সুতলি। কোথাও বা লম্বা লম্বা পাটের দড়ি। এরই মাঝখানে নড়বড়ে একখানা

তক্তাপোষে পরিচ্ছন্ন একটি বিছানা। ভামুয়া বুড়ী নিদ্রাবিলাসিনী। বিছানাটি ধবধবে পরিষ্কার না হলে তার ঘুম হয় না। ঘরের আরেক প্রান্তে একটি টিনের তোরঙ্গ, কাঠের একটি হাতবাক্স আর আছে পিতলের কিছু বাসন-কোসন। শোবার ঘরের সংলগ্ন রান্নার জন্য সংক্ষিপ্ত একটু জায়গা।

রোজ দু-বেলা খেতে খেতে ভামুয়া বুড়ীর জীবনের নানা প্রসঙ্গ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নেয় ডানিয়েল। স্বামী ছিল অত্যন্ত দরিদ্র, পরের নৌকোয় দিন মজুরিতে সে মাছ ধরতে যেত। তা ছাড়া বিবাহিত জীবনও তাদের দীর্ঘ নয়। অতএব স্ত্রীর ভবিষ্যতের কথা ভেবে সামান্য সঞ্চয়টুকুও রেখে যেতে পারে নি সে।

ভামুয়া বুড়ীকে আপন হাতে নিজের জীবন গড়ে নিতে হয়েছে। দীর্ঘ দু-যুগ ধরে অনেক টাকা রোজগার করেছে সে। একা মানুষ, খরচ আর কত! কাজেই অজস্র অর্থ সে জমাতে পারত। কিন্তু টাকার প্রতি তার আসক্তি নেই। তার সঞ্চয়ের বেশির ভাগ অংশই মনপুরাবাসীদের কল্যাণে খরচ করে দিয়েছে ভামুয়া বুড়ী। কে মেয়ের বিয়ে দিতে পারছে না, খবর পেয়েই আঁচলে টাকা বেঁধে ভামুয়া বুড়ী ছুটল। কার উনুনে তিনদিন হাঁড়ি চড়ে নি, খবরটা কানে আসা মাত্র চাল কিনে সেখানে পৌঁছে গেল। মোট কথা বিপদে-আপদে ভামুয়া বুড়ীর কাছে হাত পাতলে হতাশ হয়ে ফিরতে হয় না। এখানে বছরে একবার করে যে মরসুমী দুর্ভিক্ষ লাগে তখনও দেখা যায় ভামুয়া বুড়ী মুক্তহস্ত। যতক্ষণ তার ঘরে একদানা খাদ্য থাকে ততক্ষণ কাউকে সে ফেরায় না।

দু হাতে সমস্ত সঞ্চয় শূন্য করে দেবার পরও তার কাঠের বাক্সটিতে শ' পাঁচেক টাকার মত রয়েছে। বাক্সটায় তালা নেই। প্রায়ই দেখা যায় সেটা হাট করে খোলা।

ডানিয়েল বলে, 'অমন করে কেউ টাকা পয়সা রাখে! চুরি হয়ে যাবে না?'

ভামুয়া বুড়ী বলে, 'চুরি করবে কে?'

'কেন, এখানকার লোকেরা।'

'উঁহু—'

'উঁহু মানে?'

'আমার ঘরে ওরা চুরি করতে আসবে না। ওরা জানে এ টাকা ওদেরই।'

ভামুয়া বুড়ীর আরেকটা দিক ডানিয়েলকে অভিভূত করে ফেলেছে। সেটা তার স্নেহময়ী জননী মূর্তি। তার সামনে খেতে বসলে রক্ষা নেই। প্রতিদিনই ডানিয়েলকে অনেক বেশি পরিমাণে খেতে হয় এবং আকণ্ঠ খেয়ে প্রচণ্ড অস্বস্তি ভোগ করতে হয়। প্রতিবাদ করে লাভ নেই। যদি ডানিয়েল বলে, 'আমার পেট ভরে গেছে, আর দিও না' ভামুয়া বুড়ী বলে, 'পেট ভরেছে কিনা তুই তা বুঝিস?'

'বা রে, তুমি আমাকে বাচ্চা ছেলে ভাব নাকি?'

'বাচ্চা না তো কি? তর্ক না করে খা দিকি বাপু। যা দেব চুপচাপ লক্ষ্মী ছেলের মত খেয়ে উঠবি।'

'খাইয়ে খাইয়েই তুমি আমায় মেরে ফেলবে ঠাকুমা।'

'কথা শোন বাঁদরের।' ভামুয়া বুড়ী হেসে ফেলে।

নাঃ, পশ্চিমঘাটের এই অজ্ঞাতবাসে এসেও মায়ের হাত এড়ানো গেল না। বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ থেকে কয়েক হাজার মাইল দূরে এই অজানা উপত্যকায় মাতৃস্নেহের মেলা যে সাজানো রয়েছে, কে তা ভাবতে পেরেছিল!

দ্বিতীয় যে মেয়েমানুষটি ডানিয়েলকে আকর্ষণ করেছে তার নাম গঙ্গাবাঈ।

গঙ্গাবাঈ-এর সঙ্গে পরিচয়টা কিঞ্চিৎ নাটকীয়। একদিন স্কুল থেকে বেরিয়ে মনপুরা গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে লক্ষ্যহীনের মত ঘুরে বেড়াচ্ছিল ডানিয়েল। হঠাৎ ভাজা মাছের সুগন্ধ নাকের ভেতর ঢুকে একেবারে পাকস্থলী পর্যন্ত তোলপাড় করে দিল।

মনপুরায় আসার পর প্রথম দিনটাই যা কিছু মাছের চেহারা চোখে দেখা গিয়েছিল। তারপর আর সাক্ষাৎ ঘটে নি। মাংস তো সুদূর কল্পলোকের ব্যাপার। একেবারে একটানা নিরামিষ চলছিল। অথচ মা-বাবার কাছে থাকতে—। নাঃ, সে কথা ভেবে শুধু কষ্টই পেতে হয়।

যাই হোক, ভাজা মাছের মধুর সুগন্ধ ডানিয়েলকে সম্মোহিত করে ফেলেছিল। নিজের অজ্ঞাতসারে কখন যে পায়ে পায়ে একটা বাড়ীর ভেতর চলে এসেছে খেয়াল নেই।

দরজা-জানালা এবং বেড়াহীন একচালা রান্নাঘরে বসে মেয়েমানুষটি কড়ায় মাছ দিয়ে নিবিষ্ট চোখে তাকিয়ে ছিল। বছর সাতেকের একটি ছেলে তার কাঁধের ওপর দিয়ে কড়ার দিকে ছিল ঝুঁকে।

মেয়েমানুষটিকে ঠিকমত দেখা যাচ্ছিল না, কেননা তার মুখ ছিল সামনের দিকে ফেরানো। আর ডানিয়েল গিয়ে দাঁড়িয়েছিল তার পেছনে।

ভাজা হয়ে গেলে একটি একটি করে মাছের টুকরো কড়া থেকে নামিয়ে ঘুরে বসেছিল মেয়েমানুষটি। আর তখনই ডানিয়েলের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গিয়েছিল। অবশ্য সেই ছোট বাচ্চাটা যথারীতি তার কাঁধে ঝুলে ছিল। ডানিয়েলের মনে হয়েছে, সর্বক্ষণই বোধহয় ছেলেটা ঐভাবে ঝুলে থাকে।

কত বয়েস হবে মেয়েমানুষটির? নিশ্চয়ই তিরিশের ওপরে তবে চল্লিশের অনেক নিচে। হাত-পা-চোখ-মুখ, কোথাও কোনো মনোহারিত্ব নেই। নাকটি চাপা, চোখদুটি কোনোমতেই টানা টানা ভাসা ভাসা নয়, চিবুকটিতে কিছু খুঁত থেকে গেছে। তবে চুল আছে অজস্র, ছোট্ট কপালটির পর থেকেই কুঞ্চিত নিবিড় চুল থরে নেমে থয়ে গেছে।

পরনে আধময়লা ছাপা শাড়ি, জামার বালাই নেই। সর্বাঙ্গে ধাতুর চিহ্নমাত্র ছিল না। অলঙ্কার বলতে দু-হাতে লাল কড়ের দুটো কঙ্কন মাত্র।

চমৎকৃত হবার কিছু নেই তবু এই কালো আধবয়সী মাছভাজুনি বৌটির কোথায় যেন অপরূপের একটি ছোঁয়া আছে। তার দিকে তাকিয়েই কেউ চোখ ফিরিয়ে নেবে, সাধ্য কি।

অপরূপ শব্দটা ডানিয়েল জানে না। তার অর্থ কী, ব্যঞ্জনা কী, সে-সবও তার জ্ঞানের বাইরে। তবু এটুকু সে বোঝে, মেয়েমানুষটির দিকে তাকালে ভাল লাগে, দু-চোখ স্নিগ্ধ হয়ে যায়।

এর আগে মেয়েমানুষটিকে কখনও দেখে নি ডানিয়েল। দুপুরের সেই মজলিশে গেলেও নিশ্চয়ই সে চোখে পড়ত।

ডানিয়েলকে নিজের ঘরে দেখে বিন্দুমাত্র আড়ষ্ট বোধ করে নি মেয়েমানুষটি। আশ্চর্য সাবলীলা সে। স্নিগ্ধ হেসে সহজ সুরে বলেছে, 'কি ভাগ্যি, সাহেব যে! বোসো বোসো।' বলে কাঁধের ওপর থেকে ছেলেটাকে নামিয়ে কাঠের একটা পিঁড়ি এগিয়ে দিয়েছে।

মেয়েমানুষটি আবার বলেছে, 'তোমাকে দূর থেকে দেখেছি। তোমার কথা অনেক শুনেছি। তুমি খুব আলাপ সালাপী মানুষ। সবার বাড়িতেই যাও।'

ডানিয়েল অবাক। এই গ্রাম্য মেয়েমানুষটির কাছে প্রথম আলাপেই এতখানি সাবলীলতা যেন প্রত্যাশা করে নি। আস্তে আস্তে বলেছে, 'হ্যাঁ, যাই।'

'আমি জানতাম একদিন আমাদের বাড়িতেও তুমি আসবে।'

'জানতে নাকি!'

'ও মা, জানতাম আবার না!' মেয়েমানুষটি বলেছে, 'সবার বাড়ি যাও, আমাদের বাড়ি না আসবার কি আছে। আমরা তো কোনো দোষ করিনি।'

'তা বটে।' ডানিয়েল হেসে ফেলেছে।

একটু ভেবে মেয়েমানুষটি এবার বলেছে, 'তা আমাদের বাড়ি যে এলে, শুধু আলাপ সালাপ করতেই না অন্য কোন ব্যাপার আছে?'

'আলাপ করতেও এসেছি। আবার—'

'কী?'

'অন্য একটা মতলবও আছে।'

'কিরকম?'

আঙুল দিয়ে কড়াইটা দেখিয়ে ঠোঁট টিপে একটু হেসেছে ডানিয়েল, 'ঐ—'

মেয়েমানুষটি বুঝতে পারে নি। বলেছে, 'কী ঐ?'

'মাছ ভাজা। এমন গন্ধ বার করেছ যে রাস্তা থেকে ছুটে এসেছি। কী মাছ ওটা?'

'পাল্লা।'

'চমৎকার গন্ধ তো। খেতে বুঝি খুব ভাল?'

এবার কিছুটা অনুমান করতে পেরেছে মেয়েমানুষটি। সস্নেহে হেসে বলেছে, 'খুব ভাল খেতে, যেমন স্বাদ তেমনি গন্ধ। খাও না দু-খানা।'

ডানিয়েল তৎক্ষণাৎ রাজী। মাথা হেলিয়ে বলেছে, দিলে খাব না কেন?'

মেয়েমানুষটি আবার কি বলতে যাচ্ছিল, ঠিক সেই সময় ছোট ছেলেটা পাশ থেকে হঠাৎ তুমুল কান্না জুড়ে দিয়েছে এবং হিংস্র চোখে ডানিয়েলের দিকে তাকিয়ে বিকৃত রুদ্ধ স্বরে সমানে কী যেন বলে যাচ্ছিল।

ঘটনার আকস্মিকতায় ডানিয়েল এবং মেয়েমানুষটি, দু'জনেই চমকিত। চমক কিছু থিতিয়ে এলে মেয়েমানুষটি ছেলেটাকে কাছে টেনে এনে বলেছে, 'কী হয়েছে রে লোলা, কী হয়েছে বাবা? ছি-ছি, কাঁদে না।'

কান্না তাতে থামে নি, বরং আরো উত্তাল হয়ে উঠেছে। আর কান্না যত বেড়েছে গলার স্বর তত বিকৃত হয়ে উঠেছে ছেলেটার। তার কথার একটি বর্ণও বোঝা যায় নি।

ছেলে অর্থাৎ লোলার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে কান্না থামাতে এবং শান্ত করতে অনেকটা সময় লেগেছে। কান্না থামতে মেয়েমানুষটি জিজ্ঞেস করেছে, 'কেন কাঁদছিলি. বল্?'

ঐ বয়সের ছেলের পক্ষে যতখানি সম্ভব ঠিক ততখানি ক্রূর দৃষ্টিতে ডানিয়েলের দিকে তাকিয়ে লোলা বলছে, 'ও কেন আমাদের বাড়ি এসেছে?'

'এমনি এসেছে।'

'ন্‌না—'

'কী না?'

'ও আমাদের মাছ খেতে এসেছে।'

এতক্ষণে ছেলেটার কান্না, রাগ এবং অসন্তোষের সঙ্গত কারণটা বোঝা গেছে। মাছ ভাজার নতুন একটা ভাগীদারকে জুটতে দেখে সে আদৌ সন্তুষ্ট নয়।

অপ্রসন্ন সুরে লোলা আবার বলে উঠেছে, 'ওকে এক্ষুনি তাড়িয়ে দে মা—'

মেয়েমানুষটি তাকে বোঝাতে চেয়েছে, কেউ বাড়িতে এলে অমন কথা বলতে নেই।

কিন্তু লোলার এক জেদ, এক গোঁ। সমানে মাথা ঝাঁকিয়ে সে বলে গেছে 'ওকে তাড়িয়ে দে, তাড়িয়ে দে। নইলে আমাদের সব মাছ খেয়ে ফেলবে।'

ডানিয়েল খুব আমোদ পেয়ে গেছে। লোলার মত মাথা ঝাঁকিয়ে তার স্বর নকল করে সমানে বলেছে, 'হ্যাঁ খাব, হ্যাঁ খাব, হ্যাঁ খাব।'

লোলার রাগ আরও বেড়ে গেছে।

এদিকে মেয়েমানুষটি ছেলেটার অভব্যতায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। উনুনের পাশ থেকে একটা চেলা কাঠ তুলে চেঁচিয়ে উঠেছে, 'হারামজাদা বাঁদরের বাচ্চা, চুপ করলি? তোকে আজ যমের বাড়ি পাঠিয়ে ছাড়ব, তবে আমার নাম গঙ্গা—'

ডানিয়েল এবার উঠে পড়েছে। ব্যস্তভাবে বলেছে, 'না-না, ওকে বোকো না। ছেলেমানুষ, ওর কথা কি ধরতে আছে, না আমি ধরেছি?'

'তুমি জানো না সাহেব ঐ ছোঁড়ার জন্যে আমায় একদিন গলায় দড়ি দিতে হবে। লোকের কাছে লজ্জার একশেষ।' বলতে বলতে মেয়েমানুষটির চোখেমুখে অসীম বিরক্তি ফুটে বেরিয়েছে।

ডানিয়েল আবার বলেছে, 'আচ্ছা এখন চলি।' লোলার দিকে তর্জনী তুলে চোখ গোলাকার করে হেসেছে, 'আজ তোর মাছে ভাগ বসালাম না। আরেক দিন এসে সব খেয়ে যাব।' বলে রাস্তায় গিয়ে নেমেছে।

মেয়েমানুষটি ছুটে এসেছে, 'ও সাহেব যেও না। মাছ ভাজা খেয়ে যাও।'

ডানিয়েল বলেছে, 'তুমি পাগল হলে নাকি। তোমাকে আমি ঠাট্টা করছিলাম আর তোমার ছেলেকে—ছেলে তো?'

'হ্যাঁ।'

'খ্যাপাচ্ছিলাম।'

একটু কি ভেবে মেয়েমানুষটি এবার বলেছে, 'আমার ছেলের কথায় কিছু মনে কোরো না। ছ'মাস ধরে মাছ খাব মাছ খাব করছিল। আমাদের মত মানুষের অবস্থা তো বোঝোই। মাছ আর জোটাতে পারি না, শেষমেষ আজ জুটিয়েছি। এখন তোমাকে ভাগীদার দেখে একেবারে ক্ষেপে গেছে ছেলেটা।'

'বুঝেছি।' ডানিয়েল হেসেছে।

'তা হলে দুখানা খেয়ে যাবে না?'

'না বললাম তো।'

'তা হলে আর কী বলব। আবার এসো।'

'আসব।'

বাতাসে ভাজা মাছের সৌরভ ছড়িয়ে মনপুরা গ্রামের মাছভাজুনি বৌটি একদিন ডানিয়েলকে আকর্ষণ করে নিয়ে গিয়েছিল। তারপর থেকে অবকাশ পেলেই তার কাছে আসত ডানিয়েল।

দিনকয়েক যাতায়াতেই জানা গেছে মেয়েমানুষটির নাম গঙ্গাবাঈ। সংসারে ঐ একটা ছেলে ছাড়া আর কেউ নেই তার। এদিক থেকে ভামুয়া বুড়ীর সঙ্গে তার দুর্ভাগ্যের কিছু মিল আছে।

গঙ্গাবাঈয়ের স্বামীর নাম ভাওজিরাম। এ গ্রামের আর সবার মতই সে ছিল মাছমারা। বছর পাঁচেক আগে সমুদ্রে মাছ মারতে গিয়ে নৌকাডুবি হয়ে সে মারা যায়। স্বামীর মৃত্যুর পর স্বাভাবিক নিয়মে অনাহারই ছিল তাদের একমাত্র নিয়তি। নিজে মরে সংসারটাকে একেবারে ভাসিয়ে দিয়ে গিয়েছিল ভাওজিরাম।

যা অবধারিত তাই ঘটে যেত। ঘটেনি শুধু সুভদ্রার জন্য। চার্চ থেকে গঙ্গাবাঈ আর তার ছেলের জীবন-ধারণের সমস্ত ব্যবস্থা করে দিয়েছে সে। অবশ্য তার বিনিময়ে চার্চের প্রতি গঙ্গাবাঈয়ের কিছু কিছু করণীয় আছে এবং তা বেশ পরিশ্রমসাপেক্ষ।

চার্চের গায়ে ছোট একটি হাসপাতাল রয়েছে। গঙ্গাবাঈকে মোটামুটি খানিকটা ট্রেনিং দিয়ে নার্সের কাজ দেওয়া হয়েছে। রোজ ভোরে চার্চে যায় সে, ফেরে দুপুরে। বেশি রোগী থাকলে কিংবা অসুখের গুরুত্ব বুঝে কোনো কোনো দিন বিকেলের দিকেও তাকে যেতে হয়। তা ছাড়া আশে পাশের গ্রামগুলোতে মহামারী লাগলে রেভারেণ্ড আপ্তের সঙ্গে তাকে ছুটতে হয়। আপাতত গঙ্গাবাঈয়ের জীবনযাত্রা এইরকম।

সব শুনে ডানিয়েল জিজ্ঞেস করেছে, 'কত দিন হল তোমার স্বামী মারা গেছে?'

'সে অনেক দিন।' লোলাকে দেখিয়ে গঙ্গাবাঈ বলেছে, 'এই ছেলেটা এক শীতে হল, তারপরের বর্ষায় ওর বাপ মরল। হারামজাদা বাঁদরের বাচ্চা জন্মেই ওর বাপকে খেলে।'

ডানিয়েল মনে মনে মোটামুটি একটা হিসেব করে নিয়েছে। লোলার বয়স বছর সাতেকের মত। গঙ্গাবাঈয়ের কথামত যদি ধরে নেওয়া যায়, যে শীতে লোলা জন্মেছে তার পরের বর্ষায় ভাওজিরাম মরেছে তা হলে মৃত্যুটা সাড়ে ছ বছরের বেশি হয় নি।

ডানিয়েল বলেছে, 'ভাওজিরাম তো নৌকাডুবিতে মারা গেছে।'

'হ্যাঁ।'

'নৌকো কী করে ডুবল?'

গঙ্গাবাঈ জিজ্ঞেস করেছে, 'তুমি এ দেশে নতুন এসেছ, তাই না?'

এরকম অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্নের কারণ বুঝতে না পারলেও ডানিয়েল উত্তর দিয়েছে, 'হ্যাঁ।'

'আর এসেছও বর্ষার পর। বর্ষার সময় থাকলে বুঝবে, এ কেমন জায়গা।'

'কেন, বর্ষায় এখানে কী হয়?'

'আকাশ ভেঙে পড়ে। বৃষ্টি হচ্ছে তো হচ্ছেই। একটানা হয়ত একমাসই চলল।'

'একমাস!'

'এক মাস তো কম গো।' গঙ্গাবাঈ বলেছে, 'কোনো কোনো বছর তারও বেশি চলে। আর বৃষ্টিটা এমন যে সারা মাসে একবার থামে না পর্যন্ত।'

'তা হলে?'

'কী?'

'এখানকার লোকেরা বর্ষায় নিশ্চয়ই ঘর থেকে বেরোয় না?'

'না বেরুলে চলবে কেমন করে?' গঙ্গাবাঈ মৃদু হেসেছে, 'মেয়েমদ্দ, সবাইকেই বেরুতে হয়। নইলে খাবে কী? উপোস দিয়ে শুকিয়ে মরতে হবে না?'

ডানিয়েল চুপ করে থেকেছে।

গঙ্গাবাঈ আবার বলেছে, 'ঐ বৃষ্টি মাথায় করে ব্যাটাছেলেগুলো সাগরে যায়। আর বর্ষায় সাগরের চেহারা তো দেখ নি। তার দিকে তাকালে বুক শুকিয়ে যায়। সেবার যা বর্ষা নেমেছিল তেমন বর্ষা আমরা জন্মে থেকে দেখিনি। আমরা কেন, এ গাঁয়ের বুড়ো-বুড়ীরা পর্যন্ত দেখেনি। দিনরাত শুধু বাজের আওয়াজ আর ঝড়। এমন হাওয়ার তোড় যে বড় বড় পিপুল গাছগুলো মট মট করে ভেঙে পড়ছিল। পেট বলে কথা। এই দুর্যোগের ভেতরে গাঁয়ের লোকদের সাগরে যেতে হয়েছিল। লোলার বাপও গিয়েছিল।' বলতে বলতে হঠাৎ চুপ করে গিয়েছে।

ডানিয়েল বলেছে, 'তারপর?'

'তারপর আর কি, সেই যাওয়াই তার শেষ যাওয়া।' অপরিসীম বিষণ্ণতায় গঙ্গাবাঈয়ের স্বর বুজে এসেছে।

ডানিয়েল নিশ্চুপ। গঙ্গাবাঈয়ের বিষণ্ণতা তার মধ্যেও বুঝি সঞ্চারিত হয়ে গেছে। অনেকক্ষণ নীরব থেকে গঙ্গাবাঈ বলেছে, 'ভোরবেলা সবাই বেরিয়ে গেছে। সন্ধ্যেবেলা খবর পেলাম জেলেদের অনেক নৌকোডুবি হয়েছে। শুনে ভয়ে তরাসে দম যেন আটকে গিয়েছিল। মনে মনে [illegible]লেছি, হে ভগোয়ান, হে গণপতি, আমার কপাল যেন না পোড়ে। লোলার বাপের যেন কিছু না হয়। কিন্তু—'

ডানিয়েল কোন প্রশ্ন করে নি, রুদ্ধশ্বাসে শুধু তাকিয়ে থেকেছে।

গঙ্গাবাঈ বলেছে, 'কিন্তু ভগোয়ান গণপতি আমার কথাটা শুনলে না। আমার কপালটাই শুধু পুড়ল।' একটু থেমে কিছুক্ষণ পর আবার শুরু করেছে, 'নৌকো-ডুবি হয়ে যারা ভেসে গিয়েছিল একে একে সবাই ফিরে এসেছে। কেউ সেদিনই এসেছে, কেউ এসেছে তার পরের দিন, কেউ বা দু-চার দিন পর। কিন্তু তিন জন শুধু ফেরে নি। চান্দা গাঁয়ের ঘুনুরাম, নোনপুরা গাঁয়ের শিবল আর আমাদের—' এই পর্যন্ত বলে হঠাৎ থেমে গেছে।

গঙ্গাবাঈ যা বলে নি সেই অনুচ্চারিত অংশটা বুঝতে অসুবিধে হবার কথা নয়। দু চোখে অপার বেদনা মিশিয়ে তাকিয়ে থেকেছে ডানিয়েল।

অনেকক্ষণ চুপচাপ। একসময় গঙ্গাবাঈই আবার স্তব্ধতা ভেঙেছে, 'আমাদের এই সাগরে সব বর্ষাতেই নৌকোডুবি হয়। যারা ভেসে যায় তাদের অনেকেই যে তাড়াতাড়ি ফিরতে পারে তা নয়। ঢেউএ ঢেউএ কোথায় কোন দিকে যে চলে যায় তার কি কিছু ঠিক থাকে। এমনও দেখা গেছে, ডুবো মানুষ, যার আশা সবাই ছেড়ে দিয়েছে, হঠাৎ একমাস কি দু-মাস পর ফিরে এল। ব্যাপার কি না, সাগরের মর্জিতে সেই বোম্বাই কি গোয়ায় ভেসে গিয়েছিল।'

অস্ফুটে ডানিয়েল এবার কী যে বলে উঠেছে, বোঝা যায়নি।

গঙ্গাবাঈ থামে নি, 'এমন তো কতই হয়। তাই বুক ভেঙে গেলেও আশাটা একেবারে ছেড়ে দিই নি। ভেবেছি আজ না হোক কাল, কাল না হয় পরশু, একদিন লোলার বাপ ফিরে আসবে। কিন্তু দিনের পর দিন কেটেছে, মাসের পর মাস গেছে, তারপর দেখতে দেখতে বছরের পর বছর কেটে গেল। তখন বুঝলাম সে আর ফিরবে না, সাগরের জলে আমার সব গেছে।' বলতে বলতে দু-হাতে মুখ ঢেকে হঠাৎ প্রবল উচ্ছ্বাসে ফুঁপিয়ে উঠেছে।

ডানিয়েল বাধা দেয় নি। অদূর অতীতের পুরনো শোকের উৎসে সময় যে আবরণ টেনে দিয়েছিল, কে জানত তা এত লঘু, এত পলকা। সেখানে সামান্য হাত পড়তেই আবরণটা ছিন্ন হয়ে উচ্ছ্বসিত ধারায় চিরন্তনের শোক বেরিয়ে এসেছে।

খানিকটা শান্ত হবার পর ভাঙা ভাঙা শিথিল সুরে গঙ্গাবাঈ বলেছে, 'আমি মরেই যেতাম সাহেব, ছেলেটাকে নিয়ে আমার কী যে দুগ্‌গতি হত ভাবতেও সাহস হয় না। কিন্তু মরা আমার হয় নি ঐ সুভদ্রা বোনটার জন্যে। ও যে কী মানুষ, তুমি জানো না। লোলার বাপ সাগরে গিয়ে যেদিন ফিরল না তারপর থেকে তিনটে বছর আমার এই বাড়িতে থেকে গেছে। যখন ভেঙে পড়েছি সে বুক দিয়ে আগলেছে। খেতে পারতাম না, গলা দিয়ে কিছু নামতে চাইত না। নিজের হাতে দিদি আমার খাইয়ে

দিত। লোলা তখন একেবারে বাচ্চা। যে ছেলে জন্মেই তার বাপকে খেল তার ওপর আমার কোন মায়া ছিল না। ফিরেও তার দিকে তাকাতাম না। ঐ সুভদ্রা দিদিই তাকে খাওয়াত, চান করাত, ঘুম পাড়াত।

একটু থেমে কি ভেবে গঙ্গাবাঈ পরক্ষণে আবার বলেছে, 'এ ক'বছর কোত্থেকে খাওয়া এসেছে, কোত্থেকে খরচ চলেছে, জানতাম না। পরে জেনেছি সুভদ্রা দিদি গীর্জা থেকে সব ব্যবস্থা করে দিয়েছে।'

ডানিয়েল নিশ্চুপ। শুধু বুকের অসংখ্য স্তর ঠেলে গুহায়িত একটা দীর্ঘশ্বাস তরঙ্গিত হতে হতে বেরিয়ে এসেছে।

একদিন গঙ্গাবাঈ বলেছিল, 'জানো সাহেব, বাপকে খাবার জন্যে প্রথম প্রথম লোলাকে দু-চোখে দেখতে পারতাম না। সুভদ্রা দিদি বোঝাত, ওর আর দোষ কি। ছেলেকে জোর করে আমার কোলে তুলে দিত। আমার বাঁচতে ইচ্ছা করত না। বলতাম আমি মরব, মরব। সুভদ্রা দিদি বলত, মরা চলবে না। লোলার জন্যে আমায় বাঁচতে হবে। লোলা যদি বড় হয়, তাকে যদি মানুষ করতে পারি, তবেই আমার সব দুঃখ ঘুচে যাবে।'

ডানিয়েল বলেছে, 'তারপর?'

'সবে সোয়ামী হারিয়েছি। ও-সব কথা তখন কি আমার ভাল লাগে! মন কিছুতেই মানত না। পরে মন শান্ত হলে বুঝতে পেরেছি, সুভদ্রা দিদির কথাই ঠিক। লোলার জন্যে আমায় বাঁচতে হবে, ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আমায় বুক বাঁধতে হবে। সুভদ্রা দিদির কথায় ছেলেটাকে আবার কাছে টেনে নিলাম। কিন্তু—'

'কী?'

'আমি একটা প্রতিজ্ঞা করেছি সাহেব।'

'কী প্রতিজ্ঞা?'

'লোলাকে ওর বাপের মত আমি মাছমারা হতে দেব না।'

ডানিয়েল কিছুটা অবাক। মনপুরা গ্রামের মানুষেরা বংশানুক্রমে যে বৃত্তি গ্রহণ করে আসছে, তার প্রতি গঙ্গাবাঈয়ের এত বিদ্বেষ কেন? ডানিয়েল শুনেছে এদেশে মানুষ সংস্কারপন্থী, রক্ষণশীল। চিরকাল ধরে যে প্রথা চলে আসছে তাদের ধ্যান ধারণা তার বাইরে একটি পা-ও ফেলতে চায় না। তা-ই যদি হয় গঙ্গাবাঈ এমন প্রথাবিরুদ্ধ কথা বলে কিভাবে?

গঙ্গাবাঈ আবার বলেছে, 'আমি যতদিন বেঁচে আছি লোলাকে সাগরে পাঠাব না। ঐ সাগর আমার সর্ব্বনাশ করেছে একবার। আরেকবার সর্ব্বনাশ কিছুতেই ঘটাতে দেব না। এ গাঁয়ের সবাই সাগরে যায়, সাগর ছাড়া কারো একটা দিনও চলেনা। আমি কিন্তু লোলাকে যেতে দিই না, সবসময় চোখে চোখে রাখি।' একটু থেমে আবার বলেছে, 'এই তো গেল বছর এ গাঁয়ের মুরুব্বি শম্ভাজি আমার কাছে এসেছিল।' বলেছিল, 'তোর ছেলেটাকে আমার হাতে দে গঙ্গা। ওকে আমার সঙ্গে সাগরে নিয়ে গড়ে পিটে মানুষ করে তুলি। মাছ ধরার কাজ কম্ম শিখলে তোর কষ্ট ঘুচবে।' আমি

তাকে বলেছি, 'না কাকা, আমি ছেলে দেব না।' মুরুব্বি বলেছে, 'ছেলেকে জাত ব্যবসা শেখাবি না?' আমি বলেছি, 'না।' বলে তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি।

সমুদ্রের প্রতি গঙ্গাবাঈয়ের বিমুখতার কারণটা এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে ডানিয়েল। জিজ্ঞেস করেছে, 'ছেলেকে তো তুমি মাছমারা করবে না, সমুদ্রেও পাঠাবে না।'

'না।'

'তা হলে তাকে কী করতে চাও?'

'আমি জানি না। সুভদ্রা দিদির ইস্কুলে ওকে পাঠাই। লেখাপড়া শেখার পর সুভদ্রা দিদি আর পাদ্রীবাবা যা বলবে তাই হবে।'

'পাদ্রী বাবা কে?'

'গীজ্জের বড় পাদ্রী।'

রেভারেণ্ড আপ্তের কথাই যে গঙ্গাবাঈ বলছে, তা বুঝতে অসুবিধে হয়নি ডানিয়েলের। সমুদ্র বিদ্বেষিণী রমণীটি ছেলেকে বংশানুক্রমিক বৃত্তিতে দীক্ষা দেবে না, এইটুকুই শুধু স্থির আছে। দুর্ঘটনায় স্বামীর মৃত্যু তার জীবিকার প্রতি গঙ্গাবাঈকে বিরূপ করে তুলেছে। লোলাকে সে মাছমারা হতে দেবে না, কিন্তু তাকে কী করবে সে সম্বন্ধে নিজের স্পষ্ট কোন পরিকল্পনা বা ধারণা নেই। যাই হোক, গঙ্গাবাঈ স্বভাবে এ গ্রামের আর সব মেয়েমানুষের মতই সুরসিকা, রসোচ্ছলা, প্রিয়হাসিনী। সবার মতই ডানিয়েল সম্পর্কে তার প্রাণে অসীম বিস্ময়, অফুরন্ত কৌতূহল। ডানিয়েলের দেশ সম্পর্কে, বাবা-মা সম্পর্কে, ব্যক্তিগত অসংখ্য খুঁটিনাটি সম্পর্কে নিয়ত হাজার গণ্ডা প্রশ্ন করে থাকে সে।

রোজ নানা কথার শেষে কখনও সজ্ঞানে, কখনও বা অজ্ঞাতসারে একবার না একবার ভাওজিরামের প্রসঙ্গ নিয়ে আসে গঙ্গাবাঈ। স্বামীর সেই মর্মান্তিক মৃত্যুটা কিছুতেই ভুলতে পারে না সে। সে দুঃসহ স্মৃতি প্রাণের ভেতর সজীব হয়েই আছে।

স্বামীর প্রসঙ্গ উঠলেই বিষণ্ণ হয়ে যায় গঙ্গাবাঈ। আর এই সব-হারানো সব-খোয়ানো বিষাদময়ীর জন্য কেমন যেন আচ্ছন্ন বোধ করে ডানিয়েলের। লোলার সঙ্গেও শেষ পর্যন্ত একটা সম্মানজনক সন্ধি হয়ে গেছে ডানিয়েল। প্রথম দিন ভাজা মাছের ভাগ নিয়ে যে সংঘর্ষটা বেধেছিল আজ আর তা নেই। সংঘর্ষটা অবশ্য একতরফা, লোলার দিক থেকেই সেটা এসেছিল। ডানিয়েলের পক্ষে তা ছিল মজার একটা খেলা।

প্রথম আলাপের পরও বেশ কিছুদিন লোলার বিদ্বেষ কাটে নি। যে দৃষ্টিতে লোলা তাকিয়েছে আর যাই হোক তার মধ্যে বন্ধুত্বের চিহ্নমাত্র নেই। ডানিয়েল ডাকলে সে কাছে আসত না। দূরে সরে গিয়ে মুখ ফিরিয়ে বসে থাকত।

ধীরে ধীরে আপন স্বভাবের দমকা হাওয়ায় লোলার সব বিদ্বেষ, বিরূপতা উড়িয়ে নিয়ে গেছে ডানিয়েল। চপলতা, দুষ্টুমি এবং হাজাবো কৌশলে গঙ্গাবাঈয়ের সাত বছরের বিরূপ ছেলেটাকে একেবারে জয় করে ফেলেছে সে।

এ গ্রামের বাচ্চাদের নিয়ে আগেই একটা বাহিনী তৈরি করে নিয়েছিল ডানিয়েল। তার পেছন পেছন ছেলেগুলো সারাদিন ছায়ার মত হাঁটতে থাকে। সে দলে লোলাকেও ভর্তি করে নিয়েছে সে।

ইদানীং যখন তখন এসে লোলাকে ডাক দেয় ডানিয়েল। ডাকার শুধু অপেক্ষা, লোলা ছুটে বেরিয়ে আসে। গঙ্গাবাঈ বলে দিয়েছে; তার ছেলেকে ডানিয়েল যেখানে খুশি নিয়ে যেতে পারে। এই অনাদি অনন্ত পশ্চিমঘাটের যে কোন উপত্যকায়, যে কোন চূড়ায়, যে কোন দুর্গম অংশে লোলা যাক, গঙ্গাবাঈয়ের আপত্তি নেই। শুধু একটি জায়গায় গণ্ডি টেনে দিয়েছে সে। সেই নিষিদ্ধ স্থানটি হচ্ছে সমুদ্র—আরবসাগর। ডানিয়েল শপথ করেছে গঙ্গাবাঈয়ের নিষেধ কোনোদিন অমান্য করবে না, তার টানা গণ্ডি পেরিয়ে ভুলেও লোলাকে সমুদ্রে নিয়ে যাবে না।

মনপুরা গ্রামের প্রতিটি অন্তঃপুর হাত ধরে ডানিয়েলকে ভেতরে নিয়ে গেছে। এখানকার সব বাড়ি তার সামনে সদর দুয়ার মেলে দিয়েছে।

সব জায়গাতেই ডানিয়েলের গতিবিধি অবাধ। শুধু দুটি বাড়ি ছাড়া। রতি এবং গণেশ —এদের দুয়ার এখনও তার কাছে বন্ধ। প্রথমবার গিয়ে ফিরে আসতে হয়েছিল। তারপর আরো বারকয়েক গেছে সে। কিন্তু প্রতি বারই ফলাফল এক। অপমানিত না হলেও হতাশ হয়ে তাকে ফিরে আসতে হয়েছে।

এর মধ্যে গণেশের সঙ্গে কয়েক বার দেখা হয়েছে। উপযাচক হয়ে ডানিয়েল তার সঙ্গে কথা বলতে গেছে কিন্তু গণেশের ভঙ্গিটাই কেমন যেন এড়িয়ে যাবার মত। তাকে দেখে গণেশের মুখ শুকিয়ে গেছে। ডানিয়েলের কথার উত্তর সে দিয়েছে ঠিকই কিন্তু সবই ছাড়া-ছাড়া ভাবে। তার সঙ্গ গণেশের মনঃপুত নয়। যতক্ষণ সে সামনে দাঁড়িয়ে থেকেছে ততক্ষণ নিদারুণ অস্বস্তি ভোগ করেছে গণেশ আর চনমন করে চারিদিক লক্ষ্য করেছে। সম্ভবত বাপের কাছে ধরা পড়ে যাবার আশঙ্কায় তার এই উদ্বিগ্ন, উৎকণ্ঠা, রুদ্ধশ্বাস অবস্থা। সব প্রশ্নেরই মোটামুটি উত্তর দেয় সে, কিন্তু রতির প্রসঙ্গে একেবারে মুখ বুজে থাকে।

গণেশের মুখচোখের চেহারা দেখে ডানিয়েলের করুণাই হয়। তাকে বেশিক্ষণ আটকে রাখে না সে। আর ছেড়ে দেওয়া মাত্র গণেশ উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালায়।

গণেশের সঙ্গে তবু দেখা হয় কিন্তু সেই দিনটার পর রতিকে আর দেখেনি ডানিয়েল। দুপুরের মজলিশে সে অনুপস্থিত, দূরের ঝর্নাতেও তাকে জল আনতে দেখা যায় না। বাড়ির কোনো জানালাতে একবারের জন্যও তার বিমর্ষ মুখখানি চোখে পড়ে না। রতির বাপ কোথায় যে তাকে আটক করে রেখেছে কে বলবে।

মনপুরায় একটানা কুড়ি দিন স্কুল করে পাশের গ্রাম মান্দবিতে চলে গিয়েছিল সুভদ্রা। সেখানে দিন দশেক ক্লাস চালিয়ে আজ আবার মনপুরায় ফিরে এল সে।

ভোরবেলায় এসেছে সুভদ্রা। এসেই সবাইকে ডেকে ক্লাস বসিয়ে দিল। তাড়াতাড়ি পড়াশোনার পালা চুকিয়ে ডানিয়েলকে বলল, 'আমার সঙ্গে আজ এক জায়গায় যাবেন।'

দু চোখে প্রশ্ন নিয়ে ডানিয়েল তাকাল, 'কোথায়?'

'গেলেই দেখতে পাবেন।'

গন্তব্য সম্পর্কে দ্বিতীয় কোন প্রশ্ন না করে ডানিয়েল বলল, 'কখন যেতে হবে?'

'এখনই।'

'বেশ, চলুন।'

তৎক্ষণাৎ কিন্তু রওনা হল না সুভদ্রা। একটু কি ভেবে বলল, 'তার চাইতে বরং এক কাজ করুন। আগে চান-খাওয়াটা সেরে নিন।'

আকস্মিক মত-পরিবর্তনে ডানিয়েল অবাক। স্থির চোখে সুভদ্রার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, 'কতদূর যেতে হবে আপনার সঙ্গে?'

'অনেক দূর।'

'ফিরতে খুব দেরি হবে কি?'

'দুপুর পেরিয়ে যাবে।'

'তা হোক, চলুন।'

'খিদে পেলে আপনার আবার কষ্ট হবে না তো?'

'আপনি ভাবেন কি! বড়লোকের ননীর দুলাল নাকি আমি!' বলেই চকিত হয়ে উঠল ডানিয়েল। নিজের অজান্তে নিখাদ সত্যিটা ব্যঙ্গের ছদ্মবেশে বেরিয়ে এসেছে। একমুহূর্ত চুপ থেকে পরক্ষণেই বিচিত্র এক কৌতুক প্রাণের তলদেশ থেকে উঠে এসে দুই ঠোঁটের মাঝখানে একটি নিঃশব্দ বাঁকা হাসি হয়ে ফুটল।

সুভদ্রা তাকে লক্ষ্য করছিল। চোখ কুঁচকে বলে, 'ও কি, হাসছেন যে?'

চমকে ডানিয়েল বলল, 'না, ও কিছু না। চলুন।'

এ প্রসঙ্গে আর কোনো প্রশ্ন করল না সুভদ্রা। আগের মতোই ডানিয়েলের দিকে চোখ রেখে বলে, 'আসুন।'

মনপুরা গ্রাম পেছনে ফেলে যে পথটা চড়াই-উতরাইতে দোল খেয়ে সোজা পশ্চিমে ছুটেছে সেদিকে হাঁটতে শুরু করল সুভদ্রা, ডানিয়েল অনুসরণ করতে লাগল।

এর আগে উত্তরে গেছে ডানিয়েল, দক্ষিণে গেছে, পূবেও গেছে। শুধু এই পশ্চিমেই পা বাড়ায় নি। তবে সে শুনেছে এ রাস্তাটা সমুদ্রে গিয়ে মিশেছে।

সমুদ্রে যাবার বড় সাধ ডানিয়েলের। যাব-যাব করেও এতকাল যাওয়া হয়ে ওঠে নি। সুভদ্রা যোসেফ কি আজ তাকে সেখানে নিয়ে যাচ্ছে? চলতে চলতে উৎফুল্ল হয়ে উঠল ডানিয়েল। সুভদ্রার দিকে মুখ ফিরিয়ে উৎসাহিত সুরে বলল, 'আচ্ছা, এই পথটা 'আরেবীয়ান সী'তে গেছে, তাই না?'

নিস্পৃহ শান্ত মুখে সুভদ্রা উত্তর দিল, 'হ্যাঁ।'

'আমরা কি সেখানেই যাচ্ছি?'

'হ্যাঁ।'

ডানিয়েলের উৎসাহ এবার দশগুণ হয়ে উঠল। ছেলেমানুষের মত সে চেঁচাল, 'দারুণ ব্যাপার'।

হয়ত একটা লাফ দিয়ে উঠত ডানিয়েল কিন্তু তার আগেই পার্শ্ববর্তিনী বিরক্ত দৃষ্টি হেনে তাকে সংযত করল।

লাফ না দিলেও অপরিমেয় আনন্দটাকে একেবারে চেপে রাখা গেল না। সেটা চোখে-মুখে-কণ্ঠস্বরে ফুটে বেরুল। ডানিয়েল বলল, 'আমি কিন্তু আজই সমুদ্রে স্নান করব।'

ডানিয়েলের উচ্ছ্বাস সুভদ্রাকে আদৌ দোলাতে পারল না। আগের মত নিস্পৃহ মুখেই রইল সে; কোন উত্তর দিল না।

মনপুরা পেছনে ফেলে অনেকটা চলে এসেছে দু'জনে। গ্রামের পর থেকেই প্রায় শুরু হয়েছে বালিয়াড়ি, মাঝে মাঝে অসুর মুণ্ডের মত ইতস্তত পাথরের ঢিবি।

ডাইনে-বাঁয়ে-সামনে-পেছনে, যেদিকে যতদূর চোখ যায় শুধু বালি আর বালি। এখানে শ্যামল সজীব প্রাণের সমারোহ খুঁজতে যাওয়া বৃথা। কোথাও একটি উদ্ভিদ দিগ্বিজয়ী বীরের মত জীবনের জয়োদ্ধত পতাকাকে সগৌরবে তুলে রাখেনি। গৈরিক কাঁকুরে প্রান্তর জুড়ে এখানে শুধু নীরসতা, শুধুই নিষ্প্রাণ স্নেহহীন বিস্তার।

পশ্চিমঘাট কোথাও ফুলে-ফলে, রঙিন সজীব উচ্ছ্বাসে পূর্ণ হয়ে আছে; কোথাও রুক্ষ কঠিন মৃতবৎসা। আর এখানে এই যোজন যোজন বালিয়াড়ির বিস্তারে সে যেন নিষ্করুণ ধ্যানাসীনা সন্ন্যাসিনী।

চলতে চলতে আড়চোখে একবার সুভদ্রার দিকে তাকাল ডানিয়েল। এই রুক্ষ কর্কশ প্রান্তরের সঙ্গে গীর্জাবাসিনী মেয়েটার কোথায় যেন খানিকটা মিল আছে। পরক্ষণেই তার মনে হল, শুধু মাত্র এই প্রান্তরটার সঙ্গে তার তুলনা করতে যাওয়া নিতান্ত অকৃতজ্ঞতা। সন্ন্যাসিনী সুভদ্রার প্রাণের কোনো কোনো অংশে নীরস রুক্ষতা আছে ঠিকই কিন্তু আরেক দিকে সে করুণাময়ী, অসীম স্নেহে সে পরিপূর্ণ হয়ে আছে। পশ্চিমঘাটের বিভিন্ন প্রান্তের মত তার প্রাণেও নানা বিচিত্র খেলা। সুভদ্রা যোসেফ কোঙ্কন উপকূলের এই সীমাহীন পর্বতমালার প্রতীক যেন।

মনপুরা গ্রামে থেকে, শুধু মনপুরা কেন, আরো দূর থেকেও অশ্রান্ত সমুদ্র-কল্লোল শুনতে পাওয়া যায়। এই মুহূর্তে ডানিয়েলরা আরব সাগরের যত কাছে আসছে, সেই শব্দটা আরো স্পষ্ট আরো প্রবল হচ্ছে।

ডানিয়েল অস্থির হয়ে উঠল। সুভদ্রা যে তার সঙ্গিনী সে কথাটা প্রায়ই মনে থাকছে না। উৎসাহের ঝোঁকে মাঝে মাঝেই সুভদ্রাকে পেছনে ফেলে সে এগিয়ে যাচ্ছে। সমুদ্রের উত্তাল ঢেউয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া না পর্যন্ত তার বুঝি শান্তি নেই।

ডানিয়েল এগিয়ে গেলে দ্রুত পা ফেলে তাকে ধরবার চেষ্টা করছে সুভদ্রা। একান্ত না পারলে বলছে, 'অত জোরে হাঁটলে আমি কি পারি, আস্তে আস্তে চলুন।'

অগত্যা ডানিয়েলকে চলার বেগ কমাতে হয়। ঘাড় ফিরিয়ে সলজ্জ একটু হেসে বলে, 'বার বার আমি এগিয়ে যাচ্ছি, না?'

সুভদ্রাও মৃদু হাসে, 'তাই তো মনে হয়।'

আরো কিছুক্ষণ চলার পর হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তে ডানিয়েল বলল, 'আচ্ছা—'

'বলুন।'

'এই যে আমরা যাচ্ছি, নিশ্চয়ই কোনো জরুরী ব্যাপার আছে, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'কী?'

'এসেই তো পড়েছি, পৌঁছলে বুঝতে পারবেন।'

একসময় আরব সাগর এসে গেল। সামনে যতদূর দৃষ্টি যায় অন্তহীন সমুদ্র গম্ভীর মহিমায় প্রসারিত হয়ে আছে। কোন অনাদি অতীতে সৃষ্টির কোন দুর্জ্ঞেয় খেয়ালে এই অশেষ জলধারার সৃষ্টি হয়েছিল, কে জানে। অপরিণত শৈশবে পৃথিবী তার নিজেকে নিয়ে বিচিত্র হঠকারিতায় মেতেছিল বুঝি। তারই পরিণাম বোধ হয় পাহাড়-পর্বত-সমুদ্র-মরুভূমি। অবশ্য সেই কুয়াশা-বিলীন অতীতের কোন সাক্ষী সম্ভবত জীবজগতে ছিল না। তবু মানুষের অক্ষম কল্পনা-বিলাস পৃথিবীর আদি সূচনা নিয়ে মেতে উঠতে ভালবাসে।

সমুদ্র—মহৎ, গম্ভীর, উদার, ব্যাপ্ত। মানুষ বিভিন্ন ভাষায় যত শব্দ আর উপমা সৃষ্টি করেছে সমুদ্রকে বোঝাবার জন্য তার কোনোটাই অথবা একত্রে সবগুলিও পর্যাপ্ত নয়।

আরব সাগর সীমাহীন বিস্তারে ছুটে গিয়ে আকাশের নীলাভ রেখায় মিশে ধূসর বিভ্রমের সৃষ্টি করেছে। চমৎকৃত, মুগ্ধ, সম্মোহিত ডানিয়েল সেদিকে তাকিয়ে রইল। ডানিয়েল শুনেছে অথবা কোনো বইতে পড়েছে, জীবজগতের সর্বকনিষ্ঠ শরিক মানুষ নাকি আজ চিন্তায় এত পরিণত এত অগ্রসর যে প্রকৃতি-বিলাস নাকি তার আর সাজে না। আদি ঠিকানা প্রকৃতির কাছ থেকে সরে গিয়ে মানুষ শহর বানিয়েছে। প্রকৃতিকে নিয়ে মধ্যযুগের কবিদের মত মগ্ন হয়ে থাকা নাকি নিতান্ত ছেলেমানুষি। গাছটি দেখে ফুলটির গন্ধ শুঁকে আচ্ছন্ন হবার দিন এই যন্ত্রযুগে শেষ হয়ে গেছে।

লণ্ডন শহরের ঠাসবুনন আরাম, বিলাস এবং প্রযুক্তি বিদ্যার অজস্র উপকরণের মধ্যে একদা নিসর্গ-বিলাসী হতে ডানিয়েলের মন সায় দেয় নি। কিন্তু এই শতাব্দীরই সপ্তম দশকে কোঙ্কন উপকূলের এই প্রান্তে মানুষের জীবন মাছধরা পশুপালনের

যুগে পড়ে থাকতে ভালবাসে। মনপুরা গ্রাম লণ্ডন নিউইয়র্ক-প্যারিসে যে পৃথিবী ছড়িয়ে আছে তার কাছে এগিয়ে যেতে পারে নি।

সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ডানিয়েলের মনে হল, এই আরেবীয়ান সী, তার পশ্চাৎপটে মনপুরা গ্রামের জীবন আধুনিক পৃথিবীর কাছে থেকে তাকে বোধ হয় বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে। মনে হচ্ছে লন্ডন শহর বলে কোনোদিন কোথাও কিছু ছিল না, তা বুঝি বহুকাল আগের কোনো অর্ধবিস্মৃত স্বপ্ন কল্পনা। এখানে আর দশটা জেলে বা মুক্তোচাষীর সঙ্গে জন্ম থেকে সে যেন বড় হয়েছে। এখানকার বাতাস ফুসফুসে টেনে জীবনের এতগুলো বছর কেটে গেছে তার। কোনোদিন এই উদার ব্যাপ্তির বাইরে সে বুঝি পা বাড়িয়ে দেখে নি। বিশ শতকের আধাআধি পার করে দেবার পরও প্রকৃতি যে তার সম্মোহিনী শক্তি হারিয়ে বসে নি, সে কথা কে জানত!

সুদূর দিগন্ত থেকে দৃষ্টিটা কাছে সরিয়ে আনল ডানিয়েল। সমতল বালুকাবেলা ঈষৎ ঝুঁকে সমুদ্রে নেমে গেছে। সামনেব দিকে আরব সাগর অগভীর, জল দু'-ফুটের বেশি হবে না। দূরে সমুদ্র কালো হয়ে আছে, বেলাভূমির কাছে তার রঙ কিন্তু নীলাভ। এখানে জল এত স্বচ্ছ যে নিচের বাদামী বালি, কাঁকর, পাথরের টুকরো, শ্যাওলা, ছোট ছোট অসংখ্য জলজ জীব, সবই চোখে পড়ছে।

আরেকটা ব্যাপার লক্ষ্য করল ডানিয়েল। দূরে সমুদ্র আশ্চর্য গম্ভীর, শান্ত, স্তব্ধ। সেখানে তার চরিত্রে বিন্দুমাত্র তারল্য নেই, সেখানে ধ্যানস্থ হয়ে আছে সে। কিন্তু পারের কাছে অন্য রূপ। এখানে নিদারুণ চপল সে-অস্থির, উদ্দাম, উত্তাল। পাহাড়-প্রমাণ ঢেউগুলি ফেনায়িত উচ্ছ্বাসে একের পর এক অবিরাম বালুকাবেলায় এসে আছড়ে পড়ছে।

সমুদ্র বুঝি অদৃশ্য হাতছানিতে টানছিল। ডানিয়েল ঢেউগুলির ওপর ঝাঁপিয়েই পড়ত কিন্তু তার আগেই সুভদ্রা পাশ থেকে বলে উঠল, 'কি হল, এখানে দাঁড়িয়ে পড়লেন যে।'

তার কথাগুলো অস্পষ্টভাবে ডানিয়েলের কানে এসে বাজল। কোন উত্তর দিল না সে, ফিরেও তাকাল না, একদৃষ্টে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে রইল।

সুভদ্রা গলা চড়িয়ে আবার ডাকল, 'বেলা হয়ে যাচ্ছে; চলুন।'

ডানিয়েল তার মগ্নতা থেকে এবার উঠে এল। সমুদ্রের দিক থেকে চোখ না ফিরিয়েই অন্যমনস্কের মত বলল, 'চলুন—' বলে সামনের দিকে পা বাড়িয়ে দিল।

সুভদ্রা কি লক্ষ্য করল, সে-ই জানে। হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'মনে হচ্ছে, আরেবীয়ান সী আপনার খুব ভাল লেগেছে।'

'হ্যাঁ, খুব ভাল।'

সুভদ্রা আর কিছু বলল না।

ডানিয়েল আবার বলল, 'সমুদ্রকে এত কাছ থেকে আগে আর কখনও দেখেনি।'

আরব সাগরকে ডাইনে রেখে বালিয়াড়ির ওপর দিয়ে দু-জনে চলেছে। বেশিদূর যেতে হল না। সিকি মাইলের মত হাঁটতেই গন্তব্যে পৌঁছুনো গেল।

এখানে কিছু কিছু গাছপালা চোখে পড়ল। গাছপালা বলতে নোনা রাজ্যের একমাত্র প্রতিনিধি—ম্যানগ্রোভ। ইতস্তত ম্যানগ্রোভ ঝোপগুলির ধার ঘেঁষে সমুদ্রগামী কয়েকটা নৌকো দাঁড়িয়ে রয়েছে। নৌকোঘাটার ওপরে সারিবদ্ধ বিরাট বিরাট কয়েকখানা ঘর। সেগুলোর খিলান মোটা মোটা মজবুত কাঠের, দেওয়াল টিনের, চাল ভারী ভারী টালির। চেহারা দেখেই অনুমান করা যায়, এগুলো গুদাম ঘর। সামনের দিকে লম্বা লম্বা ত্রিপল পেতে অসংখ্য মাছ শুকোতে দেওয়া হয়েছে। শুটকি মাছের উগ্র আঁশটে গন্ধে এখানকার বাতাস মন্থর হয়ে আছে।

এগুলোই কি তবে আড়তদারদের গদি? ডানিয়েলের মন বলল, তা-ই, তা-ই।

চারপাশে মাছ শুকোতে দেওয়া হয়েছে। সেই মাছের গন্ধে বমি ঠেলে আসছে। বমনেচ্ছাকে কোনোরকমে ঠেকিয়ে রেখে ডানিয়েল ভাবল, তাকে মাছের আড়তে নিয়ে আসার কারণ কী? সঠিকভাবে সেটা বুঝবার আগে সুভদ্রা চাপা গলায় বলে উঠল, 'আজ থেকে সেই দায়িত্বটা কিন্তু আপনাকে নিতে হবে।'

'কোনটা?' সপ্রশ্ন চোখে তাকাল ডানিয়েল।

সরাসরি উত্তর না দিয়ে সুভদ্রা বলল, 'এখানকার ভাষা তো মোটামুটি রপ্ত করে ফেলেছেন। কাজেই আর অসুবিধে হবে না। মনপুরার জেলেদের জন্যে এখন থেকে মাছের ওজন লিখে আনবেন। মনে পড়ে, সেদিন এ দায়িত্ব নেবেন বলে আপনি কথা দিয়েছিলেন?'

ডানিয়েল উৎসাহিত হয়ে উঠল, 'খুব, খুব মনে পড়ে। আমরা কি তবে বিষণ নায়েকের আড়তে চলেছি?'

'হ্যাঁ।' সুভদ্রা ঘাড় হেলিয়ে বলতে লাগল, 'বিষণের সঙ্গে আজ আপনাকে ভাল করে পরিচয় করিয়ে দেব। সন্ধ্যেবেলা জেলেরা মাছ নিয়ে ঘাটে এসে ভেড়ে। ওজন লিখে তাদের সঙ্গে গ্রামে ফিরতে কিন্তু অনেক দেরি হয়ে যাবে।'

'তা তো হবেই। এতগুলো লোকের মাছের ওজন দেখে লিখে নিতে কম সময় তো লাগবে না। ফিরতে দেরি হলে কী আর করা যাবে।'

একটু ভেবে সুভদ্রা বলল, 'সেদিন বলেছিলাম, মাছের ব্যবসা সম্বন্ধে ভাল করে জেনেশুনে নেবার পর আপনাকে ওজন লেখার দায়িত্ব দেব। পরে চিন্তা করে দেখেছি, জ্ঞান অভিজ্ঞতা এ সব তো বাইরে থেকে হয় না। কাজ করতে করতেই হয়। তাই নিয়ে এলাম।'

ডানিয়েল বলে, 'একশ বার।'

আর কিছু না বলে ডানিয়েলকে সঙ্গে নিয়ে সোজা বিষণ নায়েকের আড়তে এসে উঠল সুভদ্রা।

বিষণের আড়তটা একেবারে শেষ মাথায়। প্রকাণ্ড ঘরখানার সামনের দিকে বিশাল তক্তাপোষ পাতা, তার মাঝখানে একজনের মত কাপড়ের উঁচু গদী। সেটায় বসে আছে স্বয়ং বিষণ নায়েক। তার সামনে কাঠের তাকে সিদ্ধিদাতা গণেশ মূর্তি। ধূপ এবং দীপ, দুই-ই সেখানে জ্বলছে। গণপতির মনস্তুষ্টির জন্য স্টেনলেস স্টীলের একটি রেকাবিতে কিছুটা চিনি আর গোটাকয়েক ফুল ছড়ানো।

গদীর পাশে ঝুলন্ত বিরাট দাঁড়িপাল্লা। ঘরের অন্য প্রান্তে সারি সারি সাজানো স্তূপীকৃত বরফের পেটি, কাঠের গুঁড়ো এবং মাছের চাঙাড়ি। দুপুরের আগে এই অলস প্রহরে আড়তের জনাদশেক কর্মচারী এখানে সেখানে পা ছড়িয়ে বসে চুট্টা ফুঁকছে, গল্প করছে। ঘরের মেঝে থেকে তীব্র আঁশটে গন্ধ উঠে আসছে আর অসংখ্য মাছি ভন ভন করে বেড়াচ্ছে।

সুভদ্রাদের দেখে বিষণ নায়েক চকিত হয়ে উঠল। গোলাকার চোখদুটো একটুক্ষণ স্থির হয়ে রইল, তার পরমুহূর্তেই উদার আপ্যায়নে সরব হয়ে উঠল সে, 'আসুন আসুন, আমার কি ভাগ্যি।' বলে উঠে এসে ঝাড়ন দিয়ে তক্তাপোষটা মুছে দিল, 'বসুন।'

সুভদ্রারা বসলে কৃতার্থ ভঙ্গিতে বিষণ বলল, 'বলুন আপনার জন্য কী করব?'

ডানিয়েল আগেই টের পেয়েছে সুভদ্রাকে এ অঞ্চলের মানুষ, বিশেষত বিষণ খুবই ভয় করে। সেটা সম্ভবত তার ব্যক্তিত্ব, সততা এবং জনপ্রিয়তার জন্য।

সুভদ্রা বলল, 'কিছুই করতে হবে না। আমি সেই দরকারে এসেছি।'

'কোন দরকারে?'

'সেটা তুমি নিজেও জানো। জিজ্ঞেস করবার প্রয়োজন আছে কি?'

বিষণ নায়েকের সমস্ত অবয়বের ওপর কিসের একটা ছায়া পড়ল। মুখ কালো করে সে বলল, 'তবু বলুন, আরেক বার শুনি।'

সুভদ্রা বলল, 'তার আগে এই ভদ্রলোককে দেখ।' বলে পার্শ্ববর্তী ডানিয়েলকে দেখাল। বিষণ নায়েকের চোখ ডানিয়েলের দিকে ফিরল।

সুভদ্রা বলল, 'এর নাম ডানিয়েল। কিছুদিন হল উনি মনপুরায় এসেছেন, বেশ কিছুদিন ওখানে থাকবেনও।'

বিষণ নায়েক সোৎসাহে বলল, 'এ তো খুব ভাল কথা।'

বোঝা গেল সেদিন রাত্রে তার বাড়িতে ডানিয়েলকে সে লক্ষ্য করে নি।

'উনি এখানকার ভাষা চমৎকার শিখে নিয়েছেন।'

'তাই নাকি!' বিষণের চোখে যুগপৎ শ্রদ্ধা, ভক্তি এবং প্রশংসা একাকার হয়ে নেচে গেল।

'মনপুরা গ্রামের লোকেরা ওঁকে খুব ভালবাসে।'

'তা তো বাসবেই। ভালবাসার মত লোক উনি।'

'ভক্তিও করে।'

'তা তো করবেই।' বিষণ গদগদ হয়ে উঠল।

একটু চুপচাপ। তারপর বিষণই আবার বলে উঠল, 'অপরাধ যদি না নেন আমার একটা কথা জিজ্ঞেস করবার ছিল।'

'বেশ তো, কী জানতে চাও বল।'

একটু ইতস্তত করে বিষণ নায়েক বলল, 'এনাকে দেখে তো আমাদের দেশের লোক মনে হয় না।'

'না, উনি মারাঠাওয়ারের লোক নন। উনি ইংরেজ। বিলেতের নাম শুনেছ তো?'

'হ্যাঁ।'

'উনি সেখানকার লোক।'

'তা-তা—'

'কী?'

ব্যস্তভাবে চারিদিকে তাকিয়ে কুণ্ঠিত মুখে বিষণ বলল, 'সায়েব ইংরেজ মানুষ, এই নোংরা আড়তে ভনভনে মাছি আর আঁশটে গন্ধের ভেতর উনি এসে বসেছেন। এখান থেকে নিয়ে গিয়ে কোথায় যে বসাই!' নিজের হীনম্মন্যতায় কী যে করবে ঠিক করে উঠতে পারল না সে।

'তোমাকে অস্থির হতে হবে না। ওঁর কোন অসুবিধে হচ্ছে না।' সুভদ্রা তাকে আশ্বস্ত করতে চাইল।

বিষণের অস্থিরতা কিন্তু কমল না। বলল, 'অসুবিধে না হয়ে পারে! সায়েব-ইংরেজ বলে কথা। ক'দিন আগেও ওরা আমাদের রাজা ছিল। উনাকে কী খাওয়াই, কোথায় বসাই, কী লজ্জায় যে পড়লাম।'

হেসে সুভদ্রা ডানিয়েলের কানে ফিসফিস করল, 'সাহেব হবার মর্যাদাখানা দেখেছেন! ব্যাটা আপনাকে নিয়ে কী করবে ভেবে পাচ্ছে না।'

ডানিয়েল লজ্জা পেল। বলল, 'আমার সম্বন্ধে ওকে ব্যতিব্যস্ত হতে বারণ করুন।'

'করছি তো, শুনছে না।'

বিষণ বলে উঠল, 'এক কাজ করুন, আমার বাড়ি চলুন। জেলেরা তো সেই সন্ধ্যেবেলায় আসবে। তার ভেতর ওকে একটু চা-টা খাইয়ে আড়তে ফিরে আসতে পারব।'

অতিথি-সৎকারের উদ্যমে বাধা পড়ল। এবার কণ্ঠস্বরে খানিকটা বিরক্তি মিশিয়ে সুভদ্রা বলল, 'বার বার বলছি তোমাকে অস্থির হতে হবে না, তবু কেন ঝামেলা বাধাতে চাইছ। কাজের কথাটা সেরে নিয়ে আমরা এখনই চলে যাব।'

বিরস মুখে বিষণ বলল, 'বেশ, বলুন—' বলে নিজের চিটচিটে গদীতে গিয়ে আবার বসল।

তৎক্ষণাৎ কোনো উত্তর দিল না সুভদ্রা। একটু চুপ করে থেকে আবার ডানিয়েলকে দেখিয়ে বলল, 'এই ভদ্রলোক রোজ বিকেলবেলা তোমার আড়তে আসবে।'

'নিশ্চয়ই আসবে, নিশ্চয়ই আসবে—' কৃতার্থ হতে গিয়ে হঠাৎ সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল বিষণ নায়েক, 'কিন্তু—'

'কী?'

'আমার এখানে বেড়াতে আসবে, না কোনো কাজ আছে?'

'কাজ না থাকলে রোজ রোজ তোমার মেছো আড়তে কেউ বেড়াতে আসবে?'

কিছু না বলে শঙ্কিত মুখে তাকিয়ে রইল বিষণ নায়েক।

সুভদ্রা বলল, 'সেদিন রাত্রে তোমার বাড়িতে কেন গিয়েছিলাম, মনে আছে তো?'

গলার ভেতর একটা শব্দ করল বিষণ নায়েক, 'আছে। আপনি জেলেদের মাছের ওজন লিখে দিতে বলেছিলেন। কিন্তু সেদিনই তো আপনাকে বলে দিয়েছি, লিখে দেবার মত সময় বা লোক, কোনোটাই আমার নেই।'

'সে কথা ভুলি নি। তোমাকে দিয়ে লেখাতে পারব না বলেই তো অন্য ব্যবস্থা করতে হল। এই ভদ্রলোককে ধরে নিয়ে এলাম।'

ফাটা মোটা কালো ঠোঁট জিভ দিয়ে চেটে শুকনো গলায় বিষণ জানতে চাইল, 'উনি কী করবেন?'

'মাছের ওজন লিখে নিয়ে যাবে। আর সেদিন তুমি বলেছিলে, তোমার সইয়ের রবার স্ট্যাম্প আছে একটা কবে তার ছাপ মেরে দেবে লেখা কাগজে। এখন থেকে এই নিয়মেই চলবে।'

বিষণের গোলাকার ক্ষুদ্র চোখ দুটো স্থির হয়ে গেল। সেদিন রাত্রে এই লোকটাকে নিরীহ মনে হয়েছিল ডানিয়েলের। কিন্তু আজ দিনের প্রখর আলোয় তার চোখের দিকে তাকিয়ে সমস্ত সত্তার মধ্য দিয়ে বিচিত্র শিহরণ খেলে গেল। চোখদুটি সাপের মত শীতল, কুটিল এবং নিষ্পলক। বিষণ নায়েক যে জীবনের আলোকিত পথে হাঁটে না, গভীর জটিল পথে যে তার সঞ্চরণ, তার দৃষ্টি যেন সে কথা জানিয়ে দেয়। মানুষের চোখ যে এত স্পর্শময় এত তীব্র এবং প্রকাশক্ষম হতে পারে এ ছিল ডানিয়েলের পক্ষে অকল্পনীয়।

বিষণ যে খুব খুশি হয়েছে তার কোন লক্ষণ বোঝা গেল না। চাপা গলায় সে বলল, 'এই জন্যেই বুঝি সাহেবকে নিয়ে এসেছেন?'

'হ্যাঁ'। সুভদ্রা ঘাড় কাত করল, 'তুমিই তো বলেছিলে লেখার লোক জোগাড় করতে পারলে নিয়ে আসতে। পেয়ে গেছি, তাই নিয়ে এলাম।'

বলেছিল বলেই যে একটা লেখার লোক পেতে হবে আর পেয়ে গেলেই যে তাকে নিয়ে আসতে হবে, এতটা ভেবে উঠতে পারে নি বিষণ। নিষ্পলক তাকিয়েই আছে সে। তার মস্তিষ্কের ভেতর এই মুহূর্তে কী চলছে, বাইরে থেকে বুঝবার উপায় নেই। শুধু নাকের পাটা ক্রমশ রক্তাভ হয়ে ফুলে ফুলে উঠছে।

সুভদ্রা আবার বলল, 'তা হলে ঐ কথাই রইল, কাল থেকে উনি আসছেন। আজ আমরা চলি।'

বিষণ উত্তর দিল না, দুচোখে পৃথিবীর সবটুকু বিদ্বেষ মিশিয়ে ডানিয়েলের দিকে তাকিয়ে রইল শুধু।

কে বলবে এই লোকটাই একটু আগে উদার আপ্যায়নে মুখর হয়ে উঠেছিল। বিষণ নায়েকের এই পরিবর্তনের কারণটা বিশ্লেষণ করে মনে মনে হাসতে লাগল ডানিয়েল। এদিকে সুভদ্রা উঠে পড়েছে। ডানিয়েলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'চলুন।'

আজ আর সমুদ্রে স্নান করার সময় হল না। দিগন্তবিসারী বালির প্রান্তর পাড়ি দিয়ে সুভদ্রার সঙ্গে মনপুরা গ্রামে ফিরে চলেছে ডানিয়েল। ইতিমধ্যে সূর্যটা দুর্দান্ত গতিতে তার ঘোড়া ছুটিয়ে কখন যেন একেবারে মধ্যাকাশে পৌঁছে গেছে। প্রখর

উত্তাপে বালিয়াড়ি তেতে উঠেছে। রৌদ্রে-ঝলকিত প্রান্তরে পা রাখা অসম্ভব। তবু সমুদ্রের দিক থেকে প্রবল হাওয়াটুকু আছে বলেই রক্ষা।

হাঁটতে হাঁটতে সুভদ্রা বলল, 'কাল থেকে তা হলে আপনি আসছেন?'

ডানিয়েল বলল, 'সেই রকম কথাই তো হল।'

একটু চুপচাপ। তারপর সুভদ্রা বলল, 'ক'টা দিন এখানে এসে সাবধানে থাকবেন।'

'কেন বলুন তো?'

'বিষণ নায়েক এরকম ব্যবস্থা যে হবে তা ভাবতে পারে নি। ভয়ানক চটেছে সে। আমাকে তো সব সময় পাবে না কিন্তু আপনার সঙ্গে রোজ দেখা হবে। লোকটা সাপের চেয়েও সাঙ্ঘাতিক। আপনার ক্ষতি করতে চেষ্টা করবে।' একটু থেমে আবার বলল, 'কি, ভয় পেলেন?'

গম্ভীর ভীত সুরে ডানিয়েল বলল, 'হ্যাঁ, ভয়ই তো লাগছে।'

সুভদ্রাকে চিন্তিত দেখাল। সে বলল, 'তা হলে বরং থাক। আপনি বিদেশী মানুষ, আজ আছেন কাল নেই। শুধু শুধু আর বিপদের মধ্যে আপনাকে জড়াব না।'

ঠোঁটে ঠোঁট টিপে আড়ে আড়ে সুভদ্রার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ হো হো করে উদ্দাম হাসিতে মেতে উঠল ডানিয়েল। হাসির শব্দটা অবারিত প্রান্তরের ওপর দিয়ে তরঙ্গিত হতে হতে মিলিয়ে গেল।

সুভদ্রা চমকে উঠল, 'কী, কী ব্যাপার, হাসছেন কেন?'

'এমনি।'

'এমনি না, বলুন—'

'আপনি কেমন করে ভাবলেন ঐ লোকটাকে আমি ভয় পেয়েছি?'

একটু আগের সভয় গাম্ভীর্য যে নিতান্তই কপটতা এবার তা বোঝা গেল। সুভদ্রা বলল, 'ভয় না পেলেই ভাল। তবু সাবধানে থাকবেন।'

আরো কিছুক্ষণ হাঁটার পর বালিয়াড়ির বিস্তার শেষ। এখান থেকে অল্প অল্প ঘাসের হরিৎ রেখা শুরু হয়েছে। কিছু কিছু গাছপালাও চোখে পড়ছে।

দূরমনস্কের মত কী যেন ভাবছিল ডানিয়েল। হঠাৎ সুভদ্রার দিকে ফিরে বলল, 'একটা কথা বলব?'

উদাসীন মুখে সুভদ্রা বলল, 'স্বচ্ছন্দে, তবে এমন কিছু বলবেন না যাতে সন্ন্যাসিনীর মর্যাদা সম্ভ্রম কোনমতেই ক্ষুণ্ণ হয়।'

খানিকটা হকচকিয়ে গেল ডানিয়েল। বুঝতে পারল সুভদ্রার রাগ এখনও পড়ে নি। তার বধূবেশিনী সেই ছবিটার কথা এখনও নিশ্চয়ই ভুলতে পারেনি। ভয়ে ভয়ে ডানিয়েল বলল, 'আপনার সম্বন্ধে আমার কিছুই কিন্তু জানা হয় নি। অথচ—'

'কী?' সুভদ্রার চোখমুখ কুঁচকে গেল।

'কী জানতে চান বলুন।' সুভদ্রা এমন দৃষ্টিতে তাকাল যার মধ্যে বিন্দুমাত্র প্রশ্রয় নেই।

ডানিয়েল ভয়ের একটা ভঙ্গি করল। যেন শিউরে উঠেছে, মুখচোখের চেহারা এমন করে বলল, 'ওভাবে যদি তাকান কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস পাই না যে।'

মুখের একটি রেখাও কোমল হল না। আগের সুরেই সুভদ্রা বলল, 'কিভাবে তাকাতে হবে শুনি?'

রসিকতার লোভটা সামলাতে পারল না ডানিয়েল। ডান হাতের আঙুলে একটি মুদ্রা ফুটিয়ে খানিক ঝুঁকে তরল গলায় বলল, 'এই মানে একটু হাসি হাসি চোখ করে—'

সুভদ্রা ধমকে উঠল, 'ইয়ার্কি অন্য লোকের সঙ্গে করবেন। আমার সম্বন্ধে আপনার কী জিজ্ঞাস্য শুধু সেইটুকুই বলুন।'

মনে মনে ভয়ানক দমে গেল ডানিয়েল। নিজেকে অনেকখানি সংযত করে বলল, 'এই আপনার ঘরবাড়ি কোথায়, বাবা-মা-ভাইবোন কেউ আছেন কিনা, থাকলে আছেন কোথায়, চার্চে এসে সন্ন্যাসিনী হবার প্রেরণা কিভাবে পেলেন, আপনজনদের ছেড়ে এখানে থাকতে ভাল লাগে কিনা—এই সব কথা আর কি।'

তাচ্ছিল্যভরে সুভদ্রা বলল, 'অর্থাৎ আমার জীবনী জানতে চান?'

'হ্যাঁ।' সাগ্রহে মাথা নাড়ল ডানিয়েল।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর হঠাৎ সুভদ্রা বলে উঠল, 'দেখুন আমার জীবন এমন মহান কিছু নয় যা না জানলে আপনার ক্ষতি হয়ে যাবে। কাজেই এ প্রসঙ্গ থাক।'

'মহান কি মহান নয় সেটা আমি বুঝব। আপনি বলুন।'

'না, প্রয়োজন নেই।'

হাজার অনুরোধ সত্ত্বেও নিজের জীবনের কোনো প্রান্ত থেকে একটি যবনিকাও তুলল না সুভদ্রা। নিজের চোখে যতটুকু দেখেছে, যেটুকু উপলব্ধি করেছে মাত্র ততটুকুই সন্ন্যাসিনী এই মেয়েটি সম্পর্কে ডানিয়েলের জ্ঞানের পরিধি। তার বাইরে সুভদ্রা সম্বন্ধে একটি বর্ণও তার জানা হল না।

ডানিয়েল লক্ষ্য করেছে, সেই ছবিটা যার মধ্যে বধূবেশিনী সুভদ্রা ছিল—দেখার পর থেকেই গীর্জাবাসিনী মেয়েটা অত্যন্ত কঠিন আর শীতল হয়ে গেছে। যে মানুষ হাসিতে-খুশিতে ডানিয়েলের দিকে নিজেকে প্রসারিত করে দিয়েছিল, হঠাৎ সে নিজেকে সঙ্কুচিত করে নিয়েছে। কথাটা যত ভাবল ততই ভয়ানক রকমের বিশ্রী লাগল ডানিয়েলের।

একসময় দু'জনে মনপুরা গ্রামে পৌঁছে গেল।

পরের দিন থেকে বিষণ নায়েকের আড়তে যাতায়াত শুরু করল ডানিয়েল। সন্ধ্যার কিছুক্ষণ আগে আগে গিয়ে পৌঁছয় সে। সঙ্গে সেই কুকুরছানাটা থাকে। ডানিয়েল

যাবার কিছুক্ষণের মধ্যে একে একে জেলে নৌকাগুলো সমুদ্রের পারে এসে ভিড়তে থাকে।

ডানিয়েল লক্ষ্য করেছে, প্রথম দিনের মত উদার অভ্যর্থনায় সরব হয়ে ওঠে না বিষণ। গণপতি মূর্তির তলায় নিজের গদীটিতে বসে গোলাকার শীতল চোখে শুধু একদৃষ্টে তাকিয়ে তাকিয়ে ডানিয়েলকে দ্যাখে। যে দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে থাকে আর যা-ই থাক তাতে প্রণয় নেই। জগতের সবটুকু বিদ্বেষ আর আক্রোশ নিয়ে কুটিল সরীসৃপ যেভাবে তার প্রতিপক্ষের দিকে তাকায় বিষণ নায়েকের চোখে হুবহু সেই দৃষ্টি।

চোখ দেখেই বিষণের মনোভাব বুঝে ফেলে ডানিয়েল। কাজেই মনপুরা গ্রাম থেকে এসে সরাসরি বিষণের আড়তে গিয়ে ঢোকে না সে। কুকুরছানাটাকে নিয়ে সমুদ্রের পারে বালুকা-বেলায় অথবা ম্যানগ্রেভ বনে কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়ায়। সারা দিনের ক্লান্তি গায়ে মেখে জেলেরা ফিরে এলে তাদের সঙ্গে আড়তে যায়। তারপর একে একে সবার মাছ ওজন হলে কাগজের চিরকুটে লিখে বিষণের সইয়ের ছাপ মেরে বেশ রাত করে মনপুরাবাসী পুরুষগুলির সঙ্গে গ্রামে ফেরে।

ইতিমধ্যে চিরকুটে ওজন লেখার খবরটা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। ডানিয়েলের কানে আসছে অন্য অন্য আড়তেও নাকি লেখা আদায়ের চেষ্টা চলছে। শুধু মনপুরা নয়, এ অঞ্চলের সমস্ত মৎস্যজীবীর মধ্যেই ওজন নিয়ে দীর্ঘকালের অসন্তোষ। মনপুরার জেলেরা দাবীটা আদায় করে ফেলায় অন্যদের বিক্ষোভের বারুদে আগুন ধরে গেছে যেন। শোনা যাচ্ছে, এ ব্যাপারে অন্যান্য আড়তদারেরা খুবই চিন্তান্বিত, ভীত এবং সন্ত্রস্ত।

যাই হোক, দিনকতক এইভাবে চলার পর হঠাৎ সেদিন অভাবিত ব্যাপারটা ঘটল।

যথারীতি বিকেলে সমুদ্রের পারে এসেছে ডানিয়েল। সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে নরম ভেজা বালিতে পা গেঁথে গেঁথে অন্যমনস্কের মত হাঁটছিল। কুকুরছানাটা পায়ে পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। হঠাৎ কাঁধে কার হাত পড়তে থমকে গেল ডানিয়েল। মুখ ফেরাতে চোখাচোখি হয়ে যায়। নিজের গদী থেকে বিষণ নায়েক কখন যেন উঠে এসে তার পেছনে দাঁড়িয়েছে।

ঈষৎ কাঁপা গলায় ডানিয়েল বলল, 'কী—কী ব্যাপার?'

ঠোঁট কুঁচকে নিঃশব্দে হাসল বিষণ। বলল, 'চলুন—'

'কোথায়?'

'আমার আড়তে।'

বিষণের চোখেমুখে অন্যদিনের মত কিছু একটা মাখানো। লোকটার এই রূপান্তর ডানিয়েলকে সংশয়ান্বিত করে তুলল। আস্তে আস্তে খুব সতর্ক ভঙ্গিতে সে বলল, 'কেন, সেখানে কী?'

বিষণের হাসিটা আরেকটু ছড়িয়ে পড়ে, 'কি আবার, কিছুই না।'

'তবে?'

'এরকম একা-একা ঘুরে বেড়াচ্ছেন, আমার ভাল লাগছে না। আড়তে গিয়ে বসবেন চলুন।'

'রোজই তো আমি ঘুরে বেড়াই। কই তখন তো ডাকো না।'

থতমত খেয়ে গেল বিষণ। মুহূর্তমাত্র। তারপরেই স্বাভাবিক সুরে বলে উঠল, 'রোজই ডাকব ডাকব ভাবি কিন্তু সাহস পাই না।'

'তা আজ সাহসটা হল কোত্থেকে?'

প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে বিষণ বলল, 'আসুন, আসুন—'

মনের মধ্যে সংশয়ের ছায়া থাকলেও, পায়ে পায়ে বিষণের সঙ্গে এগিয়ে চলল ডানিয়েল। সংশয়ের সঙ্গে সামান্য কৌতূহলও বুঝি তার রয়েছে।

আড়তের কাছাকাছি এসে থমকে দাঁড়াল ডানিয়েল। ভেতরে অনেকগুলো লোক বসে রয়েছে। তাদের সবার দৃষ্টি ডানিয়েলের দিকেই নিবদ্ধ। লোকগুলো এই আড়তের কর্মচারী নয়, পরিচিত বলেও মনে হচ্ছে না। ডানিয়েলের মনে হল তাকে ডেকে নিয়ে আসাটা নিছক ভদ্রতা নয়, এর নেপথ্যে নিশ্চয়ই কোন গভীর কুটিল উদ্দেশ্য রয়েছে।

পেছন থেকে বিষণ নায়েক বলে উঠল, 'কি হল, দাঁড়িয়ে পড়লেন যে। চলুন।'

চাপা গলায় ডানিয়েল ফিস ফিস করল, 'ওরা কারা?'

'কাদের কথা বলছেন?'

'কাদের কথা বলছি, বুঝতে পারছ না?'

'না, ঠিক—'

ডানিয়েল বুঝল, বিষণ নায়েক মিথ্যে বলছে। দাঁতে দাঁত চেপে আরেক বার সে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার আড়তে যারা বসে আছে তাদের কথা বলছি।'

'ও—' বিষণ ব্যাপারটায় গুরুত্ব না দিয়ে বলল, 'ওরা এখানকারই লোক।'

'তোমার আড়তে আগে তো ওদের দেখিনি।'

'না, আমার কাছে ওরা কাজ করে না।'

'তবে?'

'আশে পাশের গাঁয়ে ওরা থাকে।'

'তা হঠাৎ দল বেঁধে আজ তোমার আড়তে ওরা হানা দিল যে?'

সামনের দিকে হাত দেখিয়ে বিষণ বলল, 'চলুন না, আলাপ সালাপ করিয়ে দি। ওদের জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবেন কেন এসেছে।'

খপ করে বিষণের একটা হাত চেপে ধরল ডানিয়েল। উত্তেজিত চাপা গলায় বলল, 'তোমার মতলবটা কী, ঠিক করে বল।'

'কি আশ্চর্য, মতলব আবার কি থাকবে!' বিষণ নায়েক একেবারে অবাক হয়ে গেল যেন।

'হ্যাঁ, আছে।'

'না-না, সত্যি কিছু নেই।'

ডানিয়েলের বুকের ভেতর থেকে নামহীন একটা ইন্দ্রিয় ক্রমাগত বলতে লাগল, পালিয়ে যাও। আড়তে ঢুকলে বিপদে পড়তে হবে। ডানিয়েল কিন্তু পালাল না। এই পর্যন্ত এসে সে যদি ভেতরে না যায় তার চরিত্রে কাপুরুষতার গ্লানি এসে লাগবে। তার চাইতেও বড় কথা, সত্যি সত্যিই বিষণ নায়েক যদি কোনো ষড়যন্ত্র করেই থাকে, সাহসিকতার সঙ্গে তার মুখোমুখি হওয়া প্রয়োজন। যদি ভয় পেয়ে সে পিছু হটে, তার প্রতিক্রিয়া ভাল হবে না। বিষণ তা হলে পেয়ে বসবে।

শরীর এবং মনের সবটুকু শক্তি সংহত করে ডানিয়েল বলল, 'চল।'

ভেতরে ঢুকতেই সাড়া পড়ে গেল। সবাই সমস্বরে বলল, 'বসতে দাও, সাহেবকে বসতে দাও—'

গদীর তক্তাপোষে ডানিয়েলকে বসানো হল। কালো লোকগুলো তার চারপাশে বৃত্তাকারে বসল।

তীক্ষ্ণ চোখে সবাইকে একবার দেখে নিল ডানিয়েল। দূর থেকে এদের অপরিচিত মনে হয়েছিল। কাছাকাছি এসে মনে হল, এরা একেবারে অচেনা নয়। সমুদ্রের কিনারে এই অঞ্চলটাতেই তাদের আগে কোথাও দেখেছে। একটু ভাবতেই মনে পড়ল, অন্য আড়তগুলোতে এদের দেখা গেছে।

বিষণ ডেকে উঠল, 'সাহেব—'

ডানিয়েল ফিরে তাকাল।

বিষণ বলল, 'আসুন আপনার সঙ্গে এদের আলাপ করিয়ে দিই।'

ডানিয়েল কিছু বলল না, তীক্ষ্ণ ভ্রুকুটি ফুটিয়ে তাকিয়ে রইল।

একে একে সবার নাম বলে গেল বিষণ। গঙ্গাধর, যমুনা, শিবজী, মহাদেও, দামোদর ইত্যাদি ইত্যাদি। নাম জানাবার পর বিষণ বলল, 'এরা সবাই মাছের আড়তদার।' ডানিয়েল চকিত হয়ে উঠল। এ অঞ্চলের তাবত আড়তদার একত্র হয়ে তার সঙ্গে পরিচিত হতে চাইছে। কেন, কোন গভীর উদ্দেশ্যে তা বুঝতে পারা যাচ্ছে না। তবে উদ্দেশ্যটা যে খুব সদুদ্দেশ্য নয় সেটুকু টের পাওয়া যাচ্ছে। উদ্বিগ্ন সন্দিগ্ধ ডানিয়েল স্নায়ুগুলোকে সজাগ করে বসে রইল।

এদিকে পরিচয় পর্বের পর আড়তদারদেয় মধ্য থেকে একজন সবাইকে ঠেলে সরিয়ে একেবারে সামনে এসে বসল।

লোকটার নাম আগেই জানা হয়েছে—দামোদর। বয়সে সে প্রৌঢ়, থলথলে স্থূল শরীর। নাকটা যেন প্রকাণ্ড এক ঢিবি, শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য তার মধ্যে দুটো সুড়ঙ্গ পথ। ঘোলাটে চোখ আরক্ত, নেশায় বুঝি আচ্ছন্ন হয়ে আছে। মাথার চুল নিরপেক্ষভাবে সমান করে ছাঁটা। গলাটা শরীরের তুলনায় অস্বাভাবিক খাটো, সরাসরি ঘাড়ের ওপর মাথাটা যেন ঠেসে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। লোকটার চামড়া অত্যন্ত উর্বর, ফলে সারা শরীরে উদার অভ্যুদয় হয়েছে লোমের। থেকে থেকেই দামোদর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে, তখন তাকে শজারুর মত দেখাচ্ছে।

পরনে সংক্ষিপ্ত একটা ধুতি ছাড়া কিছু নেই। বাহুল্যবোধে অন্য সব আচ্ছাদন সে বর্জন করেছে। হাতে অনেকগুলো মাদুলি এবং গলায় কালো কারে রূপো-

বাঁধানো বাঘনখ। (ইদানীং মাদুলী-তাবিজের নাম এবং সে সবের কার্যকারিতা জেনে ফেলেছে ডানিয়েল)

এক নজরেই ডানিয়েল টের পেল, লোকটার মধ্যে কোথায় যেন খানিকটা জান্তব উপাদান রয়েছে।

কেশে গলাটা সাফ করে নিতে চাইল দামোদর। তাতে ফল কিছুই হল না, অপরিচ্ছন্ন ঘড়ঘড়ে সুরে সে বলল, 'অনেক দিন থেকে আপনার সঙ্গে আলাপ করবার ইচ্ছে ছিল সাহেব।'

'কেন?' ডানিয়েল স্থির চোখে তাকাল, বুঝতে পারল এই লোকটা আড়তদার সম্প্রদায়ের মুখপাত্র এবং বেশ জবরদস্ত নেতা।

'আহা, আপনি আমাদের দেশে নতুন এসেছেন। ইচ্ছা হয় না আলাপ করতে?'

ডানিয়েল চুপ করে রইল।

দামোদর আবার বলল, 'মনপুরা গাঁয়েই তো আপনি আছেন?'

'হ্যাঁ।'

'কদ্দিন থাকবেন?'

'ইচ্ছে তো অনেক দিন থাকার। দেখা যাক কি হয়।'

চোখদুটো অর্ধেক বুজে এবার অন্তরঙ্গ সুরে ফিসফিসিয়ে উঠল দামোদর, 'খেয়েদেয়ে বুঝি আর কোন কম্ম নেই আপনার?'

'তার মানে?' ডানিয়েলের চোখমুখ কর্কশ দেখাল।

'বলছিলাম ঘরে বুঝি আপনাদের অনেক ভাত?'

'কী বলতে চাও স্পষ্ট করে বল।'

দামোদর হাসল, 'পেটের চিন্তা বোধ হয় আপনার নেই, তাই না?'

'কে বললে তোমাকে?'

'কেউ বলে নি, তবে আপনার হালচাল দেখে তাই মনে হয়।'

'কি রকম?'

'পেটের ভাবনা থাকলে কেউ শুধু শুধু বনের মোষ তাড়িয়ে বেড়ায়? জেলেদের পেছনে এই যে দিনের পর দিন সময় নষ্ট করে যাচ্ছেন, তার কোন মানে হয়?'

'সময় নষ্ট করছি, এমন কথা ভাবছ কেন? তা ছাড়া—'

'কী?'

'শুধু শুধু তো আমি খাটি না, এর জন্যে আমি ওদের কাছে অনেক পাই।'

'কী পান শুনি—'

একটু ভেবে নিয়ে ডানিয়েল বলল, 'ওরা আমাকে আশ্রয় দিয়েছে, খাওয়া-পরার সব দায়িত্ব নিয়েছে।' মিথ্যেই বলল সে, কেননা তার সব ভার নিয়েছে চার্চ।

'এ-ই পান মোটে!' তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে হাত ওল্টাল দামোদর।

'হ্যাঁ।'

'ঐ খাটুনির জন্যে যা পান তা না-পাওয়ার মতই। আমরা আড়তদারেরা একটা কথা আপনার সম্বন্ধে ভেবেছি।'

'কী ভেবেছ?'

'আপনি আমাদের অতিথি। আমাদের ইচ্ছে যতদিন এ দেশে আছেন ততদিন আপনার সব দায় আমরা নেব। হাত খরচের জন্যে মাসে মাসে গোটা চল্লিশেক করে টাকাও দেব।'

'তোমরা আমার দায়িত্ব নেবে কেন? টাকাই বা দিতে যাবে কেন?' ডানিয়েল প্রায় হতবাক।

'আগেই তো বললাম আপনি এ দেশের অতিথি, তাই।'

'অতিথি হলেই বুঝি তোমরা তার সব ভার নাও?'

'তা নয়। তবে আপনার বেলায় নেব। কারণ আপনি অনেক দূর দেশ থেকে এসেছেন।'

খানিক চিন্তা করে ডানিয়েল বলল, 'বেশ, আমার দায়িত্ব না হয় তোমরা নিলে। কিন্তু—'

দামোদরের চোখ চকচকিয়ে উঠেছে। সে বলল, 'কিন্তু কী?'

'সে জন্যে আমাকে কী করতে হবে?'

দামোদর কী বলতে যাচ্ছিল, সেই সময় দেখা গেল জেলে নৌকাগুলো কিনারে এসে ভিড়তে শুরু করেছে। পাল নামিয়ে অনেকে পারের বালিয়াড়িতে নেমেও পড়েছে। দামোদর তাড়াতাড়ি তার সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে উঠে পড়ল। ব্যস্তভাবে বলল, 'আজ নয় সাহেব, জেলেরা সব এসে গেছে। এক্ষুনি মাছের ওজন আরম্ভ হবে। কাল কথা হবে, একটু তাড়াতাড়ি আসবেন।' বলে আর দাঁড়াল না, ঊর্ধ্বশ্বাসে নিজের নিজের আড়তের দিকে সবাই ছুটতে শুরু করল।

পরের দিন বিষণ নায়েকের আড়তেই আবার জটলা বসল। কাল যে বক্তব্যটা অর্ধসমাপ্ত ছিল আজ তা পুরোপুরি শোনা গেল।

দামোদর একটা লোভনীয় প্রস্তাব রেখেছে। সেটা এইরকম। ডানিয়েলের সব দায়িত্বই তারা নেবে এবং রাজভোগে রাজসুখে তাকে রাখবে তবে মনপুরায় তার থাকা চলবে না। ইচ্ছা হলে ডানিয়েল চান্দা গ্রামে বিষণের বাড়ি নতুবা মান্দবি গ্রামে দামোদরের বাড়িতেও থাকতে পারে। এই প্রস্তাবে রাজী হলে ডানিয়েলকে তারা মাথায় করে রাখবে।

মনোযোগ দিয়ে সব শুনে ডানিয়েল বলল, 'একটা কথা—'

'বলুন—'

'ধর তোমাদের ওখানে চলে গেলাম—'

'বেশ।'

'তারপর এখন যেমন জেলেদের হয়ে মাছের ওজন লিখে নিয়ে যাচ্ছি, সে কাজটা করতে পারব তো?'

জটলাটা এবং তাদের প্রতিনিধি দামোদর একেবারে হকচকিয়ে গেল। মুহূর্তে বিষণেব আড়ত ঘরে অস্বস্তিকর এক স্তব্ধতা নেমে এল।

সবার মুখের ওপর দিয়ে দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে নিয়ে দামোদরের মুখে স্থির করল ডানিয়েল। বলল, 'কি, চুপ করে রইলে যে? বল—'

খানিকক্ষণ তো তো করে দামোদর বলল, 'না, বলছিলাম কি—' হঠাৎ থেমে গেল সে।

'কী বলছিলে, বল।'

'আপনি সাহেব মানুষ। আপনার কি এ সব নোংরা কাজ সাজে?'

'অর্থাৎ জেলেদের মাছের ওজন লিখি, সেটা তোমরা চাও না, এই তো?'

'হ্যাঁ। আরেকটা ব্যাপারও আমরা চাই না।'

'কী?'

'ঐ সব মুখ্যু নোংরা জেলেগুলোর সঙ্গে আপনি মেশেন। আপনার একটা সম্মান নেই?' বলে পার্শ্ববর্তী আড়তদারদের দিকে তাকাল দামোদর, 'তোমরা কী বল?'

সবাই যেন মুখিয়েই ছিল, শিয়ালের মত সমস্বরে বলে উঠল, 'নিশ্চয়, নিশ্চয়।'

আড়তদারদের সমস্ত পরিকল্পনা—পরিকল্পনা না বলে শয়তানি বলাই উচিত—এতক্ষণে স্পষ্ট হয়ে গেল। ষড়যন্ত্রটা তাদের ছিল ভালই এবং সুদূরপ্রসারী। জেলেদের মাছের ওজন লিখে নেবার ব্যবস্থায় তাদের দীর্ঘকালের প্রতারণা বন্ধ হতে বসেছে। এতে তারা সন্তুষ্ট নয়। যেমন করে হোক জেলেদের কাছ থেকে ডানিয়েলকে বিচ্ছিন্ন করতে চায় তারা। ডানিয়েল যদি তাদের এই ফাঁদে পা দেয় তা হলে অনায়াসেই নিজেদের অনুকূলে ব্যাপারটা তারা টেনে নিতে পারে। আবার নতুন করে বিষণ নায়েক প্রতারণা আরম্ভ করতে পারে। অন্য অন্য আড়তে ওজন লেখার জন্য যে বিক্ষোভ শুরু হয়েছে, ডানিয়েল না থাকলে তা-ও তাড়াতাড়ি বন্ধ হয়ে যাবে।

দামোদর ডেকে উঠল, 'সাহেব— '

ডানিয়েল মুখ তুলল, 'বল– '

'কি, রাজী তো?'

'কী ব্যাপারে?'

'আমরা যে কথা বললাম তাতে?'

'ভাবছি।'

'এর ভেতর ভাবাভাবির কী আছে!'

ডানিয়েল উত্তর দিল না।

দামোদর বলতে লাগল, 'আপনাকে কিছু চিন্তা করতে হবে না সাহেব। আমরা যা বলছি তাতে রাজী হয়ে যান। আরামে থাকতে পারবেন, আপনার ভাল হবে।'

'ভাল হবে' শব্দ দুটোয় কোনো ইঙ্গিত আছে? দামোদরদের প্রস্তাবে রাজী না হলে পরিণাম খারাপ হবার সম্ভাবনা রয়েছে কী? দামোদর কি তাকে সতর্ক করে দিল? কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ডানিয়েল বলল, 'তোমাদের কথায় আমি রাজী। চান্দায় হোক আর মান্দবিতে হোক—যেখানে বলবে সেখানে গিয়েই থাকব। তবে—'

'কী?'

'মাছের ওজন লেখার কাজটা আমাকে করতে দিতে হবে। ওটা আমি ছাড়তে পারব না।' বলে রুদ্ধ কৌতুকের একটি হাসি দুই ঠোঁটের মাঝখানে চেপে জটলাটার দিকে মিটি মিটি তাকাতে লাগল।

আড়তদারেরা, বিশেষত দামোদর বার বার বোঝাতে লাগল, এ জাতীয় হীন কাজ তার মত ইংরেজের যোগ্য নয়। এতে তার অমর্যাদাই হবে। দামোদররা তার একান্ত হিতৈষী। তারা যখন এখানে আছে তখন এমন ইতর কাজে ডানিয়েলকে জড়িত থাকতে দেবে না। হাজার হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে এদেশে এসে এমন জঘন্য অসম্মানের কাজ যদি তাকে করতে হয় তা হলে দামোদরদের নাকি লজ্জায় মাথা কাটা যায়। জগতে মুখ লুকোবার জায়গাই আর তাদের থাকে না।

দামোদরদের এত অনুনয় এত তোয়াজের নেপথ্যে কী আছে, আগেই তো টের পেয়ে গেছে ডানিয়েল। তার নিজের কী করণীয় তা-ও স্থির করাই আছে। এক কথায় তাদের প্রস্তাব নাকচ করে দিয়ে সে অনায়াসেই উঠে যেতে পারে। কিন্তু তার স্বভাবটা যাবে কোথায়? একটু মজা করার লোভ কিছুতেই ঠেকিয়ে রাখতে পারল না ডানিয়েল। বলল, 'তোমরা যেরকম লোভ দেখাচ্ছ তাতে আমার মাথা ঘুরে যাচ্ছে। এমন লোভ কোনো মেয়েমানুষও আমাকে দেখায় নি। যে আরামের কথা তোমরা বলছ তেমন আরামে আমার চোদ্দ পুরুষের কেউ কখনো থাকে নি।'

সমস্ত জটলাটা হল্লা করে উঠল, 'সাহেব ব্যাটা বেড়ে লোক, কোনো মেয়েমানুষ নাকি তাকে আমাদের মত লোভ দেখায় নি! হে-হে-হে—'

ডানিয়েল বলল, 'কিন্তু—'

'কী?' জটলাটা উদগ্রীব হল।

'জেলেদের মাছের ওজন লেখাটা বাজে হতে পারে কিন্তু এর মধ্যে অন্যায় তো কিছু নেই। বরং—'

'বরং কী?'

'এতকাল জেলেরা যা আদায় করতে পারছিল না, আমার জন্য তা সম্ভব হয়েছে। আমার তো মনে হয় ন্যায়ের কাজই করছি। সেজন্যে মনে মনে গর্বও বোধ করি।'

জমায়েতটা মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেল। এত তোষামোদ এত প্রলোভনের পরিণতি যে এমন হবে, ভাবতেও পারে নি। আকস্মিক নৈঃশব্দের পর সবাই এক সঙ্গে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল, 'শালা হারামী ন্যায়ের বোনাই এসেছে।'

গালাগালটা ডানিয়েলকে উত্তেজিত করতে পারল না, সে কৌতুকই অনুভব করতে লাগল আর ঠোঁট টিপে আগের মত মিটি মিটি হাসতে লাগল।

দামোদর বলল, 'ঐ তা হলে তোমার শেষ কথা সাহেব? ওজন লেখা ছাড়বে না?'

ডানিয়েল লক্ষ্য করল, 'আপনি'র বদলে 'তুমি' বলছে দামোদর। এই সম্বোধনটা কিসের প্রকাশ তা বুঝতে অসুবিধে হবার কথা নয়। বলল, 'কী করে ছাড়ি, বল।'

তড়াক করে উঠে দাঁড়াল দামোদর। অনুচরদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'চল হে সব, চল। ঝাড়া দুটো দিন শালার পেছনে নষ্ট হল।'

দলবল আর বসল না। সেনাপতিকে অনুসরণ করে বাইরে বেরিয়ে গেল। খানিকটা গিয়ে কোমরের কষি বাঁধতে বাঁধতে আবার ফিরে এল দামোদর। রোমশ কালো একটা আঙুল তুলে আরক্ত চোখে শাসাল, 'খুব খারাপ করলে সাহেব, নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল ঝাড়লে। এর পর আমাদের আর দোষ দিতে পারবে না।' বলেই ফিরে যাবার জন্য আবার ঘুরল।

মুহূর্তের জন্য ডানিয়েলের ভাবনায় ভয়ের ছায়া পড়ল। এই অচেনা দেশ, প্রায় অপরিচিত আড়তদারের দল, তাদের স্বার্থে আঘাত হানার জন্য কতখানি প্রতিক্রিয়া হতে পারে বোঝা যাচ্ছে না। তবে এটুকু টের পাওয়া যাচ্ছে এমনি এমনি ওরা ছাড়বে না, সাঙ্ঘাতিক কিছু একটা ঘটাবেই।

মনে মনে কিছুটা দমে গেলেও নিজের স্বভাবটা বিস্মৃত হয় না ডানিয়েল। গলা তুলে ডাকল, 'ও হে আড়তদার—'

পুরোপুরি ফিরল না দামোদর। ঘাড়ের কাছ থেকে মাথাটা ঘুরিয়ে আরক্ত নিষ্পলক চোখে তাকাল।

ডানিয়েল বলল, 'তা হলে কথাটা কি হল? চান্দায় কি মান্দবিতে আমাকে কবে নিয়ে যাচ্ছ?'

দামোদর উত্তর দিল না। ঠোঁটের প্রান্তে ভারী মাংস বারকয়েক কোঁচকাল, চোখ দুটো আরেকটু রক্তাভ হল। গলার মধ্য থেকে একটা জান্তব শব্দ বার করে হন হন করে চলে গেল সে।

নাঃ, লোকগুলো বেজায় চটেছে। ডানিয়েল ভাবল, বিষণ নায়েকের আড়তে বসে থাকার অধিকার আর তার নেই। সেও বাইরের বালুকাবেলায় বেরিয়ে গেল।

সেদিন রাত্রে জেলেদের সঙ্গে মনপুরায় ফিরতে ফিরতে ডানিয়েল একবার স্থির করল, আড়তদারদের শাসানির কথাটা সুভদ্রাকে জানিয়ে দেবে। পরক্ষণেই সিদ্ধান্তটা নাকচ করে ফেলল সে। ভাবল, ক'টা দিন দেখাই যাক। সত্যিই যদি আড়তদারদের দিক থেকে ভয়ানক কিছুর সম্ভাবনা দেখা দেয় তখন না হয় সুভদ্রাকেজানানো যাবে।

যা ভাবা গিয়েছিল তা কিন্তু হল না। আড়তদারদের দিক থেকে আক্রমণের সম্ভাবনাটাই ছিল বেশি। আক্রমণ তারা করল বটে তবে লাঠি-সোটা-বল্লম-বর্শা দিয়ে নয়, মুখের কথায়। তাকে দেখলেই তারা চেঁচিয়ে ওঠে, 'ঐ যে শালা ধম্মরাজ চলেছে।'

কেউ বলে, 'ধম্মরাজ নয় রে, ধম্মের বেয়াই।'

কেউ বলে, 'হারামজাদা জেলেদের গোলাম হয়ে সাহেবকুলের মুখে ছাই তুলে দিচ্ছে।'

কেউ কেউ আবার দূর থেকেই মন্তব্য ছুঁড়ে মারে না। হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকে। ডানিয়েল এলে বেশ খাতির করে বসায়, চুট্টা কি পান এগিয়ে দেয়। ডানিয়েল অবশ্য সে সব নেয় না। শুধু বলে, 'কি বলছিলে বল।'

গলায় খাকারি দিয়ে লোকটা বলে, 'কানাঘুষো একটা কথা শুনছি।'

'কী কথা?'

খুব ঘনিষ্ঠ ভঙ্গিতে মুখটা এবার ডানিয়েলের কানে গুঁজে দেয় লোকটা, 'তুমি নাকি আমাদের জামাই হতে চলেছ?'

'জামাই।'

'হ্যাঁ গো, হ্যাঁ—'

'কী বলতে চাও, পরিষ্কার করে বল।'

চোখের একটি ভঙ্গি করে লোকটা বলে, 'তুমি যেন কিছুই জানো না। ন্যাকা—'

ডানিয়েল তাকিয়ে রইল।

লোকটা আবার বলল, 'পরের মুখ থেকে শুনতে বুঝি মিষ্টি লাগে? বেশ, তা হলে শুনে সাধ মেটাও।' বলে ও চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ চাপা গলায় শুরু করল, 'তুমি নাকি, তুমি নাকি—'

তুমি নাকি, তুমি নাকি, করে অনেকটা সময় কাটিয়ে দিল লোকটা, আসল কথা কিন্তু কিছুই বলল না।

বিরক্ত মুখে ডানিয়েল জিজ্ঞেস করল, 'আমি কী?'

গলার ভেতর খুক খুক করে লোকটা হাসল, 'ঐ খেস্তানীকে (খ্রিস্টানী) বিয়ে করছ? দিন তারিখ নাকি ঠিক হয়ে গেছে?'

ডানিয়েল উচ্চকিত। কাঁপা সুরে জানতে চাইল, 'খেস্তানী! কার কথা বলছ?'

'ঐ যে গো সুভদ্রা—গীজ্জেতে থাকে।'

মাথার ভেতর একটা শির যেন পট করে ছিঁড়ে গেল। উত্তেজিত ভাবে লোকটার একটা হাত চেপে ধরে ডানিয়েল বলল, 'কে বলেছে এসব কথা? তার নাম বল। জিভ টেনে আমি ছিঁড়ে ফেলব।'

'ক'টা জিভ ছিঁড়বে বল—'

'তার মানে?'

'এখানকার সব্বাই ঐ কথা বলাবলি করছে। আমাকে যদি বিশ্বাস না হয় আড়তে আড়তে গিয়ে জিজ্ঞেস করে দ্যাখ।'

ডানিয়েল নিশ্চুপ।

লোকটা আবার বলল, 'তা হ্যাঁ গো সাহেব, খেস্তানী হোক আর যাই হোক, আমাদের দেশেরই তো মেয়ে। তাকে যখন বিয়ে করছ তখন আমাদের জামাই হয়ে যাবে। আমরা ঠিক করেছি এখন থেকে তোমাকে জামাই বলেই ডাকব।'

হঠাৎ মাথার ভেতর কিছু ঘটে গেল ডানিয়েলের। দপ করে আগুনই ধরল বুঝি। সঙ্গে সঙ্গে গলায় শরীরের সবটুকু শক্তি ঢেলে দিয়ে সে চিৎকার করে উঠল, 'শাট আপ, শাট আপ—ইউ সোয়াইন। সান অব বীচ, দেবীর মত একটা মেয়ের সম্বন্ধে বাজে কথা বলতে তোর জিভে আটকায় না! নোংরা কুকুর।'

ডানিয়েলের কথার ইংরেজি অংশগুলি না বুঝলেও লোকটা টের পেল সাহেব খুব রেগে গেছে। খানিকটা ভয়ই পেল সে। ভীত সুরে কুঁই কুঁই করে এবার কি বলল, বোঝা গেল না।

ডানিয়েল আর বসল না, ফি দিয়ে বাইরে চলে এল।

সেদিন ধমকে চিৎকার করে একটা লোকেরই মুখ বন্ধ করা গিয়েছিল কিন্তু সারা আড়তদার পাড়াকে থামিয়ে রাখা অসম্ভব। তাকে দেখামাত্র সরাসরি কেউ কিছু বলে না। একজন আরেকজনকে শুনিয়ে বলে, 'নবরা (নতুন বর) চলেছে।'

দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথমকে বলে, 'তোর ভগ্নিপতি রে—' প্রথম জন বলে. 'আমার হবে কেন, তোর।' ইতিমধ্যে তৃতীয় আরেকজন জুটে যায়। সে বলে, 'বেশ বেশ, তোদের যখন এত আপত্তি ও শালা আমারই বোনাই হোক।'

একজন আরেকজনকে বলে কিন্তু লক্ষ্যভেদটা ঠিকই হয়ে যায়। ডানিয়েলের একেক বার ইচ্ছা হয়, ধরে ধরে সবগুলোর মুখ বালিতে ঘষে দেয়।

তাকে যা খুশি বলুক কিন্তু তার সঙ্গে গীর্জাবাসিনী নিষ্পাপ মেয়েটাকে জড়িয়ে যে সব রটনা চলেছে তা যেমন কুৎসিত তেমনি মর্মান্তিক। ডানিয়েল রোজই ভাবে, এ সব কথা সুভদ্রাকে জানিয়ে দেবে। কিন্তু জানাতে গিয়ে দেখেছে তার স্বর আটকে গেছে। ডানিয়েল নিজে খোলামেলা মানুষ, কোন কিছুই গোপন রাখতে জানে না। প্রাণে যদি কখনও ঢেউ ওঠে, চেপে রাখতে পারে না, সব কথা বলে মুক্ত হতেই সে ভালবাসে। কিন্তু সুভদ্রার সামনে ঐ নোংরা প্রসঙ্গটা কিছুতেই উচ্চারণ করতে পারে নি।

তবে আরেকটা দিকও সে ভেবে দেখেছে, এখানকার আড়তদারেরা তাদের চিরন্তন স্বার্থে আঘাত পড়ায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু এরা ভীরু কাপুরুষ। নইলে তাকে মারধোর করে হাত-পা ভেঙে দিয়ে প্রতিহিংসা মিটিয়ে নিত। কিন্তু তার বদলে কুৎসার অস্ত্রটাই হাতে তুলে নিয়েছে। এই নির্বীর্য ভীরু লোকগুলোর প্রতি হঠাৎ যেন করুণাই বোধ করে ডানিয়েল।

দিনকয়েক এভাবে চলার পর ডানিয়েলও তার প্রতিহিংসা মিটিয়ে নিল। মনপুরা গ্রামের জেলেরা ছাড়াও এ অঞ্চলের যত মাছমারা ছিল তাদের সবাইকে নিয়ে আড়তে আড়তে হানা দিয়ে ওজন লেখার ব্যবস্থাটা পাকা করে ফেলল। ফলে তার নিজেরই দায়িত্ব এবং পরিশ্রম বেড়ে গেল দশগুণ। শুধু বিষণ নায়েকের আড়তেই নয়, নিরক্ষর জেলেদের জন্য সব আড়তেই ওজন লিখতে তাকে যেতে হচ্ছে। এবং সমস্ত কাজ চুকিয়ে মনপুরায় ফিরে আসতে আসতে মাঝরাত পার হয়ে যাচ্ছে।

আজকাল আর সুভদ্রার স্কুলে পড়তে যায় না ডানিয়েল। প্রায়ই রাত থাকতে থাকতে জেলেদের সঙ্গে সমুদ্রে বেরিয়ে পড়ে। ডানিয়েল সাগর-প্রেমিক হয়ে উঠেছে।

অন্য পড়ুয়ারা তাকে পায় না, সে জন্য তাদের নিদারুণ ক্ষোভ। দেখা হলেই বলে, 'ও সাহেব, তুমি আর স্কুলে আস না কেন?'

ডানিয়েল বলে, 'শুধু শুধু গিয়ে কি করব?'

'শুধু শুধু কেন, পড়তে আসবে।'

'আমার পড়াশোনা হবে না, বুঝলি। মাথায় আমার একেবারে পচা রাবিশ পোরা। ইস্কুলে গিয়ে কি করব, বল।' হাত পা নেড়ে হতাশ একটা মুখভঙ্গি করে ডানিয়েল।

বালখিল্যের দল চেঁচামেচি বাধিয়ে দেয়, 'না-না, তোমাকে ইস্কুলে আসতে হবে সাহেব। নইলে আমাদের ভাল লাগে না।'

ডানিয়েল হাসতে থাকে। কারো মাথায় টুক করে একটা টোকা দিয়ে, কারো গালটা টিপে ধরে, কারো চুল এলোমেলো করে দিয়ে বলে, 'আচ্ছা, দেখি।'

ছেলেমেয়েগুলো আবার চিৎকার করে ওঠে, 'না না, কোন কথা শুনব না। তোমাকে আসতে হবে, আসতেই হবে।'

মনপুরাবাসিনীদের প্রাণেও কম আক্ষেপ আর ক্ষোভ জমে নেই। যে বিদেশী আগন্তুক দমকা সমুদ্র বাতাসের মত অতর্কিতে হানা দিয়ে তাদের ঝালাপালা করে তুলত তাকে আজকাল আর পাওয়া যায় না। ডানিয়েল-হীন দুপুরগুলো ইদানীং একেবারে আলুনি হয়ে উঠেছে। অবকাশের মুহূর্তগুলি আগের মত আর লোভনীয় মনে হয় না। সবার প্রাণ কেড়ে নিয়ে বিদেশী ছেলেটা দূরে সরে গেছে। দেখা হলেই মনপুরাবাসিনীরা ঘিরে ধরে, 'কি গো সাহেব, আজকাল যে বড্ড উড়ু, উড়ু!'

ডানিয়েল হাসে।

মেয়েমানুষেরা বলে, 'হাসি না, আজকাল থাকো কোথায়? আর কোথাও মজা জুটিয়ে ফেলেছ নাকি?' বলে চোখ মটকে হেসে ওঠে।

ডানিয়েল বলে, 'মজা তো কত। তোমাদের মরদদের সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে দিন কাবার হয়ে যাচ্ছে।' ইদানীং এখানকার কথা বলার ভঙ্গি আঞ্চলিক ইডিয়ম—সব আয়ত্ত করে ফেলেছে ডানিয়েল।

চোখের তারা নাচিয়ে নারীবাহিনী সমস্বরে বলতে থাকে, 'আমাদের চাইতে মরদদের গায়ের গন্ধ বুঝি বেশি ভাল লাগছে! তুমি কি ব্যাটাছেলে গো!'

এসব কথার যোগ্য প্রত্যুত্তর কি হতে পারে ডানিয়েলের জানা নেই। অপ্রতিভের মত সে হাসে শুধু।

এরপর মেয়েমানুষেরা আরো যা সব বলে তা প্রায় আদিরসের প্রান্ত-ঘেঁষা রগড়। ঠাট্টায় ঠাট্টায় ডানিয়েলকে একবারে নাজেহাল করে তোলে তারা। যে যুবক সুরসিকা মেয়েমানুষদের সঙ্গ বর্জন করে রসকষহীন পুরুষদের পিছু পিছু ঘুরতে শুরু করেছে, মনপুরাবাসিনীদের মতে, তার আর কিছু অবশিষ্ট নেই, একেবারে গোল্লায় গেছে সে।

ভোরবেলা জেলেদের সঙ্গে সমুদ্রে এসে ডানিয়েল রোজই দেখে অসংখ্য নৌকো সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তখনও আকাশের গা থেকে অন্ধকার একেবারে বিলীন হয়ে যায় না। দিগন্ত যেখানে ধনুরেখায় সমুদ্রে মিশেছে, সেখানটা গাঢ় কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকে। কুয়াশা আর অন্ধকারে বোনা একটা বিচিত্র পর্দা আরবসাগরকে রহস্যময় করে রাখে।

মাছমারারা এসে এক মুহূর্তও দাঁড়ায় না। যার যার নির্দিষ্ট নৌকোয় উঠে পাল খাটিয়ে নিদ্রিত সমুদ্রের ঘুম ভাঙিয়ে দূরে ভেসে যায়।

সমুদ্রগামী নৌকোগুলো খানিকটা যেতে না যেতেই রোদ উঠে যায়। আরবসাগরের কালো জলে প্রথমে সোনার একটি রেখা ঝিকমিকিয়ে ওঠে। দেখতে দেখতে সেই স্বর্ণচ্ছটা আলোর ঢল হয়ে অজস্র ধারায় চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

বেলাভূমি থেকে নৌকোগুলো যখন যাত্রা শুরু করে তখন মনে হয় এক ঝাঁক জলচর হাঁস চলেছে।

জেলেরা সমুদ্রকে কয়েকটি অংশে ভাগ করে নিয়েছে। প্রথমে পারের কাছে অসমান-দোলানো ঢেউ, তারপর চোরাবানের স্রোত। স্রোত পেরিয়ে সাগর আবার উতলা। উথল পাথল সেই ঢেউ পার হয়ে যেখানে পৌঁছুনো যায় সমুদ্রের সেই অংশটা আশ্চর্য শান্ত, সেখানে মীনকুলের বসতি। জেলেদের গন্তব্য সেইখানে। অবশ্য সেই শান্ত জায়গাটিতে সব মাছ থাকে না, অশান্ত অশ্রান্ত ঢেউয়ের মধ্যেও মৎস্যকুলের কেউ কেউ বসতি করতে ভালবাসে। মৎস্যজীবীদের ভেতর যারা দুঃসাহসী তারা সেখানেই জাল ফেলে।

যাইহোক পার থেকে কিছুদূর যাবার পর নৌকোগুলো পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দূরে দূরে ছড়িয়ে পড়ে এবং রোদ উঠতেই জেলেরা সমুদ্রে জাল নামিয়ে দেয়। সেই যে জাল নামে, তুলতে তুলতে দিনের আয়ু শেষ। আরবসাগরের কালো জলে সূর্য তখন ডুবতে শুরু করেছে।

সেই ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অর্থাৎ সূর্যোদয় আর সূর্যাস্ত দিয়ে ঘেরা যে দিন, সেটা সমুদ্রেই কেটে যায় জেলেদের। সমুদ্রই তাদের জীবন-মরণ, তাদের সব কিছু। তাদের অস্তিত্ব ঘিরে শুধু অথৈ অনন্ত জলরাশি, অর্থাৎ এই সুবিপুল সমুদ্র যার নাম আরবসাগর।

ভোরবেলা ঘর থেকে বেরুবার সময় এনামেলের হাঁড়িতে পান্তাভাত, আমতি, পর্যাপ্ত পরিমাণে কাঁচালঙ্কা আর পেঁয়াজ নিয়ে আসে মাছমারারা। দুপুরবেলা ফাঁক বুঝে একসময় বালতিতে জল তুলে স্নান সেরে সেই ভাত-ডাল খেয়ে নেয়। যাদের

প্রাণে অপরিমিত সাহস তারা নৌকো থেকে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে স্নান সারে। খাওয়া-দাওয়ার পর আয়েস করে কিছুক্ষণ চুট্টা ফোঁকা। তারপর পারে ফিরে আসা পর্যন্ত একটানা মাছ ধরা চলে। অবশেষে আড়তে মাছ জমা দিয়ে গ্রামে ফিরতে কোনোদিন রাতের দ্বিতীয় যাম পার হয়ে যায়, কোনোদিন বা তৃতীয় প্রহর। সংক্ষেপে এ-ই হচ্ছে তাদের জীবন।

সমুদ্রের সঙ্গে এই উদয়াস্ত সংগ্রামের মধ্যে কেউ ডানিয়েলকে ডেকে নিয়ে যায় নি। নিজের ইচ্ছায় সে ছুটে গেছে। তার প্রকৃতির মধ্যে যে উদ্দামতা রয়েছে সেটাই যেন ঝড়ের মুখে তাকে ছুঁড়ে দিয়ে দুরন্ত বেগে সমুদ্রের দিকে উড়িয়ে নিয়ে গেছে। তা ছাড়া সমুদ্রের স্বভাবের সঙ্গেও তার কিছু মিল আছে। কাজেই আরবসাগর দু-একবার যেতে না যেতেই তাকে সম্মোহিত করে ফেলেছে।

সমুদ্রে যাতায়াত করতে করতে মাছমারাদের সংগ্রামটাই শুধু দেখছে না ডানিয়েল। তাদের জীবনের অনেক অজানা খবরও পেয়েছে।

যে নৌকোগুলোয় চেপে তারা সমুদ্রে যায় সেগুলো জেলেদের নয়। নৌকো, পাল, বৈঠা, হাল—সব কিছুই আড়তদারদের সম্পত্তি। জালগুলোও আড়তদারদের সঙ্গে চুক্তি আছে, নৌকো এবং জাল ব্যবহারের জন্য জেলেদের ভাড়া দিতে হবে। ভাড়া তারা পয়সায় দেয় না, সে জন্য প্রত্যেককে পাঁচদিনের ধরা মাছ দিতে হয়। তা ছাড়া নৌকো বা জাল জখম হলে তা মেরামত করে নেবার দায়িত্ব জেলেদের। এ নিয়ম দু-চারদিনের নয়, বংশানুক্রমিক চলে আসছে। জেলেরা যেমন পুরুষানুক্রমে মৎস্যজীবী, আড়তদারেরাও তেমনি বংশ পরম্পরায় আড়তদার। আশ্চর্য! পুরুষের পর পুরুষ আসছে, যুগের পর যুগ চলে যাচ্ছে কিন্তু এ নিয়ম থেকে কোঙ্কন উপকূলের মাছমারাদের বুঝি মুক্তি নেই। আড়তদারেরা জোট বেঁধে যদি নৌকো না দেয়, তাদের জীবিকা বন্ধ হয়ে যাবে।

আড়তদারদের কাছে এদের জীবনের সর্বস্বত্ব বিকিয়ে দেওয়া রয়েছে। পাঁচদিনের মাছ নৌকো এবং জালভাড়া বাবদ দেবার পর অবশিষ্ট পঁচিশ দিনের মাছ বাবদ যে দাম মেলে তাতে সংসার চলে না। কাজেই ঋণের জন্য আড়তদারদের কাছেই হাত পাততে হয়। সে ঋণ আর শোধ হয় না। পুরুষানুক্রমে তা সুদে সুদে পাহাড় প্রমাণ হতে থাকে। বাপ ছেলের হাতে ঋণের উত্তরাধিকার দিয়ে একদিন মরে যায়। ডানিয়েল ভাবে জেলেদের জন্য কিছু একটা করা যায় কিনা যাতে তারা স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পারে, যাতে তাদের পরনির্ভরতা ঘুচে যায়। চিরাচরিত ধারা থেকে বেরিয়ে আসতে পারলে তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়বে। এমন হতাশ, দীন অবস্থা থেকে তখনই তাদের পক্ষে একটু ভদ্র রকমের জীবনযাত্রায় উঠে আসা সম্ভব। শুধুমাত্র মাছের ওজন লিখে নেওয়াই যথেষ্ট বা পর্যাপ্ত নয়। আরো কিছু করতে হবে। কিন্তু কী-ই বা করা সম্ভব? ভেবে ভেবে থৈ পায় না ডানিয়েল। আর পায় না বলে ভেতরে ভেতরে অস্থির হয়ে ওঠে।

প্রতি পাঁচজন মাছমারার জন্য একটা করে নৌকো ঠিক করা আছে। নির্দিষ্ট নৌকোটিতে তাদের উঠতেই হবে। ডানিয়েলের কিন্তু কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। ইচ্ছেমত একেক দিন একেক নৌকোয় গিয়ে ওঠে সে।

সুশীল সুবোধ বালকটির মত হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা তার স্বভাব নয়। কাজেই জেলেদের হাত থেকে জাল কেড়ে নিয়ে সমুদ্রে ফেলেও থাকে। ইতিমধ্যে চুট্টা ফোঁকাতেও ওস্তাদ হয়ে উঠেছে। একদা কোলাপুরের ট্রেনে বসে চুট্টার ধোঁয়ায় তার শ্বাসনালী ফেটে যাবার উপক্রম হয়েছিল। মনে হয়েছিল একটা গ্যাসমাস্ক পরে ট্রেনের কামরায় উঠতে তার ভুল হয়ে গেছে। সেই মানুষ আজকাল চুট্টা মুখে নৌকায় ওঠে। নামবার সময়ও দেখা যায়, দাঁতের ফাঁকে চুট্টা ধরা রয়েছে। সর্বক্ষণ নাক মুখ দিয়ে গলগল করে ধোঁয়া ছাড়ে সে।

মনপুরা গ্রামের দক্ষিণ দুয়ার আগলে যে বুড়ো দুটো সবসময় বসে থাকে তারা মূল্যবান একটি উপদেশ দিয়েছিল, এই নোনা দেশে উগ্র তামাক ছাড়া বাঁচবার উপায় নেই। ওটি না হলে শরীর নাকি হেজে যাবে। সেদিন কথাটা মনে-প্রাণে মেনে নিতে পারে নি ডানিয়েল। এখন অবশ্য সেই মহাজন বাক্যটিকে জীবনের সারাৎসার করে নিয়েছে।

প্রথম প্রথম একটা মাছও ধরতে পারত না ডানিয়েল। সমুদ্রের অতলে যেখানে মীনকুলের বসতি, কিভাবে সেখানে জালের ফাঁদ পাততে হয় সে কৌশল ছিল তার অনায়ত্ত। ধীরে ধীরে শিক্ষিত অভিজ্ঞ জেলের মত মাছ ধরায়, জাল ফেলায় পটু হয়ে উঠতে লাগল। আর এ ব্যাপারে পটুত্ব যত বাড়তে লাগল ততই তাকে নিয়ে জেলেদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। সবাই তাকে নিজের নিজের নৌকোয় পেতে চায়।

মাছ ধরতে গিয়ে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছে ডানিয়েল। জেলেনৌকোগুলো কাছাকাছি থেকে জাল ফেলে না। যে স্রোতে মাছের বাস সেখানে এসে দূরে দূরে ছড়িয়ে পড়ে। অবশ্য এত দূরে যায় না যাতে ডাকলে সাড়া পাওয়া যাবে না।

কিছুক্ষণ মাছ ধরার পর দূরবর্তী নৌকোগুলো থেকে হাওয়ার তরঙ্গে ডাক ভেসে আসে, 'আজ কেমন পড়ছে রে বলবন্ত?'

কোনোদিন প্রসন্ন প্রত্যুত্তর শোনা যায়, 'খুব ভাল। গণপতি আজ মুখ তুলে চেয়েছে। তোমার?'

'আমারও ভালই পড়ছে।'

'কী মাছ?'

'সুরমাই, পমফ্রেট আর তারিণী।'

কোনদিন বা বিমর্ষ কণ্ঠস্বর শোনা যায়, 'আজ গণপতি শিবজী মুখ ফিরিয়ে আছে। সারাদিন জাল ফেলে মাত্তর দু গণ্ডা লাল ভেটকি পেয়েছি।'

এবার যে উত্তরটা আসে সেটা বিমর্ষতর, 'তুই তো তবু দু গণ্ডা পেয়েছিস, আমার জালে মোট দুটো তারিণী পড়েছে।'

সমুদ্রের দূরবিস্তৃত পটভূমি জুড়ে জেলেদের কণ্ঠস্বর বাতাসের তরঙ্গে দোল খেতে থাকে। প্রতিধ্বনিত হবার কোন সুযোগ নেই। সমতল জলের ওপর দিয়ে তো শুধু বাধাবন্ধহীন ছুটে যায় দিগন্তের দিকে।

জেলেদের নৌকোয় উঠে সারাক্ষণ মাছই ধরে না ডানিয়েল। সমুদ্রের অতল থেকে অদৃশ্যচারী রূপালী ফসল তুলে আনার মধ্যে অবশ্যই উত্তেজনা রয়েছে, আমোদ আছে, আনন্দও। কিন্তু সেটুকুতেই মগ্ন হয়ে থাকে না ডানিয়েল। •

সে লক্ষ্য করেছে এত যে দারিদ্র্য, এত যে সংগ্রাম, প্রাণধারণের জন্য এত যে দুর্ভাবনা, তবু কোঙ্কন উপকূলের এই মাছমারাদের প্রাণ থেকে রসের উৎসটা একেবারে বুঝি শুকিয়ে যায় নি। বেলাভূমিতে যখন ফিরে আসে তখন দুর্ভাবনায় তারা বিষণ্ণ, ক্লান্ত, হতাশ। কিন্তু সমুদ্রে এসেই তাদের সম্পূর্ণ বিপরীত রূপ। মুহূর্তে জীবন যাপনের সমস্ত গ্লানি তারা বুঝি বিস্মৃত হয়ে যায়।

মাছমারাদের মধ্যে একটা গান প্রচলিত আছে। সেটা অত্যন্ত জনপ্রিয়। কিছুক্ষণ জাল ফেলার পর ঘোরের মধ্যে সেটা কেউ গেয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে আরেকজন তার একটি কলি গলায় তুলে নেয়, তারপর আরেকজন। এইভাবে আরবসাগরের এই প্রান্তটা জুড়ে গানটা ছড়িয়ে যেতে থাকে।

গানটা এ অঞ্চলের লোকসঙ্গীত। সুরের মধ্যে কোথাও আড়ম্বর নেই, বাজনার প্রয়োজন নেই। তবু কোথায় যেন একটা সরল উদার সৌন্দর্য রয়েছে। চারপাশের অনাবরণ প্রকৃতির মত, এই সমুদ্র, মাথার ওপর অনাদি অশেষ আকাশ, পশ্চিমের ভাসমান মেঘ অথবা ফোয়ারার মত উচ্ছ্বসিত অকৃপণ রোদ—এ সবের সঙ্গে গানটার আশ্চর্য মিল আছে। জেলেরা যখন গাইতে থাকে তখন অবারিত এই পটভূমির সঙ্গে তা যেন একাকার হয়ে মিশে যায়।

গানটার সারার্থ জেনে নিয়েছে ডানিয়েল। তা এইরকম ঃ বন্ধু তুমি কোথায় আছ জানি না। তবে আছ যে তা বুঝতে পারি। সমুদ্রের এই গোলকধাঁধায় সারা জীবন অবিরাম ঘুরে মরছি। তা থেকে কবে যে মুক্তি পাব জানি না। চিরতরে চোখ বুজবার আগে তোমার দেখা যদি মুহূর্তের জন্যও পাই, আমি ধন্য হয়ে যাব।

প্রথম প্রথম কান পেতে গানটা শুনত ডানিয়েল, মর্ম বোঝার চেষ্টা করত। তারপর সবার সঙ্গে একদিন গলাও মিলিয়ে দিল।

সবার নৌকোতেই যায় ডানিয়েল। এ ব্যাপারে তার বিশেষ পক্ষপাতিত্ব নেই। তবু যদি পছন্দ অপছন্দের সূক্ষ্ম প্রশ্ন কেউ তোলে তা হলে বলতে হবে বুড়ো শিবরামের সঙ্গী হতেই সে বেশি ভালবাসে।

শিবরাম মাছমারাদের মধ্যে সব চাইতে বয়স্ক, প্রবীণতম। তার বয়স যে কত, কেউ জানে না। এমন কি শিবরামের নিজের পক্ষেও তা এক জটিল রহস্য। জিজ্ঞেস করলে কোনদিন নিজের বয়স সে বলে চার কুড়ি আর আট মাস, কোনদিন বলে তিন কুড়ি দশ আর সাড়ে তিন মাস, কোনদিন বলে পাঁচকুড়ির চাইতে চার মাস সাত দিন কম। দিন মাসের কথা শুনলে মনে হবে প্রতিদিন নিজের বয়সটা একবার করে হিসেব করে নেয় শিবরাম। অথচ আজ যে বয়সের হিসেব সে দেয় তার সঙ্গে কালকের বয়সের তফাৎ হয়ত পাঁচ সাত বছর, পরশুর বয়সের সঙ্গে পার্থক্য এক যুগের ওপর।

শিবরাম যা-ই বলুক তার বয়স কমপক্ষে এক শতাব্দীর কাছাকাছি। যে নৌকোটায় করে সে মাছ ধরে তার পালটা বহুকালের পুরনো, তালিতে তালিতে চিত্র বিচিত্র। পালটার আদি রং কি ছিল বুঝবার উপায় নেই। জরাজীর্ণ ঐ পালটা শিবরামের জীবনের প্রতীক যেন, ওটার সঙ্গে তার অদ্ভুত মিল রয়েছে। ওটার মতই আরব সাগরের নোনা হাওয়ার আঘাতে আঘাতে শিবরাম ক্ষতবিক্ষত। সমুদ্রের সঙ্গে অবিরত যুদ্ধে তার হাত-পা হেজে গেছে, চামড়ায় ক্ষয় ধরেছে। কাঁটার মত মাথায় খাড়া খাড়া ধারাল চুল, মুখময় দাড়ি গোঁফ। বয়সের দিক থেকে দাড়ি গোঁফ বা চুলের রং সাদা হওয়া উচিত ছিল কিন্তু সমুদ্রে থাকার জন্যই সেগুলো পাঁশুটে। গায়ের চামড়া শ্লেটের মত কালো, তাতে মসৃণতার চিহ্নমাত্র নেই। বরং অসংখ্য রেখা এবং ভাঁজে তা কুঞ্চিত। চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে, হাত-পায়ের নখ ভাঙা ভাঙা। পিঠটা ধনুরেখায় বেঁকে গেছে।

এমনিতেই মাছমারাদের পরনে সামান্য একটা করে ধুতি থাকে, শিবরামের আচ্ছাদনটা সে তুলনায় আরো সংক্ষিপ্ত। একটা কুটকুটে নোংরা নেংটিতে এসে তা ঠেকেছে।

লোকটার চোখেমুখে, হাতে-পায়ে, সর্বাঙ্গে বহুযুগের অভিজ্ঞতা গভীর রেখায় আঁকা রয়েছে যেন। যে কোনো একটি রেখার সংকেত পাঠ করতে পারলে অতি বিচিত্র এক জীবনের বিচিত্রতর কথা জানা যাবে।

শিবরাম এ অঞ্চলের মানুষ না, কোথাকার কেউ জানে না। তাকে জিজ্ঞেস করলে কখনও বলে তার বাড়ি সাবন্তবাদী, কখনও বলে রত্নগিরি, কখনও বা বলে সুদূর চান্দা জেলায়।

কেউ যদি তার ভুল ধরিয়ে দিয়ে বলে, 'কি গো তাউই, একেকদিন যে একেকরকম বলছ! কোনোদিন বলছ এখানে, কোনোদিন বলছ ওখানে। ব্যাপারটা কী?' যেন রোদ ঠেকোচ্ছে এমনভাবে চোখের ওপর একখানা হাত রেখে ভ্রূ কুঁচকে শিবরাম বলে, 'একেকদিন একেক রকম বলছি নাকি?' ঐভাবে চোখের ওপর হাত রাখা তার অভ্যাস।

'তাই তো মনে হয়।'

শিবরাম বলে, 'আচ্ছা, তাহলে আমাকে একটু ভাবতে দাও।' কিন্তু অনেক ভেবেও সমস্যাটার সন্তোষজনক সমাধান হয় না। চিন্তিত বিব্রত মুখে শিবরাম আবার বলে, 'তাই তো, কোত্থেকে যে এসেছিলাম, কিছুতেই মনে করতে পারছি না।'

মোট কথা, বয়সটার মত সুদূর অতীতে মহারাষ্ট্রেব কোন প্রান্ত থেকে কবে কখন এই কোঙ্কন উপকূলে এসে পড়েছিল, আজ আর তা মনে নেই শিবরামের। ঘর-বাড়ি-বয়স এবং অতীতের সমস্ত কিছুই সময়ের কুয়াশায় একেবারে বিলীন হয়ে গেছে।

জগতে সে একেবারে একা, নিঃসঙ্গ। পৃথিবীতে দীর্ঘকাল টিকে থেকেও নিজের স্থায়ী একটা ঠিকানা করে নেয় নি শিবরাম। মনপুরাবাসীরা অথবা এ অঞ্চলের অন্য মাছমারারা রাতের দ্বিতীয় প্রহরে ক্লান্ত দেহে, জড়িত শিথিল পায়ে নিজের নিজের ঘরে ফিরে যায় কিন্তু তেমন কোনো নির্দিষ্ট আশ্রয় শিবরামের নেই। রাত্রিবেলা নিজের নৌকোটিতে চাট্টি খেয়ে গুটিসুটি মেরে শুয়ে থাকে সে। পরের দিন সকালে আবার সমুদ্রের সঙ্গে সংগ্রাম শুরু করে।

নিজের ঘর-সংসার নেই, রান্নাবান্নার ঝামেলাও রাখে নি শিবরাম, মাছের আড়তেও সে যায় না। প্রতিদিন তার জালে যত রূপালী ফসল ওঠে সবই সে অন্যকে বিলিয়ে দেয়। তবে এক শর্তে। যে মাছ নেবে তাকে শিবরামের দু বেলার খোরাক দিতে হবে। প্রত্যেকেই এতে রাজী। কেননা শিবরাম দু বেলায় যা খায় সে তুলনায় যে মাছ দেয় তার দাম অনেক বেশি। কাজেই মাছমারাদের মধ্যে শিবরামের প্রচণ্ড খাতির, তাকে খুশি করার জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে যায় যেন। শিবরামকে যে খুশি করতে পারবে সে-ই লাভবান হবে। কাজেই ফেউয়ের মত সকলে তার পেছনে লেগে থাকে।

কিন্তু তোষামোদে টলবার লোক নয় শিবরাম। কারো প্রতিই তার পক্ষপাতিত্ব নেই। নির্দিষ্ট কোনো একজনকেই প্রতিদিন সে মাছ দেয় না, একেক দিন একক জনকে দিয়ে থাকে। এতে কারো রুষ্ট হবার কথা নয়।

সারাদিন সমুদ্রে থাকে শিবরাম, রাতও তার সেখানেই কাটে। সমুদ্রকে বাদ দিয়ে তাকে ভাবা যায় না।

এই নিস্পৃহ, উদাসীন, গৃহবিমুখ মানুষটি ডানিয়েলকে প্রায় কুহকিত করে ফেলেছে। মাছ ধরার ফাঁকে ফাঁকে শিবরামের জীবন সম্পর্কে নানা খুঁটিনাটি প্রশ্ন করে সে। কোনদিন বলে, 'অনেক দিন হয়ে গেল এখানে এসেছ, তাই না?'

নিরুৎসুক মুখে শিবরাম জবাব দেয়, 'হ্যাঁ।'

'এখানে আসার পর দেশে আর ফিরেছ?'

'যদ্দুর মনে হচ্ছে ফিরি নি।'

'দেশে কেউ আছে?'

'আছে বোধ হয়।'

'কে?'

'অত জানি না। কবে দেশ ছেড়ে এসেছি তা কি কিছু ঠিকঠিকানা আছে। তার ভেতর কে আছে, কে মরেছে, কি করে তা বলব?'

কোনদিন ডানিয়েল জিজ্ঞেস করে, 'আচ্ছা, তুমি বিয়ে করেছ তাউই?'

এ অঞ্চলের তাবত মানুষ শিবরামকে 'তাউই' বলে। দেখাদেখি ডানিয়েলও তাকে তাই ডাকতে শুরু করেছে।

শিবরাম বলে, 'ওটা কি একটা জানবার মত কথা হল।'

'কেন?'

'সংসারে সবাই বিয়ে করে। চার কুড়ি আট বছর বয়েস হল আমার। এর ভেতর যদি একটা বিয়ে করেই থাকি অবাক হবার কিছু নেই। এ সব কথা না বলে বরং—'

'কী?'

নিজের বুকটা দেখিয়ে শিবরাম বলে, 'এইটের ভেতর কী আছে বুঝতে চেষ্টা কর সাহেব। অন্য কথা, ভাল কথা দু-চারটে শুধোও দিকি।'

এমন আত্মবিমুখ, স্বদেশবিমুখ, আত্মীয়স্বজন সম্পর্কে উদাসীন মানুষ আগে আর কখনও দ্যাখ নি ডানিয়েল। সে বলে, 'কী শুধোব?'

কথাটা যেন শুনতেই পায় না শিবরাম। আত্মবিস্মৃতের মত বলে, 'ঘর বল, সংসার বল, বউ-ছেলে বল—কিছুই আমার ভাল লাগে না। এই সাগরের কথা শুধোও—এর কোথায় কী আছে, জিজ্ঞেস কর। বলে দিতে পারব।'

সত্যিই তাই। সমুদ্র সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন করলে শিবরামের ঘোলাটে চোখ চকচকিয়ে ওঠে। ধনুকের মত বাঁকানো পিঠ ঋজু হয়ে উঠতে চায়। অসীম উৎসাহে সে জানায়, এই বিপুল আরব সাগরের কোন স্রোতে হাঙর রয়েছে, কোন স্রোতে মকর, কোথায় টার্বো-ট্রোকাস-নটিলাসদের বসতি, কোন প্রবাহে পমফ্রেট আর তারিণী মাছেরা গা ছেড়ে দিয়ে সাঁতার কেটে বেড়ায়, কোথায় অক্টোপাস, কোথায় তিমি অথবা সমুদ্রচারী অসংখ্য জীবকুল আস্তানা করে নিয়েছে—সব, সব খবর তার নখদর্পণে।

বয়স্ক জীর্ণ দুটি চোখ মেলে দিয়ে জলতলের অপার রহস্যের সমস্ত টুকুই বুঝি দেখতে পায় ডানিয়েল। সমুদ্রের জগৎ তার অতি পরিচিত, একান্ত অন্তরঙ্গ।

শিবরামের যে দিকটা ডানিয়েলকে সব চাইতে আকৃষ্ট করেছে তা হচ্ছে তার গল্প। গল্প সবাই বলতে পারে না। কিন্তু তার বলার ভঙ্গিটা চমৎকার।

শিবরামের সমস্ত গল্পই আরব সাগরকে ঘিরে। জাল বাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে চুট্টাটি দাঁতে চেপে সে যখন ডাকে, 'বুঝলে সাহেব, একবার ইদিকে এসো দিকি—' তখন আর এক মুহূর্তও দেরি করে না ডানিয়েল। নিমেষে তার কাছে চলে যায়।

শিবরামের নৌকোয় উঠলে এরকম একটা ডাকের জন্য ডানিয়েল যেন উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে। পাশ ঘেঁষে বসে বলে, 'ডাকছ কেন?'

ততক্ষণে শিবরামের চোখে মুখে কিসের যেন ছোঁয়া লেগেছে। ঘোলাটে চোখদুটি অস্বাভাবিক উজ্জ্বল, বাঁকা মেরুদণ্ডটা খাড়া হয়ে উঠেছে। পাশ থেকে নয়, মনে হয়, অনেক দূর থেকে হাওয়ার তরঙ্গে তার স্বর ভেসে আসতে থাকে, 'সেবার, মানে যেবার এদিকের সব চাইতে বড় ঝড় হয়েছিল, আমি মৎস্যকন্যা দেখেছিলাম।'

প্রত্যাসন্ন একটি গল্পের পরিমণ্ডল তৈরি করে ডানিয়েলের দিকে তাকায় সে।

ডানিয়েল বলে, 'মৎস্যকন্যা আবার আছে নাকি!'

'কে বলে নেই? আমি নিজের চোখে দেখেছি।'

'কিরকম?'

শিবরাম তার কাহিনী বলে যায়। সেটা ছিল পূর্ণিমার রাত। মাছমারারা সন্ধ্যের আগেই যে যার গ্রামে ফিরে গেছে। সমুদ্রের পারে নিজের নৌকোটিতে খাওয়া-দাওয়ার পর একা বসে ছিল শিবরাম।

অন্যমনস্কের মত একেবারে সমুদ্রের দিকে তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে আনছিল শিবরাম। হঠাৎ তার চোখে পড়েছিল, নৌকো থেকে খানিকটা দূরে পরীর মত সুন্দরী একটি মেয়ে হাতছানি দিয়ে তাকে ডাকছে। এ ঘটনা বহুকাল আগের, শিবরাম তখন মধ্যযৌবনে।

মেয়েটির বুক পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল, বাকি অংশটি জলের তলায় ছিল অদৃশ্য। মুখে ছিল তার বিচিত্র মোহিনী হাসি। আত্মবিস্মৃতের মত নৌকো নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিল শিবরাম। সে যত এগিয়েছে, মেয়েটি তত দূরে সরে গেছে। এইভাবে আচ্ছন্নের মত ঘুরতে ঘুরতে কখন যে ভোর হয়ে গেছে খেয়াল নেই। দিনের আলো ফুটতেই মেয়েটি সমুদ্রে হারিয়ে গেছে। তাকে ধরা যায় নি।

সকাল হবার পর আরেকটা বিপদ দেখা দিয়েছে। অধরা মৎস্যকন্যা বিচিত্র হাতছানিতে সমুদ্রে কোন প্রান্তে তাকে নিয়ে এসেছে বুঝতে পারা যাচ্ছিল না। অবশেষে সূর্য দেখে দিক ঠিক করে সন্ধ্যেবেলায় তীরে ফিরে এসেছিল সে।

মৎস্যকন্যার এই কাহিনীটি হাত-পা নেড়ে, কণ্ঠস্বর কখনও খাদে নামিয়ে কখনও চূড়ায় তুলে, চোখের দৃষ্টি রহস্যময় করে এমনভাবে শিবরাম বলে যায় যাতে অবিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না। সত্যি, সর্বাঙ্গ দিয়ে লোকটা গল্প বলতে জানে।

শুধু মৎস্যকন্যার গল্পই নয়, আরো অনেক কাহিনী সে বলে। কোন বছর সমুদ্রে জলস্তম্ভ উঠেছিল, কোন বার পরপয়েজ মাছ দেখার জন্য মাঝ দরিয়ায় একা একা সে অভিযান চালিয়েছিল, ইত্যাদি ইত্যাদি অসংখ্য গল্পে তার ঝুলিটি বোঝাই। গল্প শোনার ইচ্ছা হলেই এই সৃষ্টিছাড়া মানুষটির নৌকোয় গিয়ে ওঠে ডানিয়েল।

দেখতে দেখতে একটা মাস কেটে গেল।

মাছের ওজন লিখে এবং জেলেদের সঙ্গে ঘুরে তাদের আর্থিক অবস্থার ভয়াবহ ছবিটা আগেই ধরে ফেলেছিল ডানিয়েল। ওজন ঠিকমত লেখার ফলে কিছু সুবিধে তাদের অবশ্যই হয়েছে কিন্তু সর্বব্যাপী অভাব আর দৈন্যের তুলনায় তা এতই তুচ্ছ যে তারতম্যটা অনুভব করা যায় না। তাদের সংসারের প্রতি মুহূর্তের দাবীগুলি এত তীব্র এত ব্যাপক যে সামান্য কিছু বাড়তি আয় সেগুলোকে মিটিয়ে ফেলতে পারে না।

মাছমারারা আবহমান কাল সাড়ে সতের টাকা মণ হিসেবে আড়তদারদের ঘরে মাছ তুলে দিয়ে আসছে। দিনকাল বদলে যাওয়ায় চাল-ডাল-তেল-মশলা, প্রাণধারণের যাবতীয় উপকরণের দামই লাফিয়ে আকাশ ছুঁয়েছে কিন্তু পুরুষানুক্রমে আড়তদাররা মাছের যে দর দিয়ে আসছে তার কোনো হেরফের হয় নি। এদের ঠাকুরদারা সাড়ে সতের টাকা পেয়েছে, এরাও তা-ই পাচ্ছে, বংশ পরম্পরায় এদের সন্তান সন্ততিরা এবং তাদের পরবর্তী কালে যারা আসবে তারাও ঐ একই দর পেয়ে যাবে। সূর্য পূব দিকে ওঠে কিংবা পশ্চিমে অস্ত যায় জাতীয় কোন অমোঘ সত্যের মত ঐ দরটা চিরকাল অটল রয়েছে।

দরটা তো প্রায় নগণ্যই, তার ওপর জাল এবং নৌকোর ভাড়া কাটান যাবার পর মাছমারারা হাতে যা পায়, সমস্ত দিনের পরিশ্রমের কথা ভাবলে তা প্রায় নির্মম রসিকতাই। বেঁচে থাকাটা তখন নিদারুণ এক অভিশাপের মত মনে হয়।

অথচ, ডানিয়েল জেলেদের কাছে শুনেছে সাড়ে সতের টাকা দরে যে মাছ তারা দিয়ে আসে, সেই মাছই বরফের পেটিতে করে বোম্বাই, নাগপুর, বিলাসপুর, এমন কি সুদূর কলকাতার বাজারে চলে যায়। সেখানে নাকি তিন চার টাকা সের দরে তা বিক্রি হয়। শরীরের রক্ত জল করে সমুদ্র থেকে উজ্জ্বল রূপালী শস্য তুলে আনার বিনিময়ে মাছমারারা যা পায়, আড়তদারেরা যা লাভ করে তা হিসেব করলে বৃত্তিটার ওপর ধিক্কার দেবারই কথা।

ডানিয়েল প্রথম থেকেই ভেবে আসছে একটা কিছু করা দরকার। জীবনধারনের যে স্তরে এখানকার লোকেরা পড়ে আছে তা শোচনীয়। এই পশুর জীবন থেকে তাদের তুলে আনা একান্ত প্রয়োজন।

এতকাল উপায়টাই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। ভাবতে ভাবতে শেষ পর্যন্ত একটা পরিকল্পনা ডানিয়েলের মাথায় এসেছে। আর সেটা আসামাত্র অপেক্ষা করল না সে। সোজা সুভদ্রার সঙ্গে তার স্কুলে গিয়ে দেখা করল।

ইদানীং সুভদ্রার সঙ্গে দেখা হয় না বললেই চলে। ডানিয়েল তার স্কুলে যায় না। গ্রামে থাকলে দেখা হবার সম্ভাবনা, কিন্তু ভোরবেলা উঠেই তো সমুদ্রে চলে আসে সে।

ডানিয়েলকে দেখে মোটামুটি খুশীই হল সুভদ্রা, 'কি ব্যাপার, হঠাৎ গরীবের কাছে কি মনে করে?'

ডানিয়েল মৃদু হাসল, 'বিশেষ প্রয়োজন।'

গীর্জাবাসিনী মেয়েটার মন যে কোনো কারণেই হোক হালকা ছিল। গলার স্বরে ঈষৎ কৌতুক মিশিয়ে বলল, 'আমার তো ধারণা হয়েছিল—' সুরে একটু টান দিয়ে থেমে গেল।

'কী ধারণা?'

'আমার কাছে আপনার সব প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে।'

'এরকম ধারণার কারণ?'

'আপনিই ভেবে দেখুন না।'

একটু চুপ করে ডানিয়েল বলল, 'ভেবে পাচ্ছি না।'

সুভদ্রা হেসে উঠল, 'তবে আমিই বলি। এ গ্রামে আসার পর থেকে মারাঠী ভাষা শেখা পর্যন্ত আমাকে ছাড়া একদণ্ডও তো চলছিল না। যেই শেখা টেখা হয়ে গেল, আড়তে যাবার ব্যবস্থা করে দিলাম, অমনি আমাকে ভুলে গেলেন। ভুলেও একবার আমার খোঁজ করেন না।'

তরল কৌতুকের সুরেই বলেছে সুভদ্রা তবু যেন তার কাছে কথাটা প্রত্যাশা করা যায় নি। মনপুরাবাসিনী অশিক্ষিত গ্রাম্য মেয়েমানুষগুলো তাদের সঙ্গ বর্জন করে আড়তে আর সমুদ্রে ঘুরে বেড়াবার জন্য ডানিয়েলের ওপর ক্ষুব্ধ হয়েছিল। তরলতার নেপথ্যে সুভদ্রারও কি তেমনি প্রচ্ছন্ন একটু ক্ষোভ রয়েছে?

স্থির দৃষ্টিতে সুভদ্রার দিকে তাকিয়ে রইল ডানিয়েল। তার চোখে এমন কিছু আছে যাতে উসখুস করে উঠল সুভদ্রা। বলল, 'কী দেখছেন?'

'কিছু না। তবে—'

'কী?'

'আমারও একটা অভিযোগ আছে।'

'যথা?'

'প্রায় মাসখানেকের মত আপনার সঙ্গে দেখা হচ্ছে না। আমি বিদেশী মানুষ, কিভাবে আমার দিন কাটছে সে খোঁজটা আপনারও তো নেওয়া উচিত ছিল।'

দাবীটা যে অন্য দিক থেকেও আসতে পারে তা যেন ভাবতে পারেনি সুভদ্রা। বিব্রত মুখে বলল, 'কি করে খোঁজ নেব বলুন। বিকেল বেলা আপনাকে আড়তে যেতে বলেছিলাম কিন্তু ভোর বেলাতেই জেলেদের সঙ্গে আপনি চলে যান। আমি যখন এখানে আসি তখন আপনি সাগরে, যখন যাই তখনও আপনি সাগরে। দেখাটা কি করে করব?'

'ওটা একটা অজুহাত। ইচ্ছে করলেই দেখা করতে পারতেন।'

সুভদ্রা ভ্রূকুটি করল। ঘাড় বাঁকিয়ে বলল, 'কিভাবে?'

ডানিয়েল চোখ নাচিয়ে বলল, 'সমুদ্র তো এখান থেকে ন'শ পঞ্চাশ মাইল দূরে নয়। হাঁটতে হাঁটতে চলে গেলেই পারতেন। আসল কথাটা কি জানেন?'

উত্তর না দিয়ে সুভদ্রা তাকিয়ে রইল।

ডানিয়েল এবার ফিসফিসিয়ে উঠল, 'আসল কথাটা হল, আমার দিকে আপনার মনোযোগ নেই।'

সুভদ্রার মুখ ঈষৎ আরক্ত হল। পরমুহূর্তেই কণ্ঠস্বর থেকে তরলতা মুছে দিয়ে গম্ভীর মুখে সে বলল, 'বাজে কথা থাক।' ক্ষণিক আত্মবিস্মৃতির পর মেয়েটা নিজের পরিচয় সম্বন্ধে আবার সচেতন হয়ে উঠেছে।

একটু থতমত খেয়ে ডানিয়েল বলল, 'তা হলে কাজের কথাটাই বলি।'

'খানিকক্ষণ অপেক্ষা করুন। স্কুল ছুটির পর শুনব।'

'বেশ।' সময় কাটাবার জন্য ডানিয়েল ছেলেদের মধ্যে গিয়ে বসল। সঙ্গে সঙ্গে ছেলেরা তাকে নিয়ে মেতে উঠল।

ছুটির পর ছেলেরা বাড়ি গেল না। অনেকদিন পর ডানিয়েলকে পেয়েছে, তার চারপাশে সবাই ভিড় জমাতে লাগল। তাদের ইচ্ছা, ডানিয়েলকে নিয়ে আগের মত হুল্লোড় বাধায়।

অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে ছেলেমেয়েগুলোকে বাড়ি পাঠাল ডানিয়েল। বলল, সুভদ্রার সঙ্গে তার জরুরী কথা আছে। কাজেই তাদের এখানে থাকা উচিত নয়।

ছেলের দল চলে গেল বটে, তবে যাবার আগে একটা প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিল। দিনের বেলা আজ আর ডানিয়েল সমুদ্রে যেতে পারবে না। সারাদিন, সেই সূর্যাস্ত পর্যন্ত তাদের সঙ্গে হুটোপুটি করে কাটাতে হবে। এই শর্তে আপাতত মুক্তি পাওয়া গেল।

সবাই চলে গেলে সুভদ্রা বলল, 'এবার শুরু করুন।'

তৎক্ষণাৎ কিছু বলল না ডানিয়েল। সম্ভবত বক্তব্যটাকে মনের ভেতর গুছিয়ে নিতে লাগল। তারপর একসময় ধীরে ধীরে আরম্ভ করল, 'দেখুন আমি বিদেশী মানুষ, আপনাদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে কিছু বলতে যাওয়া বোধ হয় আমার উচিত নয়, তবু একটা ব্যাপারে আমাকে বলতেই হবে।'

সুভদ্রাকে চিন্তিত দেখাল, 'কী?'

'আপনাদের এখানে দু মাসের মত এসেছি। পুরোপুরি হয়ত পারিনি, তবু আমার পক্ষে যতখানি সম্ভব, ঘনিষ্ঠভাবে এখানকার মানুষের সঙ্গে মিশতে চেষ্টা করেছি।'

ডানিয়েল কী বলতে চায় বুঝতে না পেরে তাকিয়ে রইল সুভদ্রা।

ডানিয়েল আবার বলল, 'এমন দারিদ্র্য আগে আর কখনও দেখি নি।'

সুভদ্রা সামান্য একটু হাসল। তার অর্থ, এ আর আশ্চর্য কি!

ডানিয়েল বলতে লাগল, 'যেভাবে এরা বেঁচে আছে তেমন ভাবে মানুষের বেঁচে থাকা উচিত নয়। এ পশুর জীবন।'

'তা তো বুঝলাম। কিন্তু—'

'কী?'

'এর চাইতে ভালভাবে বাঁচবার উপায় এদের নেই।'

ডানিয়েলকে অত্যন্ত অসহিষ্ণু দেখাল। উত্তেজিত সুরে সে বলল, 'নেই বলে বসে থাকলে তো চলবে না। পৃথিবীর অনেক দেশ আমি ঘুরেছি। বহু মানুষ দেখেছি। অজস্র বিলাস আর প্রাচুর্যের মধ্যে, নিদারুণ অপচয়ের ভেতর তারা দিন কাটাচ্ছে। বিলাস না হোক, নিতান্ত মানুষের মত জীবনও কি এখানকার বাসিন্দারা পেতে পারে না? এ ব্যাপারে আপনাদের চার্চ কি আপনি কিছুই ভাবেন নি?'

'ভেবেছি অনেক।' ম্লান হাসল সুভদ্রা, বলল, 'কিন্তু কোনো দিকে কোনো পথই বার করতে পারি নি।'

দুই হাতে মুঠি পাকিয়ে অশান্ত ভঙ্গিতে ডানিয়েল বলল, 'তাই বলে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না, কিছু একটা করতেই হবে।'

'কিছুই করবার নেই। 'সুভদ্রাকে হতাশ দেখাল।

'নিশ্চয়ই আছে।'

একটু যেন অবাকই হল সুভদ্রা, 'কী?'

ডানিয়েল খুব কাছে এগিয়ে এল। বলল, 'দেখুন, আমার মাথায় একটা উপায় এসেছে। সেটা বলার জন্যে আজ আপনার কাছে এসেছি।'

সুভদ্রা উৎসাহিত হয়ে উঠল। সাগ্রহে প্রশ্ন করল, 'কী উপায়?'

'জীবনযাত্রার মান বাড়াতে হলে দুটো জিনিসের দরকার। শিক্ষা এবং অর্থ। সবার আগে এদের আয় বাড়াতে হবে।'

'সে তো সবাই জানে কিন্তু কিভাবে?'

'বলছি, মন দিয়ে শুনুন।' ডানিয়েল শুরু করল, 'জেলেদের সঙ্গে একমাসের মত আমি ঘুরছি, আড়তে গিয়ে তাদের হিসেব বুঝে নিচ্ছি। সপ্তাহের শেষে কি মাসের শেষে ওরা কে কি পায়, নিজের চোখেই তা দেখছি। অতি সামান্য আয়। সারাদিনের পরিশ্রমের কথা ভাবলে এই আয়টা সত্যিই খুব নৈরাশ্যজনক।'

জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে আছে সুভদ্রা।

ডানিয়েল বলতে লাগল, 'জেলেদের মুখেই শুনেছি মণ পিছু সাড়ে সতের টাকা করে মাছের দাম ওরা পেয়ে থাকে। এই দামটা বংশানুক্রমে নাকি চলে আসছে। অথচ—'

আধফোটা গলায় সুভদ্রা জিজ্ঞেস করল, 'কী?'

'প্রতিদিনই জিনিসপত্রের দর বাড়ছে। দশ বছর আগে সংসার চালাতে এদের যা খরচ হত এখন তার চাইতে ঢের বেশি লাগে কিন্তু আয়টা সেই একই আছে। এই আয়টা অন্তত তিন গুণ হওয়া উচিত। আমি ভেবে দেখেছি আড়তদারদের কাছ থেকে মাছের দর মণ পিছু অন্তত পঞ্চাশ টাকা করে আদায় করতে হবে।'

সুভদ্রা বিস্মিত। বিস্ময়ের সঙ্গে তার দু চোখে অনেকখানি শ্রদ্ধাও ফুটে উঠেছে। বিদেশী এই ছেলেটিকে প্রথম প্রথম সম্ভবত তার অত্যন্ত তরল মনে হয়েছিল। মনে হয়েছিল চপল-স্বভাব এই আগন্তুক জীবনের প্রগলভ দিকগুলি নিয়ে মেতে থাকতে ভালবাসে। এখন দেখা যাচ্ছে, বাইরের রঙচঙে চটুলতার তলায় জীবনের জটিল গভীর যে সমস্যাগুলি রয়েছে সেদিকেও তার দৃষ্টি আছে। এই দূর দেশের মানুষগুলির দরিদ্র জীবনযাত্রা তাকে ব্যথিত করেছে, চিন্তিত করেছে। তাদের দৈন্য, দুঃখ এবং হতাশা দূর করার জন্য কিছু একটা পরিকল্পনাও করেছে। এ সব কম কথা নয়।

অথচ সুভদ্রা এ দেশেরই মানুষ, কোনোদিন এই অন্তহীন দারিদ্র্য দূর করার কথা সে ভাবে নি। ভাগ্যের কাছে, চিরাচরিত প্রথার কাছে মাথা নামিয়েই আছে। অন্যায় নিয়ম ভেঙেচুরে জীবনকে মর্যাদার সিংহাসনে বসাবার সাহস অথবা দৃষ্টিভঙ্গি কোনোটাই হয়ত তার নেই। কিংবা এ দেশের মানসিক গঠনই এমন— আবহমান কাল ধরে যা চলে আসছে সেই স্রোতেই গা ভাসিয়ে থাকা।

সুভদ্রাকে চিন্তান্বিত দেখাল। সে বলল, 'দাম তো পঞ্চাশ টাকা করতে বলছেন কিন্তু আড়তদারেরা কি তা দেবে?'

ডানিয়েল বলল, 'দিতে কি কেউ চায়? আদায় করে নিতে হবে।'

'ধরুন যদি আদায় করা না যায়?'

'সে দিকটাও আমি ভেবে রেখেছি।'

'কিরকম?'

'ওদের আড়তে মাছ বিক্রি করা হবে না।'

'তবে কোথায় বিক্রি করা হবে?'

ডানিয়েল বলল, 'জেলেদের নিজেদেরই আড়ত করে নিতে হবে। সে আড়তের মালিকানা কারো একজনের থাকবে না। সবাই সমান অংশের মালিক হবে।'

'তা কি করে সম্ভব?'

'নয় কেন?'

'আড়ত করব বললেই তো হয় না। তার জন্যে অনেক টাকার দরকার। অত টাকা জেলেদের কোথায়?'

'সে কথাও আমি ভেবেছি। আমার কাছে হাজার দেড়েক টাকা আছে। তার থেকে এক হাজার দিয়ে একটা ফাণ্ড খোলা হবে। তারপর যেভাবে হোক আরো টাকা জোগাড় করতে হবে। জেলেরাও তাদের আয় থেকে প্রতি মাসে কিছু কিছু জমা দেবে। এইভাবে টাকা জমাবার পর আড়ত খোলা হবে।'

ডানিয়েল যা বলল তা সমবায়ের কথা। সমবায় কি জিনিস, তার কি চেহারা, সে জানে না। জেলেদের সঙ্গে মিশে তাদের শ্রম এবং প্রাপ্তির মধ্যেকার পার্থক্য দেখে এ জাতীয় একটা পরিকল্পনা তার মাথায় এসেছে। ডানিয়েলের ধারণা, এতে মাছমারারা চিরন্তন বঞ্চনার হাত থেকে খানিকটা অন্তত বাঁচবে।

সুভদ্রা বলল, 'কিন্তু—'

'কী?'

'আরেকটা দিক ভেবে দেখেছেন? শুধু আড়ত খুললেই তো হবে না। স্বার্থে ঘা পড়ছে বুঝতে পারলেই আড়তদারেরা নৌকো-জাল বন্ধ করে দেবে। মাছ ধরাই যদি না হয় আড়ত খুলে লাভ কি?'

ডানিয়েল বলল, 'নৌকো-জাল আড়ত খোলার আগে কিনতে হবে।'

সুভদ্রা বলল, 'যেভাবে টাকা জমাবার কথা বললেন তাতে দু-দশ বছরে কিছু করা সম্ভব নয়।'

'অসম্ভব বলে কিছু নেই। যেভাবেই হোক আর যত তাড়াতাড়ি হোক দরকারী টাকা জোগাড় করতেই হবে।'

একটু ভেবে সুভদ্রা বলল, 'একটা কাজ করুন, এ ব্যাপারে আপনি রেভারেণ্ড আপ্তের সঙ্গে দেখা করে কথা বলুন।'

'বেশ।'

খানিকটা চুপচাপ। তারপর হঠাৎ মুখ তুলে হাসি হাসি উজ্জ্বল মুখে সুভদ্রা বলল, 'ঐ দেখ, একটা কথা বলতে একেবারে ভুলে গেছি।'

'কী?' ডানিয়েল সুভদ্রার চোখের দিকে তাকাল।

'আপনি তো আজকাল এদিককার 'গড' হয়ে উঠেছেন।'

'কিরকম?'

'শুনলাম মনপুরার জেলেদের জন্যেই শুধু নয়, এ অঞ্চলের সব জেলেদের জন্যই ওজন লেখার ব্যবস্থা করে ফেলেছেন। আপনার কথা ছাড়া আজকাল ওদের মুখে আর কোনো কথা নেই।'

সুভদ্রার গলায় প্রশংসারই সুর রয়েছে। আরক্ত মুখে সেটুকু মাথা পেতে নিল ডানিয়েল।

সুভদ্রা আবার বলল, 'সত্যি একটা ভাল কাজ করেছেন, এ অঞ্চলের সব মানুষের আশীর্বাদ পাবেন।'

তার বলার ভঙ্গিটা অকৃত্রিম। ডানিয়েলের মনে হল, কোঙ্কন উপকূলের মানুষগুলোর জন্য সত্যিই যদি সে কিছু করে থাকে এই মাত্র তার পুরস্কার মিলে গেল। আস্তে আস্তে গাঢ় স্বরে সে বলল, 'আপনি তা হলে খুশি হয়েছেন?'

'নিশ্চয়ই।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর সুভদ্রা আবার বলল, 'জেলেদের ওজন লেখার কাজ তা হলে আপনার ভাল লাগছে?'

'ভাল না লাগলে কি ওটা করতাম!' ডানিয়েল হাসল।

'রেভারেণ্ড আপ্তের কাছে কবে যাবেন?'

'যেদিন বলবেন।'

'শিগগিরই চলুন একদিন, শুভস্য শীঘ্রম্।'

'বেশ।'

দেখতে দেখতে গণেশ পুজোর মাস এসে গেল।

ভাদ্রমাসের শুরুতে মনপুরায় এসেছিল ডানিয়েল। এখন কার্তিক মাসের মাঝামাঝি। অর্থাৎ চতুর্থ ঋতু হেমন্ত মধ্যপ্রহরে। নিয়ম অনুযায়ী সমারোহ করে হিম

এবং কুয়াশা নেমে যাবার কথা। উত্তুরে বাতাসের ঘাড়ে চড়ে একটা উদ্দাম খ্যাপামির দিগ্বিদিকে দাপাদাপি করে বেড়ানোও উচিত ছিল।

কিন্তু জগতের আর যেখানে যা খুশি চলুক, মহারাষ্ট্রের এই প্রান্তে একেবারে বিপরীত রীতি। এখানে হিম নেই, কুয়াশা অবশ্য আছে, তবে তা ফিনফিনে, হালকা। উত্তুরে বাতাসটাকেও কেউ বুঝি খাপে পুরে খাপটার মুখ বন্ধ করে দিয়েছে।

দু-আড়াই মাসের মত এ দেশে এসেছে ডানিয়েল। এর মধ্যে তার ধারণা হয়েছে, বর্ষাই এখানকার প্রধানতম ঋতু ঋতুরাজই বলা যায় তাকে। আকাশময় এখনও, এই মধ্য কার্তিকে টুকরো টুকরো ইতস্তত মেঘ ছড়ানো। আষাঢ় শ্রাবণের পর কত দিন, কত মাস, কত সময়ই তো পার হয়ে গেছে তবু এই কোঙ্কন উপকূল বর্ষাকে বুঝি প্রাণ ধরে বিদায় দিতে পারে নি, আকাশ জুড়ে আষাঢ়-শ্রাবণের স্মৃতি সে সাজিয়ে রেখেছে।

ঋতুবদলের যে সামান্য লক্ষণ চোখে পড়ছে তা এইরকম। রোদের তাপ কিছু জুড়িয়েছে আর এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা সিন্ধু সারস ছাড়াও কিছু কিছু বিদেশী ভবঘুরে পাখি আসতে শুরু করেছে। এইসব যাযাবর পাখিরা নাকি প্রতি বছরই আসে। ওরা আসে সুদূর শীতের দেশ থেকে। হয়ত মানস সরোবর, হয়ত হিমালয় কিংবা আরো দূরের কোনো দিগন্ত প্রান্ত থেকে। হেমন্তের অবশিষ্ট দিন ক'টা এবং পুরো শীতটা এখানে কাটিয়ে বসন্তের শুরুতে ওরা আবার ফিরে যাবে।

যাই হোক, কার্তিক মাস পড়তে না পড়তেই সমস্ত কোঙ্কন উপকূল জুড়ে বিশেষ করে মনপুরা গ্রামটায় ব্যস্ততার ছোঁয়া লেগে গেল। ডানিয়েল লক্ষ্য করেছে এখানকার মানুষ হৈ চৈ করে বাঁচতে জানে না। তাদের জীবন স্তিমিত, কুণ্ঠিত, মূক। হঠাৎ সেই বেগহীন স্রোতহীন বিবর্ণ জীবনে দোলা লেগে গেছে।

এখন প্রতিটি বাড়িতে ঘর ধোয়া-মোছার ধুম পড়ে গেছে। শুধু ঘরই না, বাসন-কোসন, জামা-কাপড়, বিছানা-বালিশ—সব ঝকঝকে তকতকে করে তোলা হচ্ছে।

ইতিমধ্যে শহর থেকে ফেরিওলারা এসে গেছে, তারা ঝোলা বোঝাই করে এনেছে রঙচঙে লোভনীয় জামা-ফ্রক-ইজের-শাড়ি-ধুতি ইত্যাদি ইত্যাদি। কেউ এনেছে সস্তাদামের মনোহরণ খেলনা, কেউ পেতলের আর কাঠের বাসন-কোসন, কেউ এনেছে কাঁচা চামড়ার রঙিন জুতো, কেউ বঁটি-খুন্তি-হাতা-ছুরি-ডালের কাঁটা জাতীয় গৃহস্থালির টুকিটাকি জিনিসপত্র। আর এনেছে মাটির তৈরি রাশি রাশি গণপতি মূর্তি।

ফেরিওলা পসরা কাঁধে ফেলে প্রতিটি বাড়ির সামনে দিয়ে হেঁকে যায়, 'নেবে গো মুম্বাই শাড়ি, কলকাত্তাই গেঞ্জি-ই-ই-ই—'

'নেবে গো ভাল ভাল জামা, ভাল ভাল ইজের—'

'নেবে গো মুম্বাই স্টীলের বাসন—'

'নেবে গো গণপতি ঠাকুর—'

সদরের ঐ ডাকগুলো মোহনী মন্ত্রের মত অন্দরমহলের বাসিন্দাদের বাইরে টেনে নিয়ে যায়। বউরা, বয়স্কা প্রবীণারা, নব যুবতীরা—সবাই হুড়মুড় করে ছুটে আসে। যে ফেরিওলাই সামনে দিয়ে যাক, তাদের ডেকে থামানো চাই।

ফেরিওলারা এরই অপেক্ষায় থাকে। মধুর হাসি ছড়িয়ে কোঙ্কনবাসিনী মেয়ে-মানুষগুলির সামনে তারা মনোহারি পসরা মেলে ধরে।

এখানকার মানুষ সারা বছরের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এই গণপতি-পুজোর মাসেই কিনে রাখে। আপাতত দেখাশোনার পালা চলছে, কেনাকাটা আরো পরে।

শহর থেকে আরো ফেরিওলা আসুক, আরো দেখাশোনা চলুক। তারপর পছন্দের প্রশ্ন। পছন্দের পর দর কষাকষি। অবশেষে কেনা। তাড়াতাড়ি কিনেকেটে ঠকবে নাকি! কেনা হলে তো হয়েই গেল। কেনার পর হয়ত দেখা গেল আরো সস্তায় আরো লোভনীয় জিনিস এসে গেছে। তখন আর আক্ষেপের অন্ত থাকবে না, কাজেই কোঙ্কনবাসিনীদের এত সতর্কতা।

ডানিয়েল শুনেছে, এখানে ঘরে ঘরে গণেশ পুজো হয়। শুধু প্রতি বাড়িতেই নয়, প্রতি গ্রামে সবাই চাঁদা দিয়ে একটা, দুটো এমনকি চারটে পাঁচটা পর্যন্ত বারোয়ারি পুজো করে।

সমুদ্রে যাবার ফাঁকে ফাঁকে মাছমারারা বারোয়ারি পুজোর জন্য চালি বাঁধতে শুরু করেছে। তা ছাড়া গান-বাজনার একটি আসর বসাবে, হিন্দুপুরাণ থেকে পালা নিয়ে অভিনয় করবে—সে জন্য বাঁশ-কাঠ দিয়ে বড় বড় একচালা তৈরি হচ্ছে।

আরো একটা ব্যাপার চোখে পড়ছে। চান্দা জেলা না সাতারা, কোথা থেকে যেন দিশি মদের একটা দোকান এসে জুটেছে। ডানিয়েল শুনেছে, মুসুম্বি লেবুর রস গেঁজিয়ে এখানে মদ তৈরি হয়। নেশার এই বস্তুটি পুজোর দিনগুলোকে আচ্ছন্ন এবং মদির করে রাখবে।

গণেশ পুজো নাকি মহারাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় উৎসব। উৎসবটা দিন দশেক ধরে চলে কিন্তু সেটা ঘিরে যে মত্ততা, যে উদ্দীপনা তার মেয়াদ নাকি মাসখানেক। মাতা-মাতিতে এই সময়টা কোঙ্কন উপকূলই শুধু নয়, সারা মহারাষ্ট্র ভেসে যায়।

অনুমান করা যাচ্ছে মনপুরা গ্রাম এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলিতে এই মুহূর্তে যা চলেছে তা ভূমিকা মাত্র। অনাগত অদৃষ্টপূর্ব উৎসবের জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা কবে যাচ্ছে ডানিয়েল।

এই মনপুরা গ্রামের এমন কেউ নেই যে ডানিয়েলকে নিমন্ত্রণ করে নি। এমন কি তার প্রতি যে দু'জনের বিদ্বেষ অপরিসীম সেই গণেশ রতির বাপেরা পর্যন্ত পুজোর দিনে তাদের বাড়ি যাবার জন্য জোড়হাতে অনুরোধ জানিয়ে গেছে।

এর নামই বোধ হয় উৎসব, যা সব কিছু ভাসিয়ে নেয়। গ্লানি, বিদ্বেষ, বিরূপতা, প্রতিশোধের সঙ্কল্প, শত্রুতা, সব কিছুর ওপর একটি স্নিগ্ধ আবরণ টেনে দেয়।

মনপুরার বাসিন্দারাই শুধু নয়, আশেপাশে যত মাছমারা আছে সবাই ডানিয়েলকে নিমন্ত্রণ করেছে। ডানিয়েল না গেলে তারা খুবই দুঃখ পাবে. সে কথা জানিয়ে দিয়েছে।

অন্য মাছমারাদের নিমন্ত্রণ করার হেতু আছে। সেটা তাদের কৃতজ্ঞতার প্রকাশ। মনপুরাবাসীদের মত চিরন্তন প্রতারণার হাত থেকে ডানিয়েল তাদেরও বাঁচিয়েছে। তাদের ওজন লেখার দায়িত্বও সে নিয়েছে। প্রতিদিন মেলামেশার ফলস্বরূপ এই

সব হত দরিদ্র মানুষগুলির সঙ্গে গভীর বন্ধুত্বও হয়ে গেছে। বন্ধুত্ব, কৃতজ্ঞতা সব মিলিয়ে এ অঞ্চলের সমস্ত মানুষ তার বশীভূত। অবশ্য আড়তদার ক'জন বাদ। তবে গণেশ পুজোয় তারাও নিমন্ত্রণ না করে পারে নি।

মোট কথা, গণেশ পুজোর দিন যত এগিয়ে আসছে ততই কোঙ্কন উপকূলের চেহারা দ্রুত বদলে যাচ্ছে। জীবনযুদ্ধে পরাভূত জর্জরিত বিষণ্ণ মানুষগুলোর মুখে আলো ফুটছে। উৎসবের দিনে কে ক'টা জামা-কাপড় কিনবে, বাড়িতে ভাল ভাল কি সুখাদ্য তৈরি হবে, ক'বোতল মুসুম্বির তাড়ি খাবে—ইত্যাদির স্বপ্নে এবং পরিকল্পনায় সবাই বিভোর হয়ে আছে।

দেখেশুনে ডানিয়েলের মনে হল, ব্যাপারটা তাদের কৃশমাসের মত। বড়দিনকে ঘিরে সমস্ত খ্রীস্টান জগৎ যেভাবে মেতে ওঠে ইণ্ডিয়ার সুদূর প্রান্তে এই কোঙ্কন উপকূলটাও গণপতি উৎসবে তেমনভাবেই উদ্বেল হয়ে উঠেছে। কৃশমাস খ্রীস্টের জন্মদিন। এই পুণ্যদিনে খ্রীস্টান মাত্রেই, তা সে বিত্তবানই হোক আর বিত্তহীনই হোক, নিজের বাড়িঘর সাজাবেই, দুটো নতুন পোশাক, কিছু কেক, মোমবাতি এবং কৃশমাস রুটি কিনবেই। বুড়ো সান্টাক্লস তার ঝুলিটি ভরে এই দিনে সবার জন্য কিছু না কিছু উপহার নিয়ে আসে। গণপতি-উৎসব বড়দিনের সেই উদ্দীপনার কথাটাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে।

ইতিমধ্যেই ডানিয়েল জেনে ফেলেছে, এখানকার বাসিন্দারা ধর্মবিশ্বাসে হিন্দু, সুতরাং আইডোলেটারস। সে যাই হোক, ডানিয়েলের মনে হল, হিন্দু বা খ্রীস্টান—সব জগতেই উৎসবের তাৎপর্য এক। মানুষ স্বার্থের সংঘাতে পরস্পরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দ্বীপের মত দূরে দূরে সরে যায়, তাদের মধ্যে আর সংযোগ থাকে না। উৎসবগুলো সর্বব্যাপী ঢলের মতো সবাইকে ভাসিয়ে নিয়ে সব দূরত্ব সব বিচ্ছিন্নতা ঘুচিয়ে দিয়ে একাকার করে দেয়।

এতদিন ছিল ভূমিকা। আজ থেকে গণেশ পুজো শুরু হল। ডানিয়েল আগেই শুনেছে, এই পুজোটা ক'দিন ধরে চলবে।

ডানিয়েলের পক্ষে এ এক বিচিত্র চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা। দু চোখে অপার বিস্ময় নিয়ে সকাল থেকে বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়াচ্ছে সে।

মনপুরাবাসীরা এতদিন জামাকাপড় পছন্দ করেছে, বাছাই করেছে। দিন দুই আগে নির্বাচন-পর্ব শেষ করে কেনাকাটা সেরে ফেলেছে। গাঢ় রঙের প্রতি এখানকার মানুষের প্রবল আকর্ষণ। তাই দেখা যাচ্ছে, রাস্তায় রাস্তায় প্রখর উজ্জ্বল রঙের হাট বসে গেছে। শিশুরা, যুবকেরা, যুবতীরা—নির্বিশেষে সমস্ত স্ত্রী-পুরুষ নতুন পোশাক পরেছে।

প্রতিটি বাড়ির সদর দরজার দুপাশে কলাগাছ পোঁতা। কলাগাছের পাশে জলপূর্ণ ঘটের ওপর শিস ডাব। আরো একটা ব্যাপার লক্ষ্য করল ডানিয়েল, সব বাড়িই দেবদারু পাতায় সাজানো। দেওয়াল আর মেঝেগুলো সাদা খড়ির গুঁড়ো, হলুদের গুঁড়ো এবং ইটের গুঁড়ো দিয়ে নক্সা এঁকে এঁকে চিত্রিত করা হয়েছে।

গৃহসজ্জার এমন মনোরম চিত্র আগে আর কখনোও দ্যাখে নি ডানিয়েল। জিজ্ঞেস করে জেনেছে, ওগুলোর নাম আলপনা। প্রতিটি বাড়ির সব চাইতে ভাল ঘরটিতে উঁচু বেদী করে গণপতি মূর্তি বসানো হয়েছে। তার সাজের ঘটা কত! ফুলে-চন্দনে-ধূপে-দীপে একটা পবিত্র পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে।

ডানিয়েল শুনেছে, জগতের সমস্ত সার্থকতার মূলে আছেন এই গণপতি। তিনি হচ্ছেন সিদ্ধিদাতা। হিন্দুদের জীবনে যত কামনা, যত কর্ম—সব কিছু তাঁর প্রসন্ন দৃষ্টিতে সিদ্ধ হয়। তিনি সিদ্ধির ঈশ্বর। সুতরাং তাঁর পুজোয় ঘটা হওয়া উচিত বৈকি।

ঘরে ঘরে পুজো তো আছেই। মনপুরাবাসীরা গ্রামের মাঝখানে একটা বারোয়ারি পুজোর ব্যবস্থাও করেছে। পুরনো টিন আর বাঁশ দিয়ে চালি বেঁধে তার তলায় বিশাল গণেশ মূর্তি স্থাপিত করা হয়েছে।

যত দেখছে যত ঘুরছে ততই মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছে ডানিয়েল। ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ সুভদ্রার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সাজসজ্জায় কোনোদিনই আড়ম্বর নেই সুভদ্রার, গীর্জায় যে শুদ্ধ জীবন তাকে যাপন করতে হয় তাতে বিলাস বা সৌখিনতার অবকাশ নেই। আড়ম্বর সেখানে দৃষ্টিকটুই না, বুঝি বা অপরাধও।

এই উৎসবের দিনেও তার সাজে কোনো পরিবর্তন হয় নি। অন্য দিন পাড়হীন সাদা শাড়ি আর সাদা জামা পরে সুভদ্রা। আজও তা-ই পরে এসেছে।

পোশাক সম্বন্ধে গীর্জাবাসিনী মেয়েটা আদৌ সচেতন নয়। ফলে জামাকাপড় সাদা হলেও প্রতিদিন সেগুলো ঘামে ধুলোয় এবং বহু ব্যবহারে ময়লা, বড় জোর আধময়লা থাকে। কিন্তু আজ একেবারে পাটভাঙা ধবধবে পোশাক পরে এসেছে। চিরদিনের রুক্ষ আগোছালো চুলে চিরুণি টেনেছে৷ আর তারই ফলে তাকে আশ্চর্য সুন্দর মনে হচ্ছে।

সুভদ্রা বলল, 'যাক, রাস্তাতেই আপনাকে পাওয়া গেল। ভাবছিলাম কোথায় আপনাকে ধরা যায়। আজকাল নিজের ঘরে একদণ্ডও তো আর পা পেতে বসেন না যে সেখানে গেলে পাব—'

জিজ্ঞাসু সুরে ডানিয়েল বলল, 'কেন, কিছু দরকার আছে?'

'আছে বৈকি—'

'আদেশ করুন—' তরল সুরে ডানিয়েল বলল।

'রেভারেণ্ড আপ্তে এটা আপনাকে দিয়েছেন—' বলে কাগজের বড় একটা প্যাকেট তুলে ধরল সুভদ্রা।

প্যাকেটটা সুভদ্রার হাতেই ছিল, ডানিয়েল আগে খেয়াল করে নি। তার মুগ্ধ দৃষ্টি পতঙ্গের মত মেয়েটার চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। একটু অবাক হয়েই মোড়কটা ধরল সে। বলল, 'কী আছে এর ভেতর?'

'খুলে দেখুন না।'

'খুলব?'

'নিশ্চয়ই খুলবেন।'

মোড়ক খুলতেই ভেতর থেকে একটা চকোলেট রঙের নতুন ট্রাউজার আর সাদা জামা বেরিয়ে পড়ল। সবিস্ময়ে ডানিয়েল বলল, 'এসব কি?'

'রেভারেণ্ড আপ্তে এগুলো উপহার পাঠিয়েছেন আপনাকে।' স্নিগ্ধ একটু হাসল সুভদ্রা।

'হঠাৎ উপহার!'

'বা রে, আজ উৎসব না?'

একটু ইতস্তত করে দ্বিধান্বিত সুরে ডানিয়েল বলল, 'কিন্তু—'

'কী?'

'এ উৎসব তো আমাদের নয়।'

বুঝতে না পেরে বিমূঢ়ের মত সুভদ্রা ডানিয়েলের প্রতিধ্বনি করল, 'আমাদের নয়!'

'না।' ডানিয়েল মাথা নাড়ল, 'ও তো হিন্দু ফেস্টিভ্যাল।'

'যে কোন ফেস্টিভ্যালকে ফেস্টিভ্যাল বলে মেনে নেওয়াই ভাল।'

বিষয়টা আলোচনা-সাপেক্ষ। তবে এ সম্বন্ধে আর কিছুই বলল না ডানিয়েল।

সুভদ্রা আবার বলল, 'হিন্দুদেরই হোক আর খ্রীস্টানদেরই হোক, উৎসব উৎসবই। তা থেকে আনন্দটুকু ছেঁকে নেওয়াই আসল।'

ডানিয়েল এবার বলল, 'তা অবশ্য সত্যি।'

'রেভারেণ্ড আপ্তে বার বার বলে দিয়েছেন এর মধ্যেই ওগুলো পরবেন।'

'নিশ্চয়ই পরব।'

খানিকটা চুপচাপ। তারপর সুভদ্রাই একসময় শুরু করল, 'আজ তো আর মাছ-মারাদের সঙ্গে সমুদ্রে যান নি।'

'না। গণেশ পুজোর ক'টা দিন ওরা মাছ ধরবে না বলেছে। আমি একা সমুদ্রে গিয়ে কি করব।' ডানিয়েল বলল।

সুভদ্রা বলল, 'তা সকাল থেকে এতক্ষণ করছিলেন কি?'

'ঘুরে ঘুরে পুজো দেখছিলাম। গ্রামটায় ফেস্টিভ্যালের মুড় লেগে গেছে।'

'কেমন লাগছে?'

'চমৎকার।'

সুভদ্রা একবার মাথার ওপর তাকাল। কোঙ্কন উপকূলের সূর্য এখন মধ্যাকাশে উঠে এসেছে। দ্রুত চোখ নামিয়ে ব্যস্ত সুরে বলল, 'আপনার কি এখন কোনো কাজ আছে?'

'না।' ডানিয়েল মাথা নাড়ল, 'কাজ আর কি, শুধু ঘুরে বেড়ানো।'

'তবে চলুন না আমার সঙ্গে।'

'কোথায়?'

'রতিদের বাড়ি। রতির বাপ টিকলরাম গণেশপুজোর জন্যে একটা পুরুত জোগাড় করে দিতে বলেছিল। চান্দা গাঁয়ে এক পুরুত থাকে। কাল গিয়ে তাকে খবর দিয়ে এসেছি। সে এল কিনা, কে জানে।' সুভদ্রা বলতে লাগল, 'না এলে মহা

মুশকিল। ওরা হয়ত আশায় আশায় বসে থাকবে, অন্য পুরুতের চেষ্টা করবে না। গেলে সব বুঝতে পারব।'

ডানিয়েল বলল, 'চলুন।'

যেতে যেতে কি মনে পড়তে চকিতে মুখ ফেরাল সুভদ্রা। অস্বস্তির সুরে বলল, 'কিন্তু—'

'কী?'

'ওখানে যাওয়া বোধ হয় আপনার উচিত হবে না।'

ডানিয়েল বুঝল, রতির বাপ তার ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে আছে। সে খবর সুভদ্রার অজানা নয়। সেখানে গেলে সেই লোকটা যদি অসম্মানকর কোনো ব্যবহার করে বসে তা মোটেই প্রীতিকর হবে না। সম্ভবত সেই কারণে সুভদ্রা বিব্রত হয়ে পড়েছে। ঝোঁকের বশে ডানিয়েলকে তার সঙ্গী হতে বলে এখন কিভাবে ফেরাবে বুঝতে পারছে না।

সুভদ্রার বিব্রত ভঙ্গিটা মনে মনে উপভোগ করল ডানিয়েল। বেশ কৌতুকও বোধ করতে লাগল। কিন্তু প্রাণের তলদেশ থেকে সেই কৌতুককে ওপরে ভেসে উঠতে দিল না। নিরীহ ভালোমানুষের মুখে সে জিজ্ঞেস করল, 'উচিত হবে না কেন?'

কুণ্ঠিত মুখে একটু চুপ করে থেকে সুভদ্রা বলল, 'তা তো আপনি জানেন।'

'তবু আপনার মুখে একবার শুনি।'

উত্তর দিতে গিয়ে হঠাৎ ডানিয়েলের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। কি দেখল, সুভদ্রাই জানে। বলল, 'আমার মুখ থেকে না শুনলেও চলবে। মোট কথা আপনি যাবেন না।'

'কিন্তু—'

'আবার কী?'

'আমি না গেলে যে খুব খারাপ দেখাবে।'

'তার মানে?'

'টিকলরাম তার বাড়িতে প্রসাদ খাবার নেমন্তন্ন করেছে যে।'

ভ্রূকুটি করে সুভদ্রা বলল, 'একথা আগে বললেই হত।'

ডানিয়েল ঠোঁট টিপে হাসতে লাগল।

সুভদ্রা বলল, 'আর হাসতে হবে না। চলুন।'

একটু পরেই রতিদের বাড়ি পৌঁছে গেল দু'জনে।

রতির বাপ টিকলরাম সদরের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। সুভদ্রাদের দেখামাত্র ছুটে এল এবং সাদর অভ্যর্থনায় মুখর হয়ে উঠল, 'এসো দিদি, এসো। সাহেব এসো।' টিকলরামের সঙ্গে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে সুভদ্রা জিজ্ঞেস করল, 'পুরুত এসেছিল তো?'

'হ্যাঁ। সেই সক্কালবেলায় এসে হাজির। তুমি বলে দিয়েছ, না এসে উপায় আছে তার?' টিকলরাম বলতে লাগল, 'পুরুত যখন এল তখনও আমাদের পুজোর

জোগাড় হয় নি। তাকে বসিয়ে রেখে তাড়াহুড়ো করে আয়োজন করলাম। এই খানিকটা আগে পুজো সেরে পুরুত চলে গেল।'

'আমার খুব চিন্তা ছিল, পুরুত শেষ পর্যন্ত আসবে কিনা। যাক, ভালয় ভালয় তা হলে কাজটা চুকে গেছে।'

ঘরে এনে শতরঞ্চি পেতে সুভদ্রা আর ডানিয়েলকে বসাল টিকলরাম। তারপর ব্যস্তভাবে ডাকতে লাগল, 'রতি—রতি—'

বাড়ির ভেতর থেকে রতি এ ঘরে এসে ঢুকল।

টিকলরাম সেই যে সেদিন অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছিল, তারপব এই প্রথম রতিকে দেখল ডানিয়েল। অনেক রোগা হয়ে গেছে মেয়েটা। ক'দিন আগেও প্রাণের অপরিমিত ঐশ্বর্যে যে ভরপুর ছিল আজ সে একান্ত নির্জীব, করুণ, বিষণ্ণ। টগবগে প্রাণবন্ত মেয়েটার চোখেমুখে ক্ষণে ক্ষণে কৌতুকের দীপ্তি আর জীবনের প্রাচুর্য বিচ্ছুরিত হতে থাকত। আজ তার চিহ্নমাত্র নেই। এমন যে গণপতি উৎসব যা সমস্ত কোঙ্কন উপকূলকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে—রতির মধ্যে তা বোধহয় একটি তরঙ্গ ও তুলতে পারেনি।

ডানিয়েল লক্ষ্য করল, ঘরে ঢুকে কারো দিকে তাকায় নি রতি। এককোণে চুপচাপ মুখ নামিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দেখতে দেখতে ডানিয়েলের বুকের ভেতর কোথায় যেন একটা মোচড় পড়ল। সকাল থেকে মনপুরা গ্রামে ঘুরতে ঘুরতে বিচিত্র এক ভাল লাগা তাকে প্রায় আবিষ্ট করে ফেলেছিল। গণপতি উৎসব তার হাত ধরে মধুর এক আচ্ছন্নতার মধ্যে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেই নিরবচ্ছিন্ন ভাল লাগাটা এই মুহূর্তে মলিন হয়ে গেল।

এই উৎসবের দিনে সবাই হাসবে, আনন্দে উচ্ছুসিত হয়ে থাকবে আর ঐ মেয়েটাই শুধু বিষাদময় করুণ মুখে চুপচাপ থাকবে—এই চিন্তাটাই ডানিয়েলকে অত্যন্ত পীড়িত করে তুলল। রতির বিষাদের উৎসটা যে কোথায়, সে জানে। আজকের এই নির্জীব করুণ মেয়েটাকে কি নতুন করে পুনর্জন্ম দেওয়া যায় না? আবার কি তাকে মাসখানেক আগের মত কৌতুকে, উচ্ছলতায়, জীবনের অসীম গৌরবে উজ্জ্বল, প্রাণবন্ত, দীপ্তিময়ী করে তোলা যায় না? যত ভাবল ততই অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল ডানিয়েল।

টিকলরাম বলল, 'সাহেবকে আর সুভদ্রাদিদিকে প্রসাদ দে রতি।'

এই ঘরেরই পুবদিকের দেওয়াল ঘেঁষে গণপতি মূর্তি রয়েছে। তার সামনে পেতল আর কাঠের বাসনে প্রসাদ সাজানো। সেখান থেকে কিছু ফলমিষ্টি নিঃশব্দে দুটো পদ্মপাতায় তুলে সুভদ্রা আর ডানিয়েলের হাতে দিল রতি। তারপর দু গেলাস জল দিয়ে ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ফলমিষ্টির দিকে লক্ষ্য ছিল না ডানিয়েলের। অন্যমনস্কের মত বসেই রইল।

এদিকে টিকলরাম তাড়া দিয়ে উঠল, 'ও কি সাহেব, চুপ করে বসে আছো যে! খাও।'

চমকে ডানিয়েল বলল, 'এই যে খাচ্ছি।' বলে পদ্মপাতায় হাত রাখল। কিন্তু পরক্ষণেই আবার অনমনস্ক হয়ে পড়ল। টিকলরাম আবার ডেকে তাকে খেতে বলল।

বার বার আনমনা হয়ে পড়ছে ডানিয়েল। বার বার খাবার জন্য তাড়া লাগাচ্ছে টিকলরাম। অবশেষে সে বলল, 'কি অত ভাবছ সাহেব?'

আজ গণপতি-উৎসবের প্রথম দিন। এই দিনটার স্বভাবই আলাদা, কি এক জাদুকাঠি ছুঁইয়ে টিকলরামকে একেবারে বদলে দিয়েছে সে। ডানিয়েলের বিরুদ্ধে আজ আর পুরনো বিদ্বেষ, রাগ অথবা অসন্তোষ—কিছুই পুষে রাখেনি টিকলরাম। বরং তার কথায় বার্তায়, ব্যবহারে, অভ্যর্থনায় রীতিমত আন্তরিকতার উত্তাপই পাওয়া যাচ্ছে।

ডানিয়েল আস্তে আস্তে বলল, 'যা ভাবছি তোমার কাছে বলতে ভরসা হয় না।'

হাসতে হাসতে হাল্কা সুরে টিকলরাম বলল, 'ভরসা দিলাম, তুমি বলে ফেল দিকি।'

'সত্যি, ভরসা দিলে?'

'সত্যি গণপতির দিব্যি।'

টিকলরামের চোখে চোখ রেখে ডানিয়েল বলল, 'অনেক দিন পর রতিকে আজ দেখলাম। মেয়েটার চেহারা খুব খারাপ হয়ে গেছে।'

টিকলরাম মাথা নাড়ল, মুখে কিছু বলল না।

একটু চিন্তা করে ডানিয়েল আবার বলল, 'অনেক দিন থেকেই তোমাকে একটা কথা বলব, ঠিক করে রেখেছিলাম। প্রথম যেদিন তোমার বাড়ি আসি সেদিন তোমাদের ভাষা জানতাম না। পরে যখন সেটা শিখে তোমার কাছে এলাম তখন হাঁকিয়ে দিলে। বার বার এসেছি, বার বার তাড়িয়ে দিয়েছ।'

টিকলরাম নিশ্চুপ, শুধু তার মুখে দ্রুত কিসের ছায়া ঘন হতে লাগল।

ডানিয়েল বলতে লাগল, 'রতি তোমার মেয়ে, নিশ্চয়ই তুমি তার সুখ চাও?'

টিকলরাম সুরহীন গলায় উত্তর দিল, 'চাই বৈকি, সব বাপই তা চায়। কিন্তু—'

'বল।'

'ও ছুঁড়ি যেভাবে সুখ চায় তাতে আমার সায় নেই।'

আলোচনাটা যেদিকে বাঁক নিচ্ছে তা খুবই বিপজ্জনক। পাশে বসে সুভদ্রা শঙ্কিত হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি বলল, 'ওসব কথা থাক।'

তার কথা না ডানিয়েল না টিকলরাম, কেউ বোধহয় শুনতে পেল না। কিংবা শুনলেও গ্রাহ্য করল না। ডানিয়েল জানতে চাইল, 'কেন সায় নেই?'

'তুমি তো জানো জাতে আমরা ঘাটি আর গণেশরা জেলে। বেজাতের হাতে মেয়ে দেব কি করে!' টিকলরাম বলল।

'দিলে কি হবে?'

'সমাজে আমায় থাকতে হবে না? অন্য জাতের ঘরে মেয়ে গেলে সবাই আমার গায়ে থুতু দেবে। কেউ আমার বাড়ি আসবে না, আমার সঙ্গে কাজ করবে না, আমার

বাড়ি কেউ মরলে মড়া ছোঁবে না। মোট কথা আমাকে একঘরে করে রাখবে। রতিই আমার একমাত্র মেয়ে নয়, আরো ছেলেপুলে আছে। তাদের কথাও তো ভাবতে হবে।'

ডানিয়েল মাথা নাড়ল। কথাটা খুবই সত্যি। মানুষ যখন সমাজবদ্ধ জীব তখন তাকে টিকে থাকতে হলে সব ব্যাপারেই সমাজের অনুমোদন এবং সমর্থন প্রয়োজন। সমাজ-নিয়ন্ত্রিত সংস্কার এবং প্রথার বিরুদ্ধে হয়ত যুদ্ধ ঘোষণা করা যায় কিন্তু তাতে নিরাপত্তা কোথায়? বিশেষত এখানকার অশিক্ষিত অনালোকিত সমাজ এ ব্যাপারে নিষ্করুণ। যে পথ সে বাঁধিয়ে রেখেছে তার বাইরে একটা পা-ও ফেলার উপায় নেই। ফেললে দণ্ড অনিবার্য। কাজেই টিকলরামের ভয় পাওয়ার মধ্যে অস্বাভাবিকত্ব নেই। নিশ্চিন্ত জীবনের ভেতর কে আর অহেতুক দুর্যোগ ডেকে আনতে চায়।

ডানিয়েল বলল, 'কোনোমতেই কি গণেশের সঙ্গে রতির বিয়েটা হতে পারে না?'

'না।' টিকলরাম জোরে জোরে মাথা নাড়ল, 'অসুবিধেটা কোথায় তা তো তোমাকে খুলেই বললাম সাহেব।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ। হঠাৎ একটা সম্ভাবনা বিদ্যুৎচমকের মত ডানিয়েলের চেতনার মধ্য দিয়ে বয়ে গেল। ঈষৎ উত্তেজিত ভঙ্গিতে টিকলরামের দিকে ফিরল সে, 'আচ্ছা—'

তার ডাকের মধ্যে এমন কিছু রয়েছে যা টিকলরামকে চকিত করে তুলল। সে বলল, 'কি ব্যাপার?'

'ধর, তোমার আত্মীয় স্বজন জ্ঞাতি গোষ্ঠি যদি বিয়েতে আপত্তি না করে তা হলে তুমি রাজী হবে তো?'

টিকলরাম থতমত খেয়ে গেল। দিশেহারার মত কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, 'হ্যাঁ। কিন্তু—'

'কী?'

'আমার জ্ঞাতিরা আপত্তি করবে না, এমন কথা তোমায় কে বললে?'

'কেউ বলে নি।'

'তবে?'

'যাতে আপত্তি না করে সে জন্যে আমি তাদের বোঝাতে চেষ্টা করব। আমি তোমায় বলছি টিকলরাম, গণেশের সঙ্গে বিয়ে হলে মেয়েটা সব চাইতে সুখী হবে, নইলে মরে যাবে। চেহারার কি হাল হয়েছে দেখেছ?'

'তা আমি জানি, দেখ যদি আমার আত্মীয়স্বজনদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে মত করাতে পার। তা ছাড়া—'

'কী?'

'শুধু, আমাদের দিকটা দেখলেই চলবে না। গণেশের বাপকেও রাজী করাতে হবে। তাদের সমাজকেও বোঝাতে হবে।'

ডানিয়েল বলল, 'সে দায়িত্ব আমার।'

'বেশ।'

একটু চিন্তা করে ডানিয়েল এবার বলল, 'এ গ্রামে তোমার আত্মীয়স্বজন কে কে আছে বল—'

টিকলরাম নাম বলে গেল। দেখা গেল মনপুরায় মোট দশ ঘর ঘাটির বাস। তারা সবাই ডানিয়েলের পরিচিত। ঘাটিদের সম্প্রদায়গত বৃত্তি ছিল ভিন্ন। ইদানীং জীবিকার দায়ে সবাই মাছমারা হয়ে গেছে।

গোষ্ঠীর লোকেদের নাম ধাম জানিয়ে টিকলরাম বলল, 'শুধু এদের মত পেলেই চলবে না। আশেপাশে যে আট দশ খানা গ্রাম রয়েছে সে সব জায়গায় আমাদের জাতের অনেক লোক আছে। তাদের মতামতও দরকার। কারণ এদের নিয়েই আমাদের সমাজ।'

'বেশ, এদের সবার কাছেই আমি যাব। তা হলে এখন আমরা উঠি।' সুভদ্রাকে সঙ্গে নিয়ে ডানিয়েল উঠে পড়ল। বেরুতে যাবে, ঠিক সেই সময় তার চোখে পড়ল, ভেতর দিকের দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে রয়েছে রতি।

ডানিয়েলের মনে হল, ধ্যান জ্ঞান সব কিছু কানের মধ্যে ঢেলে দিয়ে অসীম মনোযোগে এবং উৎকণ্ঠায় এতক্ষণ টিকলরাম আর তার কথাবার্তা শুনে যাচ্ছিল মেয়েটা। চোখাচোখি হতেই চকিত হয়ে উঠল মেয়েটা। তারপর সজল কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে দরজার পাশ থেকে নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেল।

একটুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল ডানিয়েল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, যেভাবেই হোক যত বিরুদ্ধতাই আসুক গণেশের হাতে রতিকে তুলে দিতেই হবে। নীরব সজল চোখের দৃষ্টি দিয়ে ঘাটিদের ঐ মেয়েটা তার হৃৎপিণ্ড আমূল বিদ্ধ করে গেছে।

বাইরে বেরিয়ে এসে সুভদ্রা বলল, 'দরজার পাশে রতিকে দেখলাম।'

ডানিয়েল বলল, 'ওর চোখদুটোর দিকে তাকিয়েছিলেন?'

'ছিলাম।'

'কি মনে হল?'

'মনে হল রতির সঙ্গে গণেশের বিয়েটা হয়ে যাওয়া একান্ত দরকার। কিন্তু—'

'কী?'

ডানিয়েলের মুখে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে সুভদ্রা বলল, 'একটু আগে যে দায়িত্ব ইচ্ছা করে মাথায় নিলেন তার ঝামেলা কতখানি জানেন?'

'জানি বৈকি।' ডানিয়েল হাসল।

'তা ছাড়া সংস্কারাচ্ছন্ন লোকগুলোকে বোঝানো কি সহজ হবে?'

'কাজটা নিশ্চয়ই কঠিন। তাই বলে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলে তো চলবে না। আপনি নিজেই বলেছেন রতি-গণেশের বিয়ে হওযা দরকার। বাজে সংস্কারগুলো যদি না ভাঙা যায় ওগুলো একেবারে পেয়ে বসবে।' গলার স্বরে সবটুকু আকুলতা মিশিয়ে ডানিয়েল বলল, 'আপনি যদি আমাকে একটু সাহায্য করেন এই বিয়েটা নিশ্চয়ই হয়ে যাবে। করবেন সাহায্য?'

সুভদ্রা বোধহয় অভিভূত হয়ে গিয়েছিল। আবহমান কালের কুসংস্কারগুলোর কাছে এই কোঙ্কন উপকূল মূঢ়ের মত আত্মসমর্পণ করে আছে, সব জেনেও তার বিরুদ্ধে তারা একটি আঙুলও তোলে নি। অসহায়ের মত শুধু দেখে গেছে। এই সংস্কারগুলো কত যে হৃদয় কত যে সংসার ধ্বংস করে দিয়েছে তার হিসেব নেই।

এই ছেলেটা, বিদেশী এক আগন্তুক মাত্র, মাস দুয়েকের মত এখানে এসেছে। এরই মধ্যে কোঙ্কনের ভালমন্দের সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে সে। এখানকার খারাপ প্রথাগুলো তাকে এত বিচলিত করেছে যে সেগুলোর বিরুদ্ধে একক দাঁড়াতেও সে প্রস্তুত। অথচ ডানিয়েল যা করতে চলেছে সেটা যে কোন বিবেকবান সুশিক্ষিত মানুষেরই কর্তব্য। সুভদ্রার নিজেরই তো রতি-গণেশের বিয়ের ব্যাপারে অনেক আগে এগিয়ে আসা উচিত ছিল।

হঠাৎ কেমন যেন অনুপ্রাণিত বোধ করল সুভদ্রা। সম্মোহিতের মত বলল, 'নিশ্চয়ই সাহায্য করব। কিন্তু কিভাবে?'

কৃতজ্ঞ সুরে ডানিয়েল বলল, 'আপনি ভরসা দিলেন, কতখানি শক্তি যে পেলাম তা আমিই জানি। কাজটা অনেক সহজ হয়ে যাবে। এখন আসুন আমার সঙ্গে।'

'কোথায়?'

'গণেশদের বাড়ি।'

'চলুন।'

গণেশের বাপ মধুকরও ডানিয়েলকে গণপতি-উৎসবে নিমন্ত্রণ করেছিল। তার বাড়িতে পৌঁছুতেই সাদরে দু'জনকে ভেতরে নিয়ে বসাল সে। টিকলরামের মতই পুরনো বিদ্বেষ মন থেকে মুছে ফেলেছে মধুকর।

এখানেও আপ্যায়ন অভ্যর্থনার ত্রুটি ঘটল না। টিকলরামের তুলনায় মধুকরেরা অনেক বেশি সম্পন্ন। সংসারে টিকলরাম একা রোজগেরে। আর মধুকরেরা তিনজন উপার্জনক্ষম। মধুকর স্বয়ং এবং তার দুই ছেলে গণেশ আর লটাই।

পদ্মপাতায় সুভদ্রা আর ডানিয়েলকে প্রচুর পরিমাণে ফল আর মিষ্টি খেতে দিল মধুকর।

খেতে খেতে নানা বিষয়ে কথা হতে লাগল। গণেশ পুজোর দিনগুলো গ্রামের মানুষেরা কিভাবে কাটাবে, বারোয়ারি পুজোর আসরে এবার কী ধরনের আমোদ টামোদ হবে, অন্যান্য বছরের তুলনায় এবার জামা কাপড় এবং জিনিসপত্রের দাম ফেরিওলারা কেমন বাড়িয়ে দিয়েছে—ইত্যাদি ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গে আলোচনাটা পাক খেতে লাগল।

অবশেষে সুকৌশলে গণেশ-রতির বিয়ের প্রসঙ্গ এনে ফেলল ডানিয়েল। অনেক কথার পর টিকলরামের মত মধুকরও জানাল এ বিয়েতে তার আপত্তি নেই, ভয়টা শুধু সামাজিক অসন্তোষের জন্য। ডানিয়েল যদি তার আত্মীয়-পরিজন এবং সম্প্রদায়ের মানুষদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে মত আদায় করতে পারে তা হলে ঘাটিদের মেয়েকে মাথায় করে সে নিজের ঘরে নিয়ে আসবে।

রতির ওপর মধুকরের কোন রাগ, বিদ্বেষ অথবা বিরূপতা নেই। এতদিন এই বিয়ের বিরুদ্ধে সে যে নিষ্ঠুরভাবে দাঁড়িয়েছে তার কারণ আর কিছু নয়— সামাজিক শাস্তির ভয়।

মধুকরের আত্মীয়স্বজন এবং জেলে সম্প্রদায়কে বোঝাবার দায়িত্ব নিয়ে সুভদ্রা আর ডানিয়েল যখন বেরিয়ে এল মধ্যাকাশ থেকে সূর্যটা তখন অনেক পশ্চিমে নেমে গেছে। কোঙ্কন উপকূলের রোদ জুড়িয়ে যেতে শুরু করেছে।

ডানিয়েল বলল, 'যাক, বার আনার মত ঝামেলা চুকল। সাপ-বেজী, দুই পক্ষই রাজী হয়ে গেছে। এখন বাকি কাজটুকু সেরে সব চাইতে যে দিনটা আগে পাওয়া যাবে সেই দিনেই গণেশ-রতিকে জুড়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।'

'শুভকাজ ঝুলিয়ে রাখা ভাল নয়, কি বলেন?' সুভদ্রা হাসল।

'যা বলেছেন।' ডানিয়েলও হাসল, 'রাজী থাকতে থাকতেই হাঙ্গামা চুকিয়ে ফেলা ভাল। পরে আবার যদি বিগড়ে বসে, মহা মুশকিল।'

একটু চুপচাপ।

তারপর সুভদ্রা বলল, 'টিকলরাম আর মধুকরের বাড়ি ঘুরে দুটো মস্ত কাজ তো চুকোলেন। এখন কী করবেন?'

'এখন দু-পক্ষের আত্মীয়স্বজন আর জাতের যে যেখানে আছে সবার সঙ্গে দেখা করব।' বলতে বলতে চোখমুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল ডানিয়েলের। ব্যস্তভাবে বলতে লাগল, 'দেখুন, আমার মাথায় একটা প্ল্যান এসেছে।'

'কী প্ল্যান?'

'কাল তো বারোয়ারি পুজোর ওখানে পালা গান হবে।'

'হ্যাঁ!'

'আশপাশের গ্রাম থেকেই আসবে তো?'

এখানে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে যে দশখানা গ্রাম আছে তাদের প্রত্যেকটায় গানের ব্যবস্থা হয়েছে। গণপতি উৎসবের দশ দিনে দশখানা গ্রামে দশটা অর্থাৎ প্রতি গ্রামে একটা করে পালা।

প্রতিদিন একেক গ্রামে একটা করে আসর বসানোর কারণ আছে। একসঙ্গে দু-তিন জায়গায় পালার ব্যবস্থা করলে এ অঞ্চলে সব মানুষ সব পালা শুনতে পাবে না। তাই এই ব্যবস্থা।

সুভদ্রা বলল, 'নিশ্চয়ই আসবে। দেখবেন কাল সন্ধে থেকে কাপড়ের খুঁটে চিঁড়ে বেঁধে হাতে লণ্ঠন ঝুলিয়ে সবাই আসতে শুরু করেছে। পালা বলে কথা, সমস্ত রাত গান শুনে ভোরবেলা ঢুলতে ঢুলতে যে যার বাড়ি ফিরে যাবে।'

নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে ডানিয়েল বলল, 'যাক, খাটুনিটা তাহলে বেঁচে গেল!'

'কিসের খাটুনি বলুন তো?' সুভদ্রা কৌতূহলী হয়ে উঠল।

'ওরা কাল না এলে আজ আপনাকে সঙ্গে নিয়ে দশখানা গাঁ ঘুরতে হত।'

'কেন?'

'সবাইকে খবর দিতে।'

একটু চিন্তা করে সুভদ্রা বলল, 'সবাইকে তো কাল পাচ্ছেন। তা আপনার মতলবটা কি বলুন—'

'সেটা ক্রমশ প্রকাশ্য। কাল পর্যন্ত ধৈর্য ধরুন।' ডানিয়েল হাসল।

'প্রশ্নটা করা আমার ঠিক হল না। আপনার মতলব আমি জানি। তবে কিভাবে এতগুলো লোককে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজী করাবেন সেই পদ্ধতিটাই শুধু জানি না। বলুন না—'

'কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।'

পরের দিন বিকেল থেকেই চারদিকের গ্রামগুলো ফাঁকা করে জলোচ্ছ্বাসের ঢলের মত মেয়ে-পুরুষ-শিশু-বুড়োর দল আসতে লাগল। গান বাজনার প্রতি এদের অনুরাগ যে কি প্রবল, এতেই টের পেল ডানিয়েল।

বারোয়ারি পুজোর মণ্ডপের কাছে পুরনো টিন আর বাঁশ দিয়ে চালি বাঁধা হয়েছিল। ওখানেই আসর বসবে। পালাটার নাম 'দক্ষযজ্ঞ'। হিন্দু পুরাণ থেকে একটা অংশ তুলে নিয়ে ওটা বানানো হয়েছে।

পালার গল্পটা আগে তাকে বলে দিয়েছিল সুভদ্রা। খুব ভাল লেগেছিল ডানিয়েলের। বলেছিল, 'ভেরি ইন্টারেস্টিং।'

সুভদ্রা বলেছিল, 'হিন্দু পুরাণে অনেক চমৎকার চমৎকার গল্প আছে।'

'আমাকে বলবেন তো।'

'বলব। কিন্তু—'

'কী?'

'ওসবের ইংরেজি অনুবাদও আছে।'

ডানিয়েলের কৌতূহলী হয়েছিল। তার মনে পড়েছিল, ভারতীয় মাইথোলোজির প্রায় সব ইংরেজি অনুবাদই তার বাবার সংগ্রহে আছে। কিন্তু সে সব তার পড়া হয়ে ওঠে নি। বলেছিল, 'আপনার কাছে ঐ সব বই আছে?'

'আছে কিছু কিছু।'

'আমাকে দেবেন।'

'দেব।'

যাই হোক, গানের আসরের সামনের দিকে অনেকটা জায়গা জুড়ে মাঠ। আশপাশের গ্রাম থেকে যারা আসছে তারা সেখানে গিয়ে বসছে। আসন্ন পালাটা কিরকম জমবে তার গবেষণায় সবাই মশগুল। আগের দিন চান্দা গ্রামে 'রাবণ বধ' পালা হয়ে গেছে। সে সম্বন্ধেও আলোচনা চলছে। পালাটা নাকি চমৎকার উৎরে

গিয়েছিল। প্রতি গ্রামের স্থানীয় শিল্পীরাই পালা নির্বাচন, পরিচালনা এবং অভিনয় অথবা গান—যাবতীয় কিছুই করে থাকে। এ অঞ্চলে চান্দা গ্রামের লোকেরা নাকি এ ব্যাপারে সবার সেরা আর মনপুরা এ বিষয়ে সবার পেছনে। কাজেই গত রাতের 'রাবণ বধে'র সঙ্গে আজকের 'দক্ষযজ্ঞে'র সম্ভাব্য ফলাফল নিয়ে আলোচনাটা বার বার তুলনামূলক দিকেই চলে যাচ্ছে। সবারই প্রায় বিশ্বাস, চান্দার কাছে মনপুরা দাঁড়াতেই পারবে না।

কাল সবাই চান্দায় গিয়ে রাত জেগেছিল। আজ ভোরে যে যার গ্রামে ফিরে সারাদিন ঘুমিয়ে মনপুরায় আসছে। কাল গ্রামে ফিরে ঘুমিয়ে আবার ছুটবে অন্য গ্রামে। এই ভাবে গণেশ পুজোর রাত ক'টা এদের বিনিদ্র কেটে যাবে।

সন্ধের মধ্যেই সামনের মাঠটা ভরে গেল।

পালা শুরু হবার কথা রাতের দ্বিতীয় প্রহরে। গাইয়ে এবং অভিনেতারা আসরে উঠবার আগে একটা নাটকীয় ব্যাপার ঘটে গেল। সুভদ্রা, টিকলরাম এবং মধুকরকে নিয়ে সেখানে চলে এল ডানিয়েল।

ব্যাপারটা অপ্রত্যাশিত, শ্রোতারা কিছুটা বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে রইল।

আড়তদারদের কাছ থেকে ওজন লিখিয়ে আনার কারণে ডানিয়েলের জনপ্রিয়তা অস্বাভাবিক বেড়ে গেছে। এ অঞ্চলের তাবত মৎসজীবী তার কাছে কৃতজ্ঞ।

ইদানীং দশটা গ্রামের যত মাছমারা আছে তাদের প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবে চেনে ডানিয়েল। তাদের প্রত্যেকের নাম পর্যন্ত জানে।

বিমূঢ় ভাবটা কিছু কাটলে চারদিক থেকে সমস্বরে সবাই চেঁচিয়ে উঠল, 'কি ব্যাপারে সাহেব? তুমি আসরে যে? সুভদ্রা দিদিকেও দেখতে পাচ্ছি। মধুকর, টিকলরাম—'

দু-হাত তুলে জনতাকে শান্ত করল ডানিয়েল। তারপর একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বক্তব্যটা মনের মধ্যে গুছিয়ে নিয়ে শুরু করল, 'তোমাদের কাছে খুব গুরুতর একটা কথা বলব। মন দিয়ে শোন। তারপর ঠাণ্ডা মাথায় বিচার বিবেচনা করে উত্তর দেবে। মনে রাখবে ব্যাপারটার সঙ্গে দুটো মানুষের জীবন-মরণ জড়িয়ে আছে।'

কণ্ঠস্বরে, মুখচোখের চেহারায় এবং বলার ভঙ্গিতে গানের আসরে ডানিয়েল এমন একটা গম্ভীর আবহাওয়া তৈরি করে ফেলল যাতে সবাই রুদ্ধশ্বাসে তাকিয়ে রইল। কী বলবে ডানিয়েল, কেউ জানে না। ডানিয়েলের গুরুতর ব্যাপারটা যে কী, তা-ও বুঝতে পারা যাচ্ছে না। কাজেই স্তম্ভিত বিস্ময়ে, কৌতূহলে, উদ্বেগে এবং আশঙ্কায় সবাই দোল খেতে লাগল।

একটু পর ডানিয়েলের কণ্ঠস্বর আবার শোনা গেল। টিকলরাম আর মধুকরকে দেখিয়ে সে বলল, 'এদের নিশ্চয়ই তোমরা চেন।'

জনতা ফিস ফিস করল, 'চিনি বৈকি। এ টিকলরাম আর ও হল মধুকর। একসঙ্গে ছেলেবেলা থেকে মাছ ধরছি আর চিনব না?'

এর পর রতি-গণেশের পরস্পরের প্রতি দীর্ঘ দিনের আকর্ষণ এবং অনুরাগের কথা জানিয়ে ডানিয়েল বলল, ওদের বিয়ে হওয়া একান্ত দরকার এবং এ ব্যাপারে

দশ গাঁয়ের যারা এখানে উপস্থিত হয়েছে তাদের অনুমোদন এবং আশীর্বাদ প্রয়োজন। ডানিয়েলের বিশ্বাস সবাই এ বিয়ে সমর্থন করবে এবং শুভেচ্ছায় আশীর্বাদে নবদম্পতীর জীবন কল্যাণময় করে তুলবে।

ডানিয়েলের বলা শেষ হলে জমায়েতটা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর বিস্তৃত চত্বর জুড়ে গুঞ্জন উঠল। গুঞ্জনটা অতি দ্রুত একটা তুমুল হট্টোগোলের রূপ নিল। সবাইকে উত্তেজিত দেখাচ্ছে।

একজন বয়স্ক প্রবীণ লোক ভিড়ের মধ্য থেকে উঠে দাঁড়িয়ে কুণ্ঠিত মুখে ডানিয়েলের উদ্দেশে বলল, 'মাছের ওজনের ব্যাপারে তুমি আমাদের অনেক উপকার করেছ সাহেব। তোমার কথাটা আমাদের রাখা উচিত।'

'মাছের ওজন লেখা অন্য জিনিস। আর এ হল গিয়ে তোমাদের সামাজিক ব্যাপার। মনে খটকা থাকলে বল।'

'ভরসা যখন দিলে সাহেব, বলেই ফেলি। এ বিয়ে হতে পারে না।'

'কেন?'

'ছেলেমেয়ের একজন হল জেলে, আরেক জন ঘাটি। ভিন্ জাতের সঙ্গে বিয়ে হবে কি করে!' এ তুমি কী বলছ!'

একটু চিন্তা করে ডানিয়েল বলল, 'বলছি কি সাধে? পৃথিবীর সব জায়গায় এক জাতের সঙ্গে আরেক জাতের বিয়ে হচ্ছে! শুধু কি আলাদা আলাদা জাতে, এক দেশের লোকের সঙ্গে অন্য দেশের লোকের পর্যন্ত বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। আর তোমরা মান্ধাতা আমলের পচা প্রথা নিয়ে বসে আছ। তাজ্জবের ব্যাপার।'

সেই লোকটা এবং তার চারপাশের বিশাল জনতা স্তম্ভিত হয়ে গেল। এই মাত্র ডানিয়েল এক বিস্ময়কর খবর দিয়েছে। তাদের কোঙ্কন উপকূলের বাইরে পৃথিবীতে নাকি অসবর্ণ বিয়ে, এমন কি ভিন্ন ভিন্ন দেশবাসীর মধ্যে বিয়েও হয়ে থাকে। খবরটা অবিশ্বাস করতে পারল না তারা, আবার মন দিয়ে মেনে নেওয়াও কঠিন হল। যাই হোক এর পর জনতা তাদের সংস্কারের দুর্গটাকে রক্ষা করতে প্রায় যুদ্ধই ঘোষণা করল। ডানিয়েল একাই তাদের সঙ্গে লড়াই চালাতে লাগল।

অবশেষে অনেক যুক্তি-তর্ক-চিৎকার-উত্তেজনার পর মোটামুটি একটা সন্ধি হল। যেহেতু ডানিয়েল তাদের যথেষ্ট উপকার করেছে এবং সুভদ্রার নীরব সমর্থন আছে সেই কারণে জনতা গণেশ-রতির অসবর্ণ বিয়ে মেনে নিল, তবে একটা শর্তে। প্রথাবিরুদ্ধ কাজের জরিমানাস্বরূপ রতির বাপ টিকলরাম আর গণেশের বাপ মধুকরকে তাদের নিজের নিজের জ্ঞাতিগোষ্ঠিকে ভোজ দিয়ে সন্তুষ্ট করতে হবে এবং ব্রাহ্মণ ডাকিয়ে একটা প্রায়শ্চিত্ত করে নিতে হবে।

ডানিয়েল প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল কিন্তু সুভদ্রা তাকে থামিয়ে দিয়েছে। সংস্কার ভাঙতে ওরা রাজী হয়েছে—এটাই এখানকার জীবনে নিদারুণ ঘটনা। তার ওপর ওদের সামান্য দাবীটুকু যদি মেনে না নেওয়া হয় তা হলে বিগড়ে যেতে কতক্ষণ? প্রথমেই সব দিক থেকে চাপ দেওয়া ঠিক হবে না। ধীরে ধীরে কুসংস্কারের দুর্গগুলো ভাঙতে হবে। সুভদ্রার পরামর্শ ডানিয়েলের যুক্তিসঙ্গত মনে হল।

এদিকে আরেকটা কাণ্ড ঘটে গেল। জনতার শর্ত শুনে রতির বাপ গণেশের বাপ—দু'জনে তড়াক করে লাফিয়ে উঠেছে। তারা বলল, 'আমরা গরীব লোক, এত লোককে খাওয়াব কোত্থেকে? বামুন ডাকিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করবার পয়সাও আমাদের নেই।'

জনতা গর্জে উঠল, 'তা হলে এ বিয়ে আমরা মানব না।'

ব্যাপারটা যে এ রকম ভয়ানক দিকে ঘুরবে, ডানিয়েল ভাবতে পারে নি। প্রথমটা বিমূঢ় হয়ে রইল সে। অসহায়ের মত সুভদ্রার দিকে তাকাল কিন্তু ঘটনার আকস্মিকতায় সুভদ্রাও কেমন বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে।

এদিকে জনতা উত্তেজিত চিৎকার জুড়ে দিয়েছে।

একটুক্ষণ মাত্র। তারপরেই সামনের দিকে দু-হাত বাড়িয়ে সবাইকে শান্ত করল ডানিয়েল, 'এই থাম, থাম সবাই।'

জনতা চুপ করলে ডানিয়েল বলল, 'তোমরা যা বলেছ টিকলরাম আর মধুকর তা-ই করবে। আত্মীয়-স্বজনকে খাওয়াবে, প্রায়শ্চিত্ত করবে।'

টিকলরাম আর মধুকর চেঁচামেচি করে উঠল, 'পাগলের মত কী বলছ সাহেব? আমরা কেমন করে খাওয়াব? আমরা গরীব লোক। হে গণপতি, কী বিপদে যে সাহেব আমাদের ফেললে। এমন জানলে কোন শালা এখানে আসত।'

জনতা রুখে উঠল, 'কি সাহেব, ও হারামজাদারা তো রাজী নয়।'

ডানিয়েল ব্যস্তভাবে বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, রাজী।'

'তুমি তো বলছ কিন্তু ওরা তো অন্যরকম গাইছে। শালারা ভিন্ জাতে ছেলেমেয়ের বিয়ে দেবে আর খাওয়াবার বেলায় বুক চড় চড় করে!'

জনতাকে কিছু না বলে ডানিয়েল দ্রুত টিকলরাম আর মধুকরের কাছে চলে এল। তাদের কানে মুখ গুঁজে ফিসফিসিয়ে বলল, 'খরচের জন্য তোমাদের চিন্তা নেই, যা লাগবে আমি দেব।'

টিকলরাম আর মধুকর এবার মধুর হেসে বলল, 'তা হলে আমাদের আপত্তি নেই।'

জনতা ক্ষিপ্ত হতে শুরু করেছে। তারা বলল, 'শালা দুটো তো কিছুই বলছে না। খাওয়াবে কিনা, প্রায়শ্চিত্ত করবে কিনা, আমরা স্পষ্ট জানতে চাই।'

ডানিয়েল দু-জনকে সামনে ঠেলে দিল। ইঙ্গিতে বলল, 'বল।'

টিকলরামেরা বলল, 'বেশ তোমরা যখন চাইছ, খাওয়াব। প্রায়শ্চিত্ত করব।'

সোল্লাসে জনতা এবার চিৎকার করে উঠল। টিকলরামদের ঘোষণায় তারা খুশি হয়েছে।

অতএব গণেশ-রতির বিয়ে পাকা হয়ে গেল। আগের ব্যবস্থা অনুযায়ী তারপর শুরু হল পালাগান।

ভোর রাতে গান শেষ হল।

জনতা এবং গাইয়েরা, কেউই ডানিয়েল এবং সুভদ্রাকে ছাড়ে নি। কাজেই রাতভর গান শুনতে হয়েছে। অবশ্য আনন্দের এই হাট থেকে তাদের নিজেদেরই চলে যাবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ছিল না।

বিপুল উৎসাহে গান শুনে ডানিয়েল আর সুভদ্রা এখন গ্রামের ভেতরে চলেছে। ডানিয়েলের বাসনা, বাকি রাতটুকু ভামুয়া বুড়ির বাড়ি গিয়ে ঘুমোবে। সুভদ্রা ঘুমোতে যাবে গঙ্গাবাঈয়ের কাছে।

গান ভাঙার পর ভিন্ গ্রামের লোকেরা লণ্ঠন জ্বালিয়ে চলে যেতে শুরু করেছে। দূর থেকে তাদের টুকরো টুকরো কথা ভেসে আসছে। এ গ্রামের বাসিন্দা যারা, তারাও যে যার ঘরে ফিরে যাচ্ছে।

এখনও অন্ধকার আছে, আকাশময় রাশি রাশি তারা ছড়ানো। ঝোপঝাড় থেকে অশ্রান্ত বিলাপের মত ঝিঁঝিদের একটানা কান্না ভেসে আসছে।

যেতে যেতে সুভদ্রা বলল, 'সত্যি, অসাধ্য সাধন করলেন। এ অঞ্চলের পক্ষে অসবর্ণ বিয়ে রীতিমত এক বিপ্লব।'

প্রশংসায় মাথা নুয়ে পড়ল ডানিয়েলের। কোন উত্তর দিল না।

সুভদ্রা আবার বলল, 'আপনি যা করলেন, আমি কোনোদিন তা পারতাম না। এ আমার সাধ্যের বাইরে।'

মুখ না তুলে অস্ফুটে ডানিয়েল বলল, 'কিন্তু—'

'কী?'

'রতি গণেশের বিয়ের ব্যাপারে যা করেছি, তা কি আমিই কোনোদিন করতে পারতাম! পেরেছি শুধু—' বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেল ডানিয়েল।

সুভদ্রা বলল, 'চুপ করলেন কেন, বলুন।'

ডানিয়েল বলল, 'বলতে ভরসা পাই না যে।'

সুভদ্রা হাসল, 'নির্ভয়ে বলতে পারেন।'

গীর্জাবাসিনী মেয়েটা আজ উদার হয়ে গেছে। ডানিয়েল সম্বন্ধে তার প্রাণে সংশয়ের ছায়ামাত্র নেই। যদি কোন অস্বস্তিকর রসিকতা সে করেও বসে আজ সুভদ্রা তা ক্ষমা করে দেবে।

ডানিয়েল বলল, 'পেরেছি শুধু আপনার জন্যে।'

'আমার জন্যে!' সুভদ্রা হতবাক।

'হ্যাঁ, আপনারই জন্যে। আপনার কাছ থেকেই এ কাজের শক্তি পেয়েছি।'

'কিন্তু—'

'কী?'

'এ ব্যাপারে কোনোদিন কোনো উৎসাহ আপনাকে দিয়েছি বলে তো মনে পড়ে না। বরং প্রবল বাধাই দিয়েছি। আর আপনি বলছেন, আমার কাছ থেকে শক্তি পেয়েছেন।'

'হ্যাঁ, বলছি।'

'কিন্তু—' বিস্ময়টা কিছুতেই যাচ্ছে না সুভদ্রার।

'কিন্তুর কিছু নেই।' ডানিয়েল বলতে লাগল, 'কে যে কিভাবে কার কাছে প্রেরণা পায়, শক্তি পায় তা সব সময় বলা যায় না। তবে আমার নিজের কথা বলতে পারি। আপনাকে দেখার পর ভাল করে চেনার পর মনে হয়েছে, জগতের অনেক দুরূহ

কাজ এখন আমি করে ফেলতে পারি।' বলতে বলতে হঠাৎ মুখ তুলে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে সুভদ্রার দিকে তাকাল।

সুভদ্রা কিছু বলল না। সন্ন্যাসিনীর সম্বন্ধে অসঙ্গত কিছু ভাবতে নেই। তবু মনে হয়, তার প্রাণের অতলে অসংখ্য তরঙ্গ বুঝিবা উদ্বেল হয়ে যাচ্ছে। নির্নিমেষ দৃষ্টিতে ডানিয়েলের দিকে সেও তাকিয়ে রইল।

এরপর অসীম স্তব্ধতা। তবু মনে হচ্ছে সত্তার গভীরে অসংখ্য শব্দই বুঝি উচ্চারিত হচ্ছে। নীরবতাও যে মুখর ভাষাময় হয়ে উঠতে পারে তা কে জানত।

ভামুয়া বুড়িকে ডেকে একটা শতরঞ্চি আর একখানা বালিশ নিয়ে শুয়ে পড়ল ডানিয়েল। কিন্তু চোখের পাতায় ঘুম এল না। অশান্ত ভ্রমরের মত ঘুরে ঘুরে সুভদ্রার মুখটা তার চারপাশে চক্র দিয়ে ফিরতে লাগল।

মানচিত্রের ব্যস্ত কোলাহলময় অংশ থেকে অনেক, অনেক দূরে ব্রাত্যদের এই গ্রাম। এখানে, এই কোঙ্কন উপকূলে নিজের পলাতক জীবনের একটা সত্য আজ আবিষ্কার করেছে ডানিয়েল এবং সে কথা সুভদ্রার কাছে বলেও এসেছে।

সেই সত্যটা হল স্বয়ং সুভদ্রা—ডানিয়েলের সমস্ত কাজের প্রেরণারূপিনী সে।

এখানে আসার সেই প্রথম দিনটি থেকে আজ পর্যন্ত সমস্ত ঘটনাই এই মুহূর্তে মনে পড়ছে ডানিয়েলের। তার যা জীবন তাতে জেলে এবং মুক্তোচাষীদের মত নগণ্য মানুষগুলোর সঙ্গে একাত্ম হবার প্রেরণা কোথায় ছিল? এই অজানা দেশে আজ যে চিরাচরিত সংস্কার ছিন্ন করে অসবর্ণ বিয়ে স্থির করে এল, ডানিয়েল জানে, এত বড় শক্তি তার কোনোদিনই ছিল না।

সুভদ্রা এ বিয়েতে বাধা দিয়েছে, নিষেধ করেছে তবু তার জীবন থেকেই প্রেরণা পেয়েছে ডানিয়েল, তার কাছ থেকেই শক্তি সংগ্রহ করে পুরনো প্রথার দুর্গ ভেঙেছে।

কিভাবে সুভদ্রার কাছ থেকে প্রেরণা পাওয়া গেছে? তার উত্তর নিতান্ত সহজ।

এ গ্রামে পা দিয়েই ডানিয়েল টের পেয়েছে, এই মেয়েটার দেহ-মন-আত্মা-শক্তি-কর্মক্ষমতা—সব কিছু মানুষের কল্যাণে মানুষের মঙ্গলে নিবেদিত। বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় নিজেকে সে উৎসর্গ করে দিয়েছে। এ অঞ্চলের মানুষের জন্য নিজের দিকে তাকাবার অবকাশটুকু পর্যন্ত তার নেই। নিজের সুখ, আনন্দ, বিলাস, আরাম—সব কিছু মুঠোয় পুরে সে আরবসাগরে ভাসিয়ে দিয়েছে।

সুভদ্রার জীবন, তার প্রতিদিনের কাজকর্ম, মানুষের জন্য তার অফুরন্ত মমতা —এ সবের মধ্য থেকেই তিলে তিলে উদ্দীপনা সংগ্রহ করে যাচ্ছে ডানিয়েল। মেয়ে বলে সুভদ্রা সব বাধাবন্ধন ছিন্ন করতে সাহস পায় না, আবহমান কালের প্রথার বিরুদ্ধে, রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে দ্বিধাগ্রস্ত হয়। তবু ডানিয়েলের

শক্তির কেন্দ্রে বসে আছে সে-ই। তার সমস্ত প্রেরণার উৎসই ঐ মেয়েটা—গীর্জাবাসিনী সুভদ্রা জোসেফ।

অথচ—অথচ এখানে আসার আগে জীবনটা কেমন ছিল ডানিয়েলের? সে কথা ভাবতে গেলে স্তম্ভিত বিস্ময়ে অবাক হয়ে যেতে হয়।

ভোর রাতের এই নিদ্রাবিহীন প্রহরে সুভদ্রার কথা ভাবতে গিয়ে কিন্তু তুলনামূলকভাবে সেই জীবনটার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে।

তিন পুরুষ ধরে তাদের লর্ড ফ্যামিলি। তার আগে তারা ছিল ভূস্বামী, হ্যাম্পেস্টেডশায়ারের বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে তাদের ছিল জমিদারি। লর্ড উপাধির গৌরব তখনও তারা পায় নি, ঠাকুরদার বাবা বিগত শতাব্দীর শেষভাগে ব্রিটিশ মিশনের সঙ্গে ব্রহ্মদেশে এসেছিলেন। সেখানে রাজা থিবোর বিরুদ্ধে যুদ্ধের পুরস্কার স্বরূপ লর্ড খেতাব পেয়েছিলেন। ঠাকুরদার বাবা ছিলেন লর্ড ইলিংওয়ার্থ ডন ফ্রান্সিস অব হ্যাম্পেস্টেডশায়ার। ঠাকুরদা লর্ড হ্যামিল্টন ডন ফ্রান্সিস অব হ্যাম্পেস্টেডশায়ার। বাবা লর্ড হাঙ্গারফোর্ড ডন ফ্রান্সিস অব হ্যাম্পেস্টেডশায়ার। তাঁর ছেলে ডানিয়েল স্বয়ং। তার নামের আগে 'হিজ লর্ড শিপ' শব্দটা এখনও যুক্ত হয় নি।

তিন পুরুষ অর্থাৎ প্রায় পঁচাত্তর বছর ধরে হাউস অব লর্ডসের এক কোণে ঠাকুরদার বাবা যে সিংহাসনখানা পেতে রেখে গিয়েছিলেন, পুরুষানুক্রমে তস্য পুত্র ঠাকুরদা এবং তস্য পুত্র বাবা সেখানে গিয়ে বসছেন।

বাবার ইচ্ছা, তাঁর পর বংশানুক্রমিক সেই রাজাসনখানায় ডানিয়েল গিয়ে বসবে। সে জন্য প্রচেষ্টার অন্ত নেই তাঁর। শুধু লর্ডশিপের গৌরবটাই বাবার কাঙ্ক্ষিত নয়। তাঁর বাসনা, ছেলে শুধু লর্ড সভাতেই টিমটিম করবে না, ব্রিটিশ কূটনৈতিক সারভিসে যাতে খ্যাতিমান হয়ে উঠতে পারে সে দিকে তাঁর সতর্ক দৃষ্টি।

ইংরেজ জাতের রক্ষণশীলতা প্রবাদের মত। ঐ বস্তুটির কেন্দ্রবিন্দুতে তাদের সর্বস্বত্ব বাঁধা। তা ছাড়া নিয়মতন্ত্রের প্রতি তাদের সীমাহীন আনুগত্য।

এমনিতেই সমস্ত জাতটা নিয়ম মেনে চলতে অভ্যস্ত। তাদের মধ্যে লর্ড সম্প্রদায়ের নিয়মতন্ত্র আবার প্রচণ্ড রকমের কড়া। নিজেদের চারপাশে অসংখ্য প্রাচীর তুলে তারা আত্মগোপন করে থাকতে ভালবাসে। পাছে অন্যদের ছোঁয়ায় লেগে স্পর্শদোষ ঘটে যায়, পাছে কমনারদের নিশ্বাসের ছোঁয়ায় তাঁদের বাইবেল অশুদ্ধ হয়ে যায় সে জন্য লর্ডদের সতর্কতার শেষ নেই। চারদিকের দুয়ার বন্ধ করে একটা রুদ্ধশ্বাস জগতে নিজেদের জীবনকে তারা আটকে রেখেছে।

এখানে আসার আগে অক্সফোর্ডের ছাত্র ছিল ডানিয়েল। রাজনীতি বিজ্ঞান অর্থনীতি পরিসংখ্যান এবং অঙ্ক—বিশ্ববিদ্যালয়ে এ সব ছিল তার পাঠ্য বিষয়। বাড়িতে যে কঠোর আচরণবাদের মধ্যে তাকে জীবনের বাইশ তেইশটা বছর কাটাতে হয়েছে তার বুঝি তুলনা নেই। সেখানে যে বাতাস বইত তা এত ভারী যে ফুসফুসে টানতে গিয়ে দম বন্ধ হয়ে আসত। সূর্যের যে আলো সেখানে পৌঁছত তা স্বচ্ছ, উদার বা পর্যাপ্ত নয়। একটা ঘষা কাঁচের মধ্য দিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে তা যেন সেখানে যেত।

মোট কথা জগতের যে আলো স্বাভাবিক, যে বাতাস স্বচ্ছন্দ, যা কিছু স্বতঃস্ফূর্ত তাদের প্রবেশাধিকার সেখানে ছিল না।

ভবিষ্যৎ লর্ড ডানিয়েলের প্রতিটি পদক্ষেপ ছিল নিয়ন্ত্রিত। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে মেডিকেটেড জলে স্নান সেরে পড়াশোনা। তারপর ডাইনিং হলে গিয়ে পুরো এটিকেট মেনে মা-বাবার সঙ্গে ব্রেকফাস্ট। ব্রেকফাস্টের পর ইউনিভার্সিটি। মা-ই সেখানে পৌঁছে দিতেন। দিয়ে আসার সময় প্রতিদিন সতর্ক করে আসতেন, অন্য ছাত্রদের সঙ্গে ডানিয়েল যেন বেশী ঘনিষ্ঠতা না করে, যতটুকু ভদ্রতা তার বেশি কারো সঙ্গে আলাপ রাখার প্রয়োজন নেই। কাঁটায় কাঁটায় একটা বাজলে মা-ই আবার সোফার নিয়ে ইউনিভার্সিটি থেকে তাকে বাড়ি নিয়ে আসত। ড্রেস ছেড়ে ব্যাকরণ-সম্মত লাঞ্চের পোশাকে দ্বিপ্রাহরিক খাওয়া সারত। তারপর আবার ইউনিভার্সিটি। বিকেলে মা আর তাকে আনতে যেতেন না সোফার নিয়ে আসত।

বিকেলে আরেক বার স্নান সেরে কিছু খাওয়া, তারপর বাবার সঙ্গে কিছুক্ষণ টেনিস খেলা। অবশেষে ম্যাসেজ। সন্ধ্যের পর ডিপ্লোমেটিক এটিকেট শেখাবার জন্য একজন রিটায়ার্ড কূটনীতিবিদ আসতেন। তিনি যাবার পর মা-বাবার সঙ্গে আদব কায়দা মেনে ড্রিঙ্ক, তারপর আসতেন বল্ শেখাবার মাষ্টার। অতঃপর ডিনার স্যুট পরে খাবার ঘরে যাওয়া। খাওয়ার পর বিধিসম্মতভাবে মা-বাবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শুতে যাওয়া।

এই ছিল ডানিয়েলের প্রতিদিনের জীবন। এ ছাড়া আরো কিছু কিছু দিক ছিল।

বিভিন্ন দূতাবাস থেকে প্রায়ই মা-বাবার নামে নিমন্ত্রণ আসত। মাঝে মাঝে তাঁরা ডানিয়েলকেও সঙ্গে নিয়ে যেতেন। তাকে সে সব জায়গার শিষ্টাচার শেখানোই ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য।

গ্রীষ্মে সমুদ্রতীরের কোন স্বাস্থ্য নিবাসে বাবা-মা ডানিয়েলকে নিয়ে যেতেন। প্রতি শীতে তারা যেত স্কাণ্ডিনেভিয়ার কোন দেশে। সেখানে কস্টিউম পরে বালুকাবেলায় মা-বাবার সঙ্গে স্যাণ্ডব্যাথ বা সানবাথ করত।

যত সহজে কথাগুলো বলা গেল, আসলে ব্যাপারগুলো তত সহজ নয়। ইউনিভার্সিটির কয়েকটা ঘণ্টা বাদ দিলে প্রায় সর্বক্ষণই মা অথবা বাবার সতর্ক পাহারায় তাকে থাকতে হত।

জোরে একটু হাসলে মা এমনভাবে তাকাতেন যাতে ডানিয়েল ম্রিয়মাণ হয়ে যেত। কথা বলার সময় গলার স্বর বিশেষ পর্দা ছাড়িয়ে গেলে বাবা অসন্তুষ্ট হতেন। চলাফেরা-হাঁটা-হাসা—সবই ছিল তার নিয়ন্ত্রিত, মাপ-জোখ করা। ভবিষ্যৎ লর্ডকে নানা কঠিন আচরণের মধ্যে ঢালাই করে নেবার জন্য বাবা-মা কোনো ত্রুটি রাখেননি। ডানিয়েলের জীবনকে কঠোর ফ্রেমের মধ্যে তাঁরা পুরে দিতে চেয়েছিলেন।

কিন্তু ডানিয়েলের চরিত্রের মধ্যে বিদ্রোহের উপাদান ছিল। কিন্তু মা-বাবার ব্যক্তিত্ব এত প্রবল এতই সর্বব্যাপী যে তা প্রকাশের অবকাশ ছিল না।

ডানিয়েলের ইচ্ছা হ'ত গলা ফাটিয়ে হো হো করে হেসে ওঠে, কমনারদের মত রাস্তায় হল্লা করতে করতে যায়, বেপরোয়ার মত উদ্দাম বেগে যেখানে খুশি ছোটে।

জনসাধারণের জন্য নির্দিষ্ট পুলে ইচ্ছামত হাত-পা ছুঁড়ে খানিক সাঁতার কাটে। হিচহাইক করে অ্যাডভেঞ্চার-প্রিয় ছেলেদের মত দেশে দেশে ঘুরে বেড়ায়। সমস্ত রকম নিয়ম-বন্ধন ছিন্ন করে দিগ্বিদিকে নিজেকে ছড়িয়ে দেবার জন্য তার সমস্ত প্রাণ খাঁচার পাখির মত ছটফট করতে থাকত।

রাস্তায় যে মাতালটা টলতে টলতে রাতভর প্রলাপ বকে যেত, পিকাডেলি সার্কাসের কাছে যে ভিখিরিটা হ্যাট বাড়িয়ে দিয়ে ঘুরে ঘুরে ভিক্ষে করত অথবা যে ট্যাক্সি ড্রাইভারেরা লন্ডনের পথে পথে সারাদিন ছুটে বেড়াত—তারা সবাই ডানিয়েলকে ঈর্ষান্বিত করে তুলত। গল্পে-পড়া গৃহহীন বোহেমিয়ান আর মধ্য এশিয়ার যাযাবরদের স্বচ্ছন্দ মুক্ত জীবন তার প্রাণ কেড়ে নিয়ে যেত। বাবা-মা যে কঠোর নিয়মের ফ্রেমে তাকে পুরে দিয়েছেন সেটা ভেঙেচুরে যাযাবরদের দলে নাম লেখাতে ইচ্ছা করত। জগতে যা কিছু স্বাধীন, যা কিছু স্বচ্ছন্দ, যা কিছু মুক্ত— তা পশুই হোক, পাখিই হোক, আর আকাশের ভাসমান মেঘ বা তারাই হোক, সব দূর থেকে তাকে নিয়ত হাতছানি দিত।

কিন্তু প্রাণে যাই থাক, মা-বাবার নির্দেশিত পথেই এতকাল তাকে চলতে হয়েছে। তার বাইরে একটা পা ফেলারও উপায় ছিল না। কিন্তু ইণ্ডিয়ায় আসার পর সেই ফ্রেমটা ভেঙে ফেলতে পেরেছে ডানিয়েল। সুভদ্রা জোসেফ হাত ধরে এমন এক জীবনে পৌঁছে দিয়েছে যা ছিল চিরদিন তার নাগালের বাইরে, তার কল্পনার সুদূর সীমার ওপারে।

ডানিয়েলকে মাছমারাদের সঙ্গে ঘুরতে দেখলে, তাদের হিসেব লিখতে দেখলে, পোড়া রুটি-আমতি-গলা ভাত খেতে দেখলে বাবা-মা নিশ্চয়ই মূর্ছা যেতেন। কিন্তু নিয়ম-বন্ধনের আলো-বাতাসহীন ধূসর জগৎ থেকে পালিয়ে এসে যে উদার, মুক্ত জীবনের মুখোমুখি ডানিয়েল দাঁড়িয়েছে তার কাছে সে অসীম কৃতজ্ঞ। এই জীবন তার হাতে মুক্তির সনদ তুলে দিয়েছে, তার নিশ্বাস-প্রশ্বাস সহজ করেছে, বাবা-মা হাতে-পায়ে যে বেড়িগুলো পরিয়ে দিয়েছিলেন সেগুলো ভেঙে তার গতিবিধি অবাধ করেছে।

হাতের মুঠোয় এই জীবনটা যে তুলে দিয়েছে সে সুভদ্রা। তার কাছে ডানিয়েলের ঋণের অন্ত নেই। সুভদ্রার মুখ যতবার সে ভাবল ততবার বিচিত্র আবেগে বুকের ভেতরটা তরঙ্গিত হতে লাগল, হৃৎপিণ্ডে নাম-না-জানা উচ্ছ্বাসের ঢল নামল। মনে হল সমস্ত প্রাণ ক্রমশ গলে গলে একটা স্রোত হয়ে যাচ্ছে, আর সেই স্রোতে ডানিয়েলের সত্তা, অস্তিত্ব—সব কিছু ভেসে যেতে লাগল।

লণ্ডন শহরের সেই জীবনের পাশাপাশি কোঙ্কন উপকূলের এই পলাতক জীবনটাকে কাল ভোরে তুলনামূলক একটা বিশ্লেষণ করছিল ডানিয়েল। করতে করতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল, মনে নেই।

আজ উৎকট বাজনার শব্দে ঘুমটা ভেঙে গেল। চোখ মেলে ডানিয়েল প্রথমটা বুঝে উঠতে পারল না, কোথায় শুয়ে আছে। পর মুহূর্তেই কাল রাতেব ঘটনাগুলো বায়োস্কোপের ছবির মত তার ভাবনায় অতি দ্রুত ফুটে উঠল। পালা ভাঙার পর কোথায় এসে শুয়েছিল, তা-ও মনে পড়ল।

চারদিকে ভাল করে তাকিয়ে ডানিয়েল দেখল, অজস্র তেজী রোদে ভামুয়া বুড়ির ঘর ভরে গেছে। দেখতে দেখতে চোখ জ্বালা করতে লাগল। বোঝা গেল, বেলা বেশ চড়ে গেছে।

উঠতে যাবে, সেই সময় ভামুয়া বুড়ি ঘরে এসে ঢুকল। বলল, 'কি রে, ঘুম ভেঙেছে?'

'এই ভাঙল।' হাতের ভর দিয়ে উঠে বসল ডানিয়েল।

'এই নিয়ে সাত বার হল তোকে দেখতে আসছি। যত বারই আসি, দেখি তোর নাক ডাকছে।'

'ডাকোনি কেন? কত বেলা হয়ে গেল!'

'ভোরবেলা এসে তো শুয়েছিস। কাঁচা ঘুমটা ভাঙালে সারাদিন মাথা টিপ টিপ করত, চোখ জ্বালা করত, কোনো কাজে গা লাগত না।'

এই সময়ে বাইরের সেই বাজনাটা আরো উদ্দাম হয়ে উঠল।

ডানিয়েল বলল, 'কি ব্যাপার ঠাকুমা, কিসের বাজনা?'

'সং বেরিয়েছে।' ভামুয়া বুড়ি জানাল।

বুঝতে না পেরে ডানিয়েল জিজ্ঞেস করল, 'কিসের সং?'

'বাঘের সং। যা না, ঘরে বসে ন্যাজ না নেড়ে বাইরে বেরিয়ে একটু দ্যাখ।'

তড়াক করে লাফ দিয়ে বাইরের রাস্তায় চলে এল ডানিয়েল।

বিচিত্র ব্যাপার! দুটো লোক ভুষো কালি, পাটের ফেঁসো, পাট কিলে আর হলুদ রং, লোমশ টুপি, বাঘের দাঁত, নখ, গোঁফ আর খড়ের ল্যাজ দিয়ে বাঘ সেজে পায়ে ঘুঙুর লাগিয়ে নাচতে নাচতে চলেছে। নাচের সঙ্গে গানও জুড়ে দিয়েছে তারা ঃ

'গণপতি বাপ্পা মোরেয়া,
পুড়ছা বরষি লৌকর ত্রয়া।'

অর্থাৎ হে সিদ্ধিদাতা গণেশ, আগামী বছর আরো তাড়াতাড়ি আমাদের এখানে এসো, ইত্যাদি ইত্যাদি। গানের সঙ্গে সঙ্গে বাজনাও চলেছে। বড় বড় লোহার করতাল, ঢোল, জগঝম্প ইত্যাদি নানা বাদ্যযন্ত্রের শব্দে আকাশ ফেটে যাবার উপক্রম। বাজনা যত প্রবল হচ্ছে সং দুটোর নাচ তত উদ্দাম হয়ে উঠছে, গানের গলা উদারা মুদারার পরোয়া না করে একেবারে তারায় গিয়ে ঠেকেছে।

সব চাইতে বিস্ময়ের ব্যাপার, মনপুরা গ্রামের একটি মানুষও আর ঘরে নেই। বাঘের সং দেখার জন্য বৌরা, বাচ্চারা, বয়স্ক প্রাচীনেরা, কিশোরীরা, জোয়ানেরা, নবযুবতীরা—সবাই শোভাযাত্রা করে পিছু পিছু চলেছে। আর সমানে চেঁচামেচি জুড়ে দিয়েছে, 'ওয়াম আলো—' অর্থাৎ বাঘ এসেছে, বাঘ এসেছে।

অভিজ্ঞতাটা চমকপ্রদ বটে। কিছুক্ষণ অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল ডানিয়েল। তারপর কখন যে নিজের অজান্তে সেই শোভাযাত্রায় ভিড়ে গেল, খেয়াল নেই।

সেই মিছিলে কে নেই! টিকলরাম, ভাওজী, গ্রামের পশ্চিম দুয়ার আগলে যে বুড়ো দুটো সর্বক্ষণ বসে বসে চুট্টা ফোঁকে সেই যশোবন্ত আর নওলপতিকেও দেখা গেল। এমন কি যে মানুষ সব সময় সব কিছু থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে, সুখদুঃখ যাকে স্পর্শ করতে পারে না, উদাসীন আনমনে ছয়ঋতু বারোমাস যে সমুদ্রেই পড়ে থাকে সেই শিবরাম পর্যন্ত মিছিলে রয়েছে। গণপতি উৎসবের উদ্দামতা তাকেও দুলিয়ে দিয়েছে।

সং দুটোকে প্রথমে চিনতে পারছিল না ডানিয়েল। একটু লক্ষ্য করতেই বোঝা গেল একজন গণেশ, দ্বিতীয় জন এই গ্রামেরই আরেক জন জোয়ান, নাম বলবন্ত।

গাইতে গাইতে এবং নাচতে নাচতে গণেশ আর বলবন্ত চলেছে। পেছনে রয়েছে সেই বিচিত্র মিছিল।

যেতে যেতে একেকটা বাড়ি পড়ছে অমনি সং দুটো থেমে প্রচণ্ড উৎসাহে লম্ফঝম্ফ দিয়ে নেচে উঠছে, সেই সঙ্গে গণপতি উৎসবের গান। নাচগানের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাদ্য ঝনঝনাও চলছে। সম্মিলিত আওয়াজে মনপুরা গ্রাম চৌচির হয়ে ফেটে যাবে বোধ হয়।

যে যে বাড়ির কাছে শোভাযাত্রা থামছে সে-ই সে-ই বাড়ি থেকে সংদের মিঠাই কি পয়সা অথবা চাল-ডাল দেওয়া হচ্ছে।

এইভাবে খানিকটা চলার পর মিছিলটা গঙ্গাবাঈয়ের বাড়ির কাছে এসে পড়ল। সেখানে সুভদ্রাকে দেখা গেল। কাল ভোর রাতে সে গঙ্গাবাঈয়ের বাড়ি এসেছিল। সুভদ্রাও ডানিয়েলকে দেখেছে। দেখে স্নিগ্ধ একটু হাসল।

ডানিয়েলও হাসল। তারপর ভিড় ঠেলে সুভদ্রার কাছে চলে এল।

সুভদ্রা বলল, 'সংয়ের দলে ভিড়ে গেছেন দেখছি।'

'তা ভিড়েছি। কিন্তু না বুঝে।'

'মানে?'

'হঠাৎ গণেশ আর বলবন্ত বাঘ সাজতে গেল কেন, বুঝতে পারছি না।'

'গণেশ আর বলবন্ত কেন, দেখবেন এ অঞ্চলের অনেকেই বাঘ সাজবে।'

'কেন?'

সুভদ্রা বুঝিয়ে দিল, গণপতি পুজোয় বাঘের সং সাজা মহারাষ্ট্রের লৌকিক রীতি। এ রীতি অনেকেই মেনে চলে। আরো একটা মজার খবর দিল সুভদ্রা। গণেশ পুজোর চতুর্থ এবং পঞ্চম দিনে আশেপাশের দশখানা গ্রামের বাসিন্দাদের মধ্যে সং সাজার

এবং নাচ-গান-বাজনার প্রতিযোগিতা হবে। শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগীকে পুরস্কার দেবার বন্দোবস্ত আছে।

ডানিয়েল উৎসাহিত হয়ে উঠল, 'প্রতিযোগিতা কোথায় হয়?'

'একেক বার একেক গ্রামে হয়, এবার হবে 'সুখনা'তে।'

'কে শ্রেষ্ঠ, তার বিচার কে করবেন?'

'রেভারেণ্ড আপ্তে।'

'এবার কম্পিটিশনটা হচ্ছে কবে?'

'কাল।'

একটু চিন্তা করে ডানিয়েল বলল, 'সে সময় আপনি সুখ্‌নাতে যাচ্ছেন তো?'

'নিশ্চয়ই।' সুভদ্রা বলল, 'দশ গাঁয়ের একটা লোকও ঘরে থাকবে নাকি? সবাই কাল সুখনাতে ছুটবে।'

এদিকে গঙ্গাবাঈকে নাচ দেখিয়ে গান শুনিয়ে সংয়েরা এগিয়ে চলেছে।

সুভদ্রা বলল, 'ওরা তো চলল। আপনি যাবেন না?'

'হ্যাঁ, যাব।' ডানিয়েল ঘাড় কাত করল। তারপর সুভদ্রার চোখে চোখ রেখে বলল, 'এখন আপনার কাজ আছে কিছু?'

'না, কেন?'

'তা হলে আপনাকেও যেতে বলতাম আমার সঙ্গে।'

একটু দ্বিধা করে সুভদ্রা বলল, 'বেশ, চলুন।'

যেতে যেতে ডানিয়েল বলল, 'দেশ ঘুরলে নানারকম অভিজ্ঞতা হয়, না কি বলেন?'

'তা তো হয়ই।'

'বাঘ সাজা যে উৎসবের অঙ্গ হতে পারে, এখানে না এলে কোনোদিন কি জানতে পারতাম! সত্যি ভারি ইন্টারেস্টিং।'

'জগতে কত ইন্টারেস্টিং ব্যাপার যে আছে!' সুভদ্রা হাসল।

একটু চুপচাপ।

তারপর সুভদ্রা বলল, 'কাল বিকেলে কম্পিটিশন হবে। আমি দুপুরবেলা সুখনাতে চলে যাব। আপনি আমার সঙ্গে যাবেন নাকি?'

কি ভেবে ডানিয়েল বলল, 'না।'

'কেন, এখন আবার আপনার কি কাজ!'

'কোন কাজ নেই। গণপতি উৎসবের সময় ওরা মাছ ধরতে যায় না। আমি একেবারে বেকার হয়ে পড়েছি।' ডানিয়েল হাসতে লাগল।

'তবে আর কি, আমার সঙ্গেই যাবেন।' সুভদ্রা বলল।

'উঁহু—' আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল ডানিয়েল। তারপর অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। খুব সম্ভব মনে মনে একটা ভাবনার খেলা চলতে লাগল তার।

নিজের স্বভাবের বিরুদ্ধে গিয়ে আজ যেন অনেকখানি প্রগলভতটাই হয়ে উঠেছে সুভদ্রা। চোখ কুঁচকে ঘাড় বেঁকিয়ে ঈষৎ উঁচু গলায় বলল, 'উঁহু কেন? আমার সঙ্গে গেলে কি বাইবেল অশুদ্ধ হয়ে যাবে!'

সুভদ্রার স্বরের উত্থান-পতন লক্ষ্য করলেও সে সম্বন্ধে ডানিয়েলের মনোযোগ ছিল না। দূরমনস্কের মত সে বলল, 'কাল দুপুরবেলা আপনি একাই চলে যাবেন, আমি পরে যাব।'

আর কিছু বলল না সুভদ্রা। তার যা স্বভাব তাতে যে প্রগলভতাটুকু সে ইতিমধ্যেই করে ফেলেছে তা যদি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে লজ্জায় মাথা কাটা যাবে। কিন্তু এখন তা বিশ্লেষণ করে দেখার সময় নয়। তবু ডানিয়েল যে এভাবে তার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করবে, তা ছিল অকল্পনীয়। সুভদ্রার আত্মবিশ্বাস ছিল অপরিসীম। হয়ত তার ধারণা ছিল, সে হাতছানি দিলেই ডানিয়েল ছুটে যাবে। তা ছাড়া ডানিয়েলের ওপর তার একটা অধিকারবোধও সম্ভবত জন্মে গিয়েছিল। এ গ্রামে তারই জন্য আশ্রয় পেয়েছে ডানিয়েল, সে-ই সেবায় শুশ্রূষায় অসুস্থ ডানিয়েলকে সারিয়ে তুলেছে। তারপর ভাষা শেখানো থেকে শুরু করে এখানকার জীবনের অন্তঃপুরে তার হাত ধরে পৌঁছে দিয়েছে।

কাজেই সুভদ্রা যদি ডাক দেয় ডানিয়েলের তো ছুটে যাওয়াই উচিত। কিন্তু অকৃতজ্ঞ বিদেশী কাল তার সঙ্গে সুখনাতে যেতে রাজী নয়। সুভদ্রা যতখানি ক্ষুব্ধ হল, তার চাইতে অনেক বেশি হ'ল আহত। গীর্জাবাসিনী সুভদ্রা জোসেফ আপন স্বভাব থেকে যতখানি বেরিয়ে এসেছিল এবার তার দশগুণ নিজেকে গুটিয়ে নিল। অস্বাভাবিক থমথমে এবং গম্ভীর মুখে সে ডানিয়েলের পাশাপাশি চলতে লাগল।

ডানিয়েল বলল, 'কারা প্রতিযোগিতায় নাম দেবে?'

'জানি না।' নিস্তরঙ্গ সুরে জবাব দিল সুভদ্রা।

'বলতে পারেন।'

'এর আগের বছর কোন গ্রাম বেস্ট হয়েছিল?'

'জানি না।'

'আচ্ছা—'

প্রথমটা লক্ষ্য করেনি ডানিয়েল, নিজের ভাবনার মধ্যেই সে মগ্ন হয়ে ছিল। এবার কানে সুভদ্রার স্বরটা বেসুরো বাজল। একটু আগে সুভদ্রার গলায় যে প্রগলভতা ছিল এখন তার চিহ্নমাত্র নেই। অর্বাচীন বিদেশী কারণটা বুঝতে না পেরে খানিক অবাক হয়েই পার্শ্ববর্তিনীর দিকে তাকাল। বলল, 'কি ব্যাপার, হঠাৎ এমন গম্ভীর হয়ে গেলেন যে!'

কড়া গলায় সন্ন্যাসিনী ধমক লাগাল, 'ইয়ার্কি দিতে হবে না।'

ইয়ার্কিটা যে কোথায় দিল তা বুঝতে না পেরে ডানিয়েল বিমূঢ়। হাসি-খুশি উচ্ছ্বাস থেকে কড়া প্রকৃতির গম্ভীর সন্ন্যাসিনীতে মুহূর্তে সুভদ্রার রূপান্তর তাকে স্তম্ভিত করে দিয়েছে। উত্তর অবশ্যই সে একটা দিতে পারত কিন্তু দেবার মত সাহসটাই সংগ্রহ করে উঠতে পারল না।

প্রাচ্যের মেয়েগুলো বোধহয় ভারি বিচিত্র। ডানিয়েল ভাবল, এই মেঘ এই রোদের মত তাদের মনও সম্ভবত দ্রুত বদলে যায়।

একটি কথাও বলছে না সুভদ্রা, ডানিয়েলের দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না। মুখটা অন্য দিকে ঘুরিয়ে কঠিন অনমনীয় ভঙ্গিতে হেঁটে চলেছে।

একসময় শোভাযাত্রাটা রতিদের বাড়ির সামনে এসে পড়ল। গান-বাজনার শব্দে রতিরা সবাই ছুটে বেরিয়ে পড়েছে। টিকলরাম, টিকলরামের বৌ, রতি এবং রতির ভাইবোনেরা—সবাই সং দেখে খুব মজা পেয়েছে। প্রচুর হাসছে তারা, হাসতে হাসতে পরস্পরের গায়ে ঢলে ঢলে পড়ছে। তারই মধ্যে হাততালি দিয়ে উঠছে।

টিকলরাম আর গণেশের বাপ যেদিন রতি-গণেশকে তার ঘর থেকে টানতে টানতে নিয়ে এসেছিল তারপর মাত্র বার তিনেকের মত রতিকে দেখেছে ডানিয়েল। তিন বারই অত্যন্ত করুণ, বিমর্ষ এবং বিষাদময়ী মনে হয়েছিল তাকে। এতদিন পর মেয়েটা তার উচ্ছ্বসিত প্রাণবন্ত স্বভাবের মধ্যে নিজেকে ফিরে পেয়েছে। সবার হাসি সবার উচ্ছ্বাস ছাপিয়ে সে হেসে উঠেছে। প্রমত্ত জোয়ারে মেয়েটা যেন গা ভাসিয়ে দিয়েছে।

ডানিয়েলের মনে হল, বিয়ে ঠিক হয়ে যাবার খবরটা নিশ্চয়ই পেয়ে গেছে রতি। তার পেছনে লেগে, তাকে ঝালাপালা করার লোভটা কিছুতেই ঠেকিয়ে রাখতে পারল না সে। সুভদ্রার কথা আর খেয়াল রইল না। দুই ঠোঁটের মাঝখানে কৌতুকের একটু হাসি দুলিয়ে রেখে দু-হাতে ভিড় ঠেলে খুব দ্রুত রতির পেছনে এসে দাঁড়াল ডানিয়েল।

হাস্যময়ী টগবগে মেয়েটা এখনও হেসেই চলেছে। হাসতে হাসতে তার কালো সুঠাম শরীর যেন ঝড়ের দোলায় একেক বার নুয়ে পড়েই পরক্ষণে সোজা হয়ে উঠছে।

আস্তে করে তার মাথায় একটা টুসকি দিল ডানিয়েল। চমকে রতি ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। চোখাচোখি হতেই ঠোঁট টিপে চোখ গোল করে ভ্রূ দুটো ওপর দিকে টেনে তুলল। অর্থাৎ ব্যাপারখানা কী? এত হাসি কি জন্য?

হাসির উচ্ছ্বাসটা বাইরে থেকে এবার ভেতর দিকে গিয়ে থমকাল। অবশ্য বাইরে যে তার ছিটেফোঁটা দেখা গেল না, তা নয়। চোখের কালো তারায় তা ছলকাতে লাগল। ঠোঁটে দাঁত গেঁথে সে-ও ভুরুদুটো ওপর দিকে তুলল।

রতির এত আমোদের কারণটা ডানিয়েল ইঙ্গিতে আবার জানতে চাইল।

চোরা চোখে একবার বাবা-মা-ভাইবোনদের দেখে নিল রতি। ওরা সংএর দিকে তাকিয়ে মশগুল হয়ে আছে। ফিসফিসিয়ে বলল, 'হাত-মুখ ঘোরাচ্ছ কেন? আমাদের ভাষা তো জান।'

রতি-গণেশকে যেদিন তার ঘর থেকে টেনে আনা হয়েছিল সেদিন মারাঠী জানত না ডানিয়েল। তার ধারণা ছিল, ইতিমধ্যে সে যে ভাষাটা শিখে নিয়েছে সে খবর রতি জানে না। এই নিয়ে একটু কৌতুক করার লোভ ছিল তার প্রাণের কোণে।

ডানিয়েল বলল, 'আমি তোমাদের ভাষা জানি, তোমাকে সে খবর কে দিলে?'

'দেবার লোকের অভাব আছে নাকি? তা ছাড়া—'

'কী?'

'আমি সবার সব খবর জানি।'

'ঠিক বলছ?'

'হুঁ—' জোরে জোরে ঘাড় নেড়ে রতি বলল।

ঠোঁট আগেই টেপা ছিল, সেখানে আরো গভীর খাঁজ পড়ল। চোখের তারায় এবার কৌতুক আর দুষ্টুমি একসঙ্গে চিকচিকিয়ে উঠল। গলা নামিয়ে ডানিয়েল বলল, 'সবার সব কথা তো জানো।' সং দু'জনের মধ্যে গণেশকে দেখিয়ে প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা বল তো, ও কে?'

মুহূর্তে সারা মুখে রক্তোচ্ছ্বাস খেলে গেল রতির। চোখ নামিয়ে চাপা আধফোটা সুরে সে বলল, 'আমি জানি না।'

গণেশকে চিনতে তা হলে ভুল করেনি রতি। বাঘের সংয়ের মধ্য থেকেও যথাযথ তাকে চিনে ফেলেছে। ডানিয়েল বলল, 'তবে যে বললে, সব জানো?'

'আহা, সব জানা আর এ জানা এক নাকি! কিসের সঙ্গে কি!'

'আমি বলব, ও কে?'

'কে?' চোখ না তুলেই জানতে চাইল রতি। 'সত্যি বলব কে?'

'বলতেই তো বললাম।'

'বুড়ো যশোবন্ত, ঐ যে পশ্চিম দিকে বসে দিনরাত চুট্টা ফোঁকে।'

'তোমাকে বলেছে!'

প্রাণের ভেতর হাসি ফেনিয়ে উঠছিল। সেটা চেপে রেখে মুখখানা গম্ভীর করে ডানিয়েল বলল, 'তা হলে ট্যারা অর্জুন?'

রতি মুখ ঝামটা দিল, 'ট্যারা কোথায় দেখলে!'

'তবে কি খোঁড়া মুলকিরাম?'

'ও খোঁড়া! তোমার কি চোখ খারাপ হয়ে গেছে সাহেব?'

এবার অনেকখানি ঝুঁকে রতির কানের কাছে মুখ এনে ডানিয়েল ফিস ফিস করল, 'এতক্ষণে বোধহয় চিনতে পেরেছি।'

'পেরেছ নাকি!'

'হুঁ। গণেশ বলেই মনে হচ্ছে যেন।' ঠোঁট ছুঁচলো করে ডানিয়েল বলল।

এবার ক্ষিপ্র ভঙ্গিতে মুখ তুলল রতি, চোখের কৃষ্ণ তারকা কিসের রসে যেন ভাসো-ভাসো। কিছুক্ষণ খাঁচায় পাখির মত সে দুটো চোখের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ছোটাছুটি করে বেড়াল। পরক্ষণেই আবার মুখ নামাল রতি।

একটু চুপচাপ, তারপর ডানিয়েল বলল, 'কাল রাত্তিরে পালাগানের আসরে একটা কাণ্ড হয়েছিল। কী হয়েছিল জানো?'

থুতনিটা অল্প একটু তুলে চোখ বুজে জোরে জোরে মাথা নেড়ে রতি বলল, 'জানি না।' অর্থাৎ সে সবই জানে।

'জানো না যখন, এখন আমিই বলি।'

'বল।'

'কাল রাত্তিরে আমরা তোমার বিয়ে ঠিক করে ফেলেছি।'

রতি চুপ।

ডানিয়েল বলল, 'কার সঙ্গে করেছি জানো কি?'

'জানি না।' মুখ টিপে টিপে হাসল রতি।

'তা হলে জানিয়েই দিই।' ডানিয়েল বলতে লাগল, 'এ-গাঁয়ে ও-গাঁয়ে সাত গাঁয়ে ঘুরেও জোয়ান ছেলে তোমার জন্যে জোটানো গেল না। তাই—' রতির প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করার জন্য একটু থেমে আবার শুরু করল, 'তাই বুড়ো যশোবন্তকেই তোমার বর ঠিক করে ফেললাম।' বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

এবার থুতনিটা পুরোপুরি তুলে পরিপূর্ণ চোখে ডানিয়েলের দিকে তাকাল রতি। আঁখিতারায় কপট রাগ ফুটল, ঠোঁটে কিন্তু হাসি। কৌতুকে গলা ভিজিয়ে বলল, 'বেশ তো, ওকেই গলার মালা করে নেব।'

তাকিয়ে তাকিয়ে কোঙ্কন উপকূলের প্রাণবন্ত মেয়েটাকে কিছুক্ষণ দেখল ডানিয়েল। তারপর বলল, 'আর যদি গণেশের সঙ্গে ঠিক করে থাকি?'

ফিসফিসিয়ে রতি বলল, 'গলায় দড়ি দেব।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ গো সাহেব, হ্যাঁ।'

রতির থুতনির তলায় আঙুল রেখে ডানিয়েল বলল, 'তবে তাই দিও। আসছে মাসে গণেশের সঙ্গেই তোমাকে জুড়ে দেব।'

কিছুক্ষণ নীরবতা।

তারপর রতি গাঢ় স্বরে বলল, 'আমার জন্যে তুমি যা করেছ, নিজের লোকও তা করে না।'

'কি করেছি তোমার জন্যে?'

'জানি না, যাও।' রতি মুখ ঝামটা দিল।

ডানিয়েল হাসতে লাগল।

রতি আবার বলল, 'সত্যি আর জন্মে তুমি আমার মায়ের পেটের ভাই ছিলে।'

'আর জন্মের কথা তোমার মনে আছে?'

'জানি না।'

একটু চুপ করে থেকে ডানিয়েল বলল, 'কাল যে ব্যবস্থা হল তাতে খুশি তো?'

'ই-হি-হি-হি—।' মুখ ভেংচে, চোখের তারায় ডানিয়েলকে বিদ্ধ করে রতি বলল, 'জানি না, যাও। বাঁদর, শয়তান কোথাকার।' বলে ঠোঁটের প্রান্তে হাসতে লাগল।

আর মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকে দেখতে লাগল ডানিয়েল। একটা মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে পেরেছে। এমন তৃপ্তি জীবনে আর কখনও পায় নি সে। হাসি নয়, যেন তার দু-হাত সুধায় ভরে দিয়েছে রতি।

এদিকে গণেশরা নাচ দেখিয়ে গান শুনিয়ে রতির বাপের কাছ থেকে পার্বণী আদায় করে সামনের দিকে চলতে শুরু করেছে। তা লক্ষ্য করে ব্যস্তভাবে ডানিয়েল বলে উঠল, 'আমি এখন যাই।' বলেই শোভাযাত্রার দিকে ছুটল।

সুভদ্রা কিন্তু রতিদের বাড়ির কাছেই দাঁড়িয়ে পড়েছে। খুব সম্ভব আর সে যাবে না। ডানিয়েলের ইচ্ছা হল, তাকে ডেকে আবার সং-এর পিছু পিছু যায়। সেই উদ্দেশ্যে একবার দাঁড়িয়েও পড়ল। কিন্তু সুভদ্রার মুখের দিকে তাকিয়ে তাকে ডাকার উৎসাহটা কেমন স্তিমিত হয়ে গেল। কড়া মিশনারি নানের মুখে কোথাও এতটুকু কোমলতা নেই।

সুভদ্রার দিকে চোখ রেখে করুণ মুখে ধীরে ধীরে শোভাযাত্রায় মিশে গেল ডানিয়েল।

বিকেলে গণেশের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল ডানিয়েল। খুব বেশি অবশ্য খোঁজাখুঁজি করতে হল না। তাদের বাড়িতে যেতেই ওকে পাওয়া গেল।

ক'দিন আগেও তাকে দেখলে ভয়ানক বিব্রত বোধ করত গণেশ। পথে দেখা হলে অত বড় জোয়ান ছেলেটা কুঁকড়ে জড়সড় হয়ে ছুট লাগাত, দৈবাৎ চোখাচোখি হয়ে গেলে কী করবে ভেবে পেত না। মোট কথা ডানিয়েলের সঙ্গে দেখা হওয়ার ভয়ে সর্বক্ষণ সন্ত্রস্ত হয়ে থাকত গণেশ।

আশ্চর্য! আজ সেই গণেশের খাতিরের ঘটা দেখে মনে মনে না হেসে পারল না ডানিয়েল। এত আপ্যায়নের মর্মার্থ জলের মত সহজ, কাঁচের মত স্বচ্ছ। ডানিয়েল লক্ষ্য করেছে, কাল রাতে গানের আসরে যখন বিয়ের কথাবার্তা চলছিল সেই সময় এককোণে উদ্বিগ্ন মুখে শ্বাসরুদ্ধর মত বসেছিল গণেশ। তখন তাকে দেখে কি হাসি যে পাচ্ছিল ডানিয়েলের!

আজ রাস্তা থেকে হাত ধরে ডানিয়েলকে বাড়িতে নিয়ে গেল গণেশ। বাড়িতে সে ছাড়া এই মুহূর্তে আর কেউ নেই। উৎসবের দিনে সবাই বেড়াতে বেরিয়েছে।

ডানিয়েলকে নিয়ে কোথায় যে বসাবে, মাথায় রাখবে না মাটিতে রাখবে, কিছুই স্থির করে উঠতে পারছে না গণেশ।

খালি মেঝের একপাশে নিজেই বসে পড়ল ডানিয়েল।

'আরে আরে, বসে পড়লে যে! দাঁড়াও একটা কিছু পাতি।' গণেশ হাঁ-হাঁ করে উঠল।

'কিছু লাগবে না, খালি মেঝেই ভাল।'

'কি খাবে সাহেব, বল। ঘরে ভেলপুরী আছে, ভুট্টার খই আছে, কলা আর আনারস আছে। দইও বোধ হয় আছে। তুমি একটু বোসো, আমি নিয়ে আসছি।'

ডানিয়েল বলল, 'তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না। বোসো দিকি।'

ব্যস্ততা কিন্তু ঘুচল না গণেশের। বলল, 'তা-ই কখনো হয়?'

ডানিয়েল এবার আর কিছু বলল না। হাত ধরে গণেশকে বসিয়ে দিল।

করুণ মুখে গণেশ বলল, 'কিছু খাবে না তা হলে?'

'আরে না। খিদে পেলে নিশ্চয় খেতাম। না দিলে চেয়ে খেতাম। তোমাকে অত সাধাসাধি করতে হ'ত না।'

গণেশ আর কোন উত্তর দিল না বটে, তবে খুঁতখুঁতুনি তার গেল না।

মজাদার ভঙ্গিতে চোখ নাচিয়ে ডানিয়েল বলল, 'এখন খুব খাতির, অথচ ক'দিন আগে আমায় তো চিনতে পারতে না, দেখা হলেই পালাতে।'

ফস্ করে মুখটা একেবারে নিভে গেল গণেশের। তো তো করে কি একটা বলার চেষ্টা করল গণেশ কিন্তু গলার স্বর ফুটল না।

ডানিয়েল বলল, 'থাক, আর লজ্জা পেতে হবে না। রতিকে চেয়েছিলে, তাকে পেয়ে যাচ্ছ আসছে মাসে। খুশি তো?'

গণেশ চোখ নামাল, উত্তর দিল না।

ডানিয়েল বলল, 'উঁহু, চুপ করে থাকলে চলবে না। খুশি কিনা বলতেই হবে।'

গাঢ় গদগদ স্বরে গণেশ এবার যা বলল তা স্পষ্ট বোধগম্য হল না, তবে তার সারার্থ অস্পষ্ট রইল না।

ডানিয়েল বলল, 'থাক ওসব কথা। তোমার কাছে একটা বিশেষ দরকারে এসেছি গণেশ।'

'কী?' গণেশ জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল।

'শুনলাম, সুখনাতে কাল চারপাশের গাঁ থেকে বাঘের সং সেজে লোকেরা যাচ্ছে। যার সাজ ভাল হবে সে পুরস্কার পাবে।'

'হ্যাঁ।'

'আমাদের মনপুরা থেকে ক'জন সং সাজছে?'

'জনা দশেক।'

'দশজনের ভেতর তুমিও আছ নাকি?'

'হ্যাঁ।'

একটু ভেবে নিয়ে ডানিয়েল বলল, 'তোমার কাছে বাঘ সাজার মালমশলা বেশি হবে?'

'হবে। কেন?'

'আমাকে দিতে হবে।'

কিছুক্ষণ চিন্তা করল গণেশ। তারপর কি খানিকটা আন্দাজ করে লাফিয়ে উঠল। চোখ বড় করে গলার স্বরে টান দিয়ে বলল, 'সাহে-এ-এ-ব!'

'বল—' ডানিয়েল গণেশের চোখে চোখ রাখল।

'তুমি বাঘ সাজবে?'

'হুঁ—' ডানিয়েল মুখ টিপে নিঃশব্দে হাসতে লাগল।

'কি মজা! সত্যি চমৎকার হবে সাহেব।'

'অত লাফালাফি কোরো না।' গণেশকে নিরস্ত করতে করতে ডানিয়েল বলল, 'একথা কাউকে বলবে না।'

এমন একটা খবর রটাতে পারবে না, সে জন্য ভয়ানক বিমর্ষ দেখাল গণেশকে। করুণ চোখে ডানিয়েলের দিকে তাকিয়ে রইল সে।

ডানিয়েল বলল, 'কাল সকালবেলা সাজ সরঞ্জাম নিয়ে আমার ঘরে চলে যাবে। খাওয়া-দাওয়া সব আমার ওখানেই হবে। বাঘ সেজে আমরা ওখান থেকেই সুখনাতে চলে যাব।'

'আচ্ছা।' গণেশ ঘাড় কাত করল। আড়চোখে ডানিয়েলকে একবার দেখে খানিক ইতস্তত করে বলল, 'কিন্তু—'

'কী?'

'আমাকে তো তোমার সং সাজার কথা বলতে বারণ করছ।'

'হ্যাঁ, করছি।'

'কিন্তু বাঘ সেজে যখন রাস্তায় বেরুবে তখন তো সবাই জানতে পারবে।'

'তা পারুক গে।'

আসল কথা, অন্য কেউ যদি জানতে পারে জানুক। সে জন্য বিশেষ মাথাব্যথা নেই ডানিয়েলের। সমস্ত ব্যাপারটা একমাত্র সুভদ্রার কাছ থেকেই সে আড়াল রাখতে চায়। উদ্দেশ্য, আসরের মাঝখানে সং-এর ভূমিকায় নেমে গীর্জাবাসিনী মেয়েটাকে একেবারে হতবাক্‌ করে দেবে।

ডানিয়েল বলল, 'আবার বলছি আগে যেন কেউ জানতে না পারে।'

গণেশ চুপ করে রইল।

ডানিয়েল ফের বলল, 'যদি ও কথা আর কাউকে বল তা হলে কি হবে জানো?'

দু চোখে প্রশ্ন নিয়ে গণেশ তাকাল।

'রতির সঙ্গে বিয়ে বন্ধ হয়ে যাবে।' ডানিয়েল হাসতে লাগল।

গণেশ নিশ্চুপ।

পরের দিন সারাটা দুপুর নিজের ঘরে বসে সবার অলক্ষ্যে গণেশের সঙ্গে বাঘ সাজল ডানিয়েল।

বাঘ সাজার ব্যাপারে খড় আর ভূষো কালি, হলুদ রং, পাট, বাঘনখ—এ সব হচ্ছে উপকরণ। ডানিয়েল এমনিতেই চমৎকার ছবি আঁকতে পারে। বাঘ সাজার ব্যাপারে সেই বিদ্যাটা কাজে লেগে গেল।

একটা আয়না যোগাড় করা হয়েছিল। সেটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সর্বাঙ্গে কোথাও কোনো খুঁত আছে কিনা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল ডানিয়েল। তারপর সাজ সম্পর্কে মোটামুটি সন্তুষ্ট হয়ে গণেশের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কেমন হয়েছে গণেশ?'

এই অঞ্চলের বাসিন্দাদের মধ্যে চিত্রবিদ্যা কেউ জানে না। সহজাত অনুমানবোধ থেকেই তারা নিজেদের দেহে বাঘের চেহারা ফোটায়। সে সাজে স্বভাবতই ত্রুটি থেকে যাবার কথা। কিন্তু ডানিয়েলের মত নিপুণ চিত্রকরের হাতে সেই সাধারণ

খুঁতগুলো কিছুতেই হবার কথা নয়।

গণেশ নির্ণিমেষে তাকিয়ে রইল। এর আগে এমন চমৎকার বাঘের সাজ সে আর দ্যাখে নি। মুগ্ধ সুরে বলল, 'আমি তোমায় বলে দিচ্ছি সাহেব, এবার তুমিই দশখানা গাঁয়ের সব চাইতে সেরা বাঘ হবে।'

'তাই নাকি?'

'নিঘ্যাত। দেখে নিও।' বলতে বলতে হঠাৎ কি মনে পড়ে গেল গণেশের, 'কিন্তু সাহেব—'

গণেশের বলার সুরে এমন কিছু ছিল যাতে খানিক অবাক না হয়ে পারল না ডানিয়েল, 'কী ব্যাপার?'

'শুধু সাজলেই তো হবে না, গানও গাইতে হবে।'

'কী গান?'

'ঐ যে 'গণপতি বাপ্পা মোরেয়া, পুড়ছা বয়ষি লৌকর ত্র্যয়া'—ঐ গানটা।'

জানালার বাইরে ক্ষিপ্র চোখে রোদের চেহারাটা একবার দেখে নিল ডানিয়েল। দুপুরটা ইতিমধ্যে বিকেলের দিকে ঢল খেয়েছে। ডানিয়েল চঞ্চল হয়ে উঠল, 'উঠে পড় গণেশ, আর দেরি করলে সুখনায় গিয়ে কোন লাভ হবে না। যেতে যেতে রাস্তায় গানটা শিখে নেব।'

গণেশ উঠে পড়ল।

সুখনায় আসতে দেখা গেল, একেবারে মেলা বসে গেছে। বড় একটা টিলার তলায় প্রতিযোগিতার আসর বসানো হয়েছে। ইতিমধ্যে তারা দু-জন ছাড়া দশখানা গ্রামের তাবত প্রতিযোগী এবং তাদের শুভাকাঙ্ক্ষীরা সেখানে হাজির হয়ে গেছে। মৌচাকের ভনভনানির মত জায়গাটা ঘিরে আওয়াজ উঠছে।

দেখা গেল, সামনের দিকে তিনখানা চেয়ার পাতা। মাঝখানেরটিতে বসে আছেন রেভারেণ্ড আপ্তে, তিনিই এই প্রতিযোগিতার বিচারক, শ্রেষ্ঠত্বের রায় তাঁর মুখ থেকেই ঘোষিত হবে। রেভারেণ্ড আপ্তের একপাশে বসে আছে সুভদ্রা, অন্য পাশে আরেক জন মিশনারি—রেভারেণ্ড বীরকর। ডানিয়েল যেদিন চার্চে গিয়েছিল সেদিন রেভারেণ্ড আপ্তে এঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। রেভারেণ্ড আপ্তের সামনে স্টেনলেস স্টীলের নতুন প্রকাণ্ড হাঁড়ি, এক কাঁদি পাকা কলা আর একটা পেতলের গণপতি-মূর্তি। ওগুলো শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগীর পুরস্কার।

প্রতিযোগীরা একধারে বসে আছে। ঝাঁকের কই ঝাঁকে মিশে যাবার মত ডানিয়েল আর গণেশ তাদের মধ্যে গিয়ে বসল।

একটু পর রেভারেণ্ড আপ্তে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন। গম্ভীর প্রসন্ন সুরে জানতে চাইলেন, 'সব প্রতিযোগীই কি হাজির হয়েছে?'

চারদিক থেকে সাড়া এল, 'হ্যাঁ—'

'কোন গ্রামের কেউ বাকি নেই তো?'

'না—না—'

'সবাই যখন এসে পড়েছে তখন কাজ শুরু করি?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, আরম্ভ করে দিন।' সমস্ত অঞ্চলটা জুড়ে উৎসাহিত কোলাহল উঠল।

প্রতিযোগীরা, বিশেষত ডানিয়েল সাগ্রহে প্রতীক্ষা করতে লাগল। বলা বাহুল্য, এমন প্রতিযোগিতা আগে আর কখনও দ্যাখেইনি সে, এর কথা শোনেও নি। তার জীবনে এ এক বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা।

যাই হোক রেভারেণ্ড আপ্তে বলতে লাগলেন, 'মান্দবি গ্রামের সংয়েরা চলে এস।'

রেভারেণ্ড আপ্তেরা যেখানে বসে আছেন তার সামনে উন্মুক্ত জমি। তারপর অর্ধবৃত্তাকারে মানুষের জটলা। দশখানা গ্রামের কেউ বোধ হয় আর ঘরে বসে নেই; সবাই সেখানে ভিড় জমিয়েছে।

মান্দবি গ্রামের সংয়েরা খোলা জায়গায় এসে দাঁড়াল। তারা মোট সাতজন। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তাদের প্রত্যেককে যাচাই করলেন রেভারেণ্ড আপ্তে। প্রত্যেককে দিয়ে আলাদা আলাদা ভাবে গান গাওয়ালেন। অবশেষে সাতজনের মধ্যে মাত্র একজনকে মনোনীত করে খোলা জায়গাটার একধারে বসতে বললেন। বাকি ছ'জনকে নাকচ করে দিলেন। বিমর্ষ মুখে তারা অন্য প্রান্তে গিয়ে বসল।

মান্দবির পর এল সুখনার প্রতিযোগীরা। তাদের মধ্য থেকে একজনকে বাছাই করে মান্দবির মনোনীত সংয়ের পাশে বসতে বলা হল।

ডানিয়েল অনুমান করল, সব গ্রাম থেকে একজন একজন করে ছেঁকে নিয়ে দশ গ্রামের মোট দশ জনকে নিয়ে চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা হবে।

সুখনার পর একে একে এল চান্দা, নোনপুরা, মোহনগিরি, মধুয়াল, ছত্রপতি, ইটিশপুরা এবং টিরুণ্ডা। সবশেষে ডাক পড়ল মনপুরার।

মনপুরার মোট দশজন প্রতিযোগী। তাদের মধ্যে ডানিয়েল মুহূর্তে রেভারেণ্ড আপ্তে এবং চারপাশের বিশাল জনতার মনোযোগ আকর্ষণ করে নিল।

এমন চমৎকার বাঘের সাজের ধারণা এ অঞ্চলের মানুষের সুদূর কল্পনাতেও ছিল না, তারা দেখল, সং নয়, সত্যকারের অরণ্যচারী জীবন্ত একটা বাঘ যেন লাফ দিয়ে তাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। কে এমন বাঘ সেজেছে তা নিয়ে চারপাশে গুঞ্জন উঠল। কিন্তু ছদ্মবেশের আড়ালে আসল লোকটাকে চেনা গেল না।

রেভারেণ্ড আপ্তে ডানিয়েলকে মনোনীতদের দলে গিয়ে বসতে বললেন। যেতে যেতে চোরা চোখে সে লক্ষ্য করল, পলকহীন সুভদ্রা তারই দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

রেভারেণ্ড আপ্তে বললেন, 'দশ গ্রাম থেকে দশজন সেরা সংকে বেছে নিয়েছি। এবার তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা হবে।' বলে মনোনীত প্রার্থীদের ডেকে সামনে আসতে নির্দেশ দিলেন।

উপস্থিত দর্শকদের চোখেমুখে কৌতূহল এবং উৎকণ্ঠা ঝকমক করছে। কোন গ্রাম শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা পাবে, সে জন্য তাদের রুদ্ধশ্বাস অধীর প্রতীক্ষার পালা চলছে। এর মধ্যে দশ গ্রামের সেরা দশজন প্রতিযোগী এসে পড়েছে। নিরপেক্ষ বিচারকের দৃষ্টিতে সবাইকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলেন রেভারেণ্ড আপ্তে,

তাদের নাচতে বললেন, গাইতে বললেন। কোথাও কোন অবিচার ঘটে না যায় সে জন্য তাঁর সতর্কতার শেষ নেই।

নাচ, গান এবং সাজসজ্জা—সব পরীক্ষাতেই একেবারে ফুলমার্ক পেয়ে ফার্স্ট হল ডানিয়েল। অন্য প্রতিযোগীর সঙ্গে সকল বিষয়ে ডানিয়েলের পার্থক্যটা এত বেশি যে তার ফার্স্ট হওয়ার বিরুদ্ধে কারুর কোন অভিযোগ নেই। বরং জনতা এতে খুব খুশি হয়েছে। মোট কথা রেভারেণ্ড আপ্তের বিচার নির্ভুল হয়েছে বলা চলে।

রেভারেণ্ড আপ্তে ডানিয়েলকে কাছে ডেকে বাকি সবাইকে বাতিলের দলে গিয়ে বসতে বললেন। ডানিয়েল সামনে গিয়ে দাঁড়াল বটে, তার দৃষ্টি কিন্তু রেভারেণ্ড আপ্তের দিকে নেই। নির্নিমেষে তাঁর পার্শ্ববর্তিনীর দিকে সে তাকিয়ে আছে।

অনেকক্ষণ থেকেই সুভদ্রা তাকে লক্ষ্য করে যাচ্ছিল। হঠাৎ তার চোখের কোণ ঈষৎ কুঁচকে গেল। খুব সম্ভব, কিছু একটা সে অনুমান করতে চাইছে। ডানিয়েল মনে মনে হাসতে লাগল।

রেভারেণ্ড আপ্তে বললেন, 'তুমি তো মনপুরা গাঁয়ের লোক?'

'হ্যাঁ—' ডানিয়েল ঘাড় কাত করল।

'তোমার সাজ সব চাইতে সেরা হয়েছে। নাম বল—সবাইকে জানাতে হবে।'

মৃদু স্বরে ডানিয়েল নাম বলল। রেভারেণ্ড আপ্তে প্রথমটা হকচকিয়ে গেলেন। তারপর উচ্ছ্বসিত সুরে বললেন, 'আরে আপনি!'

ডানিয়েল উত্তর দিল না। আড়ে আড়ে সুভদ্রাকে দেখতে লাগল। তার নামটা সুভদ্রারও কানে গেছে। অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ে গীর্জাবাসিনী মেয়েটার মুখখানা যেন কেমন হয়ে গেছে। ডানিয়েল যে এভাবে বাঘের সং সেজে বসবে, তার সুদূর কল্পনাতেও সে সম্ভাবনা ছিল না।

এদিকে রেভারেণ্ড আপ্তে উদ্‌গ্রীব দর্শকদের কাছে ঘোষণা করতে শুরু করেছেন, 'মনপুরা গাঁয়ের ডানিয়েল সাহেব এবার সেরা সং সেজেছেন। তাঁকে পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে।' বলে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা হিসেবে স্টীলের সেই কলসী, কলার কাঁদি এবং গণেশমূর্তিটা ডানিয়েলের হাতে তুলে দিলেন।

ইতিমধ্যে ডানিয়েলের নামটা ঘোষণা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভিড়ের মধ্যে সাড়া পড়ে গেছে। বিস্ময় আর কারো বাধা মানছে না, 'আমাদের সাহেব এমন সং সেজেছে! কি তাজ্জবের কথা!'

কেউ বলল, 'ব্যাটা ভিন্ দেশী লোক। কোন মুল্লুক থেকে এ দেশে এসে আমাদের চাইতে ভালো সং সেজে বসল!'

কেউ বলল, 'সাহেব শালা যাই বলিস বেড়ে লোক।'

কেউ মন্তব্য করল, 'এমন বাঘ সেজেছে যে চিনবার উপায় নেই।'

একসময় জমায়েত ভেঙে গেল। ধীরে ধীরে মানুষজন নানা দিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

রেভারেণ্ড আপ্তে, রেভারেণ্ড বীরকর এবং সুভদ্রা তখনও রয়েছে। তাদের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে ডানিয়েল।

রেভারেণ্ড আপ্তে বললেন, 'আপনি এখন কোথায় যাবেন?'
ডানিয়েল জানাল, 'মনপুরায় যাবে।'
'আমি চার্চে ফিরব। একসঙ্গে অনেকটা পথ যাওয়া যাবে।' বলতে বলতে সুভদ্রার দিকে ফিরলেন, 'তুমি কোথায় যাবে?'
'মনপুরায়।'
'ডানিয়েলের সঙ্গে পুরো পথটা তা হলে তুমি যেতে পারবে।'
সুভদ্রা উত্তর দিল না।
রেভারেণ্ড বীরকর বলে উঠলেন, 'আমি কিন্তু আপনাদের সঙ্গে যাচ্ছি না। আমাকে চান্দা যেতে হবে। আমার পথ একেবারে উল্টো দিকে।'
রেভারেণ্ড বীরকর চলে গেলেন। রেভারেণ্ড আপ্তে আকাশের দিকটা দেখে নিয়ে বললেন, 'সন্ধে হয়ে আসছে। আর বসে থাকা ঠিক হবে না। এমনিতেই আমার চার্চে পৌঁছুতে রাত হয়ে যাবে। মনপুরায় পৌঁছুতে আপনাদের আরো দেরি হবে।'
টিলার পাশ থেকে নেমে তিনজনে হাঁটতে শুরু করল।
চলতে চলতে রেভারেণ্ড আপ্তে বললেন, 'সত্যি, আপনি একেবারে অবাক করে দিয়েছেন।'
ডানিয়েল হাসল, কিছু বলল না।
রেভারেণ্ড আপ্তে আবার বললেন, 'এত চমৎকার যে বাঘ সাজা যায়, আমার ধারণা ছিল না। দু-পায়ে না হেঁটে যদি চার পায়ে হাঁটতেন তা হলে সং মনে হ'ত না। মনে হ'ত সত্যিকারের বাঘ। যেভাবে ছদ্মবেশ নিয়েছেন, ছবিটবি আঁকার জ্ঞান না থাকলে এত নিখুঁতভাবে নেওয়া যায় না। চিত্রবিদ্যা জানা আছে নাকি?'
রেভারেণ্ড আপ্তের এক পাশে রয়েছে ডানিয়েল, অন্য পাশে সুভদ্রা।
ও পাশ থেকে চাপা তীব্র সুরে সুভদ্রা হঠাৎ বলে উঠল, 'ও বিদ্যেটা খুব ভালভাবেই জানা আছে। বিশেষ করে মানুষকে নিয়ে কারটুন আঁকতে উনি ভারি ওস্তাদ।'
ডানিয়েল চকিত হল। সুভদ্রাকে নিয়ে একদিন যে ছবিটা সে এঁকেছিল, সে সম্বন্ধেই খোঁচা দেওয়া হল আর কি। যদিও সেটা ব্যঙ্গচিত্র বা কারটুন ছিল না তবু জ্ঞানে অথবা অজ্ঞানে ঐ নামেই তাকে চিহ্নিত করেছে সুভদ্রা। সে যাই হোক, বাঘের সাজের আড়ালে একটু না হেসে ডানিয়েল পারল না।
ডাইনে-বাঁয়ে ঘাড় হেলিয়ে দুই সহচর-সহচরীকে দেখে নিলেন রেভারেণ্ড আপ্তে। তারপর স্নিগ্ধ হেসে বললেন, 'তাই নাকি, কারটুন আঁকেন?'
ডানিয়েল হেসে মাথা নামাল।
এবার সঙ্গিনীর দিকে তাকিয়ে রেভারেণ্ড আপ্তে জিজ্ঞেস করলেন, 'কার কারটুন এঁকেছে?'
সুভদ্রা বলল, 'ওঁকেই জিজ্ঞেস করুন না—'
দু-জনকে সকৌতুক বিশ্লেষণী চোখে দেখতে রেভারেণ্ড আপ্তে বললেন, 'যেরকম রাগ তাতে মনে হচ্ছে ডানিয়েল তোমারই ছবি এঁকেছে।'

'হ্যাঁ, আমারই ছবি।'

'তোমাকে নিয়ে কি ব্যঙ্গ করেছিল শুনি?'

'ব্যঙ্গ ঠিক নয়।' একটু ভেবে সুভদ্রা বলল।

'তবে?'

'বিশ্রী রসিকতা।'

'কি রকম?'

'ওঁকে জিজ্ঞেস করুন।'

রেভারেণ্ড আপ্তের চোখ আবার ডানিয়েলের দিকে ফিরল। সস্নেহে হেসে তিনি বললেন, 'কী এমন রসিকতা করেছিলেন যাতে সুভদ্রা রেগে গেছে!'

সন্ন্যাসব্রতিনীকে নিয়ে কী ছবি আঁকা হয়েছিল সে কথা বলা যায় না। বিব্রত, লজ্জিত, কুণ্ঠিত ডানিয়েল মাথা নিচু করে রইল। একদিন রেভারেণ্ড আপ্তের সামনে 'লাভ' কথাটার মারাঠী সমশব্দ নিয়ে সুভদ্রাকে জ্বালাতন করেছিল সে। সুভদ্রা আজ তারই চমৎকার প্রতিশোধ নিল।

রেভারেণ্ড আপ্তে এ প্রসঙ্গে আর কোন প্রশ্ন করলেন না। ব্যাপারটায় প্রথম থেকেই তিনি গুরুত্ব দেন নি। লঘু কৌতুকটার জের টানা আর প্রয়োজন বোধ করলেন না।

কিছুক্ষণ নীরবতা।

তারপর রেভারেণ্ড আপ্তে আবার শুরু করলেন, 'আচ্ছা ডানিয়েল—'

ডানিয়েল মুখ ফেরাল। খানিক আগে রেভারেণ্ড আপ্তের স্বরে যে লঘুতা ছিল, লক্ষ্য করা গেল, এখন আর তা নেই।

রেভারেণ্ড বললেন, 'সুভদ্রার সঙ্গে সেই যে চার্চে গিয়েছিলেন তারপর আর আপনার সঙ্গে দেখা হয় নি।'

ডানিয়েল বলল, 'প্রায়ই ভাবি আপনার কাছে যাব। নানা ঝঞ্ঝাটে যাওয়া আর হয়ে উঠছে না। অথচ আপনার সঙ্গে একটা জরুরি ব্যাপারে পরামর্শ করতে হবে।'

'বেশ তো, সময় করে একদিন চলে যাবেন।'

'গণেশ পুজোটা মিটে গেলে যাব ভাবছি।'

'যাবেন।' একটু থেমে রেভারেণ্ড আবার বললেন, 'সেদিন চার্চে গিয়ে বলে এসেছিলেন, এ জায়গাটা ভাল লাগছে। তারপর তো অনেক দিন কেটে গেল। এখন কেমন লাগছে?'

'চমৎকার।' ডানিয়েল উৎসাহিত হয়ে উঠল, 'এখানকার মানুষগুলো এত সরল এত ভালো যে কি বলব! এমন মানুষ আগে দেখিনি।'

পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে ডানিয়েলের দিকে তাকিয়ে রেভারেণ্ড বললেন, 'এ অঞ্চলের লোক আপনার সম্বন্ধেও কিন্তু ঐ একই কথা বলে। আপনার মত মানুষ তারাও কোনো দিন দেখেনি।'

ডানিয়েল চুপ করে রইল।

রেভারেণ্ড বললেন, 'ওজন লিখে এনে মাছমারাদের যে উপকার আপনি করেছেন আমাদের দিয়ে কোনদিন তা সম্ভব হত না।'

'ওজন লেখাই যথেষ্ট নয়।' ডানিয়েল বলল, 'মাছমারাদের মঙ্গলের জন্য আমাদের আরো অনেক কিছু করার আছে।'

'তা তো বটেই।'

একটু ভেবে রেভারেণ্ড এবার বললেন, 'সারাদিন ওদের সঙ্গে ঘুরতে হয়, আজকাল আপনার দারুণ খাটুনি যাচ্ছে, না?'

'খাটুনি আর কি। ওদের সঙ্গ আমার খুব ভাল লাগে।' ডানিয়েল হাসল।

'আচ্ছা—'

'বলুন—'

'গণেশ পুজোর উৎসব কেমন লাগছে?'

'এক্সেলেন্ট!' ডানিয়েলের ইচ্ছা হল গণপতি-উৎসবের নামে একটা লাফ দেয়। স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনা করে লোভটা দমন করল। বলল, 'এমন চমৎকার কালারফুল ফেস্টিভ্যাল আগে আর কখনও দেখিনি।'

রেভারেণ্ড আপ্তে বললেন, 'শুধু কি কালারফুলই, অন্য একটা দিক লক্ষ্য করেছেন?'

'কোন দিক?'

'এখানকার মানুষ এত গরীব, জীবন-ধারণের জন্য তাদের এত লড়াই করতে হয় যে অন্য কোনো ব্যাপারে তাদের উৎসাহ বা উদ্দীপনা থাকার কথা নয়। সারাটা বছর ওরা যেন মরে থাকে। কিন্তু গণেশ পুজোটা যেন টনিকের মত আসে। বছরে এই একটা বারই ওরা বেঁচে ওঠে। খুশিতে, আনন্দে ভরপুর মানুষগুলোকে দেখে মনে হয় কোঙ্কন উপকূলে জীবনের সাড়া পড়ে গেছে।'

চমৎকার কথা বলতে পারেন রেভারেণ্ড আপ্তে। উচ্চারণ তাঁর মনোগ্রাহী, কানকে তৃপ্ত করে। বলার ভঙ্গিতে ত্বরা নেই। যথাযথ শব্দ বেছে ধীরে ধীরে এমনভাবে তিনি বলেন যা শ্রোতাকে মুগ্ধ করে দেয়, হয়ত প্রভাবিতও।

ডানিয়েল বলল, 'এদিকটা ভেবে দেখিনি। তবে আপনার কথা শোনার পর মনে হচ্ছে ঠিকই বলেছেন।'

একটুক্ষণ কিছু ভেবে রেভারেণ্ড আপ্তে বললেন, 'আপনাকে একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই মিস্টার ডানিয়েল।'

উৎসবের আলোচনা থেকে রেভারেণ্ড আপ্তে হঠাৎ এমনভাবে প্রসঙ্গান্তরে গেলেন যে ডানিয়েল অবাক না হয়ে পারল না। তা ছাড়া কোন কথা তিনি মনে করিয়ে দিতে চাইছেন সেটা বুঝতে না পারায় খানিক অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। বলল, 'কী কথা?'

'চার্চে যেদিন যান সেদিন জিজ্ঞেস করেছিলেন আমরা অর্থাৎ গীর্জাবাসী মিশনারিরা এ অঞ্চলে প্রীচ করি না 'কন? মনে পড়ছে?'

বলার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল। ডানিয়েল বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, পড়ছে।'

রেভারেণ্ড আপ্তে বললেন, 'প্রীচ করে ওদের কাউকে কাউকে আমরা হয়ত কৃশ্চান করতে পারতাম কিন্তু গণপতি-পুজোর মত এমন প্রাণবান উৎসব থেকে ওদের বঞ্চিত হতে হ'ত। আমি হয়ত ঠিক বোঝাতে পারছি না তবু বলছি, বাইরে থেকে একেবারে নতুন কোনো ধর্মবিশ্বাস বা মতবাদ চালাতে গেলে তার ফলাফল বোধ হয় শুভ হয় না।'

এরপর রেভারেণ্ড আপ্তে যা বলে গেলেন তার মর্মার্থ এইরকম। এই পৃথিবীর নির্দিষ্ট কোনো ঠিকানায় পুরুষানুক্রমে যে মানুষের দল বসবাস করে আসছে তাদের জীবনের শিকড় সেখানকার মাটিতে প্রোথিত। পূর্বপুরুষেরা তাদের জন্য যে সংস্কার, যে ধর্মবিশ্বাস, যে ইতিহাস এবং ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার রেখে যায় সে সবের মধ্যেই তাদের বাঁচার শক্তি থাকে। সেই সব সংস্কার, ধর্মবোধ এবং পুঞ্জীভূত ইতিহাস থেকে আলোবাতাস শুষে শুষে তারা পুষ্ট হয়, সমৃদ্ধ হয়, তাদের পরিপূর্ণ বিকাশের পটভূমি সেখানেই।

কোনো কারণে অতীতের সেই ভূমি থেকে শিকড় তুলে নিয়ে যদি নতুন অপরিচিত মাটিতে নিয়ে পোঁতা হয় তবে তা কুঁকড়ে শুকিয়ে ম্লান হয়ে যায়। মলিন ম্রিয়মান সেই জীবনে না থাকে প্রাণের উত্তাপ, না থাকে নিজেকে ছড়িয়ে দেবার কোনো প্রেরণা। নির্জীব করুণ নিরুৎসুক মানুষগুলি না পারে নতুনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে, আবার অতীতও যায় তার হারিয়ে।

মোট কথা, যে যেখানে আছে সেখানকার ভালমন্দের মধ্যেই তাকে বিকশিত হ'তে দেওয়া ভাল। বাইরে থেকে অযাচিতমঙ্গল করতে গিয়ে বিপর্যয় ঘটার সম্ভাবনাই বেশি।

রেভারেণ্ড আপ্তে বলতে লাগলেন, 'আমার কথাগুলো আপনার হয়ত ভাল লাগছে না। তবে আরো কিছুদিন যদি ঘনিষ্ঠভাবে এদের দেখেন তবে বুঝবেন কিছু প্রীচ করার অর্থ হয় না। ওদের জীবনের মধ্যেই এত অজস্র উপাদান আছে যা ওদের সব চাইতে বেশি কল্যাণ করতে পারে।'

ক'মাস আগে ডানিয়েল যেদিন কোঙ্কনের এই সুদূর উপকূলে পালিয়ে এসেছিল সেদিন জীবন সম্পর্কে তার ধারণা যেখানে ছিল আজ সেখান থেকে অনেক দূরে সরে এসেছে। তার মনে হল, রেভারেণ্ড আপ্তের কথাই বোধ হয় ঠিক। তবু সংশয়টা সম্পূর্ণ ঘুচল না। একটু ইতস্তত করে সে বলল, 'কিন্তু—'

'কী?'

'আপনি তো এদেশের মানুষ—ইণ্ডিয়ান।'

'নিশ্চয়ই।'

'কৃশ্চানিটি তো ইণ্ডিয়ার জিনিস নয়।'

'না।'

এবার দ্বিধান্বিত ভঙ্গিতে ডানিয়েল বলল, 'আপনি যদি সাহস দ্যান একটা কথা জিজ্ঞেস করি।'

'নির্ভয়ে করুন।' রেভারেণ্ড আপ্তে হাসলেন।

'চিরদিন আপনারা নিশ্চয় কৃশ্চান ছিলেন না?'

'কৃশ্চানিটির বয়েস এখনও পুরোপুরি দুহাজার বছর হয় নি। তার আগেও পৃথিবীতে মানুষ ছিল এবং তারা অবশ্যই ধর্ম বিশ্বাসে কৃশ্চান ছিল না।'

'দেখুন আমার প্রশ্নটা ঠিক তা নয়।'

'তবে?'

'আমি জানতে চাইছি কৃশ্চান হবার আগে আপনারা কী ছিলেন?'

'হিন্দু।'

রেভারেণ্ড আপ্তের চোখে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে ডানিয়েল জিজ্ঞেস করল, 'হিন্দু থেকে কৃশ্চান হয়েছেন। এ জন্য নিশ্চয়ই আপনার আক্ষেপ আছে?'

সবিস্ময়ে রেভারেণ্ড আপ্তে বললেন, 'হঠাৎ এ প্রশ্ন আপনার মনে এল যে?'

'প্রীচ না করার পক্ষে একটু আগে যা যুক্তি দিলেন তা শুনে।'

রেভারেণ্ড আপ্তে হকচকিয়ে গেলেন। কিন্তু স্থিতধী মানুষটি খুব বেশিক্ষণ বিচলিত হয়ে থাকেন না বোধ হয়। আত্মস্থ হয়ে বললেন, 'আমি নিজে কৃশ্চান হইনি। পাঁচ পুরুষ ধরে আমরা কৃশ্চান, জন্মসূত্রে আমিও তা-ই। কাজেই আক্ষেপের প্রশ্ন ওঠে না।'

বাঁকা হেসে ডানিয়েল বলল, 'পূর্বপুরুষ হয়েছেন তাই বাধ্য হয়ে কৃশ্চান থেকে গেছেন। নইলে আপনি নিজে নিশ্চয়ই কৃশ্চানিটি গ্রহণ করতেন না, তাই তো?'

'এ কথা কখনও ভেবে দেখিনি। তবে কৃশ্চান বলে চিরদিনই আমি গর্বিত। নিজের ধর্মমতকে পৃথিবীর আর কোনো ধর্মমতের চাইতে হীন বলে কখনও ভাবিনি। পরম পিতার কাছে সব সময় আমার প্রার্থনা তেমন মানসিক দীনতা কখনও যেন আমার না আসে।' বলতে বলতে থামলেন রেভারেণ্ড আপ্তে। একটু পর আবার বললেন, 'তবে—'

'কী?'

'আপনি বললেন তো পূর্বপুরুষ যা করেছে, করেছে। আপনি নিজে হলে চার্চে গিয়ে কিছুতেই কৃশ্চান হতেন না?'

'হ্যাঁ, বলেছি। আমার কিঞ্চিৎ শিক্ষাদীক্ষা আছে, জীবনকে তার আপন স্বরূপে দেখবার মত চোখ আছে। আমি যদি কোন কিছু গ্রহণ করি তো জেনেশুনেই করব, ভালমন্দ বুঝেই করব। কিন্তু যে মানুষগুলোর মধ্যে সাধারণত প্রচারকার্য চালানো হয় তারা অশিক্ষিত, জীবন সম্পর্কে তাদের কোনো স্পষ্ট ধারণা নেই। সহজেই তাদের প্রভাবিত করা যেতে পারে। নিজে জেনেশুনে কিছু গ্রহণ করা এক কথা, অন্যের প্রলোভনে বা প্ররোচনায় করা আরেক কথা। দ্বিতীয়টিতে কল্যাণ হয় না।'

মনে মনে রেভারেণ্ড আপ্তের যুক্তিতে শ্রদ্ধা না জানিয়ে পারল না ডানিয়েল। ঝোঁকের বশে এতক্ষণ তর্ক করে গেছে সে এবং অশোভনভাবে রেভারেণ্ড আপ্তেকে আঘাতও দিয়েছে। সে সম্বন্ধে সচেতন হতে এখন অত্যন্ত লজ্জা এবং সঙ্কোচ বোধ করল। কুণ্ঠিত সুরে বলল, 'আপনার কাছে আমার ভারি অন্যায় হয়ে গেছে।'

রেভারেণ্ড আপ্তে সবিস্ময়ে তাকালেন, 'কখন আবার অন্যায় হল?'

'আপনার ধর্মবিশ্বাস নিয়ে যা বলেছি তা উচিত হয় নি।'

রেভারেণ্ড আপ্তে প্রসন্ন হাসলেন। ডানিয়েলের কাঁধে হাত রেখে স্নিগ্ধ সুরে বললেন, 'অন্যায় কিছুই হয় নি। আপনার মনে সংশয় জেগেছে তাই জিজ্ঞেস করেছেন। মনে যদি কোনো প্রশ্ন আসে সেটা চেপে না রেখে বলে ফেলাই ভাল। আপনি ঠিক কাজই করেছেন।'

খানিক ভেবে ডানিয়েল বলল, 'আপনি যখন ক্ষমা করে দিয়েছেন তখন আরেকটা কথা জিজ্ঞেস করব।'

'স্বচ্ছন্দে।'

'আপনি তো পূর্বপুরুষের ধর্ম, সমাজ-নীতি, জীবন-নীতি—সবই সমর্থন করেন। কিন্তু তাদের কুসংস্কার সম্বন্ধে আপনার মত কি?'

'কুসংস্কার আমি সমর্থন করি না। তবে সেই কুসংস্কার রাতারাতি ভেঙেও দিতে চাই না। তাতে জটিলতাই শুধু বাড়বে।'

'আপনি মিস জোসেফের কাছে নিশ্চয় শুনেছেন ঘাটিদের ছেলের সঙ্গে জেলেদের মেয়ের বিয়ে ঠিক করেছি। এ ব্যাপারে আপনি কী বলেন?'

রেভারেণ্ড আপ্তে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, ভাল কথা, আমার একেবারে খেয়ালই ছিল না। সুভদ্রা আমাকে বলেছিল বটে। ও তো আপনার রীতিমত ভক্ত হয়ে উঠেছে। বলেছে, যেভাবে সবাইকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে কাজটা হাসিল করেছেন তার নাকি তুলনা হয় না। সব শুনে আমারও তাই মনে হয়েছে।'

দ্রুত মুখ তুলে রেভারেণ্ড আপ্তের মাথার পাশ দিয়ে সুভদ্রাকে দেখতে চেষ্টা করল ডানিয়েল। চোখাচোখি হতেই সুভদ্রা অন্য দিকে মুখ ফেরাল।

রেভারেণ্ডের গলা আবার শোনা গেল, 'ঐ অসবর্ণ বিয়েটার ব্যাপারে বলব, আপনি ঠিকই করেছেন। সব দিক বিবেচনা করে বুঝিয়ে সুঝিয়ে যদি কুসংস্কার ভাঙা যায় তার চাইতে ভাল আর কী হতে পারে! তবে—'

'কী?'

'শুনলাম কুসংস্কার ভাঙার দামটা আপনাকেই দিতে হচ্ছে। দু পক্ষের জ্ঞাতি গোষ্ঠীকে খাওয়াচ্ছেন।'

'ও কিছু না।' ডানিয়েল একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। তারপর বলল, 'আপনি তো বললেন কুসংস্কার ভাঙতে হবে বুঝিয়ে সুঝিয়ে। যদি তাতে কাজ না হয়?' 'তা হলে দেখতে হবে সেই বাজে সংস্কারটা কতখানি ক্ষতি করছে।' রেভারেণ্ড আপ্তে বলতে লাগলেন, 'যদি দেখা যায় মারাত্মক ক্ষতিকর তা হলে জোর করেই সেটা ভাঙতে হবে।'

'যাক, এ ব্যাপারে আপনার মতের সঙ্গে আমার পুরোপুরি মিলবে।'

কথায় কথায় এমন একটা জায়গায় তারা এসে পড়েছিল যেখানে পথটা দু-ভাগ হয়ে একটা গেছে দক্ষিণে, আর একটা পুব দিকে।

রেভারেণ্ড আপ্তে দাঁড়িয়ে পড়লেন। কাজেই সুভদ্রা আর ডানিয়েলকেও থামতে হল।

রেভারেণ্ড আপ্তে বললেন, 'আমাকে পুব দিকের রাস্তা ধরতে হবে। আপনারা যাবেন দক্ষিণে। আচ্ছা চলি। গুড্ নাইট। সময় করে একদিন আসবেন।' দীর্ঘদেহ প্রসন্ন পুরুষটি পুব দিকের রাস্তা ধরে দূর বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

ডানিয়েলরা এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে। হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল, সেদিন চার্চ থেকে ফেরার সময় রেভারেণ্ড আপ্তে একটা ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। তার সঙ্গে তাঁর কী একটা বিশেষ প্রয়োজন আছে। প্রয়োজনটা কী, আজ জিজ্ঞেস করলে ভাল হ'ত। কিন্তু কথাটা আগে খেয়াল হয় নি। ডানিয়েল স্থির করল, যেদিন চার্চে যাবে সেদিন সে কথা জেনে নেবে।

তারা দাঁড়িয়েই ছিল।

এদিকে পায়ে পায়ে কোঙ্কন উপকূলের সন্ধ্যা নেমে এসেছে। গাঢ় ছায়ায় পশ্চিমঘাটের টিলাগুলি এবং দিগন্তরেখা ক্রমশ বিলীন হয়ে যাচ্ছে। দূরে পাহাড়-চূড়ায় অল্প অল্প কুয়াশা জমতে শুরু করেছে। একটি-দুটি করে তারাও ফুটছে।

সুভদ্রা বলল, 'আর দাঁড়িয়ে থেকে কী হবে। সন্ধে হয়ে গেল।'

'হ্যাঁ চলুন।' ডানিয়েল পা বাড়িয়ে দিল।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে হাঁটার পর সুভদ্রা বলল, 'আমাব সঙ্গে চালাকি করবার কী দরকার ছিল শুনি?'

'চালাকি!'

'নয় তো কি? আপনি সং সাজবেন বলেই তো আমার সঙ্গে এখানে আসতে চান নি।'

গলার ভেতর একটা শব্দ করল ডানিয়েল।

সুভদ্রা আবার বলল, 'সং সাজার কথা বললে কী আমি বাধা দিতাম?'

'তা নয়।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাই। আমি যেন কচি খুকি, কিছুই বুঝি না।' সর্বত্যাগিনী গম্ভীর মেয়েটা কয়েক বছর পিছিয়ে হঠাৎ অবুঝ কিশোরী হয়ে গেল। গলার স্বরে কাঁপন লেগে, চোখমুখের রং বদলে গিয়ে কেমন অভিমানিনী বালিকার মত দেখাতে লাগল তাকে।

ডানিয়েল অবাক। দু চোখে অপার বিস্ময় নিয়ে সুভদ্রার সর্বাঙ্গে রূপান্তরের বিচিত্র খেলা দেখতে লাগল সে। সত্যিই অভাবনীয়, অপ্রত্যাশিত।

সুভদ্রা বলতে লাগল, 'আমি জানি সব ব্যাপার আমার কাছে আপনি গোপন করতে চান। আমাকে এড়াতে পারলেই আপনি বাঁচেন।'

ডানিয়েলের বিস্ময় এবার শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছুল। সুভদ্রা কি এই মুহূর্তে সজ্ঞানে কথা বলছে? না চারদিকে ছড়ানো পশ্চিমঘাট, কুয়াশার মায়াবরণের ওপারে চাঁদের

আভাস, দক্ষিণ থেকে ভেসে আসা ঝিরঝিরে বাতাস কিংবা ঝাপসা হয়ে যাওয়া দূর বনানী—সব একাকার হয়ে তাকে আত্মবিস্মৃত করে ফেলেছে?

এই অভিমান, ক্ষোভ, স্বরের এই কম্পন—সমস্ত কিছুই সুভদ্রার পক্ষে বেমানান। তার স্বভাবের সঙ্গে এ সব খাপ খায় না, এ সব তার সাজে না।

ডানিয়েল বলল, 'কি আশ্চর্য! আপনাকে এড়াতে যাব কেন? আপনার কাছে গোপন করবারই বা কী আছে? তবে—'

'কী?'

'ভেবেছিলাম আগে ভাগে না জানিয়ে সং সেজে আপনাকে একেবারে চমকে দেব।'

এবার খানিকটা সহজ হল সুভদ্রা। অনেকখানি স্বাভাবিক সুরে বলল, 'তবু আমাকে জানালে পারতেন। তাতে বাইবেল অশুদ্ধ হয়ে যেত না।'

কয়েকটা চড়াই-উতরাই পার হবার পর সুভদ্রা আবার বলল, 'সত্যি, আপনি আমাকে অবাক করে দিয়েছেন। আপনাকে যত দেখছি বিস্ময় তত বাড়ছে। সেই সঙ্গে আরো একটা জিনিস বাড়ছে। সেটা কী জানেন?'

'কী?'

'শ্রদ্ধা।'

কণ্ঠস্বর অনেক বদলে গেছে। সুভদ্রার মধ্যে এই মুহূর্তে একটু আগের অভিমান-আহত চঞ্চলা কিশোরীটিকে খুঁজে পাওয়া গেল না। মুগ্ধ ভক্তের মত সে কথা বলছে, সুরটি তার প্রশংসার। সেই সুরে আবেগ যদিও রয়েছে, তবে কিন্তু উচ্ছ্বাস নেই। ধীর, স্থির, অত্যন্ত সংযত—সুভদ্রাকে যা মানায়—এখন সেই রকমটিই দেখাচ্ছে।

তরল গলায় ডানিয়েল বলে উঠল, 'বলুন, আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বিস্ময়ের শেষ নেই আপনার। এই তো?'

উত্তরে সুভদ্রা স্নিগ্ধ একটু হাসল।

ডানিয়েল বলল, 'সবই ভাল বলেছেন। শুনে ল্যাজ আমার ফুলতে শুরু করেছে। কিন্তু—'

'কী?'

'ওর ভেতর আবার একটা কাঁটা ঢুকিয়ে দিলেন কেন?'

'কাঁটা!'

'হ্যাঁ, শ্রদ্ধা শব্দটা দিয়ে আমায় ভারি অস্বস্তিতে ফেলেছেন।'

সুভদ্রা গাঢ় স্বরে বলল, 'ঐ শব্দটা ছাড়া এমন কিছু জানা নেই যা দিয়ে আপনার সম্বন্ধে আমার ধারণা বোঝাতে পারি।'

সঙ্কোচে একেবারে এতটুকু হয়ে গেল ডানিয়েল।

কিছুক্ষণ পর সুভদ্রা ডাকল, 'শুনছেন—'

'বলুন—' ডানিয়েল মুখ ফেরাল।

'আমি এ দেশের মেয়ে কিন্তু এমন করে আপনার মত ওদের সঙ্গে মিশতে পারি নি, কোনো দিন পারবও না।'

কুণ্ঠিত মুখে ডানিয়েল বলল, 'কী যে বলেন!'

'ঠিকই বলছি।' সুভদ্রা বলতে লাগল, 'সেবাব্রতিনী বলে, সর্বত্যাগিনী বলে নিজের সম্বন্ধে একটু অহঙ্কার ছিল কিন্তু আপনার সারভিস দেখে লজ্জায় মুখ দেখাতে ইচ্ছা করে না। সাত জন্ম চেষ্টা করলেও আমি বাঘের সং সেজে ওদের সঙ্গে একাকার হয়ে যেতে পারতাম না।'

অস্ফুটে ডানিয়েল কী বলল বোঝা গেল না।

সুভদ্রা আবার বলে উঠল, 'কত দূর দেশ থেকে আপনি এসেছেন, ক'দিনই বা হল এসেছেন কিন্তু এর মধ্যে এখানকার একজন হয়ে গেছেন। অথচ আমি এদেশেরই মেয়ে, জেলে মুক্তোচাষী বা ঘাটিদের মতই অতি সাধারণ দরিদ্র ঘরে জন্মেছি তবু ওদের সঙ্গে সেভাবে মিশে যেতে পারি না। কোথায় যেন একটা দূরত্ব থেকে যায়। মিশনারি না হয়ে আপনি যা পেরেছেন, মিশনারি হয়েও আমি তা পারি না।'

ডানিয়েল স্পষ্ট গলায় এবার বলল, 'আপনি কিন্তু খুব বাড়াবাড়ি করে ফেলছেন মিস জোসেফ। যা সব বলছেন তাতে আমার ভয়ানক অস্বস্তি হচ্ছে।'

সুভদ্রা বুঝিবা তার কথা শুনতেই পেল না। অন্যমনস্কের মত বলল, 'আমার কথা যদি জানতেন, বুঝতে পারতেন আপনার সঙ্গে আমার তফাত কতখানি।'

ডানিয়েল চুপ করে রইল। সঙ্গিনীর দিকে তাকিয়ে তার মনে হল আরো কিছু বলবে সুভদ্রা। হয়ত নিজের জীবনে চারদিক থেকে আজ সমস্ত যবনিকা তুলে ধরবে। উৎসুক হয়ে ডানিয়েল প্রতীক্ষা করতে লাগল।

আজ ডানিয়েলরই দিন, তার প্রত্যাশামতই সব ঘটে যাচ্ছে। সুভদ্রা বলল, 'আমার কথা শুনবেন?' মনে হল পাশ থেকে নয়, অনেক দূর থেকে হাওয়ার তরঙ্গে তার স্বর ভেসে এল।

একদিন সুভদ্রার জীবনের কথা জানতে গিয়ে হতাশই হতে হয়েছিল। সে কথা জিজ্ঞেস করায় আত্মবিমুখ উদাসীনা মেয়েটা রূঢ়ভাবে ধমক দিয়েছিল। আজ উপযাচক হয়ে সে-ই বলতে চাইছে। অসীম আগ্রহে ডানিয়েল বলল, 'নিশ্চয়ই শুনব।'

তৎক্ষণাৎ কিছু বলল না সুভদ্রা। অনেকক্ষণ পর খুব আস্তে আস্তে শুরু করল, 'আমাদের বাড়ি ছিল চান্দা ডিস্ট্রিক্টে।'

'সেটা কোথায়?'

'এই মারাঠাওয়ারেই। এখান থেকে প্রথমে ধাউসপুরায় যেতে হয়, সেখান থেকে লাইট মারহাট্টা রেলে চেপে চান্দা। দূর কম নয়, পুরো একদিনের রাস্তা।'

'তারপর বলুন।'

সুভদ্রা বলতে লাগল, 'আমরা ছিলাম অত্যন্ত গরীব। অজ পাড়াগাঁয়ে থাকতাম। বাবা ছিলেন গ্রাম্য তাঁতি। একখানা মাত্র হাতে চালানো তাঁত ছিল, সেটা থেকে যা আয় হ'ত তাতে সংসার আর চলতে চাইত না। সে জন্যে বাবাকে নানারকম উঞ্ছবৃত্তি করতে হ'ত। তাঁত চালাবার ফাঁকে ফাঁকে গ্রাম গ্রামান্তরে ঘুরে ঘটকালি করতেন, পঞ্জিকা আর খানকতক পুরনো পুঁথি ছিল বাড়িতে, সেগুলো ঘাঁটাঘাঁটি করে জ্যোতিষী

করতেন। মাঝে মধ্যে জঙ্গল থেকে শিকড় বাকড় তুলে এনে বেটে বড়ি তৈরি করে কবিরাজি করতেন। এত করেও দু-বেলা পেট পুরে খেতে পেতাম না।' 'অবশ্য আমাদের সংসার খুব একটা বড় ছিল না। বাবা-মা আর আমি। যাই হোক, কোনো রকমে দিন তবু চলে যাচ্ছিল, আমিও বড় হয়ে উঠছিলাম। আমার বয়েস যখন বছর পনের সেইসময় বাবা মারা গেলেন। তার ফল হল এই, সংসার একেবারে অচল হবার মুখে এসে গেল। বাবার মৃত্যুর জন্যে শোক তো ছিলই। কিন্তু কঠিন বাস্তবটা ছিল আরো নিদারুণ। শোকের চাইতে দুশ্চিন্তা হয়েছিল অনেক গুণ বেশি; বাবা তো গেলেন, এখন আমরা খাব কী? বাঁচব কীভাবে?'

রুদ্ধশ্বাসে ডানিয়েল জিজ্ঞেস করল, 'কেমন করে আপনাদের চলতে লাগল?'

সুভদ্রা বলল, 'আমার মা ছিলেন অসাধারণ বুদ্ধিমতী, পরিশ্রমী।' গ্রাম্য স্ত্রীলোকের তুলনায় অনেক ধীর, স্থির, সংযত। শোকটা তাঁরই সব চাইতে বেশি বেজেছিল কিন্তু একেবারে অভিভূত হয়ে ভেঙে পড়েন নি। দু-চারদিনের মধ্যেই সামলে উঠেছিলেন। আমার কথা মা ভুলে যান নি। তিনি জানতেন এবার থেকে সংসারের সমস্ত দায়িত্ব তাঁকে নিতে হবে, আমাকে রক্ষা করতে হবে। আমার জন্যেই যে তাঁর বেঁচে থাকা দরকার, শক্ত হয়ে দাঁড়ানো প্রয়োজন—এ সম্বন্ধে মা খুব সচেতন ছিলেন।

'কাজেই বাবার ফেলে-যাওয়া তাঁতে মা গিয়ে বসলেন। সংসার খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে কোনরকমে চলতে লাগল। বাকি জীবন কীভাবে কাটত জানি না। কিন্তু হঠাৎ একটা ব্যাপারে আমাদের সব কিছু ওলট-পালট হয়ে গেল।'

ডানিয়েল উৎকণ্ঠের মত জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছিল?'

দূর পাহাড়-চূড়ার দিকে তাকিয়ে সুভদ্রা বলল, 'ছোট বেলা থেকেই আমার রূপের খ্যাতি ছিল। সবাই বলত আমি নাকি খুব সুন্দরী। আমার মত রূপসী মেয়ে আমাদের গ্রামে; আমাদের গ্রামে শুধু নয়, সারা মহকুমায় নাকি ছিল না।' বলতে বলতে আরক্ত মুখ আনত হল। একটু পরে চোখ তুলে আবার শুরু করল, 'নিজের কথা বললাম, কিছু মনে করবেন না।'

কয়েক মাসের পলাতক জীবনে ডানিয়েলের ধারণা হয়েছে, প্রাচ্যের মেয়েরা নিজের রূপের প্রচার সম্বন্ধে অত্যন্ত কুণ্ঠিত। এদিক থেকে পশ্চিম গোলার্ধের মেয়েরা কিন্তু একেবারে বিপরীত। সে যাই হোক, ডানিয়েল এ ব্যাপারে কোন মন্তব্য করল না।

সুভদ্রা বলতে লাগল. 'বাবা বেঁচে থাকতে থাকতেই আমার ওপর অনেকের নজর পড়েছিল। বিশেষ করে নীলকান্তর।'

ডানিয়েল বলল, 'নীলকান্ত কে?'

'আমাদের গ্রামেরই ছেলে। ওর বাপ ছিল সুদখোর মহাজন, খাতকের রক্ত শোষণ করাই ছিল তার ব্যবসা। আশেপাশের পঁচিশ তিরিশটা গ্রামে তার মত বড় লোক আর কেউ ছিল না। ঐ বাপের ছেলে নীলকান্ত কিছু করত না, নানা রকম বদ খেয়াল ছিল তার। খুব কম বয়েস থেকেই সে মারাত্মক রকমের উচ্ছৃঙ্খল। তের চোদ্দ বছর হওয়ার আগেই মদ গাঁজা ধরেছিল, কথায় কথায় ছুরিছোরা চালাত।

সেই বয়েসেই এক আধটা খুন করেছিল, পুলিশ ধরতে পারে নি। তার ভয়ে গ্রামের যুবতী মেয়ে-বৌরা রাস্তায় বেরুনো বন্ধ করে দিয়েছিল। যত দিন যাচ্ছিল তত উৎপাত বাড়ছিল, একেবারে নামকাটা সেপাই হয়ে উঠেছিল সে।'

'তারপর?'

'আমার বাবা বেঁচে থাকতে থাকতেই আমাদের বাড়ি হানা দিতে শুরু করেছিল নীলকান্ত। আমাকে হাতের মুঠোয় পাওয়ার জন্যে সে উন্মাদ হয়ে উঠেছিল। একদিন সোজাসুজি বিয়ের কথাও পেড়ে বসেছিল। বাবা রাজি হন নি। মুখের ওপর 'না' বলে দিয়েছিলেন।'

'ঠিক কাজই করেছিলেন, বদমাস গুণ্ডার হাতে কে আর মেয়ে তুলে দিতে চায়?'

সুভদ্রা বলল, 'আপনি তো বলবেন ঠিক কাজই করেছিলেন কিন্তু তার ফল কী হয়েছিল তা তো আর জানেন না।'

গভীর উদ্বেগে ডানিয়েল জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছিল?'

'খুব ভয়ে ভয়ে আমাদের থাকতে হত। প্রায়ই মদ খেয়ে এসে আমাদের বাড়ির সামনে হল্লা করত নীলকান্ত, অশ্লীল খিস্তিখেউড় করত, আমার সম্বন্ধে যা সব ইঙ্গিত করত তাতে কানে আঙুল দেওয়া ছাড়া উপায় থাকত না। আমরা দুয়ার বন্ধ করে ঘরে বসে কাঁপতাম। বাবা অবশ্য প্রথম প্রথম প্রতিবাদ করতেন, তাতে হল্লা আরো বাড়ত, খেউড়গুলো আরো কুৎসিত হ'ত।'

'লোকটা একেবারে পশু।' ডানিয়েলকে উত্তেজিত দেখাল, 'বদমাসটাকে ঠেঙিয়ে হাড় ভেঙে দেওয়া উচিত ছিল। গ্রামে লোক ছিল না কেউ? তারা কিছু বলত না?'

সুভদ্রা বলল, 'গ্রামে লোক থাকবে না কেন কিন্তু তারা সবই নীলকান্তর বাপের খাতক। তার ওপর নীলকান্ত স্বয়ং শয়তানের অবতার। তাকে কিছু বলে ধনে প্রাণে কেউ মারা পড়তে রাজী নয়। তা ছাড়া আমাকে নিয়ে যে সমস্যা সেই সমস্যা তো গ্রামের অন্য মেয়েদেরও। আমার দিকে যদি নীলকান্তর পুরো নজরটা এসে পড়ে তারা খানিক নিশ্চিন্ত হতে পারে। নিজেদের স্বার্থেই তো গ্রামের লোকেদের কিছু বলা উচিত না। সে যাক গে, নীলকান্তকে তো ঐটুকু শুনেই পশু বললেন। তার পশুত্বের আরো কিছু নমুনা শুনুন।'

ডানিয়েল চুপ করে রইল।

সুভদ্রা বলতে লাগল, 'আমি রাস্তায় বেরুতে পারতাম না। বাবাকে তো আর ঘরে বসে থাকলে চলত না, তাঁকে বেরুতে হত। রাস্তায় বেরুলেই অশ্রাব্য গালাগাল দিত নীলকান্ত। একদিন পাশের গ্রাম থেকে ফেরার পথে রাত্রিবেলা কে যেন বাবাকে ছুরি মেরেছিল। ভাগ্য ভাল, আঘাতটা তেমন মারাত্মক হয় নি। কে ছুরি চালিয়েছিল বাবা দেখতে পাননি। না দেখলেও বুঝতে অসুবিধে হয় নি।' একটু থেমে কিছুক্ষণ পর আবার শুরু করল, 'তবু বাবা যতদিন বেঁচে ছিলেন, আমাকে আগলে আগলে রেখেছেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর নীলকান্তর উৎপাত দশ গুণ বেড়ে গেল। লোভী জানোয়ারের মত দিনে কত বার করে যে সে হানা দিতে লাগল তার ইয়ত্তা নেই। মা মেয়েমানুষ, ঐ রকম একটা জন্তুকে ঠেকিয়ে রাখা তাঁর সাধ্য নয়। যাতায়াত

করতে করতে একদিন নীলকান্ত বললে, 'অমুক তারিখে তার সঙ্গে আমার বিয়ে দিতেই হবে।'

দম বন্ধ করে ডানিয়েল বলল, 'তারপর?'

'তারপর আর কি। পাশের গ্রামে আমাদের এক আত্মীয় ছিল, নীলকান্তর দেওয়া তারিখটা আসার আগেই সেখানে পালিয়ে গেলাম। কিন্তু যাওয়ার কারণটা আত্মীয়রা যেই মাত্র শুনল, আশ্রয় দিতে রাজী হল না।'

'কেন?'

'কেন আবার। নীলকান্তকে সবাই ভয় করত, আশেপাশের বিশ পঁচিশটা গ্রামে তার চরিত্রের সৌরভ ছড়িয়ে পড়েছিল। তার নামে নিরীহ গ্রামবাসীরা আঁতকে উঠত।'

'ওই আত্মীয়রা আশ্রয় না দেওয়াতে কী করলেন?'

'ছুটলাম আরেক আত্মীয়ের বাড়িতে, সেখানেও এক অবস্থা। তারপর আরেক আত্মীয়ের বাড়ি। একে একে সেই অঞ্চলে জনদশেক আত্মীয়ের বাড়ি গেলাম। কিন্তু নীলকান্তর ভয়ে কোথাও টেকা গেল না। এদিকে নীলকান্তও রাহুর মত আমাদের পেছনে লেগে আছে। আমাকে ধরার জন্যে সে তখন উন্মাদ।'

'কোথাও তো আশ্রয় পেলেন না। তারপর?'

'তারপর গেলাম মহাদেবের মন্দিরে।'

'সেখানে কি?'

'বলছি। আমাদের ওখানে প্রকাণ্ড এক শিব মন্দির ছিল। দূর দূর জায়গা থেকে লোকেরা সেখানে পুজো দিতে আসত। ওখানে যিনি পুরোহিত ছিলেন তিনি খুব শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। সবাই তাঁকে সম্মান করত। সোজা তাঁর কাছে গিয়ে বিপদের কথা বলে আশ্রয় চাইলাম। নীলকান্তর ভয়ে তিনিও ফিরিয়ে দিলেন।'

'কিন্তু—'

'কী?'

'আমি শুনেছি শিব হিন্দুদের দেবতা আর আপনি কৃশ্চান। কৃশ্চান হয়ে শিব মন্দিরে আশ্রয় চাইতে গেলেন যে?'

'সে সময় আমি কৃশ্চান ছিলাম না, আমি তখন হিন্দু। তারপর শুনুন। কোথাও নিরাপদ একটু জায়গা না পেয়ে আবার উর্ধ্বশ্বাসে ছুটলাম। নীলকান্তও আমাদের পেছন পেছন ছায়ার মত লেগে রইল। তার সঙ্গে একটা লুকোচুরি খেলা চলতে লাগল যেন আমার। ছুটতে ছুটতে সেই চান্দা জেলা থেকে মা আর আমি শেষ পর্যন্ত এখানে চলে এলাম। সবাই আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছে কিন্তু রেভারেণ্ড আপ্তে আমাদের আশ্রয় দিলেন। নীলকান্ত এখানেও হানা দিয়েছিল কিন্তু সুবিধে করতে পারে নি। এ তো আর চান্দা জেলার সেই গ্রাম নয়। এত দূরে এসে ইতরামি করা চলে না। রেভারেণ্ড আপ্তে তাকে শাসিয়ে দিয়েছিলেন, ভবিষ্যতে এ অঞ্চলে দেখলে তার হাড় আর মাংস আলাদা করে ফেলবেন। নীলকান্ত ভয় পেলেও আশাটা একেবারে ছেড়ে দ্যায় নি, সুযোগ বুঝে মাঝে মাঝে আসত। একদিন চার্চের পাদ্রীরা তাকে ধরে

বাঁধলেন এবং কোলাপুর থানায় চালান করে দিলেন। তারপর থেকে আর সে আসেনি।'

'তার কি জেলটেল হয়েছিল?'

'জানি না।'

'চার্চে আসার পর কী হল?'

'সেই কম বয়েস থেকে ভয়ে দম বন্ধ করে বেঁচে ছিলাম। এই প্রথম প্রাণ খুলে শ্বাস টেনে বাঁচলাম। যাই হোক, মা কিন্তু বেশিদিন বাঁচলেন না। চার্চে আসার মাস ছয়েকের মধ্যেই মারা গেলেন।'

'তারপর?'

'তারপর আর কি, পৃথিবীতে আমার যাবার কোথাও জায়গা ছিল না। আমি চার্চেই থেকে গেলাম। একটা লোক তো আর হাত-পা গুটিয়ে থাকতে পারে না। ঘুরে ঘুরে চার্চের এটা সেটা করতাম, বিশেষ করে রান্না ঘরেই আমার বেশির ভাগ সময় কেটে যেত। তা ছাড়া মিশনারীদের সেবামূলক কাজ দেখতাম। সে সব ধীরে ধীরে আমার খুব ভাল লাগছিল। চার্চের জীবনযাত্রার মধ্যে এমন এক পবিত্রতা রয়েছে যা আমাকে খুবই আকৃষ্ট করেছিল, মুগ্ধ করেছিল। সবার কথা জানি না, নিজের কথাই বলছি। এতকাল যে সমাজে বাস করেছি, যে ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে লালিত পালিত হয়েছি—সে সব আমাকে নিরাপত্তা দিতে পারে নি, নির্ভাবনায় বাঁচার মত পরিবেশ তৈরি করতে অক্ষম হয়েছে। তুলনায় চার্চ আমাকে যা দিয়েছে তা আগে আর কোনোদিন পাইনি। চার্চ আমাকে শুধু আশ্রয়ই দ্যায় নি, আমাকে নতুন করে বাঁচার প্রেরণা দিয়েছে। জানেন মিস্টার ডানিয়েল, স্বাভাবিক কৃতজ্ঞতার জন্যেই আমি একদিন কৃশ্চান হয়ে গেলাম, সেবাব্রতিনীর জীবন গ্রহণ করলাম।' বলতে বলতে চুপ করল সুভদ্রা। অনেকক্ষণ কী এক ভাবনার গভীরে মগ্ন হয়ে রইল সে।

এদিকে কোঙ্কন উপকূল আরো অন্ধকার হয়ে গেছে, আরো ঝাপসা। সুভদ্রা বা ডানিয়েল কাউকেই আর স্পষ্ট করে বোঝা যাচ্ছে না।

একসময় পাশ থেকে সুভদ্রা আবার বলে উঠল, 'মিশনারি জীবনে দীক্ষা নেবার পর রেভারেণ্ড আপ্তে নিজে আমাকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন, নার্সের কাজ শিখিয়েছেন। সব শেখার পর আমি সেবাব্রতিনী হয়েছি। নিজের কথা সব বললাম। আমি এদেশের মেয়ে, অত্যন্ত দরিদ্র পরিবার থেকে এসেছি তবু কিন্তু আপনার মত সব কিছু ভুলে সাধারণ মানুষের সঙ্গে একাকার হয়ে যেতে পারিনি। বলুন, আপনার প্রতি আমার যদি শ্রদ্ধা হয়ই সেটা কি খুবই অন্যায়?'

ডানিয়েল উত্তর দিল না। খুব সম্ভব সুভদ্রার জীবনের বিচিত্র কাহিনী তার সমস্ত অস্তিত্বকে নাড়া দিয়ে যাচ্ছে।

দেখতে দেখতে গণপতি উৎসবের দশটা দিন কেটে গেল। এই সময়টা কোঙ্কন উপকূলের সমস্ত নারী-পুরুষ প্রচণ্ড পরিমাণে মসুম্বির তাড়ি খেয়েছে, তামাশা শুনেছে, বাঘের সং সেজেছে, রাত জেগে হল্লোড় করেছে, বেপরোয়ার মত সমস্ত বছরের সঞ্চয় দু-হাতে উড়িয়ে দিয়েছে। তাদের বেগহীন স্রোতহীন নিস্তরঙ্গ জীবনে কয়েকটা দিন দুরন্ত ঢল নেমে এসেছিল যেন।

অন্য বছরের তুলনায় এবার মাতামাতির মাত্রাটা কিছু বেশিই হয়েছে। সেটা ডানিয়েলের জন্য। ডানিয়েলের জন্য বললে সঠিক বলা হয় না, সে উপলক্ষ মাত্র বলা উচিত। রতি-গণেশের বিয়ের ব্যাপারটা পশ্চিমঘাটের এই সুদূর অঞ্চলে অভাবিত উত্তেজনার সঞ্চার করেছিল।

বলা যায় এক খেয়ালী পাগল ক'দিনের জন্য কোঙ্কন উপকূলটাকে দু-হাতে প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে, খানিক মজা করে গেছে। আর তারই ফলে এখানকার জীবন তার স্বাভাবিক কক্ষপথ থেকে ছিটকে বাইরে বেরিয়ে এসেছিল।

কয়েক দিন উদ্দামতার পর কোঙ্কন উপকূলে আবার তার স্তিমিত নিষ্প্রভ তরঙ্গ হীন জীবনযাত্রার মধ্যে ফিরে এসেছে। আবার সেই প্রাণধারণের সংগ্রাম, দুর্ভাবনা, সেই দারিদ্র্য, আবার সেই অপরিসীম অমানুষিক পরিশ্রম। জীবন চিরাচরিত রীতিতে, নির্দিষ্ট ধারায় বয়ে চলল।

এভাবে পুরো একটা মাস চলার পর আজ আবার এখানকার জীবনে বড় রকমের ঢেউ উঠল।

আজ গণেশ-রতির বিয়ে। বিয়েটা আগেই স্থির হয়ে ছিল। ভাল দিন দেখে শুভকাজটা মিটিয়ে ফেলার আয়োজন করা হয়েছে।

বিয়েটা ঘিরে সারা অঞ্চলে উৎসাহ-উদ্দীপনার অন্ত নেই। কেউ আজ আর নিজের নিজের বাড়িতে নেই, চারপাশের গ্রামগুলো ফাঁকা করে সবাই মনপুরায় ছুটে এসেছে। এদের মধ্যে কিছু আছে নিমন্ত্রিত, অবশিষ্টরা অনাহূত, বরাহূত। এ অঞ্চলে এ জাতীয় বিয়ে আর কখনও হয় নি। কাজেই অভাবনীয় কিছু একটা দেখার লোভ কেউ দমন করতে পারে নি। বউ-বাচ্চা-বুড়ো-বুড়ী-কিশোরী-যুবতী, দল বেঁধে সবাই চলে এসেছে।

শর্ত ছিল, এই কোঙ্কন উপকূলে গণেশ আর রতির আত্মীয়স্বজন এবং জাত গোষ্ঠির যত লোক আছে সবাইকে খাওয়াতে হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল অনাহূতের দলও খাবার ব্যাপারে খুব আগ্রহশূন্য নয়। বরং এ ব্যাপারে তাদের উৎসাহ প্রবল।

রতি-গণেশের দুই বাপ জাত গোষ্ঠিকে খাওয়াবার জন্য একটা পয়সাও খরচ করবে না। সে দায়িত্ব পুরোপুরি ডানিয়েলের।

ডানিয়েল শ তিনেক লোকের খাবার আয়োজন করেছিল। খাওয়া আর কি! ভাত, ডাল, তরকারি আর বাড়তি হিসাবে একটা করে মুগের লাড্ডু।

একদল খাবে, আরেক দল (যদিও রবাহূত) তাকিয়ে থাকবে, সেটা খুব দৃষ্টিকটু। অতএব ডানিয়েল আরো কয়েক বস্তা চাল, আধমণটাক ডাল এবং তরিতরকারি আনিয়ে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড উনুনে চাপিয়ে দিল।

আজ ডানিয়েলের ব্যস্ততার শেষ নেই। এই বিয়ের কেন্দ্রে বসে আছে সে। তার জন্যই এই বিয়ে সম্ভব হয়েছে। যুগপৎ সে-ই কন্যাকর্তা এবং বরকর্তা। একবার রান্নাবান্নার তদারক করছে, পর মুহূর্তেই ছুটে গিয়ে বিয়ের কাজ সম্বন্ধে তাড়া দিচ্ছে। একবার ছুটে যাচ্ছে রতিদের বাড়ি, পরক্ষণেই তাকে দেখা যাচ্ছে গণেশদের দুয়ারে। তারপরেই হয়ত নিমন্ত্রিতদের আপ্যায়নে মেতে উঠল। শুভকাজের কোথাও কোনো খুঁত না থেকে যায়, কোনোদিকে অঙ্গহানি না ঘটে, সে জন্য তার অসীম সতর্কতা।

অবশ্য এ ব্যাপারে সুভদ্রা তাকে খুবই সাহায্য করছে। কাল রাতেই চার্চ থেকে চলে এসেছে সে। রাত্তিরে আর ফেরে নি, গঙ্গাবাঈ-এর কাছে রাত কাটিয়ে আজ সকাল থেকে ডানিয়েলের সঙ্গে সে-ও ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছে। তারও ব্যস্ততার অন্ত নেই।

গ্রামের মেয়েরা সবাই গিয়ে রতিদের বাড়ি ভিড় জমিয়েছে। তাদের কেউ আনাজ কুটছে, কেউ ডাল বাছছে, কেউ চাল ধুচ্ছে। মোট কথা গণেশ-রতির বিয়েটাকে ঘিরে যে জোয়ার এসেছে তাতে কেউ আর বাকি নেই, সবাই ভেসে গেছে।

ছোটাছুটির ফাঁকে ঘুরে ফিরে বার বার রতির কাছে চলে আসছে ডানিয়েল। রতির সমবয়সিনীরা মানে বান্ধবীরা তাকে ঘিরে বসে আছে। এমনিতেই অপুষ্টি আর রুগ্নতার দেশে মেয়েটা আশ্চর্য ব্যতিক্রম। কালো দেবদূতীর মত মেয়েটাকে আজ কি চমৎকারই না দেখাচ্ছে!

যত বার ডানিয়েল রতিদের বাড়ি আসছে ততবারই বিয়ের একেকটা আচার চোখে পড়ছে। কখনও রতিকে মঙ্গলসূত্র পরানো হচ্ছে, কখনো গায়ে হলুদ লাগানো হচ্ছে, কখনও স্নান করানো হচ্ছে।

এ দেশের বিবাহ প্রথা কিছুই জানে না ডানিয়েল। দু-চোখে অপার বিস্ময় নিয়ে সব দেখছে সে আর অসীম কৌতূহলে প্রশ্ন করে করে রীতিগুলির কারণ এবং প্রয়োজনীয়তা জেনে নিচ্ছে। যত জানছে ততই মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছে।

কৃশ্চান-বিবাহের প্রথাগুলি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। সময় এবং পরিশ্রম বাঁচানোর জন্য সেগুলোকে কেটে ছেঁটে অত্যন্ত সরল করে ফেলা হয়েছে। এই সরলীকরণের ফলে সুবিধে অবশ্যই হয়েছে কিন্তু বিবাহ তার মাধুর্য এবং রমণীয়তা হারিয়ে ফেলেছে।

কৃশ্চান-বিবাহের নিয়মগুলি মনে পড়ে। বিয়ে ঠিক করে ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিসে যাওয়া অথবা তাঁকে বাড়িতে ডেকে পাঠানো হয়। তাঁর সামনে বর-কনে আজীবন একসঙ্গে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়ে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর দেয়। টিল ডেথ ডু আস

পার্ট—ইত্যাদি ইত্যাদি। চুক্তিনামায় সই দেবার পর দু'জনে যায় চার্চে, সেখানে জগতের প্রভুকে প্রণাম করে ধর্মযাজকের আশীর্বাদ নিয়ে সরাসরি হোটেলে। সেখানে পার্টি। যাদের সামর্থ আছে কেটারারকে অর্ডার দিয়ে বাড়িতে পার্টির ব্যবস্থা করে। সই-সাবুদ-সাক্ষী, সব কিছুর মধ্যেই কেমন একটা ব্যবসায়িক গন্ধ।

কৃশ্চান-বিবাহের এই মাধুর্যহীনতার কথা মনেই পড়ত না যদি তুলনামূলকভাবে কোঙ্কন উপকূলের এই হিন্দু বিবাহ ডানিয়েল দেখত। হিন্দু-বিবাহের সুষমা, চারুতা, রম্যতা—সমস্তই মহিমময় শিল্পের মত। ডানিয়েলের স্নায়ুগুলোকে তা যেন জুড়িয়ে দিয়েছে।

রতির সঙ্গে ডানিয়েলের যতবার চোখাচোখি হয়েছে তত বারই মধুর হেসে চোখ নামিয়ে নিয়েছে মেয়েটা। সে হাসির মধ্যে নেই কী! লজ্জা আছে, কৃতজ্ঞতা আছে, পরম প্রাপ্তির আনন্দ আছে। আর আছে উচ্ছ্বসিত প্রাণের কিছু আবেগ। উচ্ছ্বাসময়ী প্রাণবন্ত মেয়েটাকে এখন আর চেনাই যায় না। আশ্চর্য ব্রীড়াময়ী হয়ে উঠেছে সে।

এমন লজ্জা, এমন আরক্ত ব্রীড়া ইওরোপে চোখে পড়ে না। মেয়েদের এই লজ্জাটুকু বোধহয় থাকা ভাল। এটাই আজ রতির চোখেমুখে আর সর্বাঙ্গে নতুন মহিমা, নতুন শ্রী, নতুন মাধুর্য মাখিয়ে দিয়েছে।

যাই হোক বিয়ে, ব্রাহ্মণ ডাকিয়ে টিকলরাম মধুকরের প্রায়শ্চিত্ত এবং ভোজ শেষ হ'তে হ'তে রাত কাবার হয়ে গেল। পরের দিন বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুর বাড়ি রওনা হল রতি।

শ্বশুর বাড়ি যাবার দৃশ্যটা হৃদয়স্পর্শী। রতি এমন কান্না শুরু করে দিল যাতে মনে হয়, মনপুরা গ্রামের এ পাড়া থেকে ও-পাড়ায় যেন যাচ্ছে না, যাচ্ছে দূর দেশান্তরে, সেখান থেকে আর বুঝি বাপ-মায়ের কাছে ফিরতে পারবে না। বাপের বাড়ির স্নেহ-মায়া-মমতার সব সম্পর্ক যেন মনে হয় চিরকালের মত ছিন্ন করে চলে যাচ্ছে। রতির কান্না তার বাপ-মা-ভাই-বোনদের মধ্যেও সংক্রামিত হয়েছে। তারাও সমস্বরে বিলাপ জুড়ে দিয়েছে। গ্রামবাসী যারা উপস্থিত হয়েছে তাদের চোখও শুকনো নেই, গভীর বিষাদে তারা আচ্ছন্ন।

যে দেশের যেমন মানসিক গঠন। ইওরোপে তো স্বামীর বাহুলগ্ন হয়ে একরকম হাসতে হাসতেই অতীত জীবনকে পেছনে ফেলে মেয়েরা চলে যায়। কিন্তু প্রাচ্যের, বিশেষ করে ভারতবর্ষের মেয়েদের রীতিই ভিন্ন। স্বামীর ঘরে যাবার জন্য তাদের যত আগ্রহ, বাপের বাড়ির জন্য ঠিক তেমনই ব্যাকুলতা। যে বন্ধন জড়িয়ে আছে তা ছিন্ন না করলেও নয়, আবার ছিঁড়তে গেলেও প্রাণের তারে ব্যথা বেজে ওঠে।

রতির এই বিদায় দৃশ্যে কেউ আর ঘরে নেই, মনপুরা গ্রামের সমস্ত নারী-পুরুষ সেখানে এসে ভিড় জমিয়েছে। ভিড়ের ভেতর সুভদ্রাও রয়েছে।

বর কনে বার হ'তে হ'তে সন্ধ্যা হয়ে গেল। তারপর একে একে সবাই যে যার বাড়ি ফিরে চলল। ভিড়টা আস্তে আস্তে পরিষ্কার হয়ে যেতে লাগল।

দুটো দিন অপরিসীম পরিশ্রম গেছে। শ্রান্ত ডানিয়েল অবসন্ন পা ফেলে ফেলে সুভদ্রার পাশে এসে দাঁড়াল।

সুভদ্রা আস্তে আস্তে ধীর স্বরে বলল, 'শ্বশুর বাড়ি যাবার সময়টা মেয়েদের পক্ষে যে কী সময়, একমাত্র মেয়ে ছাড়া তা কেউ বুঝতে পারে না। আমার এত খারাপ লাগে।'

বোঝা গেল রতির শ্বশুর বাড়ি যাওয়ার দৃশ্যটা তাকে অভিভূত করে ফেলেছে। সে এদেশের মেয়ে, তাছাড়া সন্ন্যাসব্রত নেবার আগে সে ছিল হিন্দু। কাজেই এই দিনটার করুণ বিষণ্ণ রাগিণী সে ভালভাবেই অনুভব করতে পারে।

ডানিয়েল মাথা নাড়ল, 'ঠিকই বলেছেন। এই মাত্র রতিরা চলে গেল, দৃশ্যটা এখনও ভুলতে পারছি না। ব্যাপারটা এত 'টাচি', যে কী বলব!' ভারতবর্ষের সজল সরস আবহাওয়ায় এসে সেও কি স্পর্শকাতর ভাবপ্রবণ হয়ে উঠল! অথচ ইওরোপীয় জীবনের অভিধানে আবেগ, স্পর্শকাতরতা ইত্যাদি শব্দগুলোর অস্তিত্ব প্রায় নেই বললেই চলে। অনাবশ্যক প্ল্যাণ্ডের মত ওগুলো তারা প্রায় কেটে ছেঁটে বাদ দিয়ে দিয়েছে। সম্পূর্ণরূপে তারা গদ্যধর্মের মানুষ। আর ডানিয়েল কিনা আত্মবিস্মৃত হয়ে, জাতীয় চরিত্র ভুলে গিয়ে রতির বিদায় দৃশ্যে আচ্ছন্ন বোধ করছে!

সুভদ্রা বলল, 'দুটো দিন খুব খাটুনি গেল আপনার।'

'আমার একার? আর আপনি বুঝি আরাম করে ঘুমুচ্ছিলেন!' ডানিয়েল হাসল।

সুভদ্রাও হাসল। একটু কী ভেবে বলল, 'বড্ড ঘুম পাচ্ছে, এখন আমি কিন্তু বাড়ি যাব। গিয়েই শুয়ে পড়ব। আপনি কী করবেন?'

'আমি যাব ঠাকুমার ওখানে। গিয়ে ভাল করে স্নান করতে হবে। তারপর আপনার মত ঘুমের চেষ্টা করব।'

'চেষ্টা আর করতে হবে না। পড়া মানেই আজ মড়া। চলুন, আর দাঁড়িয়ে থেকে কী হবে।' সুভদ্রা পা বাড়িয়ে দিল।

রতিদের বাড়িটা গ্রামের ঠিক মাঝামাঝি জায়গায়। সেখান থেকে পুবে অনেকখানি হাঁটলে ভামুয়া বুড়ির বাড়ি, সেটাই ডানিয়েলের গন্তব্য। ভামুয়া বুড়ির বাড়ি ডাইনে রেখে আরেকটু এগুলে গঙ্গাবাঈয়ের বাড়ি।

আজ কী তিথি কে জানে। কুয়াশার ফিনফিনে আবরণটার ওপারে গোলাকার একখানা চাঁদ উঠেছে। গলানো রুপোর মত তরল কোমল আলোয় মনপুরা গ্রাম ভেসে যাচ্ছে।

পাশাপাশি নিঃশব্দে কিছুক্ষণ হাঁটার পর সুভদ্রা ফিসফিসিয়ে উঠল, 'কাজটা খুব ভাল হল।'

অন্যমনস্কের মত ডানিয়েল জিজ্ঞেস করল, 'কিসের কাজ?'

'এই রতি-গণেশের বিয়ের কথা বলছি।'

আবছা গলায় ডানিয়েল কী উত্তর দিল, বোঝা গেল না।

সুভদ্রা আবার বলল, 'আচ্ছা, মানুষের জীবনে বিয়ের দিনটা খুব অদ্ভুত, তাই না? বোধ হয় এই দিনে তার নতুন করে আরেক বার জন্ম হয়।'

'কী করে বলব, বলুন—' ডানিয়েল হাসল, 'আমার তো এ ব্যাপারে কোনো অভিজ্ঞতা নেই।'

'জানি আপনার বিয়ে হয় নি, তবু একটা ধারণা তো করতে পারেন।'

উত্তরটা কৌশলে এড়িয়ে গেল ডানিয়েল। বলল, 'তেমন ধারণা করা আপনার পক্ষেও সম্ভব।'

একটু চুপ করে থেকে সুভদ্রা হঠাৎ বলে উঠল, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

'স্বচ্ছন্দে।'

'আপনি বিয়ে করবেন না?'

দেবী জুনোর মত মেয়েটার মুখে চাঁদের আলো এসে পড়েছে। এমনিতেই সে সুন্দর, মনোরম। গত দু-দিনের ক্লান্তি তার রূপে একটা নতুন মাত্রা এনে দিয়েছে যেন।

সুভদ্রা নিস্পলকে ডানিয়েলের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে এলোমেলো পা ফেলছে। তার দৃষ্টিটা যেন কেমন।

এর আগেও এক-আধবার, বিশেষ করে গণেশ পুজোর সং সেজে সুখনা থেকে ফিরবার পথে সুভদ্রা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সে উচ্ছ্বাসে তেমন প্রবলতা ছিল না।

একদিন 'লাভ' কথাটার মারাঠী সমশব্দ জানতে গিয়ে বিপদে পড়তে হয়েছিল ডানিয়েলকে। সুভদ্রা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। আশ্চর্য, আজ সন্ন্যাসিনী নিজেই কিনা উপযাচিকা হয়ে বিয়ের কথা তুলেছে।

সুভদ্রার বয়স কত হবে? মেয়েদের বয়স বুঝবার চোখ ডানিয়েলের নেই। প্রথম দিন দেখে সুভদ্রাকে উনিশ-কুড়ি মনে হয়েছিল। ইদানীং আরো কিছু বেশি মনে হয়। সেটা সম্ভবত বয়সের জন্য নয়, তার গাম্ভীর্য এবং সন্ন্যাসিনী-সুলভ স্বভাবের জন্য।

রতি-গণেশের বিয়ে খুব সম্ভব সুভদ্রাকে খুবই আলোড়িত করেছে। এই বয়সের মেয়ের পক্ষে আলোড়িত হওয়াই স্বাভাবিক। সন্ন্যাসিনী হলেও বয়সের ধর্মকে অস্বীকার করতে পারেনি সুভদ্রা। যাই হোক ডানিয়েল বলল, 'বিয়ের কথা কোনোদিন ভেবে দেখিনি।'

ডানিয়েলের চোখের তারায় দৃষ্টি স্থির রেখে সুভদ্রা বলল, 'মিথ্যে কথা।'

'বিশ্বাস করুন।'

'আচ্ছা বিশ্বাস করলাম। কিন্তু '

'কী?'

কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেল সুভদ্রা। অনেকক্ষণ পর হঠাৎ গাঢ় স্বরে শুরু করল, 'আপনি বিদেশী মানুষ, চিরদিন তো আমাদের এখানে থাকবেন না।'

'কে বলল, থেকেও তো যেতে পারি।' মৃদু হাসল ডানিয়েল।

'ও একটা কথার কথা। আচ্ছা দেশে ফিরে গিয়ে আমার কথা ভাববেন?'

'সত্যিই যদি ফিরে যাই, আপনাকে কোনোদিন ভুলব না। আপনাকে ভোলা যায় না।' ডানিয়েলের স্বরে কাঁপন লাগল।

পর মুহূর্তেই সুভদ্রা প্রশ্ন করল, 'আজকাল আপনি ছবি আঁকেন না?'

'ছবি!' ডানিয়েল চকিত হল।

'হ্যাঁ, ছবি। সেই যে আমাকে নিয়ে এঁকেছিলেন। চমৎকার হাত আপনার।'

ডানিয়েল স্তম্ভিত। একদিন ঐ ছবিটা নিয়ে রীতিমত একটা যুদ্ধই হয়ে গেছে। আর আজ! সুভদ্রা কি সন্ন্যাসিনীর সমস্ত আবরণ সরিয়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে?

ইংল্যাণ্ডে থাকতে ছবি আঁকার মোটামুটি চর্চা ছিল। অবকাশ পেলেই কাগজ আর তুলি নিয়ে বসত ডানিয়েল। এখানে এসে একখানাই মাত্র ছবি এঁকেছে, তা-ও সুভদ্রাকে খ্যাপাবার জন্য।

ডানিয়েল ভাবল, সুভদ্রা ভাল কথাই মনে করিয়ে দিয়েছে। রং তুলি নিয়ে আবার তাকে বসতে হবে। পরক্ষণেই মনে হল, রং তুলি এখানে কোথায় পাওয়া যাবে! সঙ্গে সঙ্গে সমস্যাটার সমাধান করে ফেলল সে, পেন্সিল স্কেচই করবে। কোঙ্কন উপকূলের এই অবারিত প্রকৃতি, বিচিত্র জীবনযাত্রা—এসব রেখার বন্ধনে ধরে রাখা উচিত। শিল্পী হিসেবে অনেক আগেই এ দিকে তার নজর পড়া উচিত ছিল।

আস্তে আস্তে ডানিয়েল বলল, 'এবার থেকে ছবি আঁকব।'

'এঁকে কিন্তু আমাকে দেখাবেন।'

'নিশ্চয়ই।'

একসময় ভামুয়া বুড়ির বাড়ির সামনে এসে পড়ল দু-জনে।

কার্তিক মাসে গণপতি-উৎসব, অঘ্রান মাসে রতি-গণেশের বিয়ে। দুটো বড় বড় ঢেউ পর পর এসে কোঙ্কন উপকূলকে তরঙ্গিত করে গিয়েছিল। তারপর একটানা দুটো মাস সেই পুরনো স্তিমিত জীবনযাত্রা, তার মধ্যে না আছে উত্তেজনা, না বেগ, না কোনো সমারোহ।

তবু কোনরকমে দিন কেটে যাচ্ছিল। কিন্তু মাঘের শেষাশেষি এসে কোঙ্কনের জীবন থমকে দাঁড়াল।

শীতের শুরু থেকেই আরব সাগর কৃপণ হয়ে যেতে শুরু করেছিল। তার বন্ধ মুঠি থেকে আর করুণা ঝরছিল না। তবু এই দুটো মাস যা মাছ পাওয়া যাচ্ছিল তা বেচে সংসার কোনোরকমে চলছিল কিন্তু মাঘের শেষে এসে আর চলল না। সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর ইদানীং দু-আড়াই সেরের বেশি মাছ মেলে না। তাতে ঠিকমত একজনের খোরাকিও হয় না।

প্রতি বছর নাকি গণপতি-উৎসবের পর সমুদ্রের কৃপণতা দেখা দেয়। তবে ঠিক কোন সময়টা আরব সাগরের হৃদয় কঠোর হবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। কোনো বার অঘ্রান মাসেই সমুদ্র নিষ্ঠুর হয়ে যায়, কোনো বার পৌষে, কোনো বার বা মাঘ-ফাল্গুনে। এই সময়টা আরব সাগর তার মীনকুলকে কোথায় যে লুকিয়ে ফেলে কেউ জানে না।

যাই হোক, এ অঞ্চলের বাসিন্দারা খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। এমন যে উদাসীন শিবরাম, কোনো ব্যাপারেই যাকে বিচলিত হতে দেখা যায় না, তার বয়োঃজীর্ণ মুখেও ভাবনার রেখা ফুটল। কীভাবে দিন চলবে, সেই ভাবনাতে সকলেই অস্থির। দুশ্চিন্তার গাঢ় গহন ছায়া সমস্ত কোঙ্কন উপকূলটাকে দ্রুত বেষ্টন করতে শুরু করল।

শুধু ভাগ্যের হাতে সব কিছু সঁপে দিয়ে বসে থাকলেই তো চলবে না। নিজেদের বাঁচাতে হবে, ছেলেমেয়েদের রক্ষা করতে হবে।

বিভ্রান্ত মৎস্যজীবীর দল ডানিয়েলকে ধরল, সে যদি কোনো একটা পথ বলে দিতে পারে। অন্য সকলের মত ডানিয়েলও দিশেহারা হয়ে পড়েছে। সে ভেবেই পাচ্ছে না, এই বিংশ শতাব্দীতে পৃথিবী যখন এত অগ্রসর তখন এক মানবগোষ্ঠী কীভাবে সমুদ্রের খামখেয়ালির কাছে আত্মসমর্পণ করে বসে আছে! সমুদ্র যদি করুণা করে তবেই তারা বাঁচতে পারে নতুবা মৃত্যু অনিবার্য। ডানিয়েল কী বলবে, ভেবে পেল না। এ ব্যাপারে রেভারেণ্ড আপ্তে এবং সুভদ্রার সঙ্গে পরামর্শ করা প্রয়োজন মনে করল সে। মনে করতে আর দেরি করল না, একদিন সকালে সোজা চার্চে এসে হাজির হল।

গীর্জায় দু-জনকেই পাওয়া গেল। রেভারেণ্ড আপ্তে সস্নেহে হেসে বললেন, 'এত সকালে হঠাৎ কী মনে করে?'

ডানিয়েল তার আসার উদ্দেশ্যটা জানিয়ে বলল, 'এখন বলুন, কী করণীয়?'

শুনতে শুনতে রেভারেণ্ড আপ্তের মুখ থেকে হাসিটুকু বিলীন হয়ে গিয়েছিল। চিন্তাগ্রস্তের মত তিনি বললেন, 'খবরটা আমিও পেয়েছি কিন্তু কিছুই করবার নেই' হতাশ ভঙ্গিতে আস্তে আস্তে মাথা নাড়লেন তিনি।

'কিছুই করবার নেই!' ডানিয়েলকে বিস্মিত দেখাল।

রেভারেণ্ড আপ্তে উত্তর দিলেন না। সুভদ্রা চুপচাপ পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। এবার সে বলল, 'না।'

'তা হলে এই লোকগুলোর কী হবে?'

'ভাগ্যে যা আছে তাই হবে।'

'ভাগ্যের ওপর ভরসা করে বসে থাকতে হবে!' ডানিয়েল অসহিষ্ণু হয়ে উঠল। উত্তেজনায় বাঁ হাতের তালুতে সজোরে ডান হাতের একটা ঘুষি বসিয়ে বলল, 'এর অর্থ কী জানেন?'

'জানি বৈকি।' বিমর্ষ একটু হাসল সুভদ্রা, 'একেবারে পরিষ্কার উপোস। প্রতি বছরই তো এরকম হচ্ছে। সমুদ্রই যদি বিমুখ হয় কে কী করতে পারে বলুন—'

'না, কিছুতেই না—'

'কী না?'

'চোখের সামনে এত লোক উপোষ দিয়ে মরবে, আমি তা দেখতে পারব না।'

'কিন্তু কী করবেন?'

খানিকক্ষণ কী চিন্তা করে ডানিয়েল বলল, 'আপনাদের দেশে তো গভর্ণমেন্ট আছে। রিলিফের জন্য তার কাছে কোনোদিন আবেদন করেছেন?'

সুভদ্রা চকিত হল। বিমূঢ়ের মত বলল, 'না।'

এদিকে রেভারেণ্ড আপ্তের মুখেচোখেও কিসের ছোঁয়া লেগেছে। কাঁপা স্বরে তিনি বলে উঠলেন, 'আপনি ঠিকই বলেছেন। গভর্ণমেন্টকে এ ব্যাপারে জানানো দরকার। আশ্চর্য, কথাটা কোনোদিন আমাদের মনেই আসে নি। আমি কালই কোলাপুর যাব, ডিস্ট্রিক্ট অথরিটির সঙ্গে দেখা করে সব বলব। দেখি ওঁরা কিভাবে সাহায্য করতে পারেন।'

'হ্যাঁ, কালই চলে যান। বেশি দেরি করা ঠিক হবে না।'

রেভারেণ্ড বললেন, 'আপনি আমার সঙ্গে যাবেন?'

উৎসাহের ঝোঁকে ডানিয়েল বলতে যাচ্ছিল, যাবে। পরমুহূর্তেই খেয়াল হল, শহরে যাওয়া তার পক্ষে নিরাপদ নয়। সেখানে ধরা পড়ে যাবার প্রচুর সম্ভাবনা।

ডানিয়েল বলল, 'আপনিই বরং যান, আমার এদিকে একটা জরুরী কাজ আছে।'

একটু থেমে জিজ্ঞেস করল, 'কোলাপুর থেকে আপনি কবে ফিরছেন?'

'আজ সোমবার, ফিরতে ফিরতে বুধবার রাত্তির হয়ে যাবে।'

'বেস্পতিবার সকালে আমি আসব, কোলাপুরে কী ব্যবস্থাটা হল জেনে যাব।'

'আচ্ছা।'

বৃহস্পতিবার আবার চার্চে এল ডানিয়েল। রেভারেণ্ড আপ্তে কোলাপুরে গিয়ে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে এসেছেন তা আদৌ উৎসাহজনক নয়। জেলা কর্তৃপক্ষ তাঁকে বিশেষ কেনো ভরসা দিতে পারেন নি। প্রাকৃতিক কোনো বিপর্যয়, যেমন বন্যা, ভূমিকম্প, জলোচ্ছাস ইত্যাদিতে ক্ষতিগ্রস্ত হলে সরকারী সাহায্য অবশ্যই পাওয়া যাবে। কিন্তু সমুদ্র কৃপণ হয়ে যদি মৎস্যজীবীদের জীবিকাকে বিপর্যস্ত করে ফেলে তার জন্য সহায়তার কী বন্দোবস্ত হতে পারে তা তাঁরা ভেবে পাচ্ছেন না। ব্যাপারটা নতুন বলেই তাঁরা কিছুটা বিমূঢ় হয়ে পড়েছেন।

রেভারেণ্ড আপ্তে অতএব জানিয়েছেন, এ-ও এক ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ই। খয়রাতি না পেলে একদল মানুষ ধ্বংসের শেষ কূলে গিয়ে দাঁড়াবে, ইতিমধ্যেই তাদের উপোস শুরু হয়ে গেছে। কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের পক্ষে নিশ্চয়ই এমন অবস্থা খুব গৌরবের নয়। এবার কর্তৃপক্ষ কিঞ্চিত ভাবিত হয়েছেন। রেভারেণ্ড আপ্তেকে মাছমারাদের তরফ থেকে একটা লিখিত আবেদন করতে বলেছেন। সেই আবেদন তাঁরা রাজধানী বোম্বাইতে পাঠিয়ে দেবেন। সেখান থেকে যদি নির্দেশ আসে তবে এখানকার অবস্থা পরীক্ষা করতে একজন অফিসার আসবেন। তাঁর রিপোর্ট যদি অনুকূল হয় কিছু সাহায্য পাওয়া যেতে পারে।

ডানিয়েলের প্রত্যাশা ছিল, রেভারেণ্ড আপ্তে কোলাপুর থেকে ভাল রকমের প্রতিশ্রুতি নিয়ে ফিরবেন। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, সমস্ত ব্যাপারটাই রয়েছে গভীর অনিশ্চয়তার মধ্যে। সরকারী সাহায্যের জন্য যা-যা করতে হবে তার জন্য দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। অন্তত একটা দেড়টা মাস এতে কেটে যাবে, তার মধ্যে কোঙ্কন উপকূল জনশূন্য হয়ে যাবার সম্ভাবনা।

অন্যমনস্কের মত ডানিয়েল জিজ্ঞেস করল, 'আপনি দরখাস্ত করে এসেছেন?'

'না।' রেভারেণ্ড আপ্তে বললেন, 'আমি দরখাস্ত করলে চলবে না। ওদের টিপসই দিয়ে করতে হবে। ভাবছি আজই টিপসইগুলো যোগাড় করে কাল সকালে আবার কোলাপুর যাব।'

'সে-ই ভাল।'

রেভারেণ্ড আপ্তে কোঙ্কনবাসীদের প্রতিনিধি হিসেবে কোলাপুর গিয়ে আবেদন-পত্র জমা দিয়ে এসেছেন। এদিকে যত দিন যাচ্ছে সমুদ্রের হৃদয় তত কঠোর হয়ে উঠছে। জলে জাল নামিয়ে দিলে হতাশা ছাড়া আর কিছুই মেলে না, আরব সাগরের সজীব রূপালী শস্য কোথায় উধাও হয়েছে কে জানে। না কি, তার ভাণ্ডারই শূন্য হয়ে গেছে!

কিছুদিন আগে দুপুরের মজলিশে মনপুরার লোকজন যা জানিয়েছিল তা-ই। দেখতে দেখতে সারা উপকূল থেকে উপোসের খবর আসতে লাগল। ভীত, সন্ত্রস্ত, হতাশ মানুষের দল দিগ্‌দিগন্ত থেকে এসে ডানিয়েলকে ধরতে লাগল, 'একটা কিছু কর সাহেব, একটা কিছু কর। ছেলে-পুলে চোখের সামনে না খেয়ে থাকছে, এ আর দেখতে পারছি না।'

প্রতি বছরই কোঙ্কন উপকূলে গণপতি-উৎসবের পর সাময়িক মন্বন্তর শুরু হয়। এখানকার মানুষ চিরদিন তাতেই অভ্যস্ত। কিন্তু এবার ডানিয়েল রয়েছে। কোঙ্কনবাসীদের বিশ্বাস, যে-ডানিয়েল রক্ষণশীলতার দুর্গ ভেঙে অসবর্ণ বিয়ে দিয়েছে, আড়তদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে মাছের ওজন লিখে আনার ব্যবস্থা করেছে, নিশ্চয়ই এবার সে কিছু করতে পারবে, নিশ্চয়ই তার হাতে অসাধ্য-সাধনের মন্ত্র রয়েছে।

কোঙ্কনবাসীরা বলতে লাগল, 'আমাদের বাঁচাও সাহেব, আমাদের বাঁচাও—'

একজন দু'জন হলে না হয় কথা ছিল কিন্তু এই অসংখ্য ক্ষুধার্ত নিরন্ন মানুষকে কীভাবে রক্ষা করবে সে?

ভেবে ভেবে ডানিয়েল যখন দিশেহারা, সেইসময় একটা কথা তার মনে হল। সঙ্গে সঙ্গে চারদিকের গ্রামগুলো থেকে তাবত মৎস্যজীবীকে মনপুরায় ডেকে আনল সে, সুভদ্রাকেও খবর দিয়ে আনাল। উদ্দেশ্য, সভা করে ভবিষ্যতের জন্য একটা কর্মসূচি স্থির করা।

সন্ধ্যার পর মশাল জ্বেলে সভা বসল। সমুদ্রের মুঠি কঠোর হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে কোঙ্কন উপকূল থেকে আনন্দ অদৃশ্য হয়েছিল। কারো মুখেই হাসির একটি

রেখা নেই। দুর্ভাবনায় সবাই গম্ভীর, থমথমে। মশালের আলো প্রতিফলিত হওয়ায় লোকগুলোকে সারি সারি ব্রোঞ্জ মূর্তির মত দেখাচ্ছে। ডানিয়েল যখন ডেকে এনেছে তখন কিছু একটা সুরাহা হয়ত হবে। লোকগুলো আশায়, আগ্রহে এবং অপরিসীম উদ্বেগে, রুদ্ধশ্বাসে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

সবার মুখের ওপর দিয়ে দৃষ্টিটা একবার ঘুরিয়ে নিয়ে গেল ডানিয়েল। তারপর শুরু করল, 'নিজের চোখেই দেখছি, আজকাল তোমরা যা মাছ পাচ্ছ তাতে সংসার চলে না। কিন্তু না খেয়ে উপোস দিয়ে মরাটা কোন কাজের কথা নয়। বাঁচার মত একটা উপায় আমার মাথায় এসেছে।'

লোকগুলোর চোখ চকচকিয়ে উঠল। নিশ্চিত মৃত্যুর অন্ধকারে বাঁচার চকিত সোনালী একটি রেখা হঠাৎ যেন তারা দেখতে পেয়েছে। তাদের মুখপাত্র হিসেবে চান্দা গ্রামের একজন বয়স্ক প্রৌঢ় লোক উঠে দাঁড়াল। সাগ্রহে বলল, 'কী উপায়?'

'বলছি। তার আগে বল, আজকাল যা মাছ পাচ্ছ, এইরকম মাছ আর কতদিন পাবে?'

'তার কিছু ঠিক নেই। সাগরের খেয়াল হলে মাসখানেকও পেতে পারি, আবার সাত দিনেও পাওয়া বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এই সময়টা সাগরের মতিগতি বোঝা যায় না।'

'আবার কবে থেকে বেশি করে মাছ পাওয়া যাবে?'

'সেই জষ্ঠি মাসের গোড়া থেকে, নতুন বর্ষা আসবার আগে আগে সাগরের দয়া হবে।'

ডানিয়েল হিসেব করে নিল। এখন মাঘ মাসের শেষাশেষি, সুদিন আসবে সেই জৈষ্ঠের শুরুতে। ফাল্গুন চৈত্র এবং বৈশাখ—মাঝখানের এই তিনটি মাস তা হলে দুঃসময়। একটা মাস কোনো রকমে যদি কাটিয়ে দেওয়া যায় তার পরেও দুটো দীর্ঘ ভয়ঙ্কর মাস থাকবে। পরের মাসগুলোর কথা পরে ভাবা যাবে। হয়ত তার মধ্যে সরকারী সাহায্যও এসে পড়তে পারে। আপাতত প্রথম মাসটার সমস্যা সমাধান করতে হবে।

ডানিয়েল বলল, 'একটানা তিনটে মাস তোমাদের তা হলে ভারি কষ্ট?'

'তিনটে মাস নয়, দু মাস।'

অবাক হয়ে ডানিয়েল বলল, 'বাকি মাসটা?'

লোকটা জানাল, 'বাকি মাসটা তেমন আতান্তর থাকবে না। বৈশাখ পড়লে আমাদের গাঁগুলো ফাঁকা করে পুরুষরা চলে যাবে সাতারা জেলায়?'

'সেখানে কী?'

'তুলোর চাষ করার জন্যে লোক দরকার হয়। আমরা গিয়ে সেখানে দিন মজুরিতে খেটে আসি। তারপর জষ্ঠির গোড়াতে আবার ফিরে আসি।' অর্থাৎ এই ক'টা মাস দুর্ভিক্ষ, অনাহার, অর্ধাহার এবং উঞ্ছবৃত্তি এখানকার মানুষদের ললাট-লিখন। লোকটা আবার বলল, 'এখন বল, কী উপায় তোমার মাথায় এসেছে?'

সামান্য কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিল ডানিয়েল। তারপর বলল, 'যতদিন না বেশি করে মাছ পাওয়া যাচ্ছে ততদিন আড়তদারদের ঘরে মাছ দেবে না কেউ।'

প্রথমে কিছুক্ষণ স্তব্ধতা। তারপর বিশাল জনতার মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিল। সুভদ্রাও পাশে বসে উসখুস করতে লাগল।

মৃদু গুঞ্জনে জনতা জিজ্ঞেস করল, 'মাছ না দিয়ে কী করব?'

'নিজেরা খাবে। বাঁচতে হবে তো?'

'শুধু মাছ খাব?'

'হ্যাঁ। খাদ্য হিসেবে মাছ খুবই ভাল, স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী। যতদিন মাছ মেলে ততদিন খেয়ে বাঁচো। তারপর কী করা যায় ভেবে দেখব।'

'কিন্তু—'

'কী?'

'আড়তদাররা রাজী হবে না।'

বুঝতে না পেরে ডানিয়েল জিজ্ঞেস করল, 'কিসে রাজী হবে না?'

জনতা জানাল, 'তাদের মাছ না দেবার ব্যাপারে—'

'সেটা আমি বুঝব। কাল সকালে তোমরা সবাই আড়তদারদের ওখানে গিয়ে জড়ো হবে। আমিও যাব, তোমাদের সুভদ্রা দিদিও যাবেন। আড়তদারদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে বললে নিশ্চয়ই তারা এতে রাজী হবে। তারাও তো মানুষ।'

'বেশ।'

আড়তদারদের মনুষ্যত্বের ওপর ভরসা ছিল ডানিয়েলের কিন্তু সে জানত না এই সম্প্রদায়টা কোন ধাতুতে তৈরি।

তাদের ঘরে ঘরে গিয়ে জেলেদের অবস্থা বুঝিয়ে ডানিয়েল আবেদন করল, কিছুদিনের জন্য তারা মাছ নেওয়া বন্ধ রাখুক। এতে মাছমারারাই শুধু বাঁচবে না, আড়তদারদেরও তাতে প্রচুর লাভ। কেননা মৎস্যজীবীরা যদি মরেই যায় তাদের ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

কিন্তু আড়তদার সমাজ কতখানি হৃদয়শূন্য, সঙ্গে সঙ্গেই তা বোঝা গেল। এ আবেদনে তাদের কাছ থেকে সাড়া মিলল না। তারা জানাল, প্রতি বছরই সমুদ্র এমন খামখেয়ালী হয়ে যায়। এতকাল যদি মৎস্যজীবীরা টিকে থাকতে পারে তবে এবারও পারবে। এতকাল যদি তাদের ব্যবসা চলে থাকে এবারও অচল হয়ে থাকবে না।

মোট কথা, সমুদ্র কৃপণ হয়ে যাওয়াতে আড়তদারেরা খুব বিচলিত নয়। মাছমারাদের সম্পর্কে তাদের প্রাণে আদৌ কোনো সহানুভূতি জাগাতে পারল না ডানিয়েল।

তবু ডানিয়েল শেষবারের মত চেষ্টা করল। বলল, 'মানুষ বলে কথা। ছেলেপুলে-বউ নিয়ে লোকগুলো মরে যাবে, এটা নিশ্চয়ই তোমরা চাও না?'

আড়তদারেরা বলল, 'সেটা আর কে চায়।'

'ওরা আজকাল যা মাছ পাচ্ছে তার বদলে যা দাম তোমরা দিচ্ছ তাতে বুঝতেই পারছ, প্রাণে বাঁচা যায় না। তবু মাছটা যদি ওরা নিয়ে যেতে পারে, নুন দিয়ে সেদ্ধ করে খেলেও কিছুদিন টিকে থাকবে।'

'তা ঠিক। তবে—'

'কী?'

'ওরা যেভাবে পারে মাছ ধরে খাক গে। আমাদের জাল-নৌকো নিয়ে ধরলে মাছ আমাদেরই দিতে হবে।'

'সে তো একই কথা হল।' ডানিয়েল ক্ষুব্ধ স্বরে বলল, 'ওদের প্রাণে মারার ফিকির।'

আড়তদারেরা বলল, 'অত কথা বুঝি না। যা বুঝি তা এই, নৌকো-জাল দেব, মাছ নেব। সোজা হিসেব। চিরকাল ঐ হিসেবেই চলে আসছে। মাছ যদি না পাই নৌকো আর জাল বন্ধ করে দেব।'

'কিন্তু—'

'কী?'

'ওদের তো নিজস্ব কোনো জাল বা নৌকো নেই। তোমরা যদি ও-দুটো বন্ধ করো ওরা মাছ ধরবে কীভাবে?'

'তা ওরা বুঝবে।'

আড়তদারেরা যখন তার আবেদনে সাড়া দিল না তখন হতাশ মুখে বাইরে বেরিয়ে এল ডানিয়েল। দূরে বাদামী বালির বেলাভূমিতে মাছমারারা অপেক্ষা করছিল, তাদের মধ্যে সুভদ্রাও বসে রয়েছে। সোজা সেখানে চলে এল সে।

ডানিয়েলের গম্ভীর মলিন মুখে আড়তদারদের সঙ্গে আলোচনার ফলাফল লেখা রয়েছে। তবু সুভদ্রা এবং জেলেরা উৎকণ্ঠের মত জিজ্ঞেস করল, 'কী হল?'

মুখে কিছু বলল না ডানিয়েল, শুধু অসীম নৈরাশ্যে মাথা নাড়ল।

'তা হলে উপায়?'

ডানিয়েল নিরুত্তর। অনেকক্ষণ স্তব্ধতার পর সে বলল, 'লোকগুলো হার্টলেশ জন্তু, একেবারে কসাই—' তারপর আড়তদারদের সঙ্গে কী কথাবার্তা হয়েছে তার বিবরণ দিল।

সুভদ্রা বলল, 'চিরদিনই ওরা তা-ই। শুধু শুধু ওদের ওখানে গিয়েছিলেন—'

আড়তদারদের কাছে গিয়ে ব্যর্থ হ'তে হয়েছে। সুতরাং দুঃসময়ে মুখোমুখি দাঁড়াবার জন্য আবার কী করা যায় সে সম্বন্ধে পরামর্শ শুরু করল ডানিয়েল। একেক জন একেক রকম মন্তব্য করতে লাগল কিন্তু সন্তোষজনক কোন উপায়ই খুঁজে পাওয়া গেল না।

অবশেষে সুখনা গ্রামের একটি লোক জানাল, দুর্দিনে আড়তদারদের কাছ থেকে তারা কিছু কিছু ঋণ পেয়ে থাকে এবং সুদিনে সুদসমেত তা শোধ করে দেয়। অবশ্য যে টাকা আড়তদারদের কাছ থেকে পাওয়া যায় তা খুবই সামান্য, দু-মাস ব্যাপী দুর্ভিক্ষ ঠেকিয়ে রাখার সাধ্য সে টাকার নেই।

ডানিয়েল উৎসাহিত হয়ে উঠল, 'তবু যে ক'টা দিন ঠেকানো যায়। তোমরা বরং যা পাওয়া যায় আপাতত তাই নিয়ে নাও। নেবে?'

দেখা গেল ঋণগ্রহণে কেউ অরাজী নয়। সমস্বরে সবাই বলল, 'নিশ্চয় নেব।'

'আড়তদারদের কাছে গিয়ে তা হলে বল।'

ডানিয়েল আবার আড়তদারদের কাছে ফিরে চলল। আড়তদারেরা কেউ এক জায়গায় বসে নেই। অতএব আলাদা আলাদাভাবে প্রতিটি আড়তে ডানিয়েলকে হানা দিতে হল। সবাইকে মাছমারাদের বিপদের কথা নতুন করে বুঝিয়ে সে বলল, 'মাছ তো তোমরা ছাড়বে না, তা এক কাজ কর—'

'কী?'

'ফি বছর ওদের বিপদের দিনে তোমরা তো কিছু টাকা ধার দাও। এবারও দাও না?'

প্রতিটি আড়তদারই জানিয়ে দিল আজই তারা এ ব্যাপারে কথা দিতে পারছে না।

ডানিয়েল পীড়াপীড়ি শুরু করলে বলল, 'দিনকয়েক পর এসো। আমরা নিজেদের ভেতর একটু পরামর্শ করে দেখি। তারপর যা হয় করা যাবে।'

ডানিয়েল জিজ্ঞেস করল, 'কবে আসব?'

'এ হপ্তা তো চলেই গেল, আসছে হপ্তার মাঝামাঝি এসো।'

'ও বাবা, সে তো অনেক দিন, মাঝামাঝি না করে বরং গোড়ার দিকে কর।'

'গোড়ার দিকে হবে না।'

এবার সমুদ্রের খামখেয়ালের যেন শেষ নেই। অন্য সব বছর আরব সাগর ধীরে ধীরে হাত গুটিয়ে নেয়। এ সপ্তাহে যদি আড়াই সের করে মাছ পাওয়া যায়, আসছে সপ্তাহে পাওয়া যাবে দু-সের, তারপরের সপ্তাহে দেড় সের। এইভাবে প্রাপ্তির পরিমাণ যদি কমতে থাকে তা হলে কিছু সুবিধা হয়। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ধারণাটা স্পষ্ট থাকলে কীভাবে চলতে হবে সেটা ঠিক করে নেওয়া যেতে পারে, সে সম্বন্ধে প্রস্তুতও হওয়া যায়।

কিন্তু এবার সমুদ্রের মতিগতি বুঝবার উপায় নেই। আড়তদারদের কাছে ঋণের দরবার করে আসার তিন দিনের মধ্যেই আরব সাগর প্রায় মৎস্যশূন্য হয়ে গেল। দু-সের আড়াই সের থেকে পাওয়ার পরিমাণটা ঝপ করে আধসের তিন পোয়ায় নেমে এল। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত কোঙ্কন উপকূল জুড়ে নিদারুণ হাহাকার উঠল। তাবত মানুষ ছুটে এল ডানিয়েলের কাছে। এখন কী করণীয়?

ঋণের ব্যাপারে আগামী সপ্তাহের মাঝামাঝি একবার খোঁজ নিতে বলেছিল আড়তদারেরা। কিন্তু তার অনেক আগেই মাছমারাদের নিয়ে তাদের কাছে যেতে হল।

আগের দিন একা গিয়ে আড়তদারদের সঙ্গে কথা বলেছে ডানিয়েল, মাছমারারা বেলাভূমির বালিতে বসে ছিল। আজ কিন্তু ডানিয়েল একা গেল না। মৎস্যজীবী জনতাকে সঙ্গে নিয়ে আড়তে আড়তে হানা দিতে লাগল।

প্রতিটি আড়তদারই বলল, 'কি ব্যাপার সাহেব, আজ কি তোমাদের খবর নিতে বলেছিলাম।'

ডানিয়েল বলল, 'সাধে কি এসেছি! মাছের অবস্থা তোমরাও জানো। চারদিকে উপোস শুরু হয়ে গেছে।'

'কিন্তু—'

'কী?'

'সবাই এক জায়গায় বসে এখনও তো পরামর্শ করে উঠতে পারিনি। ব্যবসাদার মানুষ আমরা, একজনের সঙ্গে আরেক জনের স্বার্থ জড়ানো। একা একা হুট করে তো আর কিছু করতে পারি না। দশজনে মিলেমিশে যা ঠিক হয় সবাই তা মেনে নিই। তুমি বরং এক কাজ করো সাহেব, এ ব্যাপারে পরশুদিন এসো।'

'উঁহু, পরশু পর্যন্ত তর সইবে না। আজই এখনই তোমরা পরামর্শ সেরে ফেল। আমরা অপেক্ষা করছি।' ডানিয়েল একরকম জেদই ধরল।

আড়তদারেরা প্রথমটা টালবাহানা করতে চাইল কিন্তু ডানিয়েলের জেদ এত প্রবল যে শেষ পর্যন্ত আজই পরামর্শ করতে রাজী হল। তারা বলল, 'তোমরা একটু দূরে যাও, আমরা কথাবার্তা বলে নিই। খানিকটা পরে এসো।'

ডানিয়েল তার সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে সমুদ্রের দিকে চলে গেল। আর আড়তদারেরা একে একে দামোদরের কাছে গিয়ে ভিড় জমাতে লাগল। সেই দামোদর যে আড়তদার সম্প্রদায়ের নেতা, যার শরীর জান্তব উপাদানে গঠিত, ডানিয়েলের সঙ্গে মাছের ওজন লেখার ব্যাপারে যার যুদ্ধ হয়েছিল।

সমুদ্রের পাড়ে বালুকাবেলায় বেশিক্ষণ বসে থাকতে হল না। একটু পরেই আড়তদারের লোক এসে ডানিয়েল এবং মাছমারাদের ডেকে নিয়ে গেল।

নিষ্পলক গোলাকার চোখদুটো ডানিয়েলের মুখে নিবদ্ধ করে দামোদর বলল, 'তারপর সাহেব—কেমন আছ বল?'

'রোজই তো আমায় দেখছ, কেমন আছি তুমি তো জানো।' ডানিয়েল সতর্ক দৃষ্টিতে দামোদরের দিকে তাকাল।

'অন্য দিনের কথা জিজ্ঞেস করছি না। আজ কেমন আছ, বল।' দামোদরের চোখ পিট পিট করতে লাগল।

'ভাল আছি। এখন বল, পরামর্শ করে কী ঠিক করলে?'

'টাকা ধার আমরা দেব। তবে এ হপ্তায় নয়।'

'তবে কোন হপ্তায়?'

'আসছে হপ্তার পরের হপ্তায়।' ঠোঁট কুঁচকে কেমন এক অদ্ভুত মুখ করে দামোদর বলল।

ডানিয়েল শিউরে উঠল। কাঁপা গলায় বলল, 'অত দেরি করলে তো চলবে না, মাছমারারা তা হলে মরে যাবে।'

'কড়কড়ে টাকাগুলো ঘর থেকে বার করে দিতে হবে। তুমিই বল, তাড়াতাড়ি দিতে কি প্রাণ চায়? তুমিই বিচার কর।'

হঠাৎ জোরে জোরে প্রবল বেগে মাথা নাড়তে লাগল ডানিয়েল।
দামোদর অবাক। বলল, 'ও কি সাহেব, ওরকম করছ কেন?'
ডানিয়েল বলল, 'আজই তোমাদের টাকা দিতে হবে।'
'আজই!'
'হ্যাঁ আজই।'
'আজ কোত্থেকে দেব! আমরা কি টাকার থলে নিয়ে বসে আছি।'
'তবে কাল—কাল সকালে দাও, আমরা আসব।'
দামোদরের চোখের তারা দুটো আদিম পশুর মত হয়ে উঠল। দাঁতে দাঁত ঘষে চাপা তীব্র স্বরে সে বলল, 'কাল টাকা নিতে আসবে?'
ডানিয়েল বলল, 'হ্যাঁ।'
আড়তের ভেতর দামোদরের সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল ডানিয়েল। বাইরে মাছমারারা রুদ্ধশ্বাসে দাঁড়িয়ে রয়েছে।
হঠাৎ বাইরের বিশাল জনতার দিকে আঙুল বাড়িয়ে সশব্দে বোমার মত বিদীর্ণ হল দামোদর, 'ঐ হারামজাদারা আজ তোমায় সঙ্গে নিয়ে টাকা চাইতে এসেছে সাহেব। আমাদের কাছে যে একদিন হাত পাততে হবে সেটা শালার ব্যাটারা ভুলে গিয়েছিল।'
ডানিয়েল বলল, 'কী বলতে চাও তুমি?'
উত্তেজনায় কোমরের কষিটা আলগা হয়ে গিয়েছিল দামোদরের। (প্রায়ই ওটা তার খুলে যায়।) মোটা মোটা রোমশ আঙুল দিয়ে সেটা চেপে ধরে সে ভেঙচে উঠল, 'খুব তো সাউকিরি করে ওদের ওজন লেখার ব্যবস্থা করে দিলে। এখন আবার আমাদের কাছে কেন?' বলেই দৌড়ে বাইরে এসে মাছমারাদের উদ্দেশ্যে প্রথমে একটা অশ্রাব্য খিস্তি ছুঁড়ে চিৎকার করে উঠল, 'সাহেব বাপ পেয়েছিস শালারা, সে তোদের স্বগ্‌গের সিঁড়ি তৈরি করে দিয়েছে। এখন তার কাছেই টাকা চেয়ে নে। সে-ই তোদের খাওয়াক।'
লোকগুলো নিরাশ মলিন মুখে চুপ করে রইল। আর মাথাটা ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল ডানিয়েলের। মাছের ওজন লেখার ব্যাপারে যে প্রতিহিংসা আড়তদাররা মনে মনে পুষে রেখেছিল, এতদিনে নিষ্ঠুরভাবে সেটা আত্মপ্রকাশ করেছে। মনে মনে ভীষণ ভয় পেয়ে গেল ডানিয়েল। কাঁপা স্বরে বলল, 'তোমাদের আগেও বলেছি, এখনও বলছি, মাছের ওজন লিখে কিছু অন্যায় করিনি।'
দামোদর হিংস্র জন্তুর মত দাঁত খিঁচিয়ে উঠল, 'বেশ তো, ন্যায়ের কাজটা যখন করেছ তখন ওদের খাওয়াও।'
একটুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল ডানিয়েল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'সোজা কথা খুলে বলো। টাকা দেবে কি দেবে না?'
'দিতে পারি, তবে এক শর্তে—'
'কী শর্ত?'
'মাছের ওজন লেখা বন্ধ করতে হবে।'

ডানিয়েল বুঝল চতুর আড়তদারের দল এতদিনে মৎস্যজীবীদের হাতের মুঠোয় পেয়ে গেছে। পুরুষানুক্রমে যে প্রতারণা চলে আসছিল কয়েকদিনের জন্য তা বন্ধ হয়ে যাওয়াতে তারা মনে মনে অসন্তুষ্ট এবং ক্রুদ্ধ হয়ে ছিল। কিন্তু করণীয় কিছুই ছিল না। তাই সুযোগের প্রতীক্ষায় তাদের থাকতে হয়েছে। এতদিনে আরব সাগর কৃপণ হওয়াতে তাদের প্রতিহিংসা নেবার সময় এসেছে।

ডানিয়েল বলল, 'মাছের ওজন লেখার সঙ্গে ধার নেবার সম্পর্ক কী? তা ছাড়া ধার তোমরা এমনি এমনি দেবে না, দস্তুরমত সুদ নেবে।

দামোদর বলল, 'কোন কথা শুনতে চাই না। আমাদের টাকা নিতে হলে আমাদের কথা শুনতে হবে, পরিষ্কার হিসেব। যদি এতে রাজী হও, কাল সকালে এসো। টাকা পেয়ে যাবে।'

'দেখ, আমি তোমায় এক্ষুনি কিছু বলতে পারছি না। যারা টাকা নেবে তাদের সঙ্গে একটু পরামর্শ করে নিই।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, নিশ্চয়ই পরামর্শ করবে। তবে কিছু যদি মনে না কর, একটা কথা বলি—'

'বল।'

'পরামর্শ করে কিছু লাভ নেই। আমরা বলছি দেখবে মাছমারারা রাজী হয়ে যাবে। পেট বলে কথা।' বলে দুলে দুলে হেসে উঠল দামোদর।

খিদের প্রশ্নে মৎস্যজীবীদের আত্মসমর্পণ করতেই হবে এবং ইচ্ছামত তাদের দিয়ে দাসখত লিখিয়ে নেওয়া যেতে পারে—এ ব্যাপারে আড়তদারদের বিন্দুমাত্র সংশয় নেই। বরং যা আছে তা হল পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাস। স্থির দৃষ্টিতে একবার দামোদরের দিকে তাকাল ডানিয়েল। তারপর একটি কথাও না বলে বাইরে বেরিয়ে বিশাল জনতাকে সঙ্গে নিয়ে সমুদ্রের পাড়ে বালুকাবেলায় এল। বিমর্ষ চিন্তিত সুরে বলল, 'তোমরা তো সবই শুনেছ। এখন কী কবতে চাও বল। বেশ ভাল করে ভেবে চিন্তে বলবে। তাড়াহুড়োর দরকার নেই। আজই যে বলতে হবে, তা-ও নয়। সময় নিয়ে সব দিক বিচার করে কালকেও বলতে পার।'

অনেকক্ষণ স্তব্ধতা। তারপর জনতার মধ্য থেকে একজন উঠে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে বলল, 'না সাহেব, মাছের ওজন লেখা বন্ধ করা চলবে না। এত কষ্ট করে আড়তদার শালাদের জোচ্চুরি বন্ধ করলে। এখন যদি আবার মাথা মুড়িয়ে তা চালু করতে দিই তা হলে তোমার মান তো থাকবেই না, তা ছাড়া আর কোনোদিন এই হারামীপনা বন্ধ করতে পারব না।'

জনতা সমস্বরে সায় দিল, 'ঠিক কথা—'

দ্বিধান্বিত ভঙ্গিতে ডানিয়েল বলল, 'তা তো বুঝলাম কিন্তু ওজন লেখা বন্ধ না করলে ওরা তো ধার দেবে না।'

'না দিলে আর কী করা যাবে। ফি বছর উপোস দেওয়া আমাদের অভ্যেস আছে। তা ছাড়া মাথা পিছু পঞ্চাশ টাকার বেশি তো ওরা দেবে না। তাতে খুব বেশি হলে পনের দিন চলবে। পনের দিনের পর উপোস তো দিতেই হবে। সেটা আগের থেকেই না হয় শুরু করা থাক।'

'মাথা ঠাণ্ডা করে চিন্তা কর—'

'চিন্তা করেছি।'

এবার আলাদা আলাদাভাবে প্রত্যেককে জিজ্ঞেস করতে লাগল ডানিয়েল। জানাল, তার সম্মানের প্রশ্নটা বড় কথা নয়, মৎস্যজীবীদের প্রয়োজনটাই আসল। কিন্তু দেখা গেল জনতার মনোবল অসীম, প্রত্যেকেই তারা এক জবাব দিল। আড়তদারদের শর্তে কেউ রাজী নয়, কয়েকটা টাকার জন্য তারা মাথা বিকিয়ে দেবে না।

তবু ডানিয়েল শেষবারের মত জেরা করল, 'ভেবে চিন্তে বলছ তো?'

'হ্যাঁ সাহেব, হ্যাঁ।'

'তা হলে এই কথাই আড়তদারদের জানাই?'

'জানাও।'

'পরে আমাকে দোষ দেবে না?'

'আরে না-না, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।'

সুতরাং মৎস্যজীবীদের সিদ্ধান্ত জানাতে আবার আড়তদারদের জটলায় এল ডানিয়েল। সব শুনে দামোদর ক্রুর গলায় বলল, 'বেশ, কতদিন শালাদের তেল থাকে দেখব।'

কিছুক্ষণ পর দলবল নিয়ে গ্রামের দিকে ফিরতে ফিরতে খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েছিল ডানিয়েল। বংশানুক্রমে যে নিয়মে মাছমারারা চলছিল সেইভাবে চলতে দিলেই বোধ হয় ভাল ছিল। চিরাচরিত প্রথার মধ্যে ওজন লেখার ব্যবস্থা করতে গিয়ে হয়ত সে তাদের ক্ষতিই করে ফেলেছে।

মৎস্যজীবীরা অবশ্য অপরিসীম দৃঢ়তায় আড়তদারদের শর্ত প্রত্যাখ্যান করেছে। তবু চলতে চলতে নিজেকে অপরাধী না করে পারছিল না ডানিয়েল।

দেখতে দেখতে আরো ক'টা দিন কেটে গেল। আজকাল আর মাছমারারা সমুদ্রে যায় না। গিয়ে লাভ নেই। কেননা সমুদ্র আরো নিঃস্ব আরো কৃপণ হয়ে গেছে। সমস্ত দিন পরিশ্রমের মূল্যে এক পোয়া দেড় পোয়া মাছও ইদানীং পাওয়া যায় না।

জীবিকার উৎসটা একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে। তাই বলে নির্ভেজাল অনশনটা এখনও শুরু হয়ে যায় নি। ঘরে সামান্য সামান্য যা সঞ্চয় ছিল, যেমন কিছু চাল-ডাল তেল-মশলা, কিছু পয়সা-কড়ি—তা-ই দিয়ে দিন সাতেকের মত চলল।

কীভাবে কোঙ্কন উপকূলের দুঃসময়ের দিনগুলি উত্তীর্ণ হতে পারে, সেদিকে ডানিয়েলের তীক্ষ্ণ সতর্ক দৃষ্টি রয়েছে। উদ্‌ভ্রান্তের মত বাড়ি বাড়ি ঘুরে খবর রাখছে সে।

যাই হোক সাতটা দিন তো জমানো চালডাল দিয়ে কাটানো গেল। তারপর ডানিয়েল লক্ষ্য করল, এ অঞ্চলের মানুষ দলে দলে নবটোকরাতে চলেছে।

নবটোকরা এখান থেকে কয়েক মাইল দূরের একটা বাজার। সেখান থেকেই এ অঞ্চলের বাসিন্দারা চাল-ডাল-নুন-তেল ইত্যাদি জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনে আনে।

হাতে তো কারো একটা পয়সা নেই তবে লোকগুলো নবটোকরাতে চলেছে কোন উদ্দেশ্যে? কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করল না ডানিয়েল, শুধু কৌতূহলের বশে তাদের সঙ্গে নবটোকরাতে চলল। সেখানে গিয়ে দেখল, লোকগুলো মাড়োয়াবির দোকানে রূপোর চুটকি, তোড়া, নাকছবি, আংটি ইত্যাদি ইত্যাদি জলের দরে বেচে দিচ্ছে। অর্থাৎ ঘরে যেটুকু গয়না ছিল খিদের গ্রাসে তা-ও চলে গেল।

ডানিয়েল-এর নীরব দর্শক। মাছমারাদের সমুদ্রে যাওয়া বন্ধ হওয়াতে ইদানীং তার কোনো কাজ নেই, একেবারে বেকার হয়ে পড়েছে। অবশ্য কাজ একেবারে নেই বললে মিথ্যে বলা হয়। মনপুরা গ্রামের শিশুর দল অনেক দিন পর তাকে পেয়েছে। অতএব তাদের নিয়ে ডানিয়েলকে কিছু হুল্লোড় করতেই হয়। কিন্তু আগের মত স্বাভাবিক প্রেরণায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে পারে না। ছেলেদের টানে সে ভেসে যায় সত্যি কিন্তু তাতে যেন প্রাণের টান থাকে না। কোঙ্কন উপকূলের দুর্দিন তাকে আচ্ছন্ন অভিভূত ব্যথিত বিষণ্ণ করে তুলেছে।

ছেলেদের সঙ্গে কিছুক্ষণ মাতামাতির পর ইন্দ্রিয়গুলোকে সজাগ রেখে ডানিয়েল এখানকার মানুষদের শুধু দেখে যাচ্ছে।

প্রথমে গেছে ঘরের সঞ্চয়, তারপর গয়নাগাটি। দিন দশেক যেতে না যেতে, লোকগুলো বাসনকোসনও মাড়োয়ারির দোকানে দিয়ে এল। সব শেষে গেল জামা কাপড়। গণপতি উৎসবের সময় যা দু-চারখানা নতুন কাপড় কেনা হয়েছিল সেগুলোও রইল না। নিদারুণ দুঃসময় কোঙ্কন উপকূলের প্রতিটি ঘর থেকে সমস্ত কিছু বার করে নিয়ে গেল।

সবই তো গেছে। অনিশ্চিত জীবনের নিরবধি সমুদ্রে সামান্য যে কুটোগুলো পাওয়া গেছে তাই আশ্রয় করে কয়েকটা দিন বাঁচতে চেয়েছিল মানুষগুলো। কিন্তু এখন কী করবে? ভাবতে গিয়ে ডানিয়েল অনুভব করল, মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়ে বরফের স্রোত বয়ে যাচ্ছে। ভয়ঙ্কর সেই ভাবনাটাকে দূর করতে পারলে খানিক স্বস্তি পাওয়া যেত। কিন্তু সেটা তাকে ছাড়ে না, উঠতে-বসতে-চলতে-ফিরতে সর্বক্ষণ নাছোড় সঙ্গীর মত চিন্তাটা তাকে ঘিরে আছে।

এদিকে সুভদ্রার স্কুল এখনও কোনো রকমে টিকে আছে। মাসের দশটা দিন ভোরে উঠে যথারীতি সে মনপুরায় চলে আসে, ক্লাস নেয়। অবশ্য ইদানীং ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার উৎসাহে ভাটা পড়েছে, বাপ মায়েরও তাদের জোর করে স্কুলে পাঠাবার গরজ নেই। সেটা অকারণে নয়। অন্ধকার ভয়ঙ্কর দিন ডানা ঝাপটিয়ে কোঙ্কন উপকূলের দেউড়িতে এসে দাঁড়িয়েছে। তার কালো ছায়া এখানকার জীবনযাত্রাকে দ্রুত ঢেকে ফেলতে শুরু করেছে। এ অবস্থায় পড়াশোনার উৎসাহ

অথবা মনোযোগ থাকার কথা নয়। ভারতবর্ষের এই দরিদ্র নিরন্ন অঞ্চলে শিক্ষা জীবনের প্রয়োজন নয়, নিতান্তই বিলাসিতার বস্তু। সেটুকু যে কোন মুহূর্তে তারা বর্জন করতে প্রস্তুত। কাজেই সুভদ্রাও খুব বেশি চাপ দেয় না। স্বেচ্ছায় যে ক'টি পড়ুয়া আসে তাতেই সে সন্তুষ্ট।

শুধু স্কুলের দিনেই আসে না সুভদ্রা, মনপুরায় প্রতিদিন একবার করে তার আসা চাই-ই। অন্য গ্রামে যদি ক্লাস নিতেও যায় তবু সে আসে। তখন সকালের দিকে আসা সম্ভব নয়, বিকেলের দিকে আসে। মোট কথা, ডানিয়েলের সঙ্গে রোজ দিন একবার না দেখা হলে তার বুঝি ভাল লাগে না, মনপুরা গ্রাম বিচিত্র নেশায় তাকে বোধ হয় আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

রোজই আসে সুভদ্রা, স্কুল ছুটির পর ডানিয়েলের সঙ্গে দেখা করে।

দেখা হলেই ইদানীং ডানিয়েল বলে, 'লোকগুলো ঘরের সব কিছুই বেচেটুচে তো খেল। আর কিছুই নেই। এবার কী হবে বলুন তো? কী করে ওদের চলবে?'

বিষণ্ণ হেসে সুভদ্রা বলে, 'চলে যাবে একরকম করে।'

'চলবে তো কিন্তু কীভাবে?' ডানিয়েলকে অত্যন্ত অসহিষ্ণু দেখায়, 'আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না।'

স্থির চোখে ডানিয়েলের দিকে তাকিয়ে সুভদ্রা বলে, 'আপনি ওদের কথা খুব ভাবেন, না?'

উত্তরটা এড়িয়ে গিয়ে ডানিয়েল বলে, 'সত্যি বলুন না, কী হবে এবার?'

'কি আবার হবে, অন্য সব বছর যা হয়েছে এবারও তাই হবে।'

'তার মানে ওদের উপোস দিতে হবে তো?'

তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল না সুভদ্রা। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে সেই পুরনো কথা বলল, 'ওদের ভাগ্যই এই, আপনি আমি কী করতে পারি বলুন।'

ডানিয়েল লক্ষ্য করেছে, এখানকার মানুষ প্রায় সব ব্যাপারেই দৈবনির্ভর। তাদের মানসিক চরিত্রই তা-ই। প্রতি বছর কোঙ্কনবাসীরা কিছুদিন না খেয়ে থাকে, এর বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ নেই। নীরবে ভাগ্যের হাতে সব দায় সঁপে দিয়ে তারা নিশ্চিন্ত আছে।

হঠাৎ অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে ওঠে ডানিয়েল। গলার স্বরে শরীরের সবটুকু শক্তি ঢেলে দিয়ে চিৎকার করে 'না-না-না—'

'কী না?'

'ভাগ্যের ওপর সব ছেড়ে দিয়ে বসে থাকলে হবে না। কিছু একটা ব্যবস্থা করতেই হবে।'

'কী ব্যবস্থা করবেন?'

এবার খুবই অসহায় বোধ করে ডানিয়েল। সত্যিই তো, ব্যবস্থাটা কী? হঠাৎ একটা কথা তার মনে পড়ে যায়। সে বলে, 'দেখুন, আমার কাছে দেড় হাজার টাকা ছিল। গণেশ-রতির বিয়েতে শ' তিনেক টাকার মত খরচ হয়েছে। বাকি টাকা আছে। ঐ টাকাটা এদের দিয়ে দেব।'

বার শ' কিছুক্ষণ চিন্তা করে সুভদ্রা বলে, 'না—'

'না কেন?'

'আপাতত ঐ টাকাটা থাক, এখনও তো উপোস শুরু হয়নি। যখন আর উপায় থাকবে না তখন ওটা বার করা যাবে। তা ছাড়া––'

'কী?'

'এখানে কত লোক খেয়াল আছে? মানুষ বেছে বেছে তো আর দিতে পারবেন না, দিলে সবাইকে দিতে হবে। আর দিলে ঐ টাকায় তিনদিনও চলবে না।'

সুভদ্রার যুক্তি উপেক্ষা করা যায় না, ঐ টাকাটা অতএব চরম বিপদের জন্যই তোলা থাক।

সুভদ্রা আবার বলে, 'আচ্ছা—'

'কী?'

'এখানকার মানুষদের আপনি খুব ভালবেসে ফেলেছেন, না?'

ডানিয়েল চুপ।

সুভদ্রা এবার বিষাদের সুরে বলে, 'কিন্তু কী আর করবেন বলুন, মাথার ওপর যে করুণাময় ঈশ্বর রয়েছেন তাঁর বোধহয় ইচ্ছা ওরা কষ্ট পাক।'

'না।' জোরে মাথা নাড়ে ডানিয়েল, 'যিনি করুণাময় তাঁর এমন ইচ্ছা হ'তেই পারে না।'

'তাই যদি না হবে—' সুভদ্রা ম্লান হাসে, 'আপনি তো বুদ্ধি দিয়ে বলে কয়ে রেভারেণ্ড আপ্তেকে কোলাপুরে পাঠালেন কিন্তু এখনও সরকারী দপ্তর থেকে খয়রাতি দূরে থাক, সামান্য ইন্‌স্পেকশানটুকু পর্যন্ত হচ্ছে না কেন?'

ডানিয়েল চকিত হয়ে উঠল যেন, 'হ্যাঁ, ভাল কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন। দরখাস্ত দিয়ে আসার পর রেভারেণ্ড আপ্তে আর কোলাপুর গিয়েছিলেন?'

'না। ওঁর শরীরটা ক'দিন ধরে খারাপ। জ্বর আর সর্দি হয়েছে। তাই যেতে পারেন নি।'

অন্যমনস্কের মত ডানিয়েল বলল, 'খুব ভুগছেন?'

'না, উনি অবশ্য বয়েস অস্বীকার করতে চান। কিন্তু চাইলেই তো হয় না। আজকাল একটুতেই কাহিল হয়ে পড়েন।'

রেভারেণ্ডের অসুখ বিসুখ সম্পর্কে আর কিছু জিজ্ঞেস করল না ডানিয়েল। আস্তে আস্তে শুধু বলল, 'উনি যখন যেতে পারবেন না তখন আমিই একবার যাব ভাবছি! সরকারী দপ্তরে তাগাদা দিয়ে এলে তাড়াতাড়ি কাজ হতে পারে।' কোলাপুর গেলে ধরা পড়ার সম্ভাবনা, সে কথা আর খেয়াল রইল না।

সুভদ্রা বলল, 'বেশ তো।'

'স্ট্রাগল্ ফব একজিস্টেন্স' বলে একটা কথা আছে। কথাটা ডানিয়েলের খুব পছন্দ। শব্দগুলোর মধ্যে চমৎকার ধ্বনি আছে, ঝঙ্কার আছে, গাম্ভীর্য আছে। শুনতে খুব ভাল লাগে। উচ্চারণ করতে আরো ভালো। বলার পর তার রেশটা যেন গম গম করতে থাকে।

প্রাণীতত্ত্বের ইতিহাস পড়া আছে ডানিয়েলের। পৃথিবীর সেই আদিম ঊষায় প্রকৃতি যখন নিদারুণ প্রতিকূল সেই সময় অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য জীবকূলকে কী না করতে হয়েছে! তখন মানুষের না ছিল ঘর, না বাড়ি, না কোন স্থায়ী ঠিকানা। নিতান্ত খাদ্যের সন্ধানে দেশ থেকে দেশান্তরে তাদের ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। খাস লণ্ডনের শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কোনো কামরায় বসে জীবনসংগ্রামের সেই ইতিহাস পড়তে পড়তে ডানিয়েল রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে।

ডানিয়েলের ধারণা ছিল, বইয়ে পড়া সেই সংগ্রামের কাহিনী সুদূর অতীতেই বিলীন হয়ে গেছে। একালে, আজকের মানুষের ইতিহাস যখন বহুদূর এগিয়ে এসেছে তার পুনরাবৃত্তি ঘটবার আর সম্ভাবনা নেই। কিন্তু কে জানত, ভারতবর্ষের এই অখ্যাত প্রান্তে বহু যুগ আগের সেই জীবন-সংগ্রাম অভিশাপের মত নেমে আসবে! কে জানত, বইয়ে-পড়া সেই নিদারুণ কাহিনীকে চোখের সামনে দেখা যাবে!

জামাকাপড়, গয়নাগাটি এবং বাসন-কোসন বেচে এখানকার বাসিন্দারা কিছুদিন কাটিয়েছে। এখন তাদের হাত একেবারে শূন্য।

ডানিয়েল লক্ষ্য করছে, ইদানীং মেয়ে-পুরুষ এবং শিশুর দল ভোর হতেই পাহাড়ে চলে যায়। জীবন এখানে সম্পূর্ণ প্রকৃতি-নির্ভর। এতকাল প্রাণধারণের জন্য সমুদ্রই ছিল তাদের ভরসা। সমুদ্র কৃপণ হওয়াতে এখন তারা ছুটেছে পাহাড়ে।

পশ্চিমঘাট তো পাহাড় নয়, তার শিলাময় দেহে, তার অরণ্যে উপত্যকায় খাদ্য ছড়ানো রয়েছে। শুধু খুঁজে নেবার অপেক্ষা।

আশেপাশে দশখানা গ্রামের মানুষ ভোরবেলা বেরিয়ে পড়ে, ফেরে সেই দুপুরে। যখন ফেরে তখন দেখা যায় কারো হাতে রয়েছে মেটে আলু, কারো হাতে প্রকাণ্ড একটা মানকচু, কেউ এনেছে এক কাঁদি বুনো কলা, কেউ আস্ত একটা মৌচাক, কেউ বা কিছু শাকপাতা ফলমূল।

এইভাবেই চলতে লাগল। পশ্চিমঘাটের বিপুল ভাণ্ডার থেকে কোঙ্কনের বাসিন্দারা রোজই খাদ্য সংগ্রহ করে আনতে লাগল।

মনপুরা গ্রামের পাঠশালা এখন বন্ধ। শুধু মনপুরাতেই নয়, চার পাশের সমস্ত গ্রামেই স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে। সেটা অকারণে নয়। মা-বাপের সঙ্গে ছেলেমেয়েদেরও খাবারের খোঁজে ছুটতে হচ্ছে পশ্চিমঘাটে।

কিন্তু পশ্চিমঘাটের ভাণ্ডার তো আর অফুরন্ত নয়। দিন দশেকের মধ্যে সমস্ত ফল, শাক, আহার্য উদ্ভিদ, লতাপাতা এবং মাটির নিচের মূল—নিঃশেষ হয়ে গেল। বুকের ভেতর শ্বাস রুদ্ধ করে সব দেখে যাচ্ছিল ডানিয়েল। চার্চ থেকে ভামুয়া বুড়ির বাড়িতে যথারীতি তার খাদ্যের যোগান আসছে। কিন্তু সারা কোঙ্কন উপকূলের মানুষ যখন শুধু কচুঘেঁচু খেয়ে জীবনধারণ করছে সেই সময় ভাত মুখে তুলতে তার ইচ্ছা হয় না। মনে হয় ক্ষুধার্ত নিরন্ন মানুষের সামনে নিতান্ত স্বার্থপরের মত নিজের পেট ভরানো জঘন্য এক অপরাধ। অতএব দু-একমুঠো ভাত সে মুখে তোলে কী তোলে না। বাকিটা বিলিয়ে দেয়। ভামুয়া বুড়িও তার সমস্ত সঞ্চয় ইতিমধ্যে শেষ করে বসে আছে।

যাই হোক, পশ্চিমঘাটের খাবার দাবার, শূন্য হয়ে যাবার পর মানুষগুলো ধ্বংসের শেষ সীমায় এসে পৌঁছুল। ফলমূল তো আগেই শেষ হয়ে গেছে, এবার অখাদ্য পাতা এবং আগাছা খাওয়া শুরু হল।

অবিশ্বাস্য, অকল্পনীয়। 'জিওগ্রাফি অব হাঙ্গার' নামে সেই বইটাতে অন্নহীন ক্ষুধিত মানুষের জীবন-সংগ্রামের যে কাহিনী, দুর্ভিক্ষের যে চিত্র আছে, সে সব পড়তে পড়তে শিউরে উঠেছিল ডানিয়েল। তবু ঐ সব কাহিনী পুরোপুরি বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়নি। মনে হয়েছে গ্রন্থকার কিছু অতিরঞ্জনের আশ্রয় নিয়েছেন। কিন্তু মনপুরা এবং আশেপাশের গ্রামগুলোর দিকে তাকিয়ে ডানিয়েল ভাবে, এমন মারাত্মক ঘটনা 'জিওগ্রাফি অব হাঙ্গারের' লেখকের পক্ষেও অভাবনীয়।

ইদানীং উদ্‌ভ্রান্তের মত পথে পথে ঘুরে বেড়ায় ডানিয়েল। এমনিতেই এখানকার মানুষ স্বাস্থ্যহীন, দুর্বল। জীবনীশক্তি তাদের অত্যন্ত ক্ষীণ। কিন্তু এই কয়েকদিনে তারা প্রায় কঙ্কালসার হয়ে উঠেছে। যে শিশুর দল সারাদিন হুল্লোড় করে বেড়াত তারা নির্জীব হয়ে গেছে। দিবারাত্রি তারা গুঙিয়ে গুঙিয়ে কাঁদে, 'ভাত দাও, ভাত দাও—'

যত দেখছে ততই শঙ্কিত হয়ে পড়ছে ডানিয়েল। মনে হচ্ছে সমস্ত পৃথিবী ক্রমশ সঙ্কুচিত এবং বায়ুশূন্য হ'তে হ'তে তাকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে।

একদিন অসহিষ্ণুর মত সুভদ্রাকে সেই একই কথা বলল ডানিয়েল, 'না এভাবে চলতে পারে না। কিছুতেই না।'

'কিন্তু করারই বা কী আছে?' বিষণ্ণ সুরে সুভদ্রা জানতে চাইল।

'রেভারেণ্ড আপ্তে এখন অনেকটা সুস্থ। তাঁর এখন কোলাপুরে যাওয়া উচিত।'

'ইদানীং প্রতি সপ্তাহেই তো একবার করে যাচ্ছেন।'

'কী বলছে ওরা?'

'একই কথা। বোম্বাই থেকে এখনও কোনো নির্দেশ আসে নি। ওটা না আসা পর্যন্ত ডিস্ট্রিক্ট অথরিটি ইন্‌স্পেকশনে আসবে না।'

ডানিয়েল ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল, 'কবে আসবে সেই নির্দেশ? এই লোকগুলো মরে গেলে?'

সুভদ্রা উত্তর দিল না, বিমর্ষ মুখে চুপ করে রইল।

ডানিয়েল আবার বলল, 'দেখে শুনে আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি, জীবনের দাম এখানে কানাকড়িও নয়। মানুষ এভাবে মরতে পারে, আমি ধারণাই করতে পারি না।'

একটু চুপ করে আবার, 'এই সপ্তাহটা দেখি। আসছে সপ্তাহে একবার নিজেই কোলাপুর যাব। দরকার হলে সেখানে গিয়ে ঝগড়া বাধিয়ে দেব।'

সুভদ্রা বলল, 'আপনি সেদিনও বলেছিলেন কোলাপুরে যাবেন।'

এ কথার উত্তর না দিয়ে ডানিয়েল বলল, 'দেখুন, আপনার একটা কথা আমি মানতে পারব না।'

'কী কথা?'

'আমার কাছে যে বার শ' টাকা আছে ওটা আর রেখে লাভ নেই। চোখের সামনে আমি আর এ দৃশ্য দেখতে পারছি না। আজই আমি চাল ডাল কিনে ওদের বিলিয়ে দেব।'

'তাই করুন, আমার আর কিছু বলার নেই।'

এ ব্যাপারে আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল ডানিয়েল। হঠাৎ অন্য একটা কথা মনে পড়ে যাওয়াতে বলল, 'আচ্ছা মিস জোসেফ—'

ডানিয়েলের বলার ভঙ্গিতে এমন এক আগ্রহ ছিল যাতে সুভদ্রা তার মুখের দিকে না তাকিয়ে পারল না, 'কী বলছেন?'

'আপনাদের দেশ সম্বন্ধে আমার নিজস্ব কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না। যেটুকু জ্ঞান তা নেহাতই অন্যের মারফত। হয় বই পড়ে, না হয় শুনে।'

সুভদ্রা নীরবে তাকিয়ে থাকে।

ডানিয়েল সমানে বলে যাচ্ছে, 'আমি শুনেছি পৃথিবীর নানা দেশ থেকে, যেমন ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, সোভিয়েট রাশিয়া, আমেরিকা, জাপান—আপনারা শত শত কোটি টাকা সাহায্য পান। শুধু তাই নয়, লক্ষ লক্ষ টন ফুড গ্রেনও পেয়ে থাকেন।'

সুভদ্রা বলল, 'আমি ঠিক জানি না।'

ডানিয়েল অবাক হয়ে গেল, 'সে কি!'

'কী করে জানব বলুন। আমরা থাকি শহর থেকে অনেক—অনেক দূরে এই অখ্যাত অঞ্চলে। এখানে না আছে রেডিও সেট, না আছে খবরের কাগজ। বাইরের জগতের সঙ্গে আমাদের সংযোগ প্রায় নেই বললেই চলে। কাজেই আমেরিকা রাশিয়া থেকে কী আসছে না আসছে তার খবর কী করে পাব?'

'তা বটে।' আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল ডানিয়েল। তারপর বলল, 'আশ্চর্য! সেই সব টাকা আর খাদ্য যায় কোথায়?'

'আমার পক্ষে তা জানা অসম্ভব।' সুভদ্রা হাসল।

ডানিয়েল বলল, 'প্রশ্নটা আপনাকে করিনি, করেছি নিজেকে। এত খাদ্য এত অর্থের সামান্য ছিটে ফোঁটাটুকুও কি এই কোঙ্কন উপকূল পর্যন্ত আসতে পারে না! আশ্চর্য!'

যাই হোক, সেদিনই অবশিষ্ট বারোশ টাকার চাল আর ডাল কিনে গ্রামে গ্রামে বিলিয়ে দিল ডানিয়েল। কিন্তু মানুষ যেখানে কয়েক হাজার সেখানে ঐ সামান্য চাল ডাল আর কতক্ষণ, বালির দুর্গ খাড়া করে জলোচ্ছ্বাস ঠেকাবার অবস্থা আর কি!

দিন পাঁচেক কোনোরকমে চলল। তারপর আবার অখাদ্য খাওয়া শুরু হল।

যত দিন যাচ্ছে এখানকার জীবন দ্রুত মানুষের পর্যায় থেকে পশুত্বের স্তরে নামতে লাগল। কোথাও অন্ন নেই, খাদ্য নেই। পশ্চিমঘাটের অরণ্য থেকে অখাদ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে কেউ যদি হঠাৎ একটা মেটে আলু পেয়ে যায় তাহলে রক্ষা নেই। সঙ্গে সঙ্গে সেটা ছিনিয়ে নেবার জন্য চারপাশ থেকে ক্ষুধিত নেকড়ের মত অন্যেরা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং মারামারি রক্তারক্তি শুরু হয়ে যায়।

চান্দা গ্রাম থেকে এমনই এক সংঘর্ষের খবর এসেছে। খবরটা যেমন ভয়াবহ তেমনি মর্মান্তিক। ওখানকার বাসিন্দারা জঙ্গলে গিয়েছিল খাদ্যের খোঁজে। ঘুরতে ঘুরতে একজন বড়সড় একটা বনমুরগী পেয়ে যায়। সেদিনটার জন্য অন্তত নিশ্চিন্ত হতে পেরেছিল সে। মুরগীটা ঝলসে ছেলেপুলে নিয়ে খেতে পারবে। কিন্তু যা হয়, সেটা দখল করার জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে গিয়েছিল। যে মুরগীটা ধরেছিল সে কিছুতেই ছাড়বে না, বাকি সবাই সেটা কেড়ে নেবেই, অতএব শুরু হয়েছিল যুদ্ধ। মানব-জীবনের আদিম শৈশবে খাদ্যের জন্য যে লড়াই চলত সেই লড়াই। তার ফল হয়েছিল মারাত্মক, ছুরির আঘাতে একজন মারা গেছে।

এখানকার জীবনের মূল্যবোধও দ্রুত ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। ইদানীং কারো প্রতি কারো সহানুভূতি নেই, মমতা নেই, করুণাও নেই। খাবারের খোঁজে যখন তারা পশ্চিমঘাটে যায় তখন একজন আরেক জনের দিকে হিংস্র দৃষ্টিতে তাকায়। এই সময়টা কেউ কাউকে সহ্য করতে পারে না। পশ্চিমঘাটে আছে তার দ্বিতীয় কোন ভাগীদার থাকুক, এতখানি সহনশীলতা আজ আর কারো নেই। তার বাঁচার জন্য আর সবাই মরে যাক, এটাই সম্ভবত সবার কাম্য।

শুধু কি তা-ই, খাদ্য খুঁজতে খুঁজতে কেউ যদি খাওয়ার মত গাছের একটা মূল কি একটা নোনাফল পেয়ে গেল সেটা আর বউছেলেমেয়ের জন্য বাড়ি নিয়ে যায় না, নিজেই খেয়ে ফেলে।

আরো যা যা খবর আসছে তা ভয়ঙ্কর। খিদের জ্বালায় সুখনা গ্রামের কে একজন নাকি কোলাপুরে গিয়ে নিজের একটা শিশু বেচে দিয়ে এসেছে। কথাটা সত্যি না মিথ্যে, যাচাই করে আসার সাহস হয় নি ডানিয়েলের।

অ ছাড়া দুর্ভিক্ষ এখানকার মানুষদের মনোবল ধ্বংস করে দিয়েছে। একদিন যাদের অজেয় মনে হয়েছিল আজ তারা পরাভূত, তাদের মেরুদণ্ড বেঁকে দুমড়ে গেছে। একদিন যে মৎস্যজীবীরা কোনো কারণেই আড়তদারদের কাছে মাথা নত না করার প্রতিজ্ঞা নিয়েছিল, ইদানীং-নাকি একে একে তারা দাসখত লিখে দিয়ে টাকা ধার নিয়ে আসছে। সুযোগ পেয়ে আড়তদারেরা তাদের সমস্ত শর্ত পূরণ করে নিয়েছে। প্রথম শর্তটা হল, ভবিষ্যতে আর মাছের ওজন লেখা হবে না। দ্বিতীয়টা

অবশ্য শর্ত নয়, সেটা জঘন্য ব্যাপার। তিরিশ টাকা করে হাতে দিয়ে আড়তদারেরা পঞ্চাশ টাকা লিখিয়ে নিয়েছে।

যত শুনছে ততই দিশেহারা হয়ে পড়ছে ডানিয়েল।

আড়তদারদের কাছ থেকে মাছমারারা গোপনে যে টাকা এনেছিল তার আয়ু আর ক'দিন? দিন দশেকের মধ্যে তা শেষ হয়ে গেল। তারপর আবার চলল অখাদ্য খাওয়া।

অখাদ্য খাওয়ার যা পরিণতি তাই ঘটল। মানুষের পাকস্থলীর সহনক্ষমতা তো অনন্ত নয়, তার একটা সীমা আছে। সুতরাং সমস্ত কোঙ্কন উপকূল জুড়ে মহামারী বলতে একেবারে নির্ভেজাল কলেরা।

মনপুরা গ্রামের যশোবন্তকে দিয়ে প্রথম শুরু হল। তারপর দেখতে দেখতে ভাওজীর ছোট ছেলেটা, তিলকচাঁদের নাতি, গণেশের ভাই—এমনি আরো অনেকে অসুখে পড়ল। আশেপাশের গ্রামগুলোর অবস্থা আরো শোচনীয়। সে-সব জায়গায় মহামারী ঘরে ঘরে হানা দিয়েছে। এক আধটা করে প্রতি গ্রাম থেকে মৃত্যুরও খবর আসছে।

ডানিয়েল একেবারে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল। তার কর্তব্য যে কি, বুঝতে পারছে না। শুধু মনে হচ্ছে, চারদিক ঘিরে যা শুরু হয়েছে আর কিছুদিন তা চললে সে উন্মাদ হয়ে যাবে। মৃত্যু যেন তার অশরীরী দূতগুলিকে কোঙ্কন উপকূলে ছড়িয়ে দিয়েছে, নিঃশব্দ সঞ্চারে তারা ঘুরে ঘুরে শুধু দেখে যাচ্ছে। যখন যেখানে সুযোগ পাবে সেখানেই ছোঁ মারবে।

এদিকে মহামারী শুরু হবার পর থেকে সুভদ্রার আর দেখা নেই। আগে আগে রোজ সে একবার করে আসত, ইদানীং এক সপ্তাহের মত কোথায় রয়েছে কে জানে। ডানিয়েল যখন ভাবতে শুরু করেছে গীর্জায় গিয়ে একবার খোঁজ করবে কিনা সেদিনই সুভদ্রা এসে হাজির। এই ক'দিনে মেয়েটাকে আর যেন চেনাই যায় না। চুলে তেল নেই, জামাকাপড় ময়লা, চেহারা পারিপাট্যহীন। চোখ বসে গেছে। সারা মুখে বিনিদ্র রাত্রির ছাপ মারা। দেখেই বোঝা যায় এ ক'দিন নিজেকে যত্ন করার অবকাশ তার হয় নি। যত্ন দূরের কথা, খাওয়া-দাওয়া, স্নানটুকুও বোধ হয় তার ঠিকমত হয় নি।

তার চোখের দৃষ্টি আরক্ত, উদ্‌ভ্রান্ত। উদ্বিগ্ন সুরে ডানিয়েল জানতে চাইল, 'চেহারাখানা এমন চমৎকার করে তুললেন কী করে?'

এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে সুভদ্রা বলল, 'চলুন—'

'কোথায়?'

'চার্চে। রেভারেণ্ড আপ্তে আমার সঙ্গে এক্ষুনি আপনাকে যেতে বলেছেন।'

'চলুন—' ডানিয়েল দ্বিতীয় প্রশ্ন না করে পা বাড়িয়ে দিল।

যেতে যেতে সুভদ্রা বলল, 'আপনি নিশ্চয়ই খবর পেয়েছেন চারদিকে কলেরা লেগেছে।'

'হ্যাঁ, লোকও মরতে শুরু করেছে।'

'প্রতি বছরই এই সময় এ অঞ্চলে অখাদ্য কুখাদ্য খাওয়ার ফলে অসুখ বিসুখ হয়। কিন্তু এবার যেন তার প্রকোপটা মারাত্মক।' সুভদ্রাকে চিন্তিত দেখাল।

ডানিয়েল অসহিষ্ণু হয়ে উঠল, 'কিন্তু এভাবেই কি লোক মরতে থাকবে?'

'না।'

'বাঁচাবার কী ব্যবস্থা হয়েছে শুনি?'

'রেভারেণ্ড আপ্তে আপনাকে বুঝিয়ে বলবেন।'

'আপনিই বলুন—'

খানিকক্ষণ চিন্তা করে সুভদ্রা বলল, 'আমাদের চার্চে একটা মেডিক্যাল স্কোয়াড আছে জানেন নিশ্চয়ই।'

ডানিয়েল বলল, 'জানি, গঙ্গাবাঈ সেখানে নার্সের কাজ করে তো?'

'হ্যাঁ। আমরাই গ্রামে গ্রামে ঘুরে চিকিৎসা করছি।'

একটু কী ভেবে সুভদ্রার দিকে ঝুঁকে ডানিয়েল বলল, 'এই জন্যেই বুঝি ক'দিন মনপুরায় আসেন নি?'

মৃদুস্বরে সুভদ্রা বলল, 'হ্যাঁ। ওদিককার গ্রামগুলোতে যেতে হয়েছিল।'

'দিবারাত্রিই বোধহয় রুগীদের নিয়ে ছিলেন?'

'একরকম তাই।'

'আমাকে একটা খবর দিতে পারতেন। মনপুরায় দিনরাত হাত-পা গুটিয়ে বসে আছি। আমাকে আপনাদের সঙ্গে নিলে একটু আধটু সাহায্যও তো করতে পারতাম।' ডানিয়েলকে ক্ষুব্ধ দেখাল।

সুভদ্রা বলল, 'সত্যি বলছি, খবর দেবার মত লোক বা সময় কোনোটাই ছিল না। কলেরার খবর পেয়ে এক বাড়িতে হয়ত রওনা হয়েছি, সেখানে পৌঁছুতে না পৌঁছুতে আরেক বাড়ি থেকে খবর এসে গেল। শুধু কি এক গ্রামের কয়েক বাড়িতে, গ্রামকে গ্রাম মহামারীতে উজাড় হয়ে যেতে বসেছে। সে সব ফেলে নিজেও আসতে পারছিলাম না।'

'আজ এলেন কী করে? মহামারী কি থেমে গেছে?'

'আজ এসেছি নিতান্ত নিরুপায় হয়ে। আর মহামারী থামবে কি, যত দিন যাচ্ছে তার প্রকোপ বেড়েই চলেছে।'

ডানিয়েল বলল, 'কিন্তু মনপুরাতেও তো কলেরা লেগেছে। সেখানে চিকিৎসা করতে কিন্তু আপনারা আসেন নি।'

সুভদ্রা বলল, 'কী করে আসি। লোক আমাদের অতি সামান্য, এদিক দেখতে গেলে ওদিক যাওয়া হয় না। কতদিক সামলাব বলুন?'

এক সময় তারা চার্চে পৌঁছে গেল।

রেভাবেণ্ড আপ্তে তাদের জন্য অধীরভাবে প্রতীক্ষা করছিলেন। দেখামাত্র সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলেন। সাগ্রহে বললেন, 'এই যে এসে গেছেন আসুন—আসুন—'

তাঁকে অনুসরণ করে সুভদ্রা আর ডানিয়েল চার্চের ভেতরে চলে এল।

ডানিয়েল বলল, 'আমাকে ডেকেছেন কেন?'

রেভারেণ্ড আপ্তে জিজ্ঞেস করলেন, 'সুভদ্রা আপনাকে কিছু বলে নি?'

'না।'

একটু চুপ করে রইলেন রেভারেণ্ড আপ্তে। তারপর যা বললেন, সংক্ষেপে এইরকম। এ অঞ্চলে মহামারী লাগার ফলে চার্চকে নিদারুণ সমস্যায় পড়তে হয়েছে। চার্চের যে মেডিক্যাল ইউনিট আছে তার ক্ষমতা এবং জনবল স্বাভাবিক কারণেই অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। মাত্র জন দুই পাশকরা ডাক্তার আছেন, রেভারেণ্ড কার্লেকার এবং রেভারেণ্ড আপ্তে স্বয়ং। এ ছাড়া কয়েকজনকে শিখিয়ে পড়িয়ে নার্সিংএর ট্রেনিং দিয়ে কাজ চালানো গোছের মত করে নেওয়া হয়েছে। গঙ্গাবাঈ এদের একজন। এই সামান্য ক'টি লোক নিয়ে গ্রাম গ্রামান্তরে ছড়িয়ে-পড়া নিদারুণ মহামারীর সঙ্গে যুদ্ধ করা প্রায় অসম্ভব।

মোটামুটি এই ভূমিকাটুকু করে রেভারেণ্ড আপ্তে থামলেন। ডানিয়েল স্থির চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে শুনে যাচ্ছিল। এবার বলল, 'আমাকে কী করতে হবে বলুন—'

একটু ইতস্তত করলেন রেভারেণ্ড আপ্তে। তারপর দ্বিধান্বিত সুরে বললেন, 'আপনি বিদেশী মানুষ, ক'দিনের জন্যেই বা এসেছেন। তবু নিজেই অযাচিতভাবে এখানকার মানুষের জন্যে অনেক কিছু করছেন। তার ওপর কিছু বলতে সঙ্কোচ হচ্ছে।'

'আপনি অসঙ্কোচে বলতে পারেন।'

দ্বিধাটা তবু যেন কাটল না রেভারেণ্ড আপ্তের। কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে বললেন, 'অন্য কোন ব্যাপার হলে জোর করে বলতে পারতাম। এখন সঙ্কোচের সঙ্গেই বলি, আপনি যদি আমাদের মেডিক্যাল ইউনিটের কাজে সাহায্য করেন বড় উপকার হয়। করবেন?'

'কী আশ্চর্য, এর জন্যে আপনার এত 'কিন্তু' কেন? আমি তো আসবার সময় মিস জোসেফকে এই কথাই বলছিলাম।'

পাশ থেকে সুভদ্রা বলল, 'চিকিৎসার ব্যাপারে মিস্টার ডানিয়েলকে ডাকি নি বলে উনি খুব অনুযোগ করছিলেন, বেশ ক্ষুব্ধও হয়েছেন।'

রেভারেণ্ড আপ্তে আগের কথার সূত্র ধরে বললেন, 'সাধে কি আর 'কিন্তু' করছি। দূর দেশ থেকে এসেছেন, কলেরার সেবা করতে গিয়ে আপনার যদি ভালমন্দ কিছু একটা হয়ে যায় তখন আমাদের লজ্জার শেষ থাকবে না।'

ক্ষুণ্ণ গম্ভীর মুখে ডানিয়েল বলল, 'এদেশের আপনজন হ'তে আমি কিন্তু সবরকম চেষ্টা করছি। বিদেশী বলে আপনারাই শুধু আমাকে পর করে রেখেছেন, দূরে সরিয়ে দিয়েছেন।'

ডানিয়েলের মুখের বিষণ্ণতা, স্বরের গাম্ভীর্য বুঝিয়ে দিল তার মর্মবেদনা কতখানি আর কতটা দুঃখ আঘাত সে পেয়েছে। রেভারেণ্ড আপ্তে তাড়াতাড়ি তার দুটি হাত ধরে বুকের ভেতর নিয়ে এলেন। অপ্রতিভের মত বলতে লাগলেন, 'সত্যি, আমার খুব অন্যায় হয়েছে। এদেশের আপনি আপন না পর, নিঃসন্দেহে সে প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে গেছে। আমাকে ক্ষমা করুন।'

ডানিয়েল অপ্রস্তুত। বলল, 'ছি-ছি, ক্ষমার কথা বলে আমাকে লজ্জা দেবেন না। শুধু বলুন এখন আমাকে কী করতে হবে।'

'তার আগে ক'টা কথা জিজ্ঞেস করি।'

'করুন।'

'কলেরা ইঞ্জেকসান নেওয়া আছে?'

'না।'

'আজই নিয়ে নেবেন। দেরি করার দরকার নেই। এখুনি আমি দিয়ে দিচ্ছি।' ঘরের এক কোণ থেকে চামড়ার বড় ডাক্তারী বাক্স নিয়ে এলেন রেভারেণ্ড আপ্তে। সেটার ভেতর থেকে হাইপোডারমিক সিরিঞ্জ বার করে ওষুধ পুরে ক্ষিপ্র হাতে ডানিয়েলের হাতে ইঞ্জেকসান দিলেন। তারপর সিরিঞ্জটা ধুতে ধুতে বললেন, 'মেডিক্যাল ইউনিটে কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে আপনার?'

'না

'কোনোদিন এদের কাজ দেখেছেন?'

'না। তবে ফার্স্ট এইড কীভাবে দিতে হয় জানি।'

'ওটুকু জানাতে চলবে না। সব কিছু শিখিয়ে পড়িয়ে নিতে হবে।'

ডানিয়েল চুপ করে রইল।

রেভারেণ্ড আপ্তে বললেন, 'আমাদের মেডিক্যাল ইউনিটে যে ক'জন লোক আছে তাদেরকে পাঁচটা দলে ভাগ করে নিয়েছি। প্রতিটি দলে চার জন করে রয়েছে। একেকটা দল একেক গ্রামে গিয়ে চিকিৎসা করছে। দু'জন ডাক্তার আছেন আমাদের। কীভাবে চিকিৎসা করতে হবে, কীভাবে সেবা করা দরকার—সে সব ব্যাপারে তাঁরা সর্বক্ষণ ঘুরে ঘুরে দলগুলোকে নির্দেশ দিচ্ছেন।'

সুভদ্রার দিকে তাকিয়ে রেভারেণ্ড আপ্তে বললেন, 'তোমাদের দলে কে কে আছে?'

সুভদ্রা বলল, 'গঙ্গাবাঈ, রেভারেণ্ড যোশী, বিনায়ক আর আমি।'

'এক কাজ কর, ডানিয়েলকে তোমাদের দলে নিয়ে নাও। কীভাবে কলেরা রুগীর সেবা করতে হয়, কীভাবে ইঞ্জেকসান দিতে হয় সে সম্বন্ধে তালিম দিয়ে নিও।'

'আচ্ছা।'

এবার রেভারেণ্ড আপ্তে ডানিয়েলকে বললেন, 'আপনি তা হলে এখানেই খাওয়া-দাওয়া সেরে নিন। তারপর সুভদ্রার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ুন।'

কী ভেবে ডানিয়েল বলল, 'প্রতি বছরই কি এখানে মহামারী লাগে?'

'অসুখ-বিসুখ হয়, তবে এমন ভয়ঙ্কর নয়। এবার প্রকোপটা যেন বড্ড বেশি।'

চার্চ আজ জনশূন্য। গীর্জাবাসী মিশনারীদের কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। না দেখতে পাওয়াই স্বাভাবিক, তাঁরা গ্রাম-গ্রামান্তরে সেবা, করুণা আর বরাভয় নিয়ে ছুটে গেছেন।

স্নান করে খেতে গিয়ে গঙ্গাবাঈর ছেলে লোলাকে দেখতে পেল ডানিয়েল। সুভদ্রাকে জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার, লোলা এখানে যে?'

সুভদ্রার হয়ে রেভারেণ্ড আপ্তেই জবাব দিলেন, 'গঙ্গাবাঈ তো গাঁয়ে গাঁয়ে রুগীর সেবা করে বেড়াচ্ছে। ছেলেটাকে কোথায় রাখবে? তাই চার্চে এনে রেখেছে।'

খাওয়া-দাওয়া সেরে মহারাষ্ট্রের সূর্যকে মধ্যাকাশে রেখে সুভদ্রা আর ডানিয়েল বেরিয়ে পড়ল। যেতে যেতে ডানিয়েল জিজ্ঞেস করল, 'আমরা এখন কোথায় যাব?'

'মান্দবিতে।'

এক দিনেই ইঞ্জেকসান দেবার পদ্ধতিটা আয়ত্ত করে ফেলল ডানিয়েল। কলেরা রুগীর শুশ্রূষা এবং পরিচর্যা কিভাবে করতে হয় তা-ও শিখে ফেলল।

চড়াই-উতরাইতে তরঙ্গিত কোঙ্কনের এই গ্রামগুলো যেন ইদানীং মৃত্যুর কালো ছায়ায় ঢুকে আছে।

মাত্র কিছুকাল আগে গণপতি উৎসবের দিনগুলোতে জীবনের যে উৎসবমুখর হিল্লোল দেখা গেছে তা যেন সত্যি নয়, অবিশ্বাস্য স্বপ্নকল্পনা। আজ এখানে, ভারতবর্ষের এই অখ্যাত সুদূর উপকূলে জীবনের স্পন্দন অনুভূত হয় না, প্রাণের প্রকাশ এখানে স্তব্ধ হয়ে গেছে। হৃৎপিণ্ডের অতল থেকে যুগযুগান্তের অসীম ভীতি উঠে এসে মানুষগুলোকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

ধ্বংসের দূতেরা নিঃশব্দ সঞ্চারে দুয়ারে গিয়ে যেন নিয়ত আঘাত হেনে চলেছে। ডানিয়েলের মনে হয়, সে যেন জীবন-বর্জিত মৃত্যুমগ্নতার মধ্যে এসে পড়েছে।

দিন নেই রাত নেই, সেবাব্রতীরা শুধু ছুটছে, আর ছুটছে। এক ঘর থেকে আরেক ঘরে। এক রুগীর শিয়র থেকে আরেক রুগীর শিয়রে। এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে। উদ্‌ভ্রান্তের মত তারা শুধু ছুটেই চলেছে। তাদের জীবনের আহ্নিক গতি এখন আর তাদের নিয়মে চলছে না। স্নানের সময় নেই, বিশ্রামের অবকাশ নেই, খাওয়ার ঠিকঠিকানা নেই। রাতগুলো নিদ্রাবিহীন, দিনগুলো বিশ্রামবর্জিত। শ্বাস বন্ধ করে তাদের সর্বক্ষণ শুধু ছুটে চলা।

সেবাব্রতীদের মধ্যে এসে ডানিয়েলও ছুটতে শুরু করেছে। এই জীবন অপরিসীম এক নেশার মত লাগছে তার। যেন সজ্ঞানে নয়, বিচিত্র এক ঘোরের মধ্যে রুগীদের পরিচর্যা করে চলেছে সে।

কিন্তু মহামারীর ভয়াবহতা এবং ব্যাপকতার তুলনায় চার্চের মেডিক্যাল স্কোয়াডের ক্ষমতা খুবই নগণ্য এবং সীমাবদ্ধ। অবশ্য একথা আগেই স্বীকার করেছেন রেভারেণ্ড আপ্তে। এখানকার মানুষের জীবনশক্তি বোধ হয় প্রচণ্ড। তাই সামান্য সামর্থ নিয়ে মহামারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের অধিকাংশকেই বাঁচিয়ে তোলা সম্ভব হল, তবে মারাও গেল কেউ কেউ। কিন্তু রোগমুক্ত হবার পর কে কী খাবে সেই সমস্যাও দেখা দিল।

রোগের এমন ব্যাপকতা এ অঞ্চলে অভূতপূর্ব, অভাবনীয়। রেভারেণ্ড আপ্তে চার্চের কিছু কিছু অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করে তাদের পথ্য যোগাতে লাগলেন।

দিন দশেকের মধ্যেই মহামারীর তীব্রতা অনেক কমে এল। সেবাব্রতীরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল। অমিত শক্তিতে রোগের ধ্বংসের ক্ষমতাকে তারা পরাস্ত করেছে। মৃত্যুর ছায়া দু হাতে সরিয়ে দিয়ে জীবন আবার স্বমহিমায় ফিরে আসতে চাইছে।

সেদিন সুখনা থেকে তিনজনে চার্চে ফিরে আসছিল। তিনজনে অর্থাৎ ডানিয়েল, সুভদ্রা এবং গঙ্গাবাঈ। বিনায়ক সুখনাতেই থেকে গেছে।

ঠিক ছিল ভ্রাম্যমাণ দলগুলি অবকাশ বুঝে চার্চ থেকে খাওয়া-দাওয়া সেরে যাবে। কিন্তু এতদিন রোগটা এত প্রচণ্ড ছিল যে তাদের চার্চে ফেরার কিছু স্থিরতা ছিল না।

আজ চারদিন পর ডানিয়েলরা চার্চে ফিরছে। পা আর ঠিকমত মাটিতে পড়ছিল না। ভারবাহী পশুর মত শ্রান্ত শরীর টানতে টানতে তারা চড়াই উতরাই ভাঙছিল। সময়টা বিকেল। আকাশ কিন্তু সূর্যহীন। শীতশেষের এই দিনটিতে কিছু ভবঘুরে মেঘ হঠাৎ দেখা দিয়েছে। তারাই সূর্যকে ঢেকে দিয়ে রোদটুকু গুটিয়ে কোনো একটা খাপে পুরে ফেলেছে। ভাবগতিক দেখে মনে হয়, অকালের এই মেঘ যে কোনো মুহূর্তে প্রবল বর্ষণে ভাসিয়ে দিতে পারে। অতএব জোরে জোরেই হাঁটতে চেষ্টা করছিল ডানিয়েলরা।

হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ পেটে হাত দিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল গঙ্গাবাঈ। অসহ্য কোনো যন্ত্রণায় শরীরটা বেঁকে যাচ্ছে, মুখ বিকৃত হয়ে উঠেছে।

দেখাদেখি ডানিয়েল আর সুভদ্রা কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, 'কী হল? অমন দাঁড়িয়ে পড়লে!'

আধফোটা কাতর সুরে গঙ্গাবাঈ বলল, 'পেটে ভয়ানক মোচড় দিচ্ছে।'

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে গঙ্গাবাঈকে লক্ষ্য করতে লাগল সুভদ্রা। দেখতে দেখতে মুখ ফিরিয়ে ইঙ্গিতে ডানিয়েলকে কাছে ডেকে ফিসফিসিয়ে বলল, 'আমার কিন্তু ভাল মনে হচ্ছে না। আপনি একটু দেখুন।'

এদিকে পেটে হাত রেখেই রাস্তায় শুয়ে পড়েছে গঙ্গাবাঈ। ক্রমশঃ তার শরীরটা বেঁকতে বেঁকতে প্রথমে ধনুক, তারপর আরো বেঁকে কুণ্ডলীমত পাকিয়ে গেল। দাঁতে দাঁত চাপা, একটা প্রবল বমির বেগ প্রাণপণে সে চাপতে চেষ্টা করছে। ফলে বিস্ফারিত চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসছে।

ঝুঁকে গঙ্গাবাঈকে অনেকক্ষণ দেখল ডানিয়েল। তারপর শঙ্কিত চিন্তান্বিত সুরে সুভদ্রাকে বলল, 'লক্ষণটা খুব খারাপই তো দেখছি।'

'ভারি মুশকিল হল। গঙ্গাবাঈ তো হাঁটতে পারবে না। এদিকে আমাদের যেতেও হবে অনেকখানি পথ। কী করা যায় বলুন দেখি।'

'কী আর করব, ওকে আমিই কাঁধে তুলে নিচ্ছি।' বলতে বলতে পাঁজাকোলে করে গঙ্গাবাঈকে তুলে নিল ডানিয়েল।

সুভদ্রা চিন্তিত মুখে বলল, 'এতখানি পথ ওকে বয়ে নিয়ে যেতে পারবেন?'

'পারতেই হবে। ওকে তো আর রাস্তায় ফেলে যেতে পারব না।' ডানিয়েল হাসল।

সুভদ্রা আর কিছু বলল না।

একটা লম্বা চড়াই আর ছোট ছোট দুটো উতরাই পার হওয়ার পর উদ্বেগের সুরে ডানিয়েল বলল, 'কলেরা রুগীর সেবা করতে করতে ও নিজেই বোধ হয় রোগটা ধরিয়ে ফেলল।'

উৎকণ্ঠা এবং ভর্ৎসনার ভঙ্গিতে সুভদ্রা বলল, 'কেউ যদি নিজের গলায় ইচ্ছে করে ছুরি বসায় আপনি আমি কী করতে পারি! আমি জানতাম হতভাগী নিজেই একদিন নিজের সর্বনাশ করে বসবে।'

সুভদ্রা কী বলতে চায় বুঝতে না পেরে ঘাড় ফিরিয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল ডানিয়েল। সুভদ্রা আবার বলল, 'কতদিন বলেছি কলেরা রুগীর সেবা করা মানে আগুন নিয়ে খেলা। নিজে না বাঁচলে পরোপকার করবে কে? বলেছি ইঞ্জেকসন-টিঞ্জেকসন নিয়ে নাও গঙ্গা কিন্তু কে কার কথা শোনে! এত বছর আমাদের সঙ্গে কাজ করছে কিন্তু একবারও ওকে টীকে ইঞ্জেকসান নেওয়াতে পারিনি। যখনই নেবার কথা বলেছি তখনই 'না' বলেছে, বলেছে ওর নাকি ভয় নেই, কিছু হবে না। এখন কি যে হবে! আমার তো ভয়ে হাত-পা পেটের ভেতর ঢুকে যাচ্ছে।'

এমনিতেই ক'টা দিন অপরিসীম পরিশ্রম গেছে, রাতগুলো কেটেছে বিনা ঘুমে। অবসাদে এবং ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে আসছিল। তার ওপর পূর্ণবয়স্ক একটি স্ত্রীলোকের প্রায়-অচেতন দেহ রয়েছে কাঁধে। দীর্ঘ পাহাড়ী পথের চড়াই-উতরাই ভাঙতে তার হৃৎপিণ্ড ফেটে যাচ্ছিল। ঘামে জামা সপসপে হয়ে গেছে। তবু মনে মনে গঙ্গাবাঈর কথাই ভাবছিল সে। যত ভাবছিল ততই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠছিল। ডানিয়েলের সমস্ত চেতনায় সুভদ্রার সেই কথা ক'টি ক্রমাগত প্রতিধ্বনিত হয়ে যাচ্ছে, কী হবে গঙ্গাবাঈর, কি হবে?

যেতে যেতে আরো দুটো বিপদ দেখা দিল। প্রথমত আকাশের মেঘ থেকে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। যদিও খুব জোরে নয় তবু অল্পতেই পাহাড়ী পথ পিছল হয়ে গেল। কাজেই অতি সন্তর্পণে পা ফেলতে হচ্ছে।

দ্বিতীয়ত গঙ্গাবাঈ যে বমির বেগ এতক্ষণ প্রাণপণে আটকে রেখেছিল এবার সেটা স্রোতের ধারার মত বেরিয়ে আসতে লাগল। সেই সঙ্গে মলও বেরুতে লাগল। মলে-বমিতে মুহূর্তে মাখামাখি হয়ে গেল ডানিয়েল।

বৃষ্টি-পিছল দুর্গম পাহাড়ী পথ পার হয়ে কীভাবে, কী অশেষ ক্লেশ এবং পরিশ্রমে শেষ পর্যন্ত গঙ্গাবাঈকে নিয়ে ডানিয়েল চার্চে পৌঁছল তা শুধু সে-ই জানে। ইতিমধ্যে আরো অনেক বার বমি করেছে গঙ্গাবাঈ। মলও বেরিয়েছে প্রচুর।

গঙ্গাবাঈকে নামিয়ে দেবার পর তার বমি এবং মললিপ্ত দেহ পরিষ্কার করতে বসল সুভদ্রা। এই ফাঁকে ডানিয়েল ছুটল স্নান করতে।

রেভারেণ্ড আপ্তে চার্চেই ছিলেন। খানিকটা পর পরিচ্ছন্ন হয়ে জামা কাপড় বদলে ডানিয়েল এসে দেখল, রেভারেণ্ড আপ্তে গঙ্গাবাঈকে ইঞ্জেকসান দিচ্ছেন।

শীতশেষের মেঘ মলিন বিষণ্ণ সন্ধ্যায় গঙ্গাবাঈকে কাঁধে বয়ে চার্চে নিয়ে এসেছিল ডানিয়েল। তারপর দেখতে দেখতে রাত নামল। প্রহরের পর প্রহর পার হয়ে রাতটা এক সময় ভোরের কাছে এসে পৌঁছল। দুখনিশি শেষ হয়ে এসেছে কিন্তু বিপদের অবসান ঘটল না। বরং যত সময় যাচ্ছে গঙ্গাবাঈকে ঘিরে উৎকণ্ঠা ততই ঘনীভূত হচ্ছে।

তিনটি মানুষ—রেভারেণ্ড আপ্তে, ডানিয়েল এবং সুভদ্রা কাল সন্ধ্যা থেকে আর ওঠে নি। গঙ্গাবাঈর শিয়রে বসে অসীম উদ্বেগে রাতটা কাটিয়ে দিয়েছে।

রাতে একের পর এক ইঞ্জেকসন দিয়ে গেছেন রেভারেণ্ড আপ্তে। ডানিয়েল আর সুভদ্রা শুধু পরিচর্যা করে গেছে কিন্তু গঙ্গাবাঈর বমি বা মল বন্ধ হয় নি।

পুব দিগন্তে যখন অস্পষ্ট রেখায় আলোর আভাস দেখা দিল সেই সময় ডানিয়েল জিজ্ঞেস করল, 'কেমন মনে হচ্ছে?'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়লেন রেভারেণ্ড আপ্তে। গম্ভীর বিমর্ষ মুখে বললেন, 'খুব খারাপ।'

গঙ্গাবাঈ প্রায় নিশ্চেতনের মত পড়ে আছে। বুকের নির্জীব উত্থান-পতনে শুধু বোঝা যাচ্ছে, প্রাণটুকু এখনও ধুকধুক করছে। চোখের দৃষ্টি আচ্ছন্ন, বুজে-আসা। মুখ ঈষৎ ফাঁক করা, তার ভেতর দিয়ে রক্তশূন্য জিভের একটু অংশ আর দাঁত দেখা যাচ্ছে।

অসাড় গঙ্গাবাঈ-এর দিকে চকিতে একবার দৃষ্টিক্ষেপ করে ডানিয়েল জিজ্ঞেস করল, 'এ বাঁচবে তো?' স্বরটা নিজের অজ্ঞাতসারে কেঁপে গেল।

রেভারেণ্ড আপ্তে বললেন, 'আরো ঘণ্টা বারো না গেলে বলতে পারছি না।'

'কোনো আশাই কি নেই?'

রেভারেণ্ড আপ্তে উত্তর দিলেন না।

ডানিয়েল উঠে এল। তার স্নায়ুর মধ্যে এই মুহূর্তে নিদারুণ অস্থিরতা চলছে। রেভারেণ্ড আপ্তের একটা হাত ধরে সে ঝাঁকাতে লাগল, 'বলুন কিছু—'

'আমার বলার বোধহয় কিছু নেই।' ওপরের দিকে আঙুল দেখিয়ে রেভারেণ্ড আপ্তে বললেন, 'ওখানে যিনি আছেন একমাত্র তিনিই বলতে পারেন।'

ডানিয়েলের সমস্ত অস্তিত্বের মধ্যে দিয়ে একটা শীতল স্রোত বয়ে গেল যেন।

রেভারেণ্ড আপ্তে বারো ঘন্টার কথা বলেছিলেন। কিন্তু তার আগেই শরীরে বার কয়েক খিঁচুনি এবং হিক্কা উঠে একেবারে নিশ্চল হয়ে গেল গঙ্গাবাঈ। তার হৃৎপিণ্ড চিরদিনের মত স্তব্ধ হয়ে গেল।

রেভারেণ্ড আপ্তে গঙ্গাবাঈর হাতের শিরা ধরে ছিলেন। আস্তে আস্তে হাতখানা বিছানায় নামিয়ে রেখে নিজের বাহুসন্ধি এবং বুকে আঙুল ছুঁয়ে বার তিনেক ক্রুশ

আঁকলেন। তারপর অবরুদ্ধ গলায় বললেন, 'শী ইজ নো মোর—' তার চোখ দেখতে দেখতে সজল হয়ে উঠল।

ডানিয়েল অনুভব করল শ্বাস নিতে তার ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে, গলার কাছটা এত ভারী যে ঢোঁক গিলতে পারা যাচ্ছে না। গঙ্গাবাঈ তার আত্মীয় না, পরিজন না। এমন কি স্বদেশের মানুষও না। তবু এই বিদেশবাসিনীর মৃত্যু তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে লাগল।

এদিকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করেছে সুভদ্রা। চার্চের স্তব্ধতার মধ্যে কান্নার শব্দটা অত্যন্ত ভয়াবহ আর স্পর্শময় মনে হতে লাগল।

সন্ধ্যের কিছু আগে রেভারেণ্ড আপ্তেই গঙ্গাবাঈর সৎকারের ব্যবস্থা করলেন। চার্চ থেকে খানিক দূরে চিতা সাজিয়ে গঙ্গাবাঈকে অন্তিম শয়নে শুইয়ে দেওয়া হল।

লোলাকে নিয়ে আসা হয়েছিল। তাকে দিয়ে গঙ্গাবাঈর মুখাগ্নি করালেন রেভারেণ্ড আপ্তে। তারপর লেলিহান শিখায় চিতা জ্বলে উঠল।

গঙ্গাবাঈর মৃত্যুর খবর পাওয়া থেকেই লোলা প্রাণফাটা কান্না শুরু করেছিল। সে কান্না থামে নি। চিতার আগুন ঊর্ধ্বমুখ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উদ্‌ভ্রান্তের মত সেদিকে ছুটে যেতে চাইছে সে। রেভারেণ্ড আপ্তে নিজের বিশাল বুকে তাকে জড়িয়ে ধরে আছেন।

একটু দূরে দুই হাঁটুর মাঝখানে মুখ রেখে অভিভূতের মত বসে আছে ডানিয়েল। এবারকার মহামারীতে অনেক মৃত্যু সে দেখেছে। কিন্তু গঙ্গাবাঈর মৃত্যু তার সমস্ত সত্তায় একটা নিদারুণ শোককে গভীর রেখায় এঁকে দিয়ে গেল।

কোঙ্কন উপকূলের এই গ্রামগুলোকে নিয়ে মৃত্যু কয়েকদিনের জন্য ধ্বংসের খেলায় মেতে উঠেছিল। ধীরে ধীরে তার মত্ততা কমে গেল।

মহামারীর বিরুদ্ধে রেভারেণ্ড আপ্তেরা দুর্গ সাজিয়েছিলেন। তবু মৃত্যু তার মাশুল আদায় করে নিয়ে গেছে। দশখানা গ্রামের প্রায় পঁচিশটা প্রাণ সে কেড়ে নিয়েছে।

মৃত্যু মাত্রেই অপরিসীম ক্ষতি, তবে এটুকুই শুধু সান্ত্বনা যে পঁচিশ জন মারা গেছে তাদের প্রায় সবাই অথর্ব বুড়োবুড়ি। সুস্থ সবল উপার্জনক্ষম কেউ মরে নি।

মহামারী যেমন ঝড়ের বেগে এসেছিল তেমন গতিতেই বিদায় নিচ্ছে। ইদানীং নতুন করে কারো রোগে পড়ার খবর নেই, পুরনো যারা শয্যাশায়ী হয়েছিল তারাও প্রায় সুস্থ হয়ে উঠেছে।

আজকাল আর ভ্রাম্যমাণ মেডিক্যাল ইউনিটগুলোর সঙ্গে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ায় না ডানিয়েল। মনপুরাতেই আবার ফিরে এসেছে সে, লোলাকে সঙ্গে করে

এনেছে। এতকাল সেই কুকুরছানাটা ছিল তার সর্বক্ষণের সঙ্গী। গঙ্গাবাঈ মারা যাবার পর লোলার দায়িত্ব সে নিয়েছে।

মনপুরায় ফিরে চুপ করে বসে নেই ডানিয়েল। এখানে যারা শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিল, ঘরে ঘরে ঘুরে তাদের পরিচর্যা করে বেড়াচ্ছে।

দেখতে দেখতে আরো ক'টা দিন কাটল। তারপর কোঙ্কনবাসীরা যখন মোটামুটি সুস্থ হয়ে উঠেছে সেই সময় সাতারা জেলা থেকে একদল লোক এল। প্রতি বছরই নাকি এই সময়টা তারা এখানে আসে। উদ্দেশ্য সাতারা জেলায় কার্পাস চাষের জন্য মজুর সংগ্রহ করা।

প্রায় ফি বছরই এই সময়টা আরব সাগর কৃপণ থাকে। প্রাণধারণের জন্য যে কোনো উঞ্ছবৃত্তিতে তখন এ অঞ্চলের লোক রাজী। যেবার সমুদ্র আগে আগেই তার বদ্ধ মুঠি খুলে উদার হয়ে ওঠে সেবার আর মজুর পাওয়া যায় না। আর যেবার সে নির্দয় থাকে সেবার দলে দলে সবাই কার্পাস চাষের জন্য দিনমজুরিতে সাতারায় চলে যায়।

এবার এখনও পর্যন্ত সমুদ্র নির্দয়। এখন প্রশ্ন, মাছমারারা গ্রামে বসে তার করুণার খবর কীভাবে পাবে? সে দায়িত্ব আড়তদারদের। সমুদ্রের দিকে তীক্ষ্ণ নজর মেলে তারা বসে থাকে। মাছের আনাগোনা টের পেলেই তারা গ্রামে গ্রামে খবর পাঠায়।

মজুর সংগ্রহের দালালেরা আসাতেই গ্রামে গ্রামে সাড়া পড়ে গেল। ঠিক হল, এ অঞ্চলের তাবত সুস্থ সমর্থ নারী-পুরুষ কার্পাস চাষের মাটি কোপাতে সাতারায় যাবে। শিশুরা আর বুড়িরা গ্রামেই থাকবে।

অন্য যে সব বছর তারা সাতারায় গেছে সে সব বার বেশির ভাগ লোকই নিজের নিজের সংসার উঠিয়ে সঙ্গে করে নিয়েছে। বাকিরা সুভদ্রা এবং অন্যান্য মিশনারিদের হাতে গ্রামের দায়িত্ব দিয়ে চলে গেছে।

এবার ডানিয়েল আছে। তার ওপর এখনকার বাসিন্দাদের বিশ্বাস এবং ভরসা অগাধ। সুতরাং কাজের লোক ক'টি গেলেই চলবে, অবশিষ্টদের জন্য দুর্ভাবনা নেই। নিশ্চিন্তে সাতারা জেলায় গিয়ে কার্পাস চাষের মাটির চৌরস করে আসা যাবে।

নিয়ম অনুযায়ী দালালেরা প্রত্যেক মজুরকে কিছু টাকা আগাম দেয়। সেই টাকাটা সংসারে দিয়ে তারা চলে যায় সাতারায়। সেখানে থাকা-খাওয়ার ভাবনা নেই। অবশেষে কাজ চুকিয়ে কিছু টাকা হাতে নিয়ে তারা বাড়ি ফেরে।

গ্রামে গ্রামে সাতারা যাত্রার জন্য সাড়া পড়ে গেল। একদিনের মধ্যেই সব গোছ-গাছ করে তারা রওনা হল। যাওয়ার আগে মনপুরা গ্রামের লোকগুলো যে টাকা আগাম পেয়েছিল সব ডানিয়েলের হাতে তুলে দিয়েছে। তাদের ইচ্ছা, ডানিয়েল ঐ টাকা থেকে হিসেব করে চাল-ডাল এবং নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস কিনে দেবে। তাদের বিশ্বাস, এ কাজ ডানিয়েল সুষ্ঠুভাবে করতে পারবে। ডানিয়েল প্রত্যেকের নাম আলাদাভাবে তাদের দেওয়া টাকার অঙ্ক লিখে রেখেছে। যতদিন না ওরা ফিরে আসে ততদিন ঐ টাকাতেই চালাতে হবে।

অন্য গ্রামের লোকেরাও তার কাছে টাকা গচ্ছিত রাখতে চেয়েছিল। ডানিয়েল রাজী হয় নি। একার পক্ষে এত লোকের দায়িত্ব নেওয়া সম্ভব নয়। অতএব তাদের দায়িত্ব কেউ নেয় নি, যারা বাড়িতে পড়ে আছে তাদেরই হিসেব করে করে নিজেদের খরচপত্তর চালাতে হবে।

যাওয়ার সময় মনপুরার লোকেরা তার হাত ধরে বলে গেছে, 'সাহেব, তোমার ভরসায় বুড়োবুড়ি আর বাচ্চাগুলোকে রেখে গেলাম। তুমি ওদের দেখো।'

ডানিয়েল অভয় দিয়েছে, 'কিছু ভেবো না। আমি যখন আছি তখন ওরা ভালই থাকবে।'

'তা আমরা জানি।'

'যদি কোনো বিপদ আপদ হয় প্রাণ দিয়ে ওদের রক্ষা করব।'

লোকগুলো অভিভূতের মত বলেছে, 'তুমি যে কত দিক থেকে আমাদের উপকার করছ সে কথা বলে শেষ করা যায় না।'

একসঙ্গে মাথা ও হাত প্রবলভাবে নেড়ে ডানিয়েল বলেছে, 'থাক, থাক। ও কথা বলার দরকার নেই।'

অন্য সব গ্রামের লোকেরাও বলে গেছে, সে যেন মাঝে মাঝে ওদের গ্রামে গিয়ে একটু খোঁজখবর নেয়। ডানিয়েল বলেছে, 'নিশ্চয়ই যাব। একথা তোমাদের বলতে হবে কেন?'

শক্ত সমর্থ মানুষগুলো সাতারা জেলায় চলে যাবার পর কোঙ্কনের এই উপকূলটা ইদানীং বুড়োবুড়ি, আর বাচ্চাদের উপনিবেশ হয়ে উঠেছে।

দিবারাত্রি এই মানুষগুলিকে নিয়েই কেটে যাচ্ছে ডানিয়েলের। পরিশ্রমও হচ্ছে নিদারুণ। প্রতিদিন এ বাড়ি সে বাড়ি ঘুরে কে অসুস্থ হয়ে পড়ল, কার ঘরে চাল নেই, কার ঘরে নুন নেই, কার ঘরে রান্নার কাঠকুটো নেই— এসব খবর নিতে হচ্ছে এবং সাধ্যমত সব সমস্যার সমাধান করতে হচ্ছে।

বুড়ো মানুষগুলি এমনিতেই দুর্বল। বার্ধক্য এক ব্যাধি বিশেষ। তার ওপর সামান্য একটু ধকল হলেই তারা শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে। তাদের ওপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখতে হচ্ছে ডানিয়েলকে।

তা ছাড়া বুড়োবুড়িরা জীবনের শেষ মাথায় অবোধ শিশু হয়ে গেছে যেন। তাদের নানারকম বায়না। কেউ বলে, 'ও সাহেব, জঙ্গল থেকে আমার জন্যে তেঁতুল পাতা নিয়ে এসো তো, একটু ঝোল খাব।'

ডানিয়েল তেঁতুল পাতা জোগাড় করে আনে।

কেউ বলে, 'ভাত আর আমতি খেয়ে বড্ড অরুচি ধরে গেছে। মেটে আলু এনো সাহেব। মুখ বদলাব।'

ডানিয়েল মেটে আলু আনতে ছোটে।

যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করে কেউ বলে, 'বাতের ব্যথাটা আবার চাগিয়ে উঠেছে। হাত-পা যা শুলোচ্ছে কি বলব! ছেলে আর ছেলের বৌটা তো সাতারায় গেল পয়সা রোজগার করতে। ওরা থাকলে তেল গরম করে মালিশ করে দিত!'

ইঙ্গিতটা বুঝতে অসুবিধা হয় না ডানিয়েলের। তেল গরম করে নির্বিকার চিত্তে মালিশ করতে বসে সে।

ভাওজীর মা বুড়িটার ধারণা, সবসময় সে জ্বরে ভুগছে। দেখা হলেই ডানিয়েলকে বলে, 'ও সাহেব, আমার কপালটা একটু দেখ তো।'

ডানিয়েল তার কপালে হাত রাখে। ভাওজীর মা শুধোয়, 'গা পুড়ে যাচ্ছে, না?'

ডানিয়েল বলে, 'কই, না তো।'

'তুমি ভাল করে দেখ।'

আবার মনোযোগ দিয়ে শরীরের উত্তাপ পরীক্ষা করতে হয়। কিন্তু কোনোমতেই অস্বাভাবিক মনে হয় না। ডানিয়েল বলে, 'না, জ্বর নেই। তোমার গা বেশ ঠাণ্ডা।'

রাগত ভঙ্গিতে ডানিয়েলের হাতখানা সরিয়ে দিয়ে ভাওজীর মা বলে, 'তুমি কিছু জানো না। জ্বরের তাতে আমি মরে যাচ্ছি আর তুমি বলছ, গা আমার ঠাণ্ডা। এক কাজ ক'রো, কাল সাহেববাবার কাছ থেকে জ্বর দেখার যন্তর নিয়ে আসবে।'

সাহেববাবা অর্থাৎ রেভারেণ্ড আপ্তে। জ্বর দেখার যন্ত্র হচ্ছে থার্মোমিটার। কিন্তু থার্মোমিটার এনেও লাভ হয় না। যার জ্বরই হয়নি পৃথিবীর কোনো যন্ত্রেই তা ধরা পড়বার নয়। সে কথা বলতে ভাওজীর মা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর সন্দিগ্ধ সুরে বলে, 'সত্যি বলছ তো সাহেব?'

ডানিয়েল বলে, 'সত্যি বলছি, গণপতির দিব্যি।'

খানিক ভেবে ভাওজীর মা বলে, 'যন্তরে ধরা না পড়ুক জ্বর আমার নিশ্চয় হয়েছে।'

বুড়ির মনস্তত্ত্ব এবার ধরে ফেলেছে ডানিয়েল। জ্বর নেই তবু কেউ যদি তার সুরে সুর মিলিয়ে বলে, হয়েছে তাতেই বুড়ি খুশি। ডানিয়েল বলে, 'দাঁড়াও দাঁড়াও, জ্বরটা আরেকবার দেখি।' থার্মোমিটারটা বুড়ির বগলে চেপে রেখে সেটা দেখার ভান করে বলে, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ জ্বর আছে। আমারই আগের বার দেখতে ভুল হয়েছিল।' বুড়ি সন্তুষ্ট। দাঁতহীন ফোকলা মুখে হেসে বলে, 'বলেছিলাম না, আমার জ্বর। দেখলে?'

তারপর থেকেই দেখা হলে ডানিয়েল তার কপালে হাত রেখে বলে, 'ইস্, জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। ধান দিলে খৈ হয়ে যাবে।'

বুড়ী বলে, 'তুমিই একমাত্তর বুঝলে সাহেব। আমার যে জ্বর হয়েছে আর কেউ তা মানতেই চায় না। হারামজাদা শয়তানের বাচ্চাগুলো।'

একেক জনের প্রত্যাশা একেক রকম। কেউ ডানিয়েলকে কাছে বসিয়ে রেখেই খুশি। একটি কথাও বলে না, শুধু ডানিয়েলের সঙ্গটুকুই তার কাম্য।

কেউ আবার কাছে ডেকে বক বক করতে পছন্দ করে। যেমন গণেশের ঠাকুমা হেমা বুড়ি।

নিজের ছেলে-বউ নাতি-নাতনীদের সম্বন্ধে তার অভিযোগের শেষ নেই। ডানিয়েলের সঙ্গে দেখা হলেই প্রথমে কিছুক্ষণ হাউ হাউ করে সে কাঁদে। তারপর অবরুদ্ধ সুরে বলতে থাকে, 'জানো সাহেব আমি আপদ বালাই। কেউ আমাকে দেখতে পারে না।'

ডানিয়েল বোঝাতে শুরু করে, 'না-না, ওকথা ঠিক নয়। কেন তোমায় দেখতে পারবে না?'

'আমার ছেলের বউ, ঐ গণশার মাকে তো তুমি চেনো না। দিনরাত আমায় দাঁতে কাটছে, ঢেঁকিতে কুটছে। আস্ত একটা ডাইন। আমি মরলে ও বাঁচে, ওর হাড় জুড়োয়।'

এই অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ ডানিয়েলের পছন্দ নয়। এড়াবার জন্যে সে বলে, 'এ তোমার ভুল ধারণা। আচ্ছা, এখন আমি উঠি।'

উঠব বললেই ওঠা যায় না। কাঁকড়ার দাঁড়ার মত লিকলিকে হাত দুটো দিয়ে ডানিয়েলের কাঁধ আঁকড়ে ধরে হেমা বুড়ি। অগত্যা অনিচ্ছাসত্ত্বেও বসতে হয়।

বুড়ি আবার বলে ওঠে, 'ছেলেও হয়েছে আমার ভেড়ুয়া। বউয়ের কথায় উঠবে, বসবে। আমি বাঁচলাম কি মরলাম, খেলাম কি না খেলাম সেদিকে নজর নেই। জানো সাহেব ঐ গাছটা—' আঙুল বাড়িয়ে উঠোনের শেষ মাথায় একটা বড় পিপুল গাছ দেখায় সে।

ডানিয়েল জিজ্ঞেস করে, 'ঐ গাছটা কী?'

'ওরা বলাবলি করে, আমি মরলে ওটা দিয়ে আমায় পোড়াবে। আমি যাতে তাড়াতাড়ি মরি সে জন্যে বউটা পেট ভরে খেতে পর্যন্ত দেয় না।'

শুনতে শুনতে ডানিয়েল অত্যন্ত বিষণ্ণ বোধ করে।

বুড়ি বলতেই থাকে, 'এই যে তোমায় এত কথা বললাম, তা কি বলতে পারতাম? পারতাম না। বউ হারামজাদী সাতারায় গেছে বলেই তো পারলাম।'

ডানিয়েল এবার বলে, 'আচ্ছা ওরা এলে আমি বলে দেব যেন তোমায় যত্ন করে।'

'তাই বলে দিও সাহেব। তোমার কথা ওরা ঠিক শুনবে।'

শুধু বুড়োবুড়িরা নয়। বাচ্চারাও আছে। আড়তদারদের ঘরে মাছের ওজন লিখতে যাবার সময় তারা ডানিয়েলকে কাছে পেত না। সেই না পাওয়াটা এখন তারা সুদে-আসলে পুষিয়ে নিচ্ছে। তাদের সঙ্গে ঘুরতে হচ্ছে, সমুদ্রে স্নান করতে হচ্ছে, জঙ্গলে যেতে হচ্ছে। এদের পরেও আছে লোলা তার সেই কুকুরছানাটা।

এতগুলো মানুষের কারো আবদার মিটিয়ে, কারো সেবা করে, আর বাচ্চাগুলোর সঙ্গে হুল্লোড় করে সারাটা দিন এবং রাতের প্রায় অর্ধেকটা কাটিয়ে দেয় ডানিয়েল। তারপর খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়ে।

শোওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু ঘুম আসে না। ইণ্ডিয়ায় আসার আগে ইংল্যাণ্ডের সেই জীবনটার কথা ভাবতে চেষ্টা করে। কিন্তু সেটা যেন ক্রমশ ধূসর হয়ে যাচ্ছে। মনে হয়, সেটা এ জন্মের কথা নয়। পূর্বজন্মের কোনো ইতিহাস। কোনো অলৌকিক প্রক্রিয়ায় জাতিস্মর হয়ে সে বুঝি তা মনে করতে পারে।

ইংল্যাণ্ডের সেই জীবনটার সঙ্গে ডানিয়েলের বোধ হয় কোনোকালে সংযোগ ছিল না। সুদূর এই কোঙ্কন উপকূল চিরদিনের মত তার কাছ থেকে ডানিয়েলকে বুঝিবা বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে।

শিশুবাহিনী আছে, মনপুরাবাসী অসহায় মানুষগুলি আছে। তাদের সকলের রক্ষণাবেক্ষণের প্রশ্ন আছে। তারই ভেতর অন্য গ্রামগুলিতে যাওয়ার তাগিদ আছে। কিন্তু সব কিছুর ওপর যে আছে সে সুভদ্রা—সুভদ্রা জোসেফ।

বাৎসরিক দুর্ভিক্ষ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামে গ্রামে স্কুল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। দিনকয়েক হল আবার সেগুলো একে একে খুলতে শুরু করেছে সুভদ্রা।

আগে লোকজন কম থাকার জন্য একাই তিনখানা গ্রামের স্কুল চালাতে হত সুভদ্রাকে। ইদানীং লোক পাওয়া গেছে। কাজেই তাদের ওপর অন্য দুই গ্রামের ভার দিয়ে শুধু মনপুরার দায়িত্ব নিয়েছে সুভদ্রা।

প্রতিদিন সকাল হলেই চার্চ থেকে সোজা এখানে চলে আসে সে। আন্দাজ ন'টা পর্যন্ত ক্লাস করে ছেলেমেয়েদের ছুটি দিয়ে বেরিয়ে পড়ে ডানিয়েলের সন্ধানে।

রোজ ডানিয়েলকে এক জায়গায় পাওয়া যায় না। একেক দিন একেক জায়গা থেকে তাকে আবিষ্কার করে সুভদ্রা। স্নিগ্ধ হেসে বলে, 'বেশ আছেন কিন্তু—'

'কী রকম?' চোখে হাসির ঝিলিক হেনে ডানিয়েল তাকায়।

'কারো পায়ে তেল মালিশ করে দিচ্ছেন, কারো তেঁতুল পাতা জোগাড় করে দিচ্ছেন, ধৈর্য ধরে কারো বকবকানি শুনছেন। তার ওপর বাচ্চাগুলার ঝক্কি পোয়ানো। সত্যি এতও পারেন।'

ডানিয়েল উত্তর দেয় না, শুধু হাসে।

সুভদ্রা আবার বলে, 'আমায় এ সব পোয়াতে হলে মাথা খারাপ হয়ে যেত।'

ডানিয়েল এবারও হাসে।

'রেভারেণ্ড আপ্তে আপনার সম্বন্ধে কী বলেন, জানেন?'

'কী?'

'শুনলে লেজ মোটা হয়ে যাবে।'

'হয় হবে, আপনি বলুন।'

সুভদ্রা বলে, 'উনি বলেছেন আপনার মত হিউম্যানিটারিয়ান নাকি হয় না। আপনার মত ভারতবন্ধু এদেশে আর কখনও আসে নি।'

সলজ্জ মুখে ডানিয়েল বলে, 'উনি আমাকে স্নেহ করেন তাই বলেছেন। নইলে এতবড় কমপ্লিমেন্টের যোগ্য যে আমি নই সে কথা আমার চাইতে ভাল আর কে জানে!'

গম্ভীর গলায় সুভদ্রা বলে, 'রেভারেণ্ড আপ্তে স্নেহের খাতিরেই হোক বা অন্য কোনো কারণেই হোক বাড়িয়ে বলার লোক নন। যে যতটুকু ঠিক ততটুকুই তিনি

বলেন।'

ডানিয়েল উত্তর দেয় না।

একদিন সুভদ্রা এসে বলল, 'আপনি কিন্তু আমার কথাটা ভুলে গেছেন।' তার সুরে অনুযোগ ছিল।

'কী ভুলে গেছি?' ডানিয়েল জানতে চাইল।

'সুখনায় সং সেজে ফেরার পথে আপনি কী কথা দিয়েছিলেন?'

'সত্যি বলছি মনে করতে পারছি না।'

'আপনি বলেছিলেন ছবি আঁকবেন।'

এবার মনে পড়ল। সত্যি, কোঙ্কন উপকূলের এই মনোরম নিসর্গ, এখানকার মানুষ তাদের বিচিত্র জীবনযাত্রা, তাদের উৎসব, শোক, দুঃখ, বিষাদ—সব কিছুই রং আর রেখার বন্ধনে ধরে রাখা উচিত। কোনো কারণে যদি এখান থেকে চলে যেতে হয় তবে হয়ত কোনোদিনই আর আসা হবে না। জীবনের একটা অংশ যে এখানে কাটানো গেল তার স্মৃতি ঐ ছবিগুলোর মধ্যে থাকবে। সেগুলো উল্টে পাল্টে তখন এই জীবনটাকে নতুন করে বার বার মনে পড়ে যাবে।

ডানিয়েল উৎসাহিত হয়ে উঠল, 'ঠিক বলেছেন, ছবি এবার থেকে আঁকব। আগেই আঁকা শুরু করা উচিত ছিল, তবে কিনা মহামারী গেল।' বলতে বলতে কি মনে পড়ে গেল তার, 'ছবি তো আঁকব, কিন্তু—'

'কী?'

'আমার যে রং তুলি কাগজ কিছুই নেই।'

পরের দিন ছবি আঁকার সরঞ্জাম নিয়ে এল সুভদ্রা। রঙ অবশ্য সে আনতে পারে নি, শুধু চাইনীজ ইঙ্ক এনেছে। সেগুলো ডানিয়েলের হাতে দিতে দিতে বলল, 'এই নিন।'

ডানিয়েল অবাক। বলল, 'এ সব পেলেন কোথায়?'

'রেভারেণ্ড বীরকরকে তো চেনেন। উনি আগে আগে ছবি আঁকতেন। আজকাল আর আঁকেন না। এগুলো পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছিল। আমি চেয়ে নিয়ে এলাম।'

কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে সুভদ্রার দিকে তাকাল ডানিয়েল, কিছু বলল না।

সেদিন থেকেই হাজার কাজের মধ্যে সময় করে ছবি আঁকা শুরু করল ডানিয়েল। কখনও দেখা যায়, অর্ধোলঙ্গ একটা শিশুকে সামনে বসিয়ে কাগজের ওপর ক্ষিপ্র হাতে তুলির টান দিয়ে চলেছে। কখনও দেখা যায় তার সামনে বসে আছে একটা বুড়ি, তার পিঠ বয়সের ভারে বেঁকে গেছে, অজস্র রেখায় মুখ কুঞ্চিত। দেখতে দেখতে জরাময়ী মেয়েমানুষটি অবিকল ডানিয়েলের কাগজে ফুটে উঠে। বুড়ো যশবন্ত, ভামুয়া বুড়ি, ভাওজীর মা, গণেশের ঠাকুমা—কেউ বাদ যাচ্ছে না। যাকে হাতের কাছে পাওয়া যাচ্ছে তাকেই এঁকে ফেলছে ডানিয়েল।

যুবক-যুবতী বা শক্ত সমর্থ প্রৌঢ়-প্রৌঢ়ারা আপাতত কেউ নেই। তাদের চেহারা মনে করে সমানে এঁকে চলেছে ডানিয়েল।

শুধু কোঙ্কনবাসীদের ছবিই না, তাদের ঘরবাড়ি, বাসন-কোসন, গরু-বাছুর, গৃহসজ্জার নানা উপকরণ—জীবন যাত্রার সকল দিকই নিপুণ রেখায় সে ধরে রাখছে। এমন কি গণপতি উৎসব, সং সাজা, পালাগানের আসর, রতি-গণেশের বিয়ে, কলেরায় মৃত গঙ্গাবাঈয়ের সৎকার—সব, সব কিছু মনে করে করে এঁকে যাচ্ছে। মেডিক্যাল ইউনিটের সঙ্গে গ্রামে গ্রামে ঘোরার সময়কার স্মৃতিগুলিকেও চিত্রাকারে রূপ দিয়ে চলেছে। দলবদ্ধভাবে কোঙ্কনবাসীরা যখন মাছ ধরতে যেত, যখন নৌকোর বহর ভাসিয়ে সুদূর সমুদ্রে পাড়ি জমিয়ে একের পর এক জাল ফেলত কিংবা বিষণ্ণ সন্ধ্যায় আবার যখন ফিরে আসত সে সময়কার ছবিও এঁকে চলেছে। সমুদ্রের পারে সারিবদ্ধ আড়ত, আড়তদার এবং এদের মধ্যে বিশেষ করে দামোদরকে সে এঁকেছে। তা ছাড়া দশ গ্রামের সবল নারীপুরুষগুলি যখন সাতারা জেলায় কার্পাস চাষ করতে রওনা হল সেই সময়কার ছবিও সে ধরে রেখেছে।

তা ছাড়া এখানকার যত ফুল, যত পাখি, আকাশের যত বর্ণবাহার, যত মেঘ, যত কুয়াশা—কিছুই সে বাদ দিচ্ছে না। কোঙ্কনের জীবনে যত বৈচিত্র্য, যত রম্যতা, যত গ্লানিমা, যত মনোহারিত্ব—সবই ধরে রাখতে চেষ্টা করছে ডানিয়েল। মোট কথা জীবনকে তার সর্বাঙ্গীন রূপে ধরাই তার বাসনা।

সুভদ্রা প্রতিদিনই আসে। রোজ ডানিয়েল ক'খানা ছবি আঁকে সেগুলো তার দেখা চাই। ডানিয়েলের আঁকা যে ছবিই সে দ্যাখে তাতেই মুগ্ধ হয়ে যায়। অসীম বিস্ময়ে বলে, 'বাঃ বাঃ-চমৎকার!' যত দিন যাচ্ছে ডানিয়েল সম্বন্ধে তার বিস্ময়বোধ, মুগ্ধতাবোধ বেড়েই চলেছে।

একদিন সুভদ্রা বড় বিচিত্র কথা বলল, 'সবাইকে নিয়ে তো ছবি আঁকছেন। গরু-বাছুর, ছাগল-ভেড়া—কাউকেই বাদ দিচ্ছেন না। আমি কি তাদের চাইতেও অধম?'

ডানিয়েল হকচকিয়ে গেল। অপ্রতিভের মত বলল, 'কী বলছেন ঠিক বুঝতে পারছি না।'

গলার স্বর নামিয়ে ফিসফিসিয়ে উঠল সুভদ্রা, 'আমাকে নিয়ে কি একখানাও ছবি আঁকা যায় না?'

একদিন সুভদ্রার ছবি এঁকে বিপদে পড়তে হয়েছিল। কিন্তু সে একদা আজ আর নেই। প্রদীপ্ত মুখে ডানিয়েল বলল, 'নিশ্চয়ই আঁকব—'

'কবে আর আঁকবেন! সবার হয়ে গেল—'

সুভদ্রার স্বরে কিঞ্চিৎ অভিমানের স্পর্শ আছে কি? বুঝেও ঠিক বোঝা গেল না।

ডানিয়েল বলল, 'ভেবেছিলাম সবার আঁকা হয়ে গেলে আপনার ছবিটা প্রাণমন দিয়ে আঁকব।'

'বাবা, প্রাণও দেবেন আবার মনও দেবেন!' কেমন করে যেন হাসল সুভদ্রা, 'অত আমার দরকার নেই। শুধু একটা ছবি আঁকবেন তাতেই আমি খুশি।'

ডানিয়েল হাসল। বলল, 'আজ ছবি আঁকার তেমন কোন সাবজেক্ট মনে আসছে না। আজ আপনাকেই আঁকব, দাঁড়ান ওখানে।'

'ওঃ, সাবজেক্ট পাচ্ছেন না বলে আমাকে দিয়ে দায় সারবেন। দরকার নেই অমন ছবির।'

'আরে না, দায় সারব না। আপনি ওখানে দাঁড়ান তো।'

মুখে অনিচ্ছার ক'টি রেখা টানল বটে কিন্তু মনে এবং দু-পায়ে প্রবল ইচ্ছা মেশানো। সাগ্রহে নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল সুভদ্রা।

ডানিয়েল দ্রুত হাত চালিয়ে আঁকতে লাগল। একটু পর বলল, 'হয়ে গেছে।'

'দেখি—' প্রায় ছুটেই এল সুভদ্রা। ডানিয়েলের হাত থেকে ছোঁ মেরে কাগজখানা তুলে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল।

এদিকে ডানিয়েলের চোখেমুখে নিঃশব্দ চাপা হাসি ছলকে যাচ্ছে। হঠাৎ ছবি থেকে মুখ তুলল সুভদ্রা, তার আঁখিতারায় বিদ্যুত চমকাচ্ছে। তীব্র সুরে সে বলল, 'এটা আমার ছবি!'

'হুঁ—' ডানিয়েল মাথা নাড়ল।

'আমি ট্যারা?'

ভাল করে দেখার ভান করে ডানিয়েল বলল, 'খুব বেশি ট্যারা না হলেও মোটামুটি মন্দ না।'

ছবিটা ডানিয়েলের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সুভদ্রা চেঁচিয়ে উঠল, 'আমাকে যে ট্যারা বলে সে কানা। কানা না, একেবারে অন্ধ।'

'আচ্ছা, আরেকবার দাঁড়ান। দেখি চেষ্টা করে, কি রকম হয়—'

সুভদ্রা দাঁড়াল। ডানিয়েল আঁকতে লাগল।

এবার চোখ দুটো ঠিকই হয়েছে কিন্তু ডান পা-টা বাঁ পায়ের তুলনায় খানিক ছোট।

সুভদ্রা রেগে উঠল, 'একি, এ পা-টা ছোট কেন?'

নিরীহ সুরে ডানিয়েল বলল, 'আপনার ঐ পা-টা একটু ছোট না?'

'ইয়ার্কি দিচ্ছেন!'

'কি আশ্চর্য, ইয়ার্কি দেব কেন? আমি তো প্রথম দিন থেকেই দেখে আসছি, পা ছোটর জন্যে আপনি খুঁড়িয়ে হাঁটেন।'

'আমি খুঁড়িয়ে হাঁটি!'

'হাঁটেন না?'

মুখখানা ভার করে সুভদ্রা বলল, 'দরকার নেই আমার ছবির। আমি চললাম।' বলে হনহন করে হাঁটতে শুরু করল।

অসীম কৌতুকে চোখ কুঁচকে সুভদ্রার যাওয়ার ভঙ্গিটা দেখতে লাগল ডানিয়েল। কিশোরী নয়, ডানিয়েলের মনে হতে লাগল, সন্ন্যাসিনীর গম্ভীর আবরণের তলায় অবুঝ এক বালিকাই বুঝি রয়েছে।

সুভদ্রা যখন অনেক দূর চলে গেছে তখন ছুটতে ছুটতে তার সামনে গিয়ে দু-হাত দিয়ে পথ আগলে দাঁড়াল ডানিয়েল।

ডানিয়েলের দিকে তাকাল না সুভদ্রা। পথের ডানপাশে ঢালু জমি। পাশ কাটাবার জন্য সেই জমিতে গিয়ে নামল।

ডানিয়েল নাছোড়। দেখাদেখি সে-ও গিয়ে নিচের জমিতে নামল।

গম্ভীর নীরস সুরে সুভদ্রা বলল, 'পথ ছাড়ুন—'

সোনালী চুল ঝাঁকিয়ে ডানিয়েল বলল, 'উঁহু—'

'আমাকে যেতে দিন।'

সুভদ্রা মাটিতে দৃষ্টি রেখে কথা বলছিল। ডানিয়েল নিচু হয়ে তার চোখের দিকে তাকাল। মৃদু হেসে বলল, 'আপনি ভারি ছেলেমানুষ।'

'ছেলেমানুষ হই আর যা-ই হই, আপনার তাতে কি?' সুভদ্রা রেগে উঠল।

'আমারই তো সব, আমাকেই যে সব ঝামেলা পোয়াতে হয়। আসুন আমার সঙ্গে —'

'কোথায়?'

'যেখানে কাগজ কালি ফেলে এসেছি।'

'না।'

'এবার ভাল করে ছবি এঁকে দেব।'

'ভাল ছবি কেমন আঁকবেন, আমি জানি। আমার দরকার নেই।'

ডানিয়েল হাসতে লাগল।

সুভদ্রা বিড়বিড় করতে লাগল, 'একবার খোঁড়া আঁকবে, একবার ট্যারা করবে। আমাকে নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করবে। এখন আবার ভালমানুষি করতে এসেছে।'

প্রাণপণে হাসি চেপে ডানিয়েল বলল, 'ঠাট্টাও বোঝেন না?'

'অমন ঠাট্টা বুঝে আমার দরকার নেই।'

'চলুন, আর ইয়ার্কি করব না। আপনি যা, ঠিক তাই আঁকব।'

জেদী সুরে সুভদ্রা বলল, 'আমি যাব না।'

ডানিয়েল বলল, 'অনেকক্ষণ সাধাসাধি করছি। এরপর আমার মনে যা আছে, করব কিন্তু—'

'কী করবেন শুনি?'

'দেখুন তবে—' বলে কাণ্ডজ্ঞানহীন বিদেশী সুভদ্রার একটা হাত ধরে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়ে নিয়ে চলল।

ভীত সন্ত্রস্ত সুভদ্রা চেঁচাতে লাগল, 'হাত ছাড়ুন, হাত ছাড়ুন, লোকে দেখলে কী বলবে!'

সুভদ্রার কথা গ্রাহ্য করল না ডানিয়েল। তুলি কালি যেখানে ফেলে এসেছিল সেখানে গিয়ে সুভদ্রার হাত ছাড়ল সে।

উত্তেজনায় এবং এতখানি ছুটে আসার ধকলে মুখ লাল হয়ে উঠেছে সুভদ্রার। বুক ঘনশ্বসিত। হাঁপাতে হাঁপাতে নিতান্ত নারীসুলভ সুরে গালাগাল দিতে লাগল, 'অসভ্য বাঁদর কোথাকার!'

মাথা নিচু করে ডানিয়েল বলল, 'একশ' বার আমি তাই। আপনার কমপ্লিমেন্টগুলো মাথা পেতে নিলাম। তবে একটা কথা মনে রাখবেন, আমার অবাধ্য হলে ঐরকম বিপদে পড়তে হবে।'

সুভদ্রা হেসে ফেলল, 'আপনাকে নিয়ে পারা যায় না।'

'যাক হাঁড়ি মুখে তা হলে হাসি ফুটেছে। বাঁচলাম।' ডানিয়েল সশব্দে কৌতুককর ভঙ্গিতে নিশ্বাস ফেলল।

'বাঁদরামো আমার ভাল লাগে না।' সুভদ্রা মুখ ফিরিয়ে হাসতে লাগল।

একটু ভেবে ডানিয়েল বলল, 'যান, লক্ষ্মী মেয়ের মত ঐখানে গিয়ে আবার দাঁড়ান। ছবি আঁকব।'

নিরুপায়ের মত গিয়ে দাঁড়াল সুভদ্রা। ডানিয়েল কালিতে তুলি ডুবিয়ে কাগজে আঁচড় কাটতে লাগল। কিছুক্ষণ আঁকিবুঁকি টানার পর বলল, 'নাঃ—'

সুভদ্রা কাছে এল, 'কী না?'

'আপনার ছবি এখানে হবে না।'

'কেন?'

কেন'র উত্তর না দিয়ে ডানিয়েল বলল, 'কাল আপনার কোনো কাজ আছে?'

একটু ভেবে সুভদ্রা বলল, 'না।'

'কাল চার্চ থেকে এখানে এসে স্কুল করে আর ফিরতে হবে না। ভামুয়া বুড়িকে বলে রাখব, ওখানেই খাওয়া-দাওয়া করবেন। খাওয়ার পর আমার সঙ্গে বেরুবেন।'

'আচ্ছা।'

পরের দিন ভামুয়া বুড়ির বাড়িতে খাওয়ার পালা চুকিয়ে দু-জনে রওনা হল। পশ্চিমদিকের রাস্তাটা ধরে তারা চলেছে।

অনেকখানি যাবার পর সুভদ্রা বলল, 'কোথায় নিয়ে চলেছেন বলুন তো?'

ডানিয়েল বলল, 'পৌঁছুলেই দেখতে পাবেন।'

'কেন, আগে বললে ক্ষতি কী?'

'ক্ষতি কিছু নেই, তবু আপনাকে কৌতূহল দমন করতে হবে।'

'বেশ।'

তিন চারটে চড়াই-উতরাই পেরুবার পর হঠাৎ পাশ থেকে সুভদ্রা ডেকে উঠল, 'আচ্ছা—'

ডানিয়েল মুখ ফেরাল, 'কী বলছেন?'

'কতদিন হল আপনি এখানে এসেছেন মনে পড়ে?'

'পড়ে বৈকি। সেই ভাদ্র মাসে এসেছিলাম, আর এটা বৈশাখ। আঙুল গুনে ডানিয়েল বলল, 'ন' মাস চলছে।'

'ন' মাস পুরোও হয়নি, এসেছেন। অথচ—' এই পর্যন্ত বলে সুভদ্রা থামল।

'কী?' উৎসুক দৃষ্টিতে তাকাল ডানিয়েল।

'অথচ মনেই হয় না মাত্র এক'দিন এসেছেন। মনে হয় কতকাল ধরে আপনি এখানেই আছেন। আপনি এখানকারই মানুষ। এখানকার জলবাতাসে মানুষ হয়েছেন, যুগ-যুগ ধরে এ অঞ্চলের বাসিন্দাদের সঙ্গে আপনার আত্মার বন্ধন।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ।'

খানিকক্ষণ নীরবতা। এর মধ্যে আরো একটা টিলা পার হল দু-জনে। তারপর সুভদ্রাই আবার শুরু করল, 'যেভাবে আপনি এখানকার সেবা করে চলেছেন তাতে আমি খুব প্রেরণা পেয়েছি।'

বাধা দিয়ে ডানিয়েল বলে উঠল, 'উঁহু-উঁহু, ওটা আমার কথা। সেবাব্রতের প্রেরণা আমি পেয়েছি আপনার কাছে।'

'আপনি আমার কাছে কতটুকু কী পেয়েছেন তা আপনিই বলতে পারেন। তবে নিজের কথা আমি তো জানি।'

'কী কথা?'

'সেবার ব্যাপারে, মানুষের কল্যাণের ব্যাপারে বিশেষ একটা সীমা পর্যন্ত আমি এগুতে পেরেছি। আপনি তা পেরিয়ে অনেক—অনেকদূর পৌছেছেন। সেখানে আমার পক্ষে কোনোদিন পৌছুনো বোধহয় সম্ভব নয়। ইচ্ছে হয়—'

'কী ইচ্ছে হয়?'

এবার বিচিত্র চোখে তাকাল সুভদ্রা। তার মুখে মুহূর্তে অনেকগুলো রঙ পর পর খেলে গেল। অবশেষে যে রংটা স্থায়ী হল তার নাম রক্তাভা। চোখের তারায় যে দৃষ্টি ফুটেছে তা বুঝি ব্যাখা করা যায় না। নিতান্তই তা অনুভবের ব্যাপার। সুভদ্রা বলল, 'ইচ্ছে হয়, আপনি চিরদিন পাশে থাকেন। আপনি পাশে থাকলে সারা জীবন যে কোনো দুরূহ কাজ আমি করতে পারব।' বলতে বলতে তার স্বরে কাঁপন লাগল, প্রাণের অতল থেকে দুরন্ত আবেগ উঠে এসেছে যেন। সেই আবেগ অসংখ্য ঢেউয়ে সুভদ্রার সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছে।

সুভদ্রার পরিবর্তনটা এত আকস্মিক, এত স্পষ্ট, আবেগ-তরঙ্গে সে এত দোলায়িত যে কিছু বলতে পারল না ডানিয়েল। খানিক বিস্ময়ে, খানিক খুশিতে, খানিক শিহরণে সে যেন নিজের মধ্যে টলমল করতে লাগল।

আজ বোধহয় সুভদ্রা প্রকৃতিস্থ নেই। অলৌকিক কিছু একটা তার ওপর ভর করেছে। আচ্ছন্নের মত সে বলতে লাগল, 'আমরা যেভাবে আপনাকে জড়িয়ে ধরেছি তাতে আর নিস্তার নেই। এখান থেকে আপনি কোনোদিন আর ফিরে যেতে পারবেন না। এই কোঙ্কন উপকূলই আপনার শেষ গতি হয়ে দাঁড়াবে। না কি বলেন?'

ডানিয়েল হাসল, 'দেখা যাক।'

'এড়িয়ে গেলে চলবে না, উত্তর দিন।'

'কিসের উত্তর?'

'আপনি কি এখান থেকে চলে যাবেন?'

'ভবিষ্যতের কথা কে বলতে পারে। আপনাদের এখানে কোনোদিন যে আসব তাই কি কখনও ভেবেছিলাম? তবু দেখুন চলে এসেছি। আবার এখান থেকে কোথায় চলে যেতে হবে তাই বা কে বলবে।'

সুভদ্রা যেন জেদ ধরল। বলল, 'তবু আপনার ইচ্ছা অনিচ্ছা বলে তো একটা কথা আছে। এখানে থাকতে চান না কি সেই কথাটা স্পষ্ট করে বলুন।'

গম্ভীর গলায় ডানিয়েল বলল, 'আজ নয়, সে কথা আরেক দিন শুনবেন।'

পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সুভদ্রা, আর কিছু বলল না।

একসময় সমুদ্রের পারে বালুকাবেলায় সুভদ্রাকে নিয়ে পৌঁছে গেল ডানিয়েল।

সুভদ্রা বলল, 'এখানে কী?'

'মনপুরা গ্রামের ঐ ছোট্ট ব্যাকগ্রাউণ্ডে কাল আপনাকে ধরতে চেয়েছিলাম কিন্তু আঁকতে গিয়ে তাল কেটে যাচ্ছিল। ঐ ক্ষুদ্রতার মধ্যে আঁকলে আপনার মর্যাদা দেওয়া হ'ত না। সমুদ্রের বিশালতাকে পটভূমি করলে আপনার পক্ষে উপযুক্ত হয়। এই জন্যে আজ আপনাকে এখানে ধরে এনেছি।'

স্তুতিতে মাথা নিচু করল সুভদ্রা, কিছু বলল না।

বৈশাখ মাস। সময়টা দুপুর আর বিকেলের মাঝামাঝি একটা জায়গায় নিশ্চল হয়ে রয়েছে। আরব সাগরের রৌদ্রঝকিত লবণাক্ত জল যেন তলোয়ারের ফলার মত পায়ের তলায় বালুকাবেলা বেশ গরম। সান্ত্বনা শুধু এটুকু, হাওয়া আছে অফুরন্ত—উদ্দাম, প্রচণ্ড, বেপরোয়া হাওয়া। বৈশাখের দাহ তা অনেকখানিই জুড়িয়ে দিয়েছে।

বেলাভূমির একপাশে উঁচু পাথুরে টিলা, দূরে ধোঁয়ার দৈত্যের মত পশ্চিমঘাটের সারিবদ্ধ পাহাড়চূড়া।

টিলাটা দেখিয়ে ডানিয়েল বলল, 'ঐখানে গিয়ে দাঁড়ান। পটভূমি হিসাবে এক দিকে সমুদ্র, আরেক দিকে পাহাড় পাওয়া যাবে।'

'এক্ষুণি?'

'কেন, এখন আপত্তি আছে?'

'এতখানি পথ হেঁটে এলাম, একটু জিরিয়ে নিই।'

'আচ্ছা।'

খানিকক্ষণ বিশ্রামের পর টিলার ওপর গিয়ে দাঁড়াল সুভদ্রা। ডানিয়েল দূর আকাশের দিকে চিবুক ঈষৎ উঁচু করে তাকাতে বলল, ডান হাতখানা অভয় মুদ্রায় সামনের দিকে বাড়িয়ে দিতে বলল। হাত-পা-মাথা ডানিয়েল যেভাবে রাখতে বলল সেইভাবেই রাখল সুভদ্রা।

কালিতে তুলি ডুবিয়ে কাগজে রেখা টানতে লাগল ডানিয়েল। টানতে টানতে একেবারে ধ্যানস্থ হয়ে গেল। ডানিয়েলের ধ্যান যখন ভাঙল তখন সূর্যটা আরো নিচে নেমে আরব সাগরেব আয়নায় তার মুখ দেখছে। রোদের রং এখন সোনালী হলুদ, তার দাহও জুড়িয়ে এসেছে।

সুভদ্রা টিলার ওপর দাঁড়িয়েই ছিল। ডানিয়েল তাকে ডাকল।

সুভদ্রা নেমে এসে সাগ্রহে জিজ্ঞেস করল, 'হয়ে গেছে?'

নিঃশব্দে তার দিকে ছবিটা বাড়িয়ে দিল ডানিয়েল।

ছবিটা চমৎকার। সুভদ্রা আর পশ্চিমঘাটের বিশালতার সঙ্গে সুভদ্রাকে একাকার করে দিয়েছে ডানিয়েল। প্রকৃতির ঐ বিস্ময় দুটির মতই এখানে সুভদ্রা গভীর, মহৎ, মহিমাময়ী। দেখতে দেখতে মুগ্ধ হয়ে গেল সুভদ্রা। মুগ্ধ এবং অভিভূত। এমন মর্যাদা এমন মহিমা আর কেউ তাকে দেয় নি।

পাশ থেকে ডানিয়েল বলল, 'কেমন লাগল ছবিটা?'

কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাকাল সুভদ্রা। গাঢ় স্বরে বলল, 'এত বড় করে কেউ কোনোদিন আমাকে দেখেনি।'

'একটুও বড় করিনি। আপনি যা, ঠিক তাই এঁকেছি।'

সুভদ্রা উত্তর দিল না। তার চোখ আবার ছবিটিতে গিয়ে আটকে গেল।

খানিকক্ষণ পরে ডানিয়েল আবার বলল, 'শুধু কালি দিয়ে এঁকেছি, যদি অন্য রঙ পেতাম ছবিটা আরো ভাল হ'ত।'

সুভদ্রা বোধ হয় ডানিয়েলের কথা শুনতে পায়নি, ছবির মধ্যেই সে মগ্ন হয়ে আছে।

একটু পর ডানিয়েল বলল, 'বিকেল হয়ে গেল, এখনই গাঁয়ে ফিরবেন?'

'আপনার ইচ্ছেটা কি?' ছবি থেকে মুখ তুলে মৃদু হাসল সুভদ্রা।

'আমার ইচ্ছে তো বিরাট কিন্তু তা পূর্ণ হবে কি?'

'নিশ্চয়ই হবে।'

'অভয় দিলেন?'

'দিলাম।'

'তা হলে বলি, আপনার পাশে বসে আজ সূর্যাস্ত দেখার বড় সাধ হচ্ছে।'

বিচিত্র ভ্রুভঙ্গে তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিল সুভদ্রা। তারপর বরদানের ভঙ্গিতে আস্তে আস্তে বলল, 'সাধ যখন জেগেছে তখন সেটা মেটাতেই হবে।'

বিপুল উৎসাহে ডানিয়েল বলল, 'চলুন, ঐ টিলাটার ওপরে গিয়েই বসি।'

'চলুন।'

যে টিলায় সুভদ্রাকে দাঁড় করিয়ে ডানিয়েল ছবি এঁকেছিল সেখানে গিয়ে দু-জনে পাশাপাশি বসল। সূর্যের রং দ্রুত বদলে যাচ্ছে। একটু আগে সেটা ছিল সোনালী-হলুদ, এখন তাতে রক্তাভা লেগেছে। সমুদ্র আজ বেশ শান্তই। বালুকাবেলার পাশে যে সব ক্ষয়ে-যাওয়া পাথর ইতস্তত ছড়িয়ে আছে, ছোট ছোট হাল্কা ঢেউ তাদের ফাঁকে ফাঁকে ঢুকে পড়ে খেলা করে যাচ্ছে। সূর্যের রক্তিমা পশ্চিম দিগন্তে এই মুহূর্তে প্রতিফলিত। মনে হচ্ছে ওখানকার বর্ণবাহার যেন সত্যি নয়, স্বপ্নময় এক বিভ্রম।

অনেকক্ষণ দু-জনে তাকিয়ে রইল। একসময় ডানিয়েল আস্তে আস্তে বলল, 'আজকের দিনটা আমার চিরকাল মনে থাকবে।'

ডানিয়েলের কণ্ঠস্বরে ঘোরের মত কিছু একটা ছিল। সেটা বুঝি পার্শ্ববর্তিনীর মধ্যেও ছড়িয়ে গেল। সে বলল, 'আমারও।'

ডানিয়েল বলল, 'আজ আপনাকে একটা উপহার দিতে চাই।'

'কী?'

যে ছবিটা আঁকলাম—'

ছবিটা সুভদ্রার হাতেই ছিল। ডানিয়েল বলল, 'ওটা একবার দিন তো।'

সুভদ্রা সেটা দিতেই তুলি দিয়ে তার তলায় ডানিয়েল লিখল, 'উইদ লাভ অ্যাণ্ড রেসপেক্ট—এ্যান আননোন ফরেনার।' লেখা হলে ছবিটা সুভদ্রাকে ফিরিয়ে দিল। লেখাটার দিকে একবার তাকিয়ে সুভদ্রা বলল, 'এ কি!'

'কী হল?'

'আননোন ফরেনার লিখেছেন যে! আপনি কি আননোন?'

তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল না ডানিয়েল। সুবিশাল সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্কের মত বলল, 'আননোন ছাড়া কি, আমার কতটুকুই বা আপনি জানেন!'

কিছুটা অবাক হয়ে সুভদ্রা বলল, 'কেন, আপনি নিজের কথা সবই তো বলেছেন।'

ডানিয়েল চুপ করে রইল।

সুভদ্রা আবার বলল, 'তা ছাড়া বলবার দরকারই বা কি। আপনাকে যা বুঝবার যা জানবার তা জেনে-বুঝে নিয়েছি।'

ডানিয়েল হঠাৎ চোখ ফিরিয়ে বলল, 'ঐ ছবিটা নষ্ট করবেন না। যদি কখনও এখান থেকে আমায় চলে যেতে হয় ওটা দেখলে আমার কথা মনে পড়বে। মনে পড়বে, একটা অসভ্য বাঁদর বিদেশী ক'দিনের জন্য এসে হাড় জ্বালিয়ে গেছে।'

কিছুটা অস্থির সুরে সুভদ্রা বলল, 'আজ বারে বারে ঐ এক কথাই বলছেন কেন?'

'কোন কথা বলুন তো?'

'এখান থেকে চলে যাওয়ার কথা।'

ডানিযেল বলল, 'যাবোই যে, সে কথা বলিনি। যদি যাই—'

বাধা দিয়ে সুভদ্রা বলল, 'না—'

'কী?'

ঘোরের মধ্যে থেকে সুভদ্রা বলে উঠল, 'আমি কি বলতে চাই বোঝেন না?' স্বর আস্তে আস্তে বুজে এল তার।

ডানিয়েল অনেকখানি ঝুঁকল। সুভদ্রার চোখে চোখ রেখে ফিসফিসিয়ে বলল, 'আমি চলে গেলে আপনার খুব কষ্ট হবে, না?'

সুভদ্রা উত্তর দিল না। হঠাৎ মাথাটা নুইয়ে পড়ল তার। তারপর নিজের অজ্ঞাতসারে, যেন অপার সম্মোহনের ভেতর থেকে একটা হাত বাড়িয়ে ডানিয়েলের হাত ধরল সে।

ডানিয়েল দেখল, সন্ন্যাসিনীর আবরণের ভেতর থেকে একটি বিস্মিত শিহরিত কুহকিত তরুণী তার সমস্ত আকাঙ্খা নিয়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। নিজেও কেমন যেন আচ্ছন্ন বোধ করতে লাগল সে।

গাঢ় চাপা গলায় ফিস ফিস করে ডানিয়েল ডাকল, 'সুভদ্রা—'

সুভদ্রা চুপ। তার মাথা আরো নুয়ে পড়েছে।

ডানিয়েল তার কানের কাছে মুখ এনে বলল, 'আমি যাব না, কোনোদিন কোঙ্কন উপকূল ছেড়ে কোথাও যাব না।' তার রক্তস্রোতে শিরশিরিয়ে কি এক প্রতিক্রিয়া যেন ঘটে গেল। অস্তিত্ব বুঝিবা আর নিজের বশে রইল না। সূর্যাস্তের বর্ণবহুল শোভা, আরবসাগর, ধোঁয়ার দৈত্যের মত পশ্চিমঘাটের সারি সারি পাহাড়চূড়া— কিছুই চোখের সামনে থাকল না। আত্মবিস্মৃতের মত, পরিবেশ-বিস্মৃতের মত জগৎ-সংসার নিরাকার হয়ে যাওয়া এই মুহূর্তে হাত বাড়িয়ে সুভদ্রাকে আকর্ষণ করল ডানিয়েল। তারপর অর্বাচীন পরিণামে-অচেতন বিদেশী তার ঠোঁটে ঠোঁট রাখল।

মুহূর্তমাত্র। পরক্ষণেই ডানিয়েলকে সবলে ঠেলে দিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত সরে বসল সুভদ্রা। তারপর দু-হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠল, 'এ আপনি কী করলেন, এ আপনি কী করলেন! আমি যে সন্ন্যাসিনী!'

ডানিয়েল বিমূঢ়, অপ্রস্তুত। অপরাধীর মত সে দেখতে লাগল অবিশ্রান্ত কান্নায় সুভদ্রার পিঠটা ফুলে ফুলে উঠছে। দ্বিতীয় বার তাকে কাছে টানার বা কিছু বলার সাহস হল না ডানিয়েলের। বার বার মনে হতে লাগল, আত্মবিস্মৃতির ঘোরে জঘন্য একটা অন্যায় করে ফেলেছে। অনুতপ্ত অনুশোচনায়-দগ্ধ ডানিয়েল নিজেকে অসংখ্য বার ধিক্কার দিতে লাগল।

সেদিন আরবসাগরের বেলাভূমি থেকে সূর্যাস্তের অনেক পর দু-জনে ফিরে এসেছিল। ফেরার পথে কেউ একটা কথাও বলেনি, পরস্পরের দিকে তারা তাকাতে পর্যন্ত পারেনি। সৌভাগ্যই বলতে হবে, তখন রাতের অন্ধকার ছিল। একজন আরেকজনের কাছে ছিল অস্পষ্ট।

প্রতি পদক্ষেপে ডানিয়েলের ইচ্ছা হচ্ছিল, আত্মহত্যা করে। সুভদ্রার মনোভাব বোঝা যাচ্ছিল না। তবে ডানিয়েলের চাইতে খুব ভাল কিছু যে সে ভাবছিল, এমন মনে হওয়ার কোনো কারণ নেই। নিঃশব্দে, এক মর্মদাহী যন্ত্রণার মধ্যে সারাটা পথ পাড়ি দিয়েছিল তারা।

সেদিন ফেরার পর থেকে সুভদ্রার সঙ্গে আর দেখা নেই। তিন দিন হল সে মনপুরায় আসছে না। সুতরাং স্কুলও বন্ধ।

ডানিয়েল বুঝতে পারল, গীর্জাবাসিনী মেয়েটা সঙ্কোচে কুণ্ঠায় এত ম্রিয়মান হয়ে আছে যে তার কাছে মুখ দেখাতে পারছে না। ডানিয়েলের নিজেরও আত্মপীড়নের

শেষ ছিল না। তবু সে ভাবল, সুভদ্রার সঙ্কোচ এবং কুণ্ঠা মুছে দেবে। সেই উদ্দেশ্যে একদিন ভোরবেলা সে চার্চে রওনা হল।

সুভদ্রাকে চার্চেই পাওয়া গেল। প্রথমটা কিছুতেই সে মুখ তুলবে না। কুণ্ঠিত সুরে ডানিয়েল জিজ্ঞেস করল, 'মনপুরায় যান না কেন?'

কোনরকমে আধফোটা গলায় সুভদ্রা জবাব দিল, 'এমনি, শরীরটা ক'দিন থেকে ভাল নেই তাই—'

ডানিয়েল বুঝতে পারল, সুভদ্রা মিথ্যে বলছে। বলল, 'আজ কেমন আছেন?'

তার সামনে সুভদ্রা কথা বলতে পারছিল না। কথার পিঠে কিছু বলতে হয় তাই উত্তর দিল, 'ঐ একরকম।'

আপনার ছাত্র ছাত্রীরা কিন্তু রোজ এসে ঘুরে যাচ্ছে। কবে স্কুলে যাবেন?'

'শিগগিরই যাব।'

'হ্যাঁ, তাড়াতাড়িই আসবেন।'

এরপর দু'জনের কথা যেন ফুরিয়ে গেল। কারো কিছু বলবার রইল না।

অনেকক্ষণ পর কোত্থেকে হাতড়ে হাতড়ে কিছু কথা যেন কুড়িয়ে পেল ডানিয়েল। বলল, 'সেদিনকার কথা আপনি ভুলে যান, ওটাকে একটা দুর্ঘটনা বলেই মনে করবেন। তার বেশি গুরুত্ব ওর নেই। তা ছাড়া আত্মগ্লানি থাকার তো কথাও নয় আপনার। কেননা—'

সুভদ্রা কিছু বলল না, তবে তার দিকে তাকিয়ে অনুভব করা গেল ডানিয়েলের কথার শেষাংশ শোনার জন্য সে উৎসুক হয়ে আছে।

ডানিয়েল বলল, 'সেদিন চার্চে ফিরে নিশ্চয়ই অল্টারে গিয়ে পরম পিতার কাছে প্রার্থনা করেছিলেন। সে প্রার্থনা ব্যর্থ হয় নি। প্রভু অবশ্যই আপনাকে ক্ষমা করেছেন।'

সুভদ্রা চমকে উঠল, 'আমি অল্টারে গিয়ে প্রার্থনা করেছিলাম, আপনি কেমন করে জানলেন?'

'এটা কমনসেন্সের কথা। একজন সন্ন্যাসব্রতিনী আত্মগ্লানি দূর করতে এ-ই করে থাকে।'

এর পর দু-চারটে সাধারণ কথা হল। মনপুরায় যাওয়ার জন্য বার বার সুভদ্রাকে অনুরোধ করে একসময় বিদায় নিল ডানিয়েল।

চার্চের সামনের দিকে সেই ঘাসের জমিটায় আসতেই রেভারেণ্ড আপ্তের সঙ্গে দেখা। সম্ভবত তিনি বাইরে কোথাও গিয়েছিলেন। এইমাত্র ফিরলেন। ডানিয়েলকে দেখে তিনি উৎফুল্ল। বললেন, 'কতক্ষণ এসেছেন?'

ডানিয়েল বলল, এই খানিকক্ষণ।'

কুশল বিনিময়ের পর রেভারেণ্ড জিজ্ঞেস করলেন, 'তারপর চার্চে কি মনে করে? কোনো দরকার ছিল, না এমনি?'

'মিস জোসেফের কাছে এসেছিলাম। উনি ক'দিন মনপুরায় যাচ্ছেন না তাই—'

'ও, হ্যাঁ হ্যাঁ—' রেভারেণ্ড আপ্তে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, 'ভাল কথা। মেয়েটার দু-তিনদিন ধরে কী যেন হয়েছে! খাচ্ছে না, একেবারে উপোষ দিয়ে থাকছে। আপনি কিছু জানেন?'

থতমত খেয়ে গেল ডানিয়েল। জড়িত সুরে কী বলল বোঝা গেল না। তারপর রেভারেণ্ড আপ্তেকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে বিদায় নিয়ে একরকম পালিয়েই গেল।

আরো দু-দিন পর মনপুরায় এল সুভদ্রা। তখনও তার সঙ্কোচ পুরোপুরি কাটেনি। সেটা সম্পূর্ণ কেটে গিয়ে তার স্বাভাবিক হতে এক সপ্তাহ লেগে গেল। ডানিয়েল বাঁচল যেন।

আগের মত স্বচ্ছন্দ হওয়ার পর সুভদ্রা একদিন বলল, 'আপনাকে একটা দায়িত্ব নিতে হবে।'

'কী?' ডানিয়েল জানতে চাইল।

'আপনার তো কাজ নেই এখন। এদিকে স্কুলে এত ছেলেমেয়ে নিয়ে আমি ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছি। ভাবছি ভাগাভাগি করে ক্লাস করব।'

'ওরে বাবা, আমার দ্বারা মাস্টারি সম্ভব না। তা ছাড়া—'

'কী?'

আপনি তো জানেন, ছেলেমেয়েগুলোর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা কী? পড়াতে গেলে ওরা আমাকে মানবেই না।'

একটু চিন্তা করে সুভদ্রা বলল, 'তা একটা কথা বটে। আচ্ছা থাক। তবে—'

'কী?'

'সহজে পার পাবেন না। অন্য একটা ভার আপনাকে দেব।'

'কিসের ভার?'

'এখানে গ্রাম-পঞ্চায়েত আছে জানেন তো? এতদিন আমি তার সভাপতি ছিলাম, এবার থেকে আপনাকে সভাপতির দায়িত্ব নিতে হবে।'

'তার মনে এখানকার নানা মামলার বিচার টিচার করতে হবে?'

'হ্যাঁ।'

'আমি কি পারব?'

'আমি পারলে আপনিও পারবেন।'

ডানিয়েলের মনে হল শতপাকের বন্ধনে আবার তাকে জড়াতে চাইছে সুভদ্রা। এই মেয়েটিই যে ক'দিন আগে একটি চুম্বনের জন্য নিদারুণ আত্মদহনে উপবাস করে, অল্টারে প্রার্থনা জানিয়ে নিজের শুদ্ধি ঘটিয়েছিল তা যেন বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না। সুভদ্রাকে কেমন যেন রহস্যময়ী মনে হতে লাগল তার। একটু অন্যমনস্কের মত বলল, 'বেশ, আপনি যখন পঞ্চায়েতের দায়িত্ব নিতে বলছেন তখন নেব। কিন্তু আমার বিচার গ্রামের লোকেরা মানবে কি?'

'নিশ্চয়ই মানবে।' কণ্ঠস্বরে সবটুকু দৃঢ়তা ঢেলে উচ্চারণ করল সুভদ্রা।

বৈশাখের শেষাশেষি কোঙ্কনবাসী সুস্থ সবল নারীপুরুষগুলি সাতারা জেলা থেকে ফিরে এল। কার্পাস চাষের জন্য সেখানকার মাটি চৌরস করার কাজ শেষ হয়েছে। তারা ফিরে আসার দিন তিনেক পরেই আড়তদারেরা খবর দিয়ে গেল, সমুদ্র আবার উদার হয়েছে, তার বদ্ধ মুঠি খুলে গেছে। অর্থাৎ প্রাণধারণের অনিশ্চয়তা আর উঞ্ছবৃত্তি এ বছরের মত এখানকার বাসিন্দাদের ঘুচে গেল।

মাঝখানের কিছুদিন এখানকার জীবনযাত্রা তার চিরাচরিত কক্ষপথ থেকে এক ধাক্কায় যেন বাইরে ছিটকে গিয়েছিল। আবার সেটা তার স্বাভাবিক খাতে ফিরে আসতে শুরু করেছে।

আড়তদারেরা খবর দিয়ে যাওয়ার পরদিন থেকেই তারা আবার সমুদ্রে অভিযান আরম্ভ করল। অবশ্য ডানিয়েল তাদের সঙ্গে যাচ্ছে না। দুর্ভিক্ষের সময় লুকিয়ে লুকিয়ে মাছমারারা মাছের ওজন লিখে না আনার শর্তে টাকা ধার এনেছিল। কাজেই ডানিয়েল গেলে একটা গোলমাল হবে। তাই এখনই সে যাবে না। কীভাবে শর্তটাকে উল্টে দিয়ে নতুন করে আড়তদারদের যে প্রবঞ্চনা শুরু হয়েছে তা ঠেকানো যায়, আপাতত মনপুরায় বসে তাই ভাবছে ডানিয়েল।

এভাবে মাত্র দিন তিনেক যাওয়ার পর কোলাপুর থেকে রিলিফের ইনস্পেকসন এসে পড়ল। তিনজনের সংক্ষিপ্ত একটি দল। সে দলে আছেন একজন পুলিশ অফিসার এবং তাঁদের আর্দালী।

ডানিয়েল স্থির করেছিল, রিলিফের ব্যাপারে তাগাদা দেবার জন্য সে কোলাপুর যাবে। কিন্তু মাঝখানে নানা ঝামেলায় যাওয়া হয়ে ওঠে নি।

যাই হোক, কোঙ্কনের এই প্রান্তে আসতে গেলে প্রথমেই পড়ে মনপুরা গ্রাম। অতএব দলটা মনপুরাতেই এসে পড়ল।

তখন সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। ছেলেদের নিয়ে হুল্লোড় করছিল ডানিয়েল। এমন সময় ভামুয়া বুড়ি ছুটতে ছুটতে এসে দলটার খবর দিল। কি একটা দরকারে সে গ্রামের পুব দিক গিয়েছিল, সেখানে সাহেবমতন তিনটে লোককে দেখে হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এসেছে।

কী উদ্দেশ্যে সাহেব লোকগুলো আসছে তা অবশ্য বলতে পারল না ভামুয়া বুড়ি। অতএব কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে পায়ে পায়ে পুব দিকে হাঁটতে লাগল ডানিয়েল। তার পিছু পিছু শিশুদের বাহিনীও চলল।

দুই টিলার মধ্যবর্তী সেই সিংদরজাটা—একদিন যেখানে এসে ডানিয়েল দাঁড়িয়েছিল, সেইখানে দলটার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। দ্রুত পা ফেলে তাদের সামনে চলে এল ডানিয়েল। প্রশ্নের ভঙ্গিতে বলল, 'আপনারা?'

পশ্চিমঘাটের এই সুদূর প্রান্তে কালো কালো অর্ধউলঙ্গ শিশুর দলে একটি জলজ্যান্ত বিশুদ্ধ সাহেবের দেখা পাওয়া যাবে, এ ছিল যেন অভাবনীয়। দলটা সবিস্ময়ে ডানিয়েলের দিকে তাকিয়ে রইল।

তিনজনের মধ্যে প্রথম জন বেশ বর্ষীয়ান, প্রৌঢ়ই বলা যায়। চেহারা বয়সের ভারে বেশ স্থূল, চুল কাঁচাপাকা। মাংসল গোলালো মুখ। চোখে কেমন একটা শিকারী ভাব। দ্বিতীয় জন যুবক, দীর্ঘদেহ ছিপছিপে সুপুরুষ। দু'জনের পরনে শার্ট আর ট্রাউজার। তৃতীয় জনের পরিচয় তার পোশাকেই লেখা আছে। আধময়লা পাজামা আর হাফ শার্ট এবং সস্তা রবারের স্যাণ্ডেল বুঝিয়ে দিচ্ছে সে আর্দালী বেয়ারা জাতীয় কেউ।

বিস্ময় কিছু থিতিয়ে এলে প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি, মানে—'

তাঁর কথা শেষ হবার আগে ডানিয়েল বলে উঠল, 'আমার পরিচয় থাক। আপনাদের কথা বলুন। মনে হচ্ছে, হয় পথ ভুলে চলে এসেছেন। নয় কোনো দরকারে। আপনাদের কোন সাহায্যের প্রয়োজন আছে কি?'

'ঠিকই ধরেছেন, আমরা একটা ইনস্পেকসনের ব্যাপারে এসেছি।'

'কিসের ইনস্পেকসন?'

'রেভারেণ্ড আপ্তে নামে এক মিশনারি ভদ্রলোক কোলাপুরে গিয়ে খবর দিয়ে এসেছিলেন এখানে দুর্ভিক্ষ লেগেছে। সেই ব্যাপারেই এসেছি।'

'আশ্চর্য!'

'আশ্চর্য কেন?'

'দুর্ভিক্ষ তো লেগেছিল সেই পোষ-মাঘ মাসে। তারপর মহামারী হয়ে কত লোক মরে গেল। এতদিনে আপনাদের টনক নড়েছে!'

বিব্রত মুখে ভদ্রলোক বললেন, 'কী করব বলুন। হেড কোয়ার্টার থেকে নির্দেশ না আসা পর্যন্ত তো আমরা আসতে পারি না।'

ডানিয়েল বলল, 'আপনাদের পরিচয় জানতে পারি কি?'

'বিলক্ষণ। আমার নাম মাধবরাও চবন, পুলিশ অফিসার।' প্রৌঢ় তাঁর সঙ্গী যুবকটিকে দেখিয়ে বললেন, 'উনি ব্লক ডেভলাপমেন্ট অফিসার, নাম বিনায়ক ঘাটে।' তৃতীয় জনকে দেখিয়ে বললেন, 'আর ও আমাদের আর্দালী হরিবিষ্ণু।'

ভদ্রলোক অর্থাৎ মাধবরাও কথা বলছেন বটে, তবে তাঁর দৃষ্টি সর্বক্ষণই ডানিয়েলের ওপর নিবদ্ধ। তাঁর চোখ এত তীব্র, এত প্রখর আর এত গভীরসঞ্চারী যে ডানিয়েলের হাড়-মাংস ফুঁড়ে ভেতরে ঢুকে তন্ন তন্ন করে সব দেখে নিচ্ছে। ডানিয়েল অস্বস্তি বোধ করতে লাগল।

মাধবরাও আবার বলে উঠলেন, 'আজকের রাতটা এখানে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। কাল ইনস্পেকসন করে বিকেলের দিকে ফিরে যাব।'

ডানিয়েল ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, আসুন।'

দলটাকে নিয়ে ডানিয়েলরা গ্রামের দিকে হাঁটতে শুরু করল।

মাধবরাও ডানিয়েলের গা ঘেঁষে চলেছেন। যেতে যেতে বললেন, 'কোলাপুর থেকে এ কি একটুখানির পথ! না একটা গাড়ি, না একটা ঘোড়া! দু-দিন ধরে খালি হাঁটছি আর হাঁটছি। এর চাইতে উত্তর মেরুতে পাড়ি দেওয়া অনেক সোজা বোধ হয়—না কি বলেন?' তিনি হাসলেন।

ডানিয়েল কিছু বলল না, মাধবরাওয়ের দিকে তাকালও না। তবে অনুভব করল, তাঁর দৃষ্টি তার সর্বাঙ্গে বিদ্ধ হয়েই আছে।

খানিকটা চলার পর গ্রামের কাছাকাছি এসে মাধবরাও হঠাৎ ডাকলেন, 'আচ্ছা—'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও মুখ ফেরাল ডানিয়েল, 'কী বলছেন?'

'আপনাকে কিন্তু এদেশের লোক মনে হয় না।'

'আমি এদেশের লোক নই।'

মাধবরাও আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে এলেন। চারিদিক ভাল করে দেখে গলার স্বর খাদে নামিয়ে দিলেন। ফিস ফিস করে বললেন, 'তবে কী? জার্মান না ইংরেজ?'

অস্বস্তিটা ছিলই, এবার কেমন যেন সন্দেহ দেখা দিল। তবে সে-সব গোপন করে ঈষৎ বিরক্ত সুরে ডানিয়েল বলল, 'ইংরেজ, কেন?'

ডানিয়েলের বিরক্তিটা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করলেন মাধবরাও। হাসি-হাসি মুখে বললেন, 'কিছু যদি মনে না করেন আপনার নামটা জানতে ইচ্ছা করছে।'

ডানিয়েল একবার ভাবল, যা হোক একটা নাম বলে দেবে। তার পরেই খেয়াল হল, মিথ্যে বলার উপায় নেই। গ্রামের যে কোন লোককে জিজ্ঞেস করলেই তার আসল নামটা জানা হয়ে যাবে। তাতে মাধবরাও নিশ্চয়ই সন্দিগ্ধ হয়ে পড়বেন। ডানিয়েলের মনে হল, গোড়াতেই ভুল হয়ে গেছে। এখানে এসে প্রথমেই যদি সে আসল নামের বদলে অন্য একটা নাম বলত! কিন্তু না, সে ভুল শুধরে নেবার উপায় আজ আর নেই। অগত্যা বলতেই হল, 'আমার নাম জন ফ্রান্সিস ডানিয়েল।' মাধবরাওয়ের চোখে মুহূর্তের জন্য বিদ্যুত খেলে গেল কি! তিনি বললেন, 'এখানে কতদিন আছেন?'

'সে অনেকদিন।' ভাসা-ভাসা একটা উত্তর দিয়ে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল ডানিয়েল। তবে আড় চোখের দৃষ্টিটা রইল মাধবরাওয়ের দিকেই।

মাধবরাও লোকটা বোধ হয় জোঁকেদের স্বজাতি। ডানিয়েলের বিরক্তি, অনিচ্ছা—কিছুই গ্রাহ্য করছেন না। বললেন, 'তবু?'

'তিন চার বছর হবে।'

ঠোঁট কুঁচকে কেমন করে যেন একটু হাসলেন মাধবরাও। মনে হল, ডানিয়েলের কথাটা বিশ্বাস করেন নি। বললেন, 'আচ্ছা আপনি এখানে এলেন কি করে?'

যে বিরক্তিটা এতক্ষণ ছিল আভাসে-ইঙ্গিতে এবার সেটাকে একটানে মেলে ধরল ডানিয়েল। বলল, 'আপনি তো এসেছেন এখানকার দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে ইনস্পেকশন করতে। আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে আপনার এত কৌতূহল কেন?'

'কৌতূহলটা স্বাভাবিক কিনা আপনি নিজেই বিচার করুন।'

ডানিয়েল উত্তর দিল না।

মাধবরাও বলতে লাগলেন, 'বিদেশী মানুষ আপনি। এখানে, অনেক দূরের এই গ্রামে তিন চার বছর ধরে আছেন। কেমন করে এখানে এলেন, কিভাবে আপনার দিন কাটছে, এ সব জানতে ইচ্ছে করে না?'

ডানিয়েল চুপ।

মাধবরাও আরো কি বলতে যাচ্ছিলেন সেই সময় দলটা গ্রামের ভেতর এসে পড়ল।

গঙ্গাবাঈ মারা যাবার পর তার বাড়িটা ফাঁকা পড়েছিল। ডানিয়েল মাধবরাওদের সোজা সেখানে নিয়ে তুলল। তারপর তাদের আপ্যায়ন এবং সমাদরের ব্যবস্থা করে ফেলল।

এই মুহূর্তে মনপুরা গ্রামে সুস্থ সমর্থ পুরুষ মানুষ একটিও নেই। তারা সমুদ্রে গেছে। অতএব গণেশদের বাড়ি থেকে রতি আর বুড়ো যশোবন্তের মেয়েকে ডেকে নিয়ে এল।

ইতিমধ্যে সন্ধ্যে নেমে গেছে। রতিরা এসে লণ্ঠন জ্বালল, হাত-পা ধোওয়ার জল এনে দিল। মাধবরাওদের আরাম করে বসার জন্য পরিপাটি করে একখানা বিছানা পেতে দিল। ডানিয়েলের নির্দেশে রতিরা এসব করে গেল যন্ত্রবৎ।

সব হয়ে গেলে ডানিয়েল বলল, 'আপনারা এবার হাত-মুখ ধুয়ে নিন।'

মাধবরাও বললেন, 'স্নান করতে পারলে ভাল হ'ত।'

'স্নান করবেন? আচ্ছা ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।'

কিছুক্ষণের মধ্যে রতি, যশোবন্তের মেয়ে এবং ডানিয়েল স্বয়ং আরো জল নিয়ে এল। তারপর ডানিয়েল বলল, 'এখানে বাথরুম নেই কিন্তু। খোলা জায়গাতেই স্নান করতে হবে।' অনেকদিন আগে এখানে প্রথম যেদিন সে আসে সেদিন বাথরুম নিয়ে সুভদ্রার সঙ্গে যে কথা হয়েছিল তা স্মরণ করে এই মুহূর্তে বেশ আমোদই অনুভব করল ডানিয়েল।

মাধবরাও বললেন, 'ঠিক আছে। খোলা জায়গায় স্নান করতে অসুবিধে হবে না।'

সব ব্যবস্থা নিখুঁত। স্নান সেরে মাধবরাওরা আয়না চিরুনি হাতের কাছেই পেলেন। তিনখানা পরিষ্কার ধুতি নিয়ে এসেছিল রতিরা। মাধবরাওরা অবশ্য তা পরলেন না। নিজেদের পরিত্যক্ত শার্ট ট্রাউজারই পরে নিলেন।

আবার গিয়ে তাঁরা বিছানায় বসার আগেই রতিরা তিনটে থালায় খাবার নিয়ে এল। খাবার আর কি! কিছু শশা, ভেলপুরী আর চা।

কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে ডানিয়েল বলল, 'এরা খুব গরীব। এই দিয়েই আপনাদের জলযোগ সারতে হবে।'

মাধবরাও বললেন, 'আপনার সঙ্কোচের কোনো কারণ নেই। এখানে এসে এই যা পেলাম তা কল্পনাও করতে পারিনি। আপনি ছিলেন বলেই এ সম্ভব হল। আমরা তো ভেবেছিলাম না খেয়ে, না দেয়ে, বিনা স্নানে থাকতে হবে। না কি বলেন ঘাটে সাহেব?' বলে পার্শ্ববর্তী যুবক বি.ডি. অফিসারের দিকে তাকালেন। বিনায়ক ঘাটে মাথা নেড়ে বললেন, 'ঠিকই বলেছেন।'

এরপর কিছুক্ষণ নীরবতা।

একসময় মাধবরাওই স্তব্ধতা ভাঙলেন, 'আচ্ছা মিস্টার ডানিয়েল—'

'বলুন—' ডানিয়েল তাকাল।

'রেভারেণ্ড আপ্তে বলে যে ভদ্রলোক ইনস্পেকসানের জন্যে কোলাপুর গিয়েছিলেন তিনি কোথায়?'

'তিনি এখান থেকে কিছু দূরে একটা চার্চে থাকেন। আজ রাতেই তাঁকে খবর দেব। কাল সকালে তিনি এসে পড়বেন।'

একটু চুপ। তারপর মাধবরাও ডানিয়েলের চোখে চোখ রেখে বললেন, 'এ গ্রামের ওপর আপনার খুব ইনফ্লুয়েন্স আছে, না?'

'কিভাবে বুঝলেন?'

'দেখেশুনে।' মাধবরাও হাসলেন।

'ইনফ্লুয়েন্স আছে কিনা বলতে পারছি না, তবে এখানকার মানুষ আমাকে খুব ভালবাসে। আমি কিছু করতে বললে কেউ 'না' করে না।' ডানিয়েল বলল।

একটু কি চিন্তা করে মাধবরাও বললেন, 'আচ্ছা, আপনি তো বিদেশী মানুষ। তা এখানে এলেন কী করে তা তো তখন বললেন না।'

'কিছু মনে করবেন না, আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে আলোচনা পছন্দ করি না। কাজেই ও প্রসঙ্গ থাক।'

রাত্রিবেলা খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা এ বাড়িতেই করে দিল ডানিয়েল। তিন জনের জন্য তিনখানা বিছানা পাতিয়ে দিল।

মাধবরাওদের খাওয়া-দাওয়া শেষ হতে না হতে মাছমারারা সমুদ্র থেকে ফিরে এল। তাদের একজনকে চার্চে পাঠিয়ে দিল ডানিয়েল। রেভারেণ্ড আপ্তে এবং সুভদ্রা যাতে সকালেই চলে আসে সেজন্য জরুরী একখানা চিঠিও লিখে দিল।

মনপুরা গ্রামের লোকদের বলে দেওয়া হল, তারা যেন কাল সমুদ্রে না যায়। কয়েকজনকে পাঠিয়ে আশেপাশের গ্রামেও খবর দেওয়া হল, সেখানকার বাসিন্দারাও যেন কালকের মত মাছ ধরা স্থগিত রেখে যে যার ঘরে থাকে।

পরের দিন সূর্য ওঠার আগেই রেভারেণ্ড আপ্তে আর সুভদ্রা এসে পড়ল। তাদের সঙ্গে নিয়ে মাধবরাওদের কাছে গেল ডানিয়েল।

কালই জলটল রেখে যাওয়া হয়েছিল। ইতিমধ্যে মাধবরাওরা উঠে হাত-মুখ ধুয়ে নিয়েছেন। রতিদের বলে রাখা হয়েছিল, তারা চা দিয়ে গেছে।

ডানিয়েল মাধবরাওদের সঙ্গে রেভারেণ্ড আপ্তে এবং সুভদ্রার পরিচয় করিয়ে দিল। নমস্কার বিনিময়ের পর মাধবরাও বললেন, 'রেভারেণ্ড আপ্তেকে আমি চিনি, ডিস্ট্রিক্ট কমিশনারের অফিসে বার দুই তিন ওঁকে দেখেছি।'

রেভারেণ্ড আপ্তে বললেন, 'তাই নাকি? আমি কিন্তু আপনাকে মনে করতে পারছি না।'

'তখন তো আমাদের পরিচয় হয়নি। তবে আপনার চেহারাখানা এমন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যে সহজে ভোলা যায় না। অবশ্য আপনার নামটা জানতাম না।'

রেভারেণ্ড আপ্তে কিছু বললেন না। স্মিত ভঙ্গিতে তাঁর ঠোঁট দুটি ঈষৎ বিভক্ত হল মাত্র।

মাধবরাও বললেন, 'যাক ওকথা, আপনিই তো এখানকার দুর্ভিক্ষেব খবর দিয়েছিলেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু—' এই পর্যন্ত বলে অনুচ্চারিত প্রশ্নের ভঙ্গিতে থেমে গেলেন রেভারেণ্ড আপ্তে।

'আপনি কি বলতে চান, বুঝেছি। আমাদের ইনস্পেকসানে আসতে কেন দেরি হল সে কথা মিস্টার ডানিয়েলকে বলেছি। এখন কেমন অবস্থা চলছে, বলুন।'

'এখন ওরা মোটামুটি সামলে উঠেছে। তবে—'

'কী?'

এবার রেভারেণ্ড আপ্তে গত দু-তিন মাসের কাহিনী বলে গেলেন। আরব সাগর কৃপণ হয়ে যাওয়াতে কিভাবে দুর্ভিক্ষ শুরু হয়েছিল, মানুষ খাদ্যেব অভাবে অখাদ্য খেয়ে কিভাবে মহামারী ডেকে এনেছিল তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়ে গেলেন তিনি এবং সেই মহামারী কতকগুলি জীবন ছিনিয়ে নিয়ে গেছে তা-ও বাদ দিলেন না। মোট কথা, কোঙ্কন উপকূলের এই অংশটা গত দু-তিন মাস যে বিপর্যয়ের মধ্যে গিয়ে পড়েছিল তার মর্মন্তুদ একটা ছবি মাধবরাওদের চোখের সামনে এঁকে দিলেন।

রেভাবেণ্ড আপ্তের ব্যাখ্যা এবং বর্ণনাভঙ্গি অত্যন্ত জীবন্ত। মুহূর্তে তা যেন সত্তার ভেতরে সঞ্চারিত হয়ে যায়। কিছুক্ষণের জন্য সমস্ত পরিবেশটা গভীর বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে রইল।

অনেকক্ষণ পর মাধবরাও বললেন, 'এমন ব্যাপার হয়ে গেছে তা তো আমরা জানি না। আচ্ছা আপনি তো বললেন ইদানীং ওরা সামলে উঠেছে। সামলালো কি করে?'

চার্চের মেডিক্যাল স্কোয়াড কিভাবে মহামারীর সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদের বাঁচিয়েছে এবং রোগমুক্তির পর সাতারা জেলায় কার্পাস চাষের মাটি চৌরস করে কিভাবে কিছু টাকা পেয়ে তারা সামাল দিয়েছে, রেভারেণ্ড আপ্তে তা বললেন। ইদানীং দু-চারদিন এখানকার বাসিন্দারা যে সমুদ্রে যাচ্ছে এবং সেখানে আবার যে মাছ পাওয়া যাচ্ছে তাও জানিয়ে দিলেন।

মাধবরাও কিছু বললেন না, শুধু আস্তে আস্তে মাথা নাড়লেন।

রেভারেণ্ড আপ্তে আবার বললেন, 'এই মহামারী আর দুর্ভিক্ষ একেবারে প্রতি বছরের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। ক্রনিক রোগের মত বলতে পারেন।'

•

মাধবরাওদের আসার খবর কালই দিগ্‌দিগন্তে ছড়িয়ে পড়েছিল। মনপুরার লোকেরা তো ছিলই, চারিদিকের গ্রাম থেকে বেলা বাড়াব সঙ্গে সঙ্গে দলে দলে মানুষ এসে গঙ্গাবাঈয়ের বাড়ির সামনে ভিড় জমাতে লাগল। কে যেন তাদের বুঝিয়েছে মাধবরাওরা সরকারী সাহায্য দেবার জন্য এসেছেন। টাকা পাওয়া যাবে তাঁদের কাছে, অজস্র টাকা। আর পাওয়া যাবে নিশ্চিন্ত জীবনের প্রতিশ্রুতি। তাদের চোখেমুখে ক্ষণে ক্ষণে আশা নিরাশার আলোছায়া খেলে যাচ্ছে।

মাধবরাওয়ের বদলে এবার বিনায়ক ঘাটে বলে উঠলেন, 'প্রতি বছরেই তো এইরকম মন্বন্তর আর দুর্ভিক্ষ লাগে, বললেন।'

রেভারেণ্ড আপ্তে মাথা নাড়লেন, 'হ্যাঁ।'

'গভর্নমেন্টকে এ খবর আগে দ্যাননি কেন?'

'গভর্নমেন্টের কাছ থেকে এ ব্যাপারে কোন সাহায্য পাওয়া যেতে পারে কিনা সে সম্বন্ধে আমাদের ধারণা ছিল না।'

মাধবরাও তাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ রেখে শুনে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, 'এবার ধারণা হল কি করে?'

ডানিয়েলকে দেখিয়ে রেভারেণ্ড আপ্তে বললেন, 'এই এঁর জন্যে।'

চাপাস্বরে কতকটা স্বগোতক্তির মত মাধবরাও উচ্চারণ করলেন, 'আমারও তাই মনে হচ্ছিল।'

তাঁর কথা আর কেউ না শুনলেও ডানিয়েলের কানে পৌঁছে গেছে। অজ্ঞাত আশঙ্কায় মনে মনে চকিত হয়ে উঠল সে।

এদিকে রেভারেণ্ড আপ্তে বলতে লাগলেন, 'উনি বুঝিয়েছেন, এরা যখন এদেশের মানুষ, গভর্নমেন্টের কর্তব্য তাদের বিপদে আপদে সাহায্য করা। রাষ্ট্র যখন জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত তখন সাধারণ মানুষের ডাকে তারা সাড়া দিতে বাধ্য। তাদের কল্যাণের জন্যেই তো গণতন্ত্র।'

বিনায়ক ঘাটে বললেন, 'উনি ঠিকই বলেছেন। তবে জনসাধারণের বিপদের কথাটা গভর্নমেন্টকে সঙ্গে সঙ্গে না জানালে তারা তো আন্দাজে সাহায্য করতে আসতে পারে না।'

'ঠিক কথা। কিন্তু ব্যাপারটা কি জানেন—' ক্ষোভের সুরে রেভারেণ্ড আপ্তে বললেন, 'আমরা ঠিক সময়েই খবর পাঠিয়েছিলাম। আপনারা এলেন সব চুকে যাবার পর।'

লজ্জিত ভঙ্গিতে বিনায়ক ঘাটে বললেন. 'সে ত্রুটিঅবশ্য আমাদের হয়েছে। আর যা হবার তা তো হয়েই গেছে। ভবিষ্যতে যাতে আর না বিপদ হয় সে চেষ্টা আমরা করব। এখন গ্রামগুলো আমরা ঘুরে দেখতে চাই।'

'নিশ্চয়ই।'

এদিকে আরেকটা ব্যাপার ঘটছিল। মাধবরাও রেভারেণ্ড আপ্তে এবং বিনায়ক ঘাটের কথোপকথন শুনে যাচ্ছিলেন ঠিকই, ফাঁকে ফাঁকে দু-একটা মন্তব্যও করছিলেন। কিন্তু তাঁর চোখ ছিল ডানিয়েলের দিকে। তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে কি যে তিনি খুঁজে যাচ্ছিলেন, তিনিই জানেন। আর কাল মাধবরাওদের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকে ডানিয়েলের যে অস্বস্তি শুরু হয়েছিল সেটা ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে। তার ইন্দ্রিয়গুলো একটা কিছুর আভাস পেয়েছে যেন। সেটা যে কী, স্পষ্ট করে বোঝা যাচ্ছে না। যাচ্ছে না বলেই বুকের মধ্যে, নাকি পাঁজরের তলায় অথবা অনুভূতির কোনো দুর্জ্ঞেয় অংশে একটা কাঁটার মত সেটা খচ খচ করে বাজছে।

মাধবরাও বলেছিলেন পরের দিনই ইনস্পেকসান চুকিয়ে চলে যাবেন। কিন্তু দশখানা গ্রাম ঘুরে দেখতে পুরো দুটো দিন লেগে গেল। গ্রামগুলোই নয়, এখানকার মানুষদের জীবিকা এবং আড়তে গিয়ে তাদের প্রবঞ্চিত হওয়ার নমুনাও দেখিয়ে দেওয়া হল।

দু-দিন চরকি বাজির মত ঘুরবার পর আবার সবাই মনপুরায় ফিরে এল।

বিনায়ক ঘাটে বললেন, 'আপাতত এরা মোটামুটি ভালই আছে। সরকারী সাহায্য এখন নিশ্চয়ই দরকার নেই। অবস্থা খারাপ হলে খবর দেবেন, সঙ্গে সঙ্গে সাহায্য এসে যাবে।'

ডানিয়েল বলল, 'না—'

'কী?'

'এমনি সাময়িকভাবে দু-দশ টাকা দিয়ে লাভ নেই। টাকা দেবেন, ওরা খেয়ে ফেলবে অথচ স্থায়ী কোন উপকার হবে না।'

'আপনি কী করতে বলছেন?'

'বছর বছর দুর্ভিক্ষ আর মহামারী ঠেকাবার মাত্র একটা উপায়ই আছে।'

'কী সেটা?'

'এদের স্থায়ী উপার্জনের একটা ব্যবস্থা করে দেওয়া।'

'তা কিভাবে সম্ভব?'

ডানিয়েল বলতে লাগল, 'আপনি তো আড়তগুলো দেখে এলেন। কিভাবে আড়তদারেরা মাছমারাদের ঠকায় তা-ও আপনাকে বলেছি। যদি গভর্নমেন্ট থেকে এদের মাছ ধরার নৌকো, জাল এবং সাজ-সরঞ্জাম কিনে দেওয়া হয় আর সেই সঙ্গে একটা আড়ত খোলা হয় তা হলে ওরা বঞ্চনার হাত থেকে বাঁচে। তাতে আয় অনেকগুণ বেড়ে যাবে। তখন সুদিনে ওরা ভালই সঞ্চয় করতে পারবে। দুর্দিনে তা থেকেই চলে যাবে। দুর্ভিক্ষ বা মহামারী ওদের স্পর্শও করতে পারবে না।'

অনেকক্ষণ গভীরভাবে চিন্তা করলেন বিনায়ক ঘাটে। তারপর বললেন, 'আপনি যা বলেছেন তা-ই একমাত্র স্থায়ী পন্থা কিন্তু ওটা আমার এক্তিয়ারের বাইরে। আপনারা বরং এক কাজ করুন, মাছটাছ ধরার জন্যে ওদের কি কি প্রয়োজন তার মোটামুটি একটা এস্টিমেট করে আবেদন করুন। আমি জায়গামত সেটা পাঠিয়ে একটা লোনের ব্যবস্থা করে দেব।'

'উঁহু-উঁহু—'

'কী?'

'লোন মানেই তো শোধের প্রশ্ন আছে। ওটা একেবারে সাহায্য হিসেবে পাওয়া যায় কিনা তা-ই দেখবেন। গভর্নমেন্টের কত টাকাই তো কতভাবে খরচ হয়। এই মানুষগুলোর জন্য ক'টা টাকা যদি যায়ই, কিছু ক্ষতি হবে না। বরং ওরা দু-হাত তুলে আশীর্বাদ করবে।'

'এমন ব্যাপারে সাহায্য হয় কিনা আমার জানা নেই। তবে আমি চেষ্টা করব। আর যদি লোন ছাড়া কিছু পাওয়া না যায় তাতে অসুবিধে নেই। ঐ লোনটা হবে দীর্ঘমেয়াদী। সামান্য কিছু ইন্টারেস্ট দিয়ে পনের-কুড়ি বছরের মধ্যে শোধ করে দিলেই চলবে।'

আবেদন-পত্র নিয়ে সেদিন দুপুরেই দলটা কোলাপুর চলে গেল। যাবার আগে মাধবরাও ডানিয়েলকে বললেন, 'আবার আমি আসব।'

সত্যি সত্যিই আরো বার দুই তিন মাধবরাও এলেন। তবে একা, সঙ্গে বিনায়ক ঘাটে অথবা আর্দালীটা নেই।

এখানে এসে ডানিয়েলের সঙ্গে শারীরিক কুশল জাতীয় দু-একটা ভদ্রতার কথা বলেন। তারপরেই গ্রামে গ্রামে ঘুরে বিভিন্ন লোকের সঙ্গে কি আলোচনা করেন। আলোচনার বিষয়বস্তু যে ডানিয়েল স্বয়ং সে কথা তার কানে টুকরো টুকরো ভাবে আসছে। ডানিয়েল কোথা থেকে এসেছে, কতদিন আছে, এখানে কি করে, ইত্যাদি ইত্যাদি সম্বন্ধে মাধবরাওয়ের অসীম কৌতূহল।

এ কৌতূহল একান্তই নির্দোষ। তবু বেছে বেছে তার সম্বন্ধেই এত জিজ্ঞাসাবাদ কেন? শুধু তার জন্যই কি দুর্গম পাহাড়ী পথ পাড়ি দিয়ে মাধবরাও এখানে আসেন? কথাগুলো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ডানিয়েল যতবার ভাবল গাঢ় গহন এক উদ্বেগ তার সত্তাকে যেন আচ্ছন্ন করে ফেলতে লাগল।

মাধবরাও শেষবার এসেছিলেন জৈষ্ঠ্যের প্রথম দিকে। এখন আষাঢ়ের শুরু। অর্থাৎ মাঝখানে একটা মাস পার হয়ে গেছে।

একমাস যখন মাধবরাও আসছেন না তখন ডানিয়েলের উদ্বেগ কিছুটা কমে এসেছে। তা ছাড়া মনপুরায় একটা চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটে গেছে। সেই ঘটনাটা মাধবরাওয়ের দিক থেকে তার মনোযোগ অন্য দিকে সরিয়ে দিয়েছে।

ঘটনাটা এইরকম। ভাওজীর ছোট ভাই মুকুন এই গ্রামেরই ধনিরামের বৌর সঙ্গে পালিয়ে যাচ্ছিল। পালাতে অবশ্য পারেনি, গ্রামের সীমান্ত পেরিয়ে কিছুদূর যাওয়ার পর ধরা পড়ে গেছে।

আজ সেই গর্হিত কাজের বিচার। সুভদ্রা কিছুদিন আগে পঞ্চায়েতের দায়িত্ব ডানিয়েলের হাতে সঁপে দিয়েছিল। কাজেই বিচারকের আসনে তাকেই বসতে হয়েছে।

বিচারসভা বসেছে গ্রামের মাঝখানে খোলা মাঠটায়। মনপুরা গ্রামের আর কেউ বাকি নেই, এমন কি আশেপাশের গ্রাম থেকে অনেকেই এই চাঞ্চল্যকর মামলা দেখতে এসেছে।

একটা উঁচু পাথরের ওপর বসেছে ডানিয়েল। তার খানিকটা দূরে সুভদ্রা। সামনে একদিকে মুকুন ঘাড় নিচু করে বসে আছে। ধনিরামের বৌর বসার ভঙ্গিও ঐ একই রকম। তবে দু-হাতে তার মুখ ঢাকা। তাদের পর থেকে মানুষের ভিড়।

ডানিয়েল ডাকল, 'এই হারামজাদা মুকুন—'

মুকুনের বয়স বেশি নয়, কুড়ি একুশের মত। ইতিমধ্যে প্রচণ্ড মার খেয়েছে সে। সারা গায়ে দাগড়া দাগড়া আঘাতের চিহ্ন ফুটে বেরিয়েছে। একবার আরক্ত চোখ তুলেই নামিয়ে নিল সে।

ডানিয়েল বলল, 'এ কাজ করেছিলি কেন হতভাগা? জানিস না এ অন্যায়?'

মুকুন বিড়বিড় করে বলতে লাগল, 'আমি কিছু করতে চাই নি।' ধনিরামের বৌকে দেখিয়ে বলল, ও-ই আমাকে নিয়ে যাচ্ছিল।'

সঙ্গে সঙ্গে ধনিরামের বৌ ফোঁস করে উঠল, 'আমি মেয়েমানুষ, আমি ওকে নিয়ে যেতে পারি সাহেব! ও-ই আমায় ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল।'

এবার লাফিয়ে উঠল মুকুন। দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বলল, 'শালী বদমাস মাগী, আমি নিয়ে যাচ্ছিলাম!'

ধনিরামের বৌ মুখ থেকে হাত সরিয়ে তড়াক করে উঠে দাঁড়াল। বয়েস তার বছর তিরিশেকের মত। সর্বাঙ্গে উল্কির দাগ, চোখদুটো বিড়ালীর মত কটা। সারা দেহে কেমন যেন উগ্র যৌন আবেদন মাখানো। নিজের স্বরূপ দেখাতে সে-ও খুব দেরি করল না। তীক্ষ্ণ ধারালো গলায় বলল, 'শোরের বাচ্চা, বেশ্যার বেটা, আমি তোকে ভুলিয়েছিলাম না তুই আমাকে ভুলিয়েছিলি? বলিস নি, শহরে নিয়ে আমায় রাণীর হালে রাখবি, আমায় সোনার গয়না দিবি, শাড়ি দিবি—'

বোঝা গেল একজন আরেকজনকে নানা প্রলোভনে আকৃষ্ট করেছিল, মুগ্ধ করেছিল, বশীভূত করেছিল। এখন ধরা পড়ে যাওয়ায় পরস্পরকে দোষারোপ করছে।

যাই হোক ডানিয়েল চেঁচিয়ে উঠল, 'এই বদমাসেরা চুপ, একদম চুপ। অন্যায় করে গলা চড়িয়ে কথা বলতে লজ্জা হয় না! আলজিভ টেনে একেবারে ছিঁড়ে ফেলব।'

মুকুন আর ধনিরামের বৌ—দু-জনেই থমকে গেল।

একটু চুপ করে থেকে ডানিয়েল জিজ্ঞেস করল, 'এই মুকুন, তোর বয়েস কত?'

মুকুন বলল, 'কুড়ি।'

এবার ধনিরামের বৌর দিকে তাকিয়ে ডানিয়েল জিজ্ঞেস করল, 'তোর?'

'এক কুড়ি আট।'

'হারামজাদা হারামজাদীর লঘুগুরু জ্ঞান নেই, এ্যাঁ। আমার বিচারে সবার সামনে দশ ঘা জুতো খেতে হবে মুকুনকে আর ধনিরামের বৌ মেয়েমানুষ, তাকে জুতো মুখে করে তার বাড়ি পর্যন্ত যেতে হবে।' রায় দিয়ে ভিড়টার দিকে তাকিয়ে ডানিয়েল শুধলো, 'কি, তোমাদের আপত্তি নেই তো?'

সমস্বরে জনতা জানাল, 'না-না-না—'

'তা হলে কেউ একখানা জুতো নিয়ে এসো।'

তৎক্ষণাৎ একখানা পুরনো নাগরা এসে পড়ল। দর্শকদের মধ্যে গণেশ দাঁড়িয়ে ছিল। তাকে ডেকে মুকুনকে পিছমোড়া বেঁধে জুতো মারতে বলল ডানিয়েল।

পিঠে দশ ঘা জুতোর দাগ আঁকা হওয়ার পর মুকুনকে সতর্ক করে ছেড়ে দিল ডানিয়েল। 'ভবিষ্যতে কোনদিন এজাতীয় অন্যায় করলে শাস্তিটা আরো মারাত্মক হবে।'

ধনিরামের বৌও জুতো মুখে নিয়ে স্বামীর ঘরে রওনা হল। সে ঠিকমত যায় কিনা তা দেখবার জন্য একদল লোক তার পিছু পিছু গেল। খানিক পরে ফিরে এসে তারা খবর দিল, আদেশ যথাযথ পালন করা হয়েছে।

ধনিরামের বৌ বা মুকুন—অপরাধী দু'জন নেই তবু ডানিয়েলকে ঘিরে ভিড়টা ঠিকই আছে। তারা নিজেদের মধ্যে উত্তেজিতভাবে কথা বলছে। সবার আলোচনা এবং মতলব শুনে মনে হচ্ছে ডানিয়েলের রায় তাদের খুব পছন্দ হয়েছে।

সুভদ্রা তখনও বসে আছে। তার দিকে তাকিয়ে ডানিয়েল বলল, 'কি, বিচার ঠিক হয়েছে?'

সুভদ্রা কি উত্তর দিতে যাচ্ছিল, তার আগেই হুম হাম করতে করতে ক'টা প্রকাণ্ড পাল্কি এসে ভিড়টার সামনে থামল। পাল্কি-দুটোর সঙ্গে রয়েছেন মাধবরাও আর জন পনের মহারাষ্ট্র পুলিশ।

ব্যাপারটার আকস্মিকতায় সবাই বিস্মিত, সচকিত। নির্ণিমেষে তারা পাল্কিদুটো এবং পুলিশ বাহিনীর দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

এদিকে বাহকেরা পাল্কি নামিয়ে একপাশে গিয়ে বসেছে। পাগড়ী খুলে সেটা নেড়ে নেড়ে বাতাস খাচ্ছে। দেখেই বোঝা যায় তারা শ্রান্ত, ক্লান্ত, অবসন্ন।

একদিকে একখানা পাল্কির পাল্লা খুলে যিনি বেরিয়ে এলেন তাঁকে দেখামাত্র হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ হয়ে গেল ডানিয়েলের। মা এসেছেন।

এতদিনে তার সম্বন্ধে মাধবরাওয়ের অপার কৌতূহল, তাঁর তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী দৃষ্টি, তাঁর ঘন ঘন মনপুরায় আসা—ইত্যাদি ব্যাপারের একটা যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া গেল।

কিন্তু মা! ক'মাস আগে যেদিন ডানিয়েল জলগাঁও থেকে পালিয়েছিল সেদিনকার চেয়ে অনেক রোগা হয়ে গেছেন। চোখদুটি যেন গর্তে ঢুকে গেছে, তার তলায় গাঢ় কালির পোচ, দৃষ্টি কেমন যেন ঝাপসা। হাতের শিরা এবং কণ্ঠার হাড় ফুটে

বেরিয়েছে। সর্বাঙ্গে গভীর এক অবসাদ মাখা। মায়ের এমন দীন শ্রীহীন চেহারা আগে আর কখনও দেখেছে বলে মনে করতে পারল না ডানিয়েল।

ইঙ্গিতে তাকে দেখিয়ে মাধবরাও মায়ের কানে কানে কি যেন বললেন। মা আস্তে আস্তে মাথা নাড়লেন। মাধবরাও কি বলেছেন তা বুঝতে ডানিয়েলের বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয় নি।

আচমকা একটা ভাবনা ডানিয়েলের মাথায় ভর করে বসল। মা একাই এসেছেন কিন্তু বাবা কোথায়? মা কি সেই থেকে ইণ্ডিয়াতেই আছেন? এই প্রশ্নগুলির উত্তর মায়ের সঙ্গে কথা না বলা পর্যন্ত পাওয়ার উপায় নেই।

সম্মোহিতের মত পায়ে পায়ে কাছে এগিয়ে এল ডানিয়েল। খুব আস্তে ডাকল, 'মা—'

মায়ের ঠোঁটদুটো কেঁপে কেঁপে ঈষৎ দ্বিধাবিভক্ত হল। প্রথম বার কিছু বলতে পারলেন না তিনি। তারপর প্রাণপণ চেষ্টা করে অবরুদ্ধ গলায় বললেন, 'ও নামে আমাকে আর ডেকো না। সে অধিকার বোধহয় তোমার আর নেই।'

আদুরে ছেলেমানুষের মত দু-হাতে মাকে জড়িয়ে ধরে গাঢ় স্বরে ডানিয়েল বলতে লাগল, 'তুমি আমার ওপর রাগ করেছ মা? রাগ করেছ?'

একটু চুপ করে থেকে আগের স্বরেই মা বললেন, 'ক্রুয়েল হার্টলেশ বয়—'

'তুমি আমাকে ক্ষমা কর মা।'

ডানিয়েলের কথা যেন শুনতে পেলেন না মা। আপনমনেই বলে যেতে লাগলেন, 'জলগাঁও স্টেশন থেকে সেই যে পালালে তারপর আর কোনো খবর নেই। আমাদের কি ভাবনায় ফেলেছিলে তা তোমার মত হৃদয়হীন ছেলের পক্ষে বুঝবার কথা নয়। তোমার বাবা থাকতে পারলেন না, জরুরী কাজে তাঁকে দেশে ফিরে যেতে হল। আমি যেতে পারলাম না। সেই থেকে ইণ্ডিয়াতেই থেকে গেছি। থাকতাম অবশ্য বোম্বেতে কিন্তু তোমার খোঁজে কতবার দিল্লী মাদ্রাজ কলকাতা করেছি তার ইয়ত্তা নেই। রেডিও মারফত, খবরের কাগজ মারফত তোমার খোঁজ করেছি। ইণ্ডিয়ার যত থানা আছে সব জায়গায় তোমার ফোটো পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কে জানত শহর ছেড়ে এতদূরে তুমি এসে লুকিয়ে আছ! মিস্টার মাধবরাওকে অশেষ ধন্যবাদ যে শেষ পর্যন্ত তিনি তোমাকে খুঁজে বার করতে পেরেছেন।'

তার জন্য কি অশেষ ক্লেশ মাকে স্বীকার করতে হয়েছে, কি নিদারুণ উৎকণ্ঠায় তাঁর দিন কেটেছে—সে সব অনুভব করতে চেষ্টা করল ডানিয়েল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'আমার জন্যে তোমাকে অনেক কষ্ট পেতে হয়েছে, না মা?'

'না, একটুও কষ্ট পেতে হয় নি।'

ওটা মায়ের অভিমানের কথা। ডানিয়েল কি বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই দ্বিতীয় পাল্কিখানা দেখিয়ে মা বললেন, 'এবার দয়া করে ঐ পাল্কিটায় উঠে বোসো। এখুনি আমরা রওনা হব।'

ডানিয়েল চমকে উঠল, 'এখুনি?'

'হ্যাঁ. এখুনি।' কঠিন স্বরে মা বললেন।

ডানিয়েলের মনে হল, তার স্নেহময়ী জননী নয়, লেডী হাঙ্গারফোর্ড। ডন ফ্রান্সিস অফ হ্যামেস্টেডশায়ার আদেশ দিয়েছেন।

মা আবার বললেন, 'আর একটি মুহূর্তও তোমার এখানে থাকা চলবে না। এই জংলীদের মধ্যে থেকে নিজের কী হাল করেছ হুঁশ আছে? নিজের চেহারার দিকে এখানে আসার পর কোনোদিন নজর দিয়েছ? তোমার দিকে তাকিয়ে আমার নিজেরই আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে করছে।'

ডানিয়েল চকিত হয়ে উঠল। নিজের অজান্তে হাত দুটো মুখে উঠে এল। গালভর্তি বহুদিনের সঞ্চিত দাড়ি। মাথার সোনালী চুলগুলো তেলহীন, রুক্ষ। অযত্নে আর অবহেলায় সেগুলো জটা বেঁধে গেছে। গায়ের চামড়া মসৃণতা হারিয়ে কর্কশ, খসখসে। স্বর্ণাভ গাত্রবর্ণ রোদে জলে তামাটে হয়ে গেছে। পা দুটি খালি। পরনের ট্রাউজার আর জামাটা ময়লায় চিটচিটে। ভবিষ্যতে যে লর্ড সভায় গিয়ে চোখ ধাঁধিয়ে দেবে তার আদর্শ চেহারাই বটে! তার সযত্ন-লালিত শরীর সমস্ত শ্রী, লাবণ্য, কান্তি হারিয়ে বসেছে।

এতদিন নিজের দিকে চোখ ফেরাবার কথা ডানিয়েলের খেয়াল ছিল না। তেমন অবকাশও সে পায় নি। মায়ের কথায় আজ প্রথম সে নিজেকে দেখল।

মা-ও তাকে দেখছিলেন। দেখতে দেখতে হয়ত কান্নাই পাচ্ছিল তাঁর। কিন্তু মার্জিতা, রুচিশীলা, সুশিক্ষিতা মা এতকাল পর তাকে প্রথম দেখেও ভাবাবেগ সংযত করে রেখেছিলেন। এখনও সেটাকে দূরন্ত বেগে বেরিয়ে যেতে দিলেন না। শুধু আস্তে আস্তে বললেন, 'এই জায়গাটা তোমার ওপর যে প্রভাব ফেলেছে তা ঘষে-মেজে তুলতে আমার অনেক কষ্ট করতে হবে। আর দাঁড়িয়ে থেকো না। উঠে পড়।'

ডানিয়েল ডাকল, 'মা—'

'কী বলছ?'

ডানিয়েল বুঝেছে আজই, এখনই তাকে চলে যেতে হবে। বলল, 'অনেকদিন এখানে আছি। ওদের সবার কাছ থেকে বিদায় না নিলে খারাপ দেখাবে।'

মা বললেন, 'যাও, তাড়াতাড়ি বিদায় নিয়ে এসো।'

পেছনের সেই জনতার দিকে যেতে গিয়েও হঠাৎ থমকে দাঁড়াল ডানিয়েল। একটা কথা মনে পড়েছে তার। দ্বিধান্বিত সুরে সে ডাকল, 'মা—'

'আবার কী?'

'আমাকে হাজার কুড়ি টাকা দিতে হবে।'

'কী হবে অত টাকা দিয়ে?'

'এরা বড় ভাল, বড় গরীব। ওদের ঐ টাকাটা আমি দিয়ে যেতে চাই।'

'কিন্তু অত টাকা তো আমার সঙ্গে নেই। পরে পাঠিয়ে দেওয়া যেতে পারে।'

'তা হলেই হবে।' বলে এলোমেলো পায়ে আবার পেছন ফিরে এগিয়ে এল ডানিয়েল।

'স্তব্ধ বিস্ময়ে জনতা এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। ডানিয়েল ফিরতেই তারা ঘিরে ধরল, 'ঐ মেমসাহেব কে সাহেব?'

'আমার মা।'

'কী করতে এসেছে?'

'সব বলব। তার আগে একজন চার্চে গিয়ে রেভারেণ্ড আপ্তেকে খবর দাও। আর ক'জন গিয়ে চার পাশের গ্রামে আর আড়তে খবর দিয়ে এস। বলবে, এক্ষুনি আমি তাদের এখানে আসতে বলেছি। যত কাজই থাক, সব ফেলে যেন তারা চলে আসে।'

দশ বারোটি লোক তীরের মত দিগ্বিদিকে ছুটে গেল।

মা বলেছিলেন তাড়াতাড়ি বিদায় নিতে। কিন্তু প্রায় ঘণ্টাখানেক লাগল সবার এসে পৌঁছুতে। চার্চ থেকে রেভারেণ্ড আপ্তে এবং অন্য মিশনারিরা চলে এসেছেন। অন্য অন্য গ্রামের ছেলে-বুড়ো, যুবক-যুবতী, কেউ আর বাকি নেই। সবাই এসে হাজির হয়েছে। আড়তদারেরা এসেছে, এমন কি সুখে-দুঃখে উদাসীন শিবরাম পর্যন্ত এসেছে। সমস্ত কোঙ্কন উপকূল আজ মনপুরা গ্রামে ডানিয়েলের চারপাশে এসে ভিড় জমিয়েছে। এ গ্রামের লোকজনেরা তো ছিলই। তাদের মধ্যে ভামুয়া বুড়ী, বুড়ো যশোবন্ত, রতি-গণেশ, মধুকর, টিকুলরামকে বড় বেশি করে এই মুহূর্তে চোখে পড়ছে। সর্বক্ষণের সঙ্গী লোলা আর সেই কুকুরছানাটা তো আছেই। অবশ্য কুকুরটা ইদানীং আর বাচ্চা নেই, রীতিমত সাবালক হয়ে উঠেছে।

যতক্ষণ সবাই এসে পড়ে নি ততক্ষণ যারা ছিল তাদের ভালভাবে থাকতে বলেছে ডানিয়েল। সবাই জিজ্ঞেস করেছে, হঠাৎ এ জাতীয় কথা কেন বলছে ডানিয়েল। উত্তর দ্যায় নি সে।

যারা ছিল তাদের সবার সঙ্গেই কথা বলেছে ডানিয়েল। শুধু একজন বাদ। সে সুভদ্রা—সুভদ্রা যোসেফ। তার কাছে গিয়ে দাঁড়াতে ডানিয়েলের বুঝিবা সাহস হয় নি। তবে কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে সে লক্ষ্য করেছে, নির্ণিমেষে তারই দিকে তাকিয়ে আছে সুভদ্রা। ওদিকে মা পাল্কির প্রান্ত ধরে ঠায় দাঁড়িয়ে আছেন।

যাই হোক, সবাই এসে গেলে ডানিয়েল প্রথমে গেল রেভারেণ্ড আপ্তের কাছে। দুরন্ত আবেগে তাঁর দু-খানা হাত ধরে বলল, 'আমার মা আমাকে নিতে এসেছেন। আপনাকে একদিন বলেছিলাম, আমার কেউ নেই। মিথ্যে বলেছিলাম। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।'

রেভারেণ্ড আপ্তে তাকে বুকের ভেতর টেনে নিলেন। বললেন, 'ও কথা বলবেন না।'

'আমি ইংল্যাণ্ডের লর্ড ফ্যামিলির ছেলে। আমার দুর্ভাগ্য, কমনাবদের সঙ্গে মিশে মানবসেবা আমার পক্ষে আর সম্ভব হবে না। আপনারা ঐ ব্যাপারে সুযোগ দিয়েছিলেন, সেজন্যে চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকব।'

'এই ক'মাস মানুষের কল্যাণের জন্য যে সারভিস দিয়ে গেলেন তার তুলনা নেই। করুণাময় আপনার মঙ্গল করবেন।'

ডানিয়েল বলল, 'একটা কথা। এখান থেকে দেশে ফিরে আপনার নামে কুড়ি হাজার টাকা আমি পাঠাব। সরকারী লোন কবে আসবে তার তো কোন স্থিরতা নেই। ঐ টাকাটা এখানকার মানুষের ভালর জন্যে আপনার ইচ্ছামত খরচ করবেন। আমার এই ইচ্ছাটা আপনাকে পূরণ করতেই হবে।'

রেভারেণ্ড আপ্তে কিছু বললেন না। শুধু ডানিয়েলকে বুকের ভেতর আরো নিবিড়ভাবে চেপে ধরলেন।

হঠাৎ কি মনে হতে ডানিয়েল আবার বলে উঠল, 'একটা ব্যাপারে আমার শুধু আপসোস রয়ে গেল। একদিন আপনি আমাকে কী যেন বলতে চেয়েছিলেন তা আর শোনা হল না।'

রেভারেণ্ড আপ্তে আবেগরুদ্ধ স্বরে বললেন, 'আমি আপনাকে যা বলতে চেয়েছিলাম তা আপনি করে গেছেন। তা হল মানবসেবা।'

রেভারেণ্ড আপ্তের কাছ থেকে কোঙ্কনবাসী সাধারণ মানুষগুলির মধ্যে চলে গেল ডানিয়েল। প্রত্যেকের কাছে গিয়ে হাত ধরে বিদায় চাইল সে।

ডানিয়েল চলে যাবে, প্রথমটা যেন বিশ্বাস করতে পারল না লোকগুলো। কিছুক্ষণ বিমূঢ় বিস্ময়ে শ্বাসরুদ্ধের মত তারা তাকিয়ে রইল। তারপর কেউ কেউ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। বিশেষ করে রতি গণেশ আর লোলার কান্নার বুঝি তুলনা নেই।

অবোধ কুকুরটা কি আন্দাজ করেছে, সে-ই জানে। ডানিয়েলের চারপাশে চক্কর দিচ্ছে সে, গায়ে গা ঘষছে আর কুঁই কুঁই করে অদ্ভুত এক শব্দ করছে।

সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অবশেষে শিথিল পায়ে সুভদ্রার কাছে এসে দাঁড়াল ডানিয়েল।

গীর্জাবাসিনী মেয়েটা নিষ্পলকে তাকিয়েই আছে। চোখদুটি তার অনেকখানি ফোলা, সাদা জমিটা ইতিমধ্যেই লাল হয়ে উঠেছে। সর্বাঙ্গে জীবনের কোন স্পন্দন নেই। শ্বাসক্রিয়া তার থেমে গেছে। হৃৎপিণ্ড অসাড়, ধমনীতে রক্তস্রোত বুঝি আর বইছে না।

খুব আস্তে ডানিয়েল ডাকল, 'সুভদ্রা—'

সঙ্গে সঙ্গে সেই নিষ্প্রাণ প্রস্তরীভূত মূর্তিটিতে জীবনের দুর্দম বেগ সঞ্চারিত হল। অস্থির গলায় সুভদ্রা বলল, 'আপনি যে রাজার দুলাল, একথা আগে বলেন নি কেন?'

ডানিয়েল লক্ষ্য করল এখন সুভদ্রার চোখের তারা দুটো বুঝি ফেটে যাবে। জোরে জোরে নিশ্বাস পড়ছে। তারই দোলায় বুকের উত্থানপতন ক্রমশ দ্রুততর হচ্ছে।

রেভারেণ্ড আপ্তের সঙ্গে তার একটু আগে যে কথা হয়েছে সেগুলো সুভদ্রা যে শুনেছে তাতে সন্দেহ নেই। আবছা গলায় ডানিয়েল কী একটা উত্তর দিল।

তার চোখে দৃষ্টি স্থির রেখে সুভদ্রা বলল, 'আপনি একজন শঠ, প্রতারক।'

সুভদ্রার চোখ উগ্র হয়ে উঠল, কণ্ঠস্বর চাপা এবং তীব্র। সে বলতে লাগল, 'যদি চলেই যাবেন তবে আমার এত ক্ষতি করলেন কেন?'

যে মেয়ে ক'দিন আগে একটি চুম্বনের জন্য উপবাস করেছে, অলটারে আকুল প্রার্থনা করে প্রায়শ্চিত্ত করেছে এ যেন সে নয়। সন্ন্যাসিনীর সমস্ত পরিচয় ছিন্ন করে সে আজ বেরিয়ে এসেছে। ডানিয়েলের একবার ইচ্ছা হল, শেষবারের মত তাকে একটু আদর করে যায়। ঘোরের মধ্যে সুভদ্রার দিকে একখানা হাত বাড়াতে গিয়েও সে থমকে গেল। তার বুকের ভেতর থেকে ফিসফিসিয়ে কে যেন বলল, এখন একটু স্পর্শে বিপর্যয় ঘটে যাবে। অতএব ইচ্ছাটাকে তার দমন করতে হল। ডানিয়েল বলল, 'আমি যাই।'

'যাবেনই তো, যাওয়ার জন্যেই পা বাড়িয়ে আছেন।'

'আবার যখন ইণ্ডিয়ায় আসব তখন নিশ্চয় এখানে এসে দেখা করে যাব।'

'দয়া করে এখানে আর কোনোদিন আপনাকে আসতে হবে না।'

বলতে বলতে স্বর রুদ্ধ হয়ে এল সুভদ্রার, অসহ্য অনুভূতিতে ঠোঁট থর থর করতে লাগল। ডানিয়েল লক্ষ্য করল, তার দীর্ঘ চোখদুটি আস্তে আস্তে জলে ভরে যাচ্ছে, আর তার তলায় কাল মণিদুটো ডুবে গেছে।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে কাঁপা শিথিল গলায় ডানিয়েল বলল, 'বেশ, আসব না। তবে একটা কথা। লোলার কেউ নেই, ওর দায়িত্ব তোমাকে নিতে হবে।'

সুভদ্রা উত্তর দিল না, শুধু চোখের মণি ডুবিয়ে দিয়ে যে জল টলমল করছিল এবার আর তা বাঁধ মানল না। অশ্রান্ত ধারায় নেমে এল।

ডানিয়েল আরো কিছু বলতে চাইল, পারল না। বুকের ভেতর থেকে ঢেউয়ের মত ফুলে ফুলে উঠে এসে কি একটা দুরন্ত আবেগ গলাটাকে একেবারে বুজিয়ে দিল।

কয়েকটি নিস্তব্ধ মুহূর্ত। সময় যেন কিছুক্ষণের জন্য দু-জনের মাঝখানে থমকে রইল। তারপর সুভদ্রার মুখের দিকে পরিপূর্ণ চোখে একবার তাকিয়ে পেছন ফিরে দ্রুত এলোমোলো পায়ে পাল্কিতে গিয়ে বসল ডানিয়েল।

মা এসেছিলেন দুপুরের কিছু পর। সন্ধ্যের কিছু আগে পাল্কি চলতে শুরু করল।

পাল্কির সঙ্গে সঙ্গে রেভারেণ্ড আপ্তে চলতে শুরু করলেন। তার পিছু পিছু কোঙ্কনের বিপুল জনতা। সেই কুকুটা কী যেন টের পেয়ে পাল্কির গা বেয়ে লাফিয়ে উঠতে চাইছে। প্রায় সবাই নিঃশব্দে কাঁদছিল। কিন্তু লোলা আর রতি সমস্ত নীরবতা বিদীর্ণ করে ফুঁপিয়ে চলেছে। কাঁদতে কাঁদতে তাদের হেঁচকি উঠে গেছে।

পাল্কির সঙ্গে সঙ্গে কোঙ্কন উপকূলের সবাই এসেছে। শুধু একজন ছাড়া। সেই ঘাসের জমিটার কাছে শুভ্র মূর্তির মত সে একা নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে। জনতার মাথার ওপর দিয়ে তার দিকেই নির্নিমেষে তাকিয়ে রইল ডানিয়েল। একসময় বিন্দুর মত ছোট হয়ে সুভদ্রা জোসেফ দৃষ্টির সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল। আর তখনই, তখনই ডানিয়েলের চোখ বেয়ে জল নামল। চোখের ভেতর এমন একটা সমুদ্র যে লুকিয়ে ছিল তা কে জানত।

নাকি ইণ্ডিয়ার স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়াই এর জন্যে দায়ী? চোখের স্নায়ু এবং সরু সরু শিরাগুলিকে দুর্বল করে তা বুঝি জলে ভরিয়ে দেয়।

অনেক দূর পর্যন্ত এসে কখন যেন কোঙ্কনবাসীরা দাঁড়িয়ে পড়েছিল, ডানিয়েল মনে করতে পারে না। দৃষ্টির সামনে থেকে তারাও হারিয়ে গেছে। এখন শুধু পাল্কি বাহকদের একটানা হুম হাম শব্দ ছাড়া আর কিছু নেই।

মোগল দরবারেব অপরিমেয় ঐশ্বর্যের কাহিনীতে, রাজপুত চিত্রকলার মনোহর রেখায়, রাজা-বাদশাহের গৌরব-গাথায়, অজন্তা ইলোরার প্রাণময় ছবিতে অথবা ইণ্ডোলজির সেই গ্রন্থগুলির পৃষ্ঠায় যে ভারতবর্ষ, তা নয়। অন্য এক ভারতবর্ষ দেখে গেল ডানিয়েল। শুধু দেখেই গেল না, জয়ও করে গেল।

বৃটিশ জাতির ইতিহাসে দিগ্বিজয়ের অসংখ্য কাহিনী বিপুল মহিমায় সোনার অক্ষরে লেখা আছে। কিন্তু হিস্ট্রি অফ ব্রিটানিয়ার কোনো পৃষ্ঠাতেই হৃদয়জয়ের ঐ সামান্য কাহিনীটুকু লেখা থাকবে না।

সমাপ্ত